কৈশোর থেকে হাশর

ফজলুল হক মজুমদার

কৈশোর থেকে হাশর

ফজলুল হক মজুমদার

আহসান পাবলিকেশন
বাংলাবাজার ❖ মগবাজার ❖ কাঁটাবন

www.nagorikpathagar.org

কৈশোর থেকে হাশর

ফজলুল হক মজুমদার

ISBN : 978-984-8808-85-6

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত।

প্রকাশনায় : আহ্সান পাবলিকেশন
কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, ঢাকা-১০০০

পরিবেশনায়
র‍্যাক্স পাবলিকেশন্স, ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
মক্কা পাবলিকেশন্স, ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা।
মাওলা প্রকাশনী, ১৯১ বড় মগবাজার, ঢাকা।
খেয়া প্রকাশনী, ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
কালাম বুক ডিপো, পয়ালগাছা বাজার, ডাকঘর : পয়ালগাছা, কুমিল্লা।

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারী, ২০১৭ ইং

প্রচ্ছদ : নাসির উদ্দিন

কম্পোজ : আহ্সান কম্পিউটার
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৬৭০৬৮৬

মূল্য : তিনশত বিশ টাকা।

Koishor theke Hashor written by Fazlul Huq Mazumder Published by Ahsan Publication, Katabon Masjid Campus, Dhaka-1000. First Edition February, 2017. Price Tk. 320.00 only.

AP-136

www.nagorikpathagar.org

লেখকের পরিচয়

ফজলুল হক মজুমদার ১৯৪৩ সালের ১৭ই মার্চ তারিখে কুমিল্লা জেলাধীন বরুড়া উপজেলার ভারুল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল জব্বার মজুমদার এবং মাতার নাম আশরাফুন্নিসা। তিনি স্থানীয় পয়ালগাছা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পয়ালগাছা হাইস্কুল থেকে ১৯৫৯ সালে ম্যাট্রিকুলেশন এবং কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে ১৯৬১ সালে আই.কম পাস করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গভঃ কলেজ অব কমার্স, চট্টগ্রাম থেকে ১৯৬৩ সালে বি.কম পাস করেন।

চাকুরি জীবনে তিনি বর্তমান চাঁদপুর জেলাধীন হাটিলা টঙ্গীরপাড় জুনিয়র হাইস্কুলে ০২/১০/১৯৬৩ ইং থেকে ০৬/০৬/১৯৬৪ ইং পর্যন্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর ৩০/০৮/১৯৬৪ ইং থেকে ২১/১১/১৯৬৮ ইং পর্যন্ত চট্টগ্রাম শহরের আগ্রাবাদ সরকারী কলোনী হাইস্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন এবং ২২/১১/১৯৬৮ ইং তারিখে তৎকালীন রেডিও পাকিস্তান, চট্টগ্রাম আঞ্চলিক অফিসের কমার্সিয়াল সার্ভিসের সহকারী বিজনেস ম্যানেজার হিসেবে যোগ দেন, কিন্তু ০২/০৫/১৯৬৯ ইং তারিখে সেখান থেকে পদত্যাগ করে একই দিনে উক্ত স্কুলের চাকুরিতে তিনি ফিরে আসেন। এ স্কুলে তিনি প্রায় দশ বছর চাকুরি করেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি অধিকাংশ সময় প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিতে শিক্ষক প্রতিনিধি ছিলেন এবং স্কুলের বার্ষিক ম্যাগাজিনের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি স্কুলের ইন্টারন্যাল অডিটরের দায়িত্বও পালন করতেন।

তিনি ১৯৭০ ইং সালে বিশেষ ই.পি.সি.এস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কোয়ালিফাই করেন এবং চাকুরির অপেক্ষায় থেকে উক্ত স্কুলে চাকুরি করতে থাকেন। তৎকালীন সরকার বি.সি.এস ফ্রিডম ফাইটার ও বি.সি.এস নন ফ্রিডম ফাইটার নামে দু'টি ক্যাডার সৃষ্টি করে সংক্ষিপ্ত পরীক্ষার মাধ্যমে

www.nagorikpathagar.org

তাদেরকে নির্বাচিত করে সরকারী ক্যাডার সার্ভিসে নিয়োগ দিয়ে বিশেষ ই.পি.সি.এস ও একই সময়ের বিশেষ সি.এস.এস উত্তীর্ণ চাকুরি প্রার্থীদের অধিকাংশকে ব্যাংক জাতীয়করণকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য নন-ক্যাডার সার্ভিসে নিয়োগ দেন। ফজলুল হক মজুমদারকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষানবিশ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

তিনি ১৫/০৬/১৯৭৫ ইং তারিখে স্কুলের চাকুরি থেকে পদত্যাগ করে ১৬/০৬/১৯৭৫ ইং তারিখে ব্যাংকের চট্টগ্রাম জেলার দোহাজারী শাখায় শিক্ষানবিশ কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেন। ট্রেনিং শেষে ১৭/০৫/১৯৭৭ ইং থেকে ১৯/১১/১৯৭৭ ইং পর্যন্ত সিলেট শাখায় সহকারী ম্যানেজার (লোন), ০৬/০৩/১৯৭৮ ইং থেকে ১৭/০১/১৯৮০ ইং পর্যন্ত রংপুর জেলাধীন পীরগঞ্জ শাখায় ম্যানেজার এবং ২৫/০১/১৯৮০ ইং থেকে ১৫/০৯/১৯৮৩ ইং পর্যন্ত পূর্বোক্ত দোহাজারী শাখায় ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর প্রিন্সিপাল অফিসার হিসেবে পদোন্নতি পাওয়ার পর ১৮/০৯/১৯৮৩ ইং থেকে ১২/০৭/১৯৮৪ ইং পর্যন্ত ভোলার (প্রথম) রিডিওন্যাল ম্যানেজার, ১৪/০৭/১৯৮৪ ইং থেকে ২৯/০১/১৯৮৫ ইং পর্যন্ত চট্টগ্রামের পটিয়ায় এবং ৩০/০১/১৯৮৫ ইং থেকে ০৭/০৭/১৯৮৮ ইং পর্যন্ত খাগড়াছড়িতে রিজিওন্যাল ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেন। ১৪/০৭/১৯৮৮ ইং তারিখে তিনি প্রধান কার্যালয়ের বাজেট বিভাগে সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। প্রধান কার্যালয়ে থাকা অবস্থায় তিনি সহকারী মহাব্যবস্থাপক হিসেবে পদোন্নতি পান। ১৯৯১ ইং সালের ২০ শে আগষ্ট তিনি আমেরিকার টেক্সাসে চলে যান এবং পদত্যাগ করেন। সেখানে ডাল্লাস-ফোর্টওয়ার্থ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের পার্কিং অপারেশন বিভাগে তের বছর চাকুরি করে ২০০৬ সালে পেনশন নিয়ে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৬৬ সালের ২ রা জুন তিনি হাসিনা আখতার (মালতী) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের তিন সন্তান আমেরিকায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। প্রথম সন্তান শাহেদা আখতার (শিল্পী) ইলেকট্রিক্যাল

www.nagorikpathagar.org

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মাষ্টার্স, দ্বিতীয় সন্তান রাসেল মাহমুদুল হক (শপথ) ডক্টর অব মেডিসিন এবং কনিষ্ঠ সন্তান এনামুল হক (সুমন) ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ব্যাচেলর ডিগ্রি লাভ করে নিজ নিজ ক্ষেত্রে চাকুরি শুরু করেন। শাহেদা আখতার (শিল্পী) ২০০৮ সালের ২৬ শে আগষ্ট স্বামী ও পাঁচ বছরের এক পুত্র সন্তান রেখে আমেরিকার ওহায়ো স্টেটের ক্লীভল্যাণ্ড ক্লিনিকে ইন্তেকাল করেন। সেই সালেই তার স্মরণে ভারুল গ্রামে শাহেদা ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয় যার অধীনে একটি কোরআনিয়া ও হাফেজী মাদ্রাসা, একটি ইসলামী পাঠাগার এবং সর্বসাধারণের জন্য একটি কবরের স্থান পরিচালিত হচ্ছে। তা ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন জনহিতকর কাজে অর্থ ব্যয় করা হয়।

ফজলুল হক মজুমদার কলেজ জীবন থেকে ছোট গল্প ও প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। বিভিন্ন ম্যাগাজিনে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬৭ সালে স্মৃতির অন্তরালে নামক তাঁর একটি সামাজিক উপন্যাস চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়।

২০০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি সস্ত্রীক হজ্জ করতে গিয়ে মক্কা মদীনা ও জর্ডানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেখে আসেন।

www.nagorikpathagar.org

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

বর্তমান সময়ে মানুষ জীবন ও জীবিকার তাগিদে এতই ব্যস্ত থাকে যে দৈনন্দিন জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীসের প্রয়োগের কথা চিন্তা করতে পারে না। অথচ এদের প্রয়োগ প্রতিটি ঈমানদারের জন্য বাধ্যতামূলক। এদের প্রতি অবহেলা পরকালের জন্য অনিষ্টের কারণ হতে পারে।

আমার এ বই অতি সাধারণ পাঠকের উদ্দেশ্যে লিখা। বিভিন্ন বিষয়ে কোরআন ও হাদীসের প্রাথমিক জ্ঞান দান করা আমার উদ্দেশ্য। প্রত্যেকটি বিষয়কে বোধগম্য করার জন্য কোরআনের আয়াতের বাংলা অনুবাদ এবং হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছি। কোরআনের ১১৪টি সূরার মধ্য থেকে ৮১টি সূরার ৫৯৭টি আয়াতের বাংলা অনুবাদ এ বইতে রয়েছে। আর এ বইতে উদ্ধৃত হাদীসের সংখ্যা ৫৭১টি। এদের মধ্যে বোখারী শরীফের ২২৩টি, সহীহ মুসলিমের ১৮৬টি এবং আবু দাউদ শরীফ, ইবনে মাজাহ শরীফ, তিরমিযী শরীফ, নাসাঈ শরীফ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ থেকে অবশিষ্ট ১৬২টি হাদীস নিয়েছি। বিষয় ভিত্তিক কোরআনের এতগুলো আয়াত ও এতগুলো হাদীস খোঁজ করে বের করা অনেকের পক্ষেই খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই আমি মনে করি আমার এ বইটি অনেক পাঠকের যথেষ্ট উপকারে আসবে।

বোখারী শরীফের হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়ার জন্য মেসার্স হামিদিয়া লাইব্রেরী লিমিটেডের মালিক জনাব গোলাম মাওলার সাথে ১২/০৪/২০১৩ ইং তারিখে টেলিফোনে আমার আলাপ হয়েছে এবং তিনি সানন্দে অনুমতি দিয়েছেন। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ১৮/০৪/২০১৩ ইং তারিখে ই-মেইলের মাধ্যমে তাদের প্রকাশিত সহীহ মুসলিম থেকে হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন। আমি অন্য কোন লেখক অথবা প্রকাশকের সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করিনি। আমি এ বইতে যাদের লেখা

www.nagorikpathagar.org

অথবা যে সকল প্রকাশকের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

কোরআনের কোন কোন তফসীর থেকে হুবহু তুলে দিয়েছি। আবার কিছু ক্ষেত্রে সাহায্য গ্রহণ করে আমার নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছি। তবে কোরআনের আয়াতের বাংলা অনুবাদ অপরিবর্তিত রেখেছি। হাদীসের উদ্ধৃতিতে ভাষাগত দু' এক শব্দের পরিবর্তন হয়ে থাকতে পারে। যে হাদীস একাধিক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে সে হাদীসের ক্ষেত্রে সকল গ্রন্থের বর্ণনার সমন্বয় করা হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু বিষয়বস্তুর কোন পরিবর্তন হয়নি।

আমি মাওলানা আবদুল হাকিম আজাদীর নিকট কৃতজ্ঞ। তিনি বাংলাদেশের আরটিভি থেকে প্রচারিত ইসলামিক প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান জীবন জ্যোতি এর প্রাক্তন উত্তরদাতা এবং বর্তমানে আমেরিকার ফ্লোরিডা স্টেটের হোমস্টেড সিটির মসজিদুল মোমেনীনের ইমাম। তিনি আমার পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ লেখা পড়ে সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন।

বইটি লিখা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে আমার পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন এবং অনেক বন্ধু-বান্ধব আমাকে উৎসাহিত করেছেন। তাদের সকলকে এবং এ বইয়ের প্রকাশক মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়াকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কোন আর্থিক সুবিধার জন্য আমি এ বই লিখিনি। আমার উদ্দেশ্য পাঠকগণের মধ্যে ধর্মীয় সচেতনতা সৃষ্টি করে পরকালের পাথেয় সঞ্চয়ে তাদেরকে আগ্রহী করে তোলা। এর ফলে আমার এ প্রচেষ্টাকে সদকায়ে জারিয়া হিসেবে দয়াময় আল্লাহ আমার জন্য কবুল করবেন বলে আশা করি।

এ বই থেকে প্রাপ্ত সব অর্থ শাহেদা ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, গ্রাম : ভারুল, ডাকঘর : ভারুল চৌধুরী বাড়ী, উপজেলা : বরুড়া, জেলা : কুমিল্লার মাধ্যমে এতীম, সহায়-সম্বলহীন ব্যক্তি, ইসলামী শিক্ষার প্রসার এবং বিভিন্ন জনহিতকর কাজের জন্য ব্যয় করা হবে।

ফজলুল হক মজুমদার

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইসলাম	১০
ঈমান	১৭
সালাত বা নামায	২৩
যাকাত	৪৩
সিয়াম বা রোযা	৫২
হজ্জ ও ওমরা	৬৪
অজু ও তায়াম্মুম	৮১
আজান ও একামত	৮৮
জানাযার নামায	৯৩
কবর আজাব	৯৯
কবর যিয়ারত	১০৯
তওবা ও ক্ষমা	১১৫
দোয়া বিফলে যায় না	১২২
তকদীর বা ভাগ্য	১৩০
সকল মুসলমানই মুমিন নয়	১৩৭
মোনাফেক থেকে সাবধান	১৪৪
অন্তরের ভাবনা	১৫১
পীর দরবেশ ও মাজার	১৫৮
মাতা-পিতা	১৭০
বিবাহ তালাক ও হিল্লা	১৭৮
দাম্পত্য সুখ-দুঃখ	১৮৬
যেনা	১৯৪

www.nagorikpathagar.org

বিষয়	পৃষ্ঠা

পর্দা ১৯৯

উপার্জনে বাছ্ বিচার ২০৬

হালাল ও হারাম ২১৭

পার্থিব জীবন ২২৫

বরযখী জীবন ২৩১

অনন্ত জীবন ২৩৮

কেয়ামত ২৫১

যারা আল্লাহর আরশের ছায়া পাবেন ২৭৩

সদকায়ে জারিয়া ২৮৩

প্রতিবেশীর হক ২৮৮

হত্যা ও আত্মহত্যা ২৯৫

ক্রোধ বা রাগ ৩০১

অহংকার ৩০৭

গীবত ও চোগলখুরী ৩১২

কোরআন ৩১৭

আল্লাহর গুণবাচক ৯৯টি নাম ৩২৪

নবী ও রাসূলগণ ৩৪১

বিবিধ বিষয়ে কোরআন ও হাদীসের বাণী ৪১১

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

ইসলাম

ইসলাম কি? জিব্রাইল (আ.)-এর এই প্রশ্নের জবাবে রাসূল (সা.) বলেছেন : ইসলাম এই যে, আল্লাহকে এক বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা, দৈনিক নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা, আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী যাকাত দেয়া, রমাযান মাসে রোযা রাখা এবং সামর্থ থাকলে হজ্জ করা (বোখারী শরীফ # ৪৬ ও সহীহ মুসলিম # ৫)। এ হাদীসটি হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রকাশ্য দরবারে সকলের সামনে বসেছিলেন। এমন সময় একজন (অপরিচিত) লোক তাঁর দরবারে আসলেন এবং (অতি সরলভাবে) কিছু প্রশ্ন করলেন। তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, ইসলাম কি? আগন্তুকের প্রশ্ন করা এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জবাব দেয়ার পর্ব শেষ হলে আগন্তুক চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবাগণকে আদেশ করলেন, তাঁকে আমার নিকট ফিরিয়ে আন। কিন্তু আগন্তুক কোথায় চলে গেলেন সাহাবাগণ আর দেখতে পেলেন না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন : ঐ আগন্তুক ছিলেন জিব্রাইল ফেরেশতা। তোমাদেরকে দ্বীনের প্রধান বিষয়সমূহ জ্ঞাত করার জন্য তিনি এসেছিলেন।

ইসলাম কি? এই প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) যা বলেছেন তা থেকে বুঝা গেল, (১) ঈমান (২) নামায (৩) যাকাত (৪) রোযা এবং (৫) হজ্জ, এই পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। এদের প্রত্যেকটির অনেক শাখা প্রশাখা রয়েছে। সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনা আলাদাভাবে করা হবে।

মহান আল্লাহ যুগে যুগে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। হযরত আদম (আ.) থেকে নবী রাসূলগণের আগমনের শুরু। তাদের সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্তরে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এক একজন রাসূল রয়েছে (সূরা ইউনুস # ১০ : ৪৭)। সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁদের মাধ্যমে হেদায়েত লাভ করেছে। কিন্তু অনেকে তাদের বিরোধিতা করেছে, এমনকি

www.nagorikpathagar.org

কোন কোন নবী বা রাসূলকে হত্যা করেছে। নবী বা রাসূলকে অমান্যকারী বহু জাতিকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছেন।

ইসলাম পূর্ব যুগে আরবদের মধ্যে অনেক কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। মদ খাওয়া, জুয়া খেলা, খুনাখুনি, ব্যভিচার (যেনা), মূর্তিপূজা ইত্যাদি ছিল তাঁদের নিত্যদিনের সঙ্গী। সে সমাজে নারীদের কোন মর্যাদা ছিল না। কন্যা সন্তান হওয়াকে তারা অপমান মনে করে; কোন কোন পিতা কন্যা সন্তানকে জীবিত মাটি চাপা দিয়ে দিত। আবার কেউ বা অভাবগ্রস্ত হওয়ার ভয়ে সন্তানদেরকে মেরে ফেলত। এমনি সময়ে আল্লাহ সর্বশেষ নবী হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে তাদের মাঝে পাঠিয়েছেন। তাঁর প্রচারিত ধর্মের নাম ইসলাম। এ ধর্মকে আল্লাহ্ পছন্দ করেছেন। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে, নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম (সূরা আলে ইমরান # ৩ : ১৯)। এ ধর্ম বিশেষ কোন জাতি বা গোষ্ঠীর জন্য আসেনি। এটা সর্বজনীন ধর্ম, বিশ্বের সকল মানুষের ধর্ম। এ ধর্মের আগমনের ফলে পূর্বের সকল ধর্ম রহিত হয়ে গেছে।

বহুজাতি সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর পরিবর্তে নিজেদের মনগড়া দেব-দেবীর আরাধনা করে। হিন্দুরা বলে থাকে তাদের তেত্রিশ কোটি দেব-দেবী আছে। এদের মধ্য থেকে তারা ব্রম্মা, দুর্গা, কালী, স্বরসতী, শিব ইত্যাদি দেব-দেবীর পূজা করে থাকে। বৌদ্ধ সম্প্রদায় গৌতম বৌদ্ধের পূজা করে। ইহুদীরা ধর্ম যাজক ওযায়ের (আ.)-কে এবং খৃষ্টানরা নবী ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করে তাদের এবাদত করে। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে, যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহ্বান পেয়েও আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে তার অপেক্ষা যালেম আর কে আছে? আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না (সূরা আসসফ # ৬১ : ৭)।

ওবাদা ইবনে সামেত (রা.) বর্ণনা করেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সাহাবাগণের মধ্যে উপবিষ্ট অবস্থায় তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : তোমরা আমার নিকট শপথ গ্রহণ কর এবং অঙ্গীকারাবদ্ধ হও যে, আল্লাহর সাথে কোনও বস্তুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যেনা (ব্যভিচার) করবে না, আপন সন্তানকে হত্যা করবে না, কারো উপর মিথ্যা দোষারোপ করবে না, ভিত্তিহীন অপবাদ ও অভিযোগ আনবে না এবং আমার তথা

www.nagorikpathagar.org

শাসন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধাচরণ করবে না ঐ সকল বিষয়ে যা আল্লাহর বিধান বিরোধী নয়। তিনি আরোও বললেন : যে ব্যক্তি এ সকল অঙ্গীকার অনুযায়ী চলবে, নিশ্চয়ই সে আল্লাহর নিকট তার সুফল ও পুরস্কার পাবে। যদি কেউ কোনও নিষিদ্ধ কাজ করে ফেলে এবং শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী নির্দিষ্ট শাস্তি তার উপর প্রয়োগ করা হয়, তবে সেই শাস্তি (গ্রহণে কুণ্ঠাবোধ করবে না। কারণ ঐ শাস্তি) তার গুনাহের কাফফারা হবে। কিন্তু তার ঐ কাজ প্রকাশ না হওয়ার কারণে যদি সে জাগতিক শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়ে থাকে, তবে গুনাহের বিচারের ভার আল্লাহর উপর ন্যস্ত থাকবে, আখেরাতে তাকে শাস্তি দিতেও পারেন, মাফও করতে পারেন। সে মতে সাহাবাগণ এই শপথ বা দীক্ষা গ্রহণ করে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন (বোখারী শরীফ # ১৭)।

রাসূলুল্লাহ (সা.) মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন। তাঁর প্রচারিত ইসলাম ধর্ম পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই প্রসার লাভ করেছে। কিন্তু ইহুদী ও খৃষ্টানদের অধিকাংশ লোক এ ধর্মের বিরোধিতা করে চলছে। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সা.) বলেছেন : সে সত্তার শপথ যার হাতে আমি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রাণ, বর্তমান মানব গোষ্ঠীর কোন ইহুদী বা নাসারা আমার আবির্ভাবের সংবাদ শুনার পর যে দ্বীন নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করবে সে নিশ্চিত জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে (সহীহ মুসলিম # ২৯৪)।

অপরদিকে মুসলমানদের মধ্যে বহু দলের সৃষ্টি হয়েছে। এ বিভক্তির জন্য পীর নামধারী কিছু লোকও দায়ী। এরা নিজেদের মনগড়া কিছু মতবাদ প্রচার করে ধর্ম বিষয়ে অজ্ঞ লোকদেরকে নিজেদের দিকে টেনে নেয়। এরা ইসলামের মূল ধারা থেকে দূরে সরে যায়। হযরত আউফ ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, সে মহান সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, অবশ্যই আমার উম্মত তেহাত্তরটি দলে ভাগ হবে। এদের মধ্যে একটি দল হবে জান্নাতী এবং বাহাত্তরটি হবে জাহান্নামী। আরজ করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল। কোন দলটি জান্নাতী? তিনি বললেন : জামাআত অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (ইবনে মাজাহ # ৩৯৯২)।

www.nagorikpathagar.org

মহান আল্লাহ বলেন : আর তাদের মতো হয়ো না যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নিদর্শনসমূহ আসার পরও বিরোধিতা করতে শুরু করেছে– তাদের জন্য রয়েছে ভয়ঙ্কর আজাব (সূরা আলে ইমরান # ৩ : ১০৫)। নিশ্চয়ই যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই (সূরা আনআম # ৬ : ১৫৯)। আল্লাহ আরোও বলেন : আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেককে সঠিক দিক নির্দেশ দিতাম, কিন্তু আমার এ উক্তি অবধারিত সত্য যে, আমি জিন ও মানুষ দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করব (সূরা সেজদা # ৩২ : ১৩)।

মুসলমানদের এই বিভক্তির সাথে সাথে অনেক নতুন কিছু ধর্মে সংযোজিত হয়েছে এবং আরোও হচ্ছে। ধর্মে নতুন সংযোজনকে বিদআত বলে। একে বিদআতে হাসানা (ভাল বিদআত) এবং বিদআতে সায়্যিয়া (মন্দ বিদআত) এ দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন মিলাদ পড়াকে ভাল বিদআত এবং ফকীর দরবেশের দরবারে বা মাজারে যেয়ে কিছু চাওয়াকে মন্দ বিদআত হিসেবে গণ্য করা হয়। এ মন্দ বিদআত শিরকের সমান। যারা ধর্ম সম্পর্কে সচেতন তারা এগুলো পরিহার করে চলে। কারণ বিদআতের পক্ষে কোরআন বা হাদীসের কোন সমর্থন নেই। নবী (সা.)-এর জীবনকালে, সাহাবাগণের আমলে অথবা তাবেঈন বা তাবে তাবেঈনদের সময়ে যা করা হয়নি কিন্তু পরবর্তীতে ধর্মে যোগ করা হয়েছে এগুলোই বিদআত।

নবী (সা.)-এর নামে দরূদ পড়ার জন্য পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে : আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ পাঠান। হে ঈমানদারগণ, তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠাও (সূরা আহযাব # ৩৩ : ৫৬)। তবে এ দরূদ এবং বর্তমান সময়ের মিলাদ এক নয়। এ মিলাদ বিদআতে হাসানা। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময়ে জামাতে তারাবী নামায পড়া হয়নি কিন্তু ওমর (রা.) জামাতে তারাবী নামায পড়ার নিয়ম চালু করেন। এটাও বিদআত, তবে বিদআতে হাসানা। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন খোতবা দিতেন, তখন বলতেন : উত্তম বাণী আল্লাহর কিতাব এবং উত্তম পথ মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক প্রদর্শিত পথ। অতীব নিকৃষ্ট বিষয় (ধর্মে) নতুন উদ্ভাবন বা

www.nagorikpathagar.org

বিদআত। প্রতিটি বিদআত ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণতি জাহান্নাম (সহীহ্ মুসলিম # ১৮৮৩, আবু দাউদ ও তিরমিযী)।

বর্তমান সময়ে সারা বিশ্বে ইসলামের তথা মুসলমানদের উপর হামলা চলছে। এর মূল কারণ মুসলমানদের ঈমানের দুর্বলতা, মোনাফেকী এবং নিজেদের মধ্যে একতার অভাব। এক দেশ অপর দেশের মানুষের উপর এমনকি নিজ দেশেও একদল অপরদলের উপর অত্যাচার চালায়। ইহুদী-খৃষ্টানরা কোন মুসলমানের দেশে হামলা চালালে আশে-পাশের মুসলিম দেশসমূহ প্রতিবাদ করে না। এমনকি কোন কোন দেশ শত্রুকে সাহায্য সহায়তা করে। এতে ইহুদী-নাসারারা মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালাতে উৎসাহ পায়। তারা মুসলমান নামধারী ইসলাম বিদ্বেষী শাসককে ক্ষমতায় বসিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে।

ইসলাম শান্তির ধর্ম। তা অতি সহজ। কিন্তু কিছু বিপদগামী একে বিধর্মীদের চোখে কঠিন করে তোলে। ফলে তাদের হিংসার কারণ হয়ে পড়ে। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সা.) বলেছেন : দ্বীন (ইসলাম) অত্যন্ত সহজ ও সরল কিন্তু যে কোন ব্যক্তি দ্বীনের সঙ্গে বাড়াবাড়ি করবে সে পরাজিত হবে (বোখারী শরীফ # ৩৫)।

মুসলমানেরা যদি নিজেদের কার্যাবলী ও আচার-আচরণ দিয়ে বিধর্মীকে মুগ্ধ করতে পারে, তবে অনেক বিধর্মী হিংসা বিদ্বেষ ভুলে ইসলাম গ্রহণ করতে আগ্রহী হবে। কথা-বার্তায় যদি তাদেরকে বুঝানো যায় যে, তারা ভুল পথে আছে এবং সে জন্য পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে অথচ ইসলাম গ্রহণের ফলে তাদের পূর্বের পাপ মাফ করে দেয়া হবে আর নতুন ভাল কাজের জন্য উত্তম পুণ্য দান করা হবে তা হলে তাদের মধ্যে পরিবর্তন অবশ্যই আসবে। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছেন, কোন মানুষ যখন ইসলাম কবুল করে এবং তার ইসলাম গ্রহণ খাঁটি ও পূর্ণাঙ্গ হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন। পূর্বের হিসাব পরিষ্কার হওয়ার পরমুহূর্ত থেকে তার জন্য কার্যানুপাতিক প্রতিফল এ হিসাবে দান করা হয় যে, নেক কার্যে একের পরিবর্তে দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত এবং গুনাহের কাজে একের পরিবর্তে একই প্রতিফল দান করা হয়। কিন্তু আল্লাহ মাফও করতে পারেন

www.nagorikpathagar.org

অর্থাৎ এর কোন প্রতিফল ভোগ করতে হবে না (বোখারী শরীফ # ৩৭)।

বিধর্মীদের অপসংস্কৃতিতে আকৃষ্ট হয়ে অনেক ছেলে-মেয়ে বিপথগামী হয়ে যাচ্ছে। তদুপরি মুসলমান নামধারী অনেকেই অত্যাধুনিক হওয়ার জন্য চাল-চলনে, পোশাক-পরিচ্ছদে ইহুদী-নাসারাদের অনুকরণ করে চলছে। হযরত আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন : তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, তোমরা তাদের হুবহু অনুকরণ করবে। এমনকি তাদের কেউ যদি টিকটিকির গর্তে প্রবেশ করে থাকে, তোমরাও তার অনুকরণ করবে। প্রশ্ন করা হল : তারা কি ইহুদী না খৃষ্টান? তিনি বললেন, তবে আর কারা- বোখারী ও মুসলিম (হাদীসে রাসূল)? কোন কোন পথভ্রষ্ট ব্যক্তি আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল (সা.) এবং ইসলামের অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে এমন সকল কুৎসিত মন্তব্য করে থাকে যা বিধর্মীদের মন্তব্যকেও হার মানায়। কিন্তু মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেও প্রভাবশালীদের ভয়ে এই সকল মন্তব্যের প্রতিবাদ করতে অনেকে সাহস পায় না।

ইসলামের যাত্রা শুরু হয়েছিল খাদিজা বিনতে খোয়ালিদ, আলী ইবনে আবু তালেব, যায়েদ ইবনে হারিসা, আবু বকর সিদ্দিক, ওসমান ইবনে আউফ, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস, তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ, আবু ওবায়দা প্রমুখ সাহাবাগণের মত মাত্র কয়েকজন দৃঢ় প্রত্যয়ী ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে। সেই সময়ের মুষ্টিমেয় মুসলমানেরা আবু লাহাব, আবু জাহেল, ওতবা, শায়বা, ওলীদ, উমাইয়াদের মত দুষ্ট লোকদের অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর এক সময়ের ইসলামের ঘোর বিরোধী, প্রবল শক্তিধর আব্বাস, ওমর ও আবু সুফিয়ানদের মত ব্যক্তিরা ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামের প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন।

ক্রমান্বয়ে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পরবর্তী সময়ে সারা বিশ্বে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু কেয়ামত ঘনিয়ে আসলে মাত্র কয়েকজনের মাঝে ইসলাম টিকে থাকবে। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : ইসলাম আগন্তুকের মত অপরিচিত অবস্থায় শুরু হয়েছিল। আবার আগন্তুকের মতই অপরিচিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে (সহীহ মুসলিম # ২৮০)

---

www.nagorikpathagar.org

ঈমান

ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। এদের প্রথম ও সর্বপ্রধানটির নাম ঈমান। ঈমান অর্থ বিশ্বাস। যার ঈমান নেই ইসলামে তার স্থান নেই আর ইসলামে যার স্থান নেই তার স্থান বেহেশতেও নেই। ঈমান সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, রাসূল বিশ্বাস রাখেন সেই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তার উপর নাযিল হয়েছে এবং মুমিনরাও। সকলে বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি। তারা বলে, আমরা তাঁর পয়গম্বরগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের প্রভু আর তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে (সূরা বাকারা # ২ : ২৮৫)।

আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) একদিন লোকদেরকে নিয়ে বসেছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে তাঁর হাঁটুর কাছে বসে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল, ঈমান কি? তিনি বললেন, আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, আখেরাতে তাঁর সাক্ষাৎ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস রাখা, মরণের পরে পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রতি বিশ্বাস রাখা এবং তকদীরের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখাই ঈমান। আগন্তুক বললেন, আপনি সত্যিই বলেছেন (সহীহ মুসলিম # ৭, বোখারী শরীফ # ৪৬)।

আগন্তুক আরো কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে চলে গেলে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এ হলেন জিব্রাইল (আ.)। তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন।

ঈমানের তিনটি স্তর যথাক্রমে- (১) অন্তরের বিশ্বাস (২) মৌখিক স্বীকৃতি এবং (৩) কার্যে পরিণত করা। ঈমান দুই প্রকার যেমন :

১। ঈমানে মুজাম্মাল (সংক্ষিপ্ত ঈমান) : আমানতু বিল্লাহি কামা হুয়া বিআসমায়িহী ওয়া সিফাতিহী ওয়া কাবিলতু জামিয়া আহকামিহী ওয়া আরকানিহী।

www.nagorikpathagar.org

অর্থ ঃ আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলির প্রতি আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং তাঁর আদেশাবলী আমি স্বীকার করে নিলাম।

২। ঈমানে মুফাসসাল (বিস্তারিত ঈমান) : আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালায়িকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসুলিহী ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি ওয়াল ক্বাদরি খাইরিহী ওয়া শাররিহী মিনাল্লাহি তা'আলা ওয়াল বা'ছি বা'দাল মাউত।

অর্থ ঃ আমি ঈমান আনলাম আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর নবী-রাসূলগণের প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি, তকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি এবং মরণের পরে পুনরুত্থানের প্রতি।

আবার এই ঈমান বা কালেমা পাঁচটি :

(১) কালেমায়ে তাইয়েবা : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ।

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর প্রেরিত রাসূল।

(২) কালেমায়ে শাহাদাত : আশ্‌হাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

(৩) কালেমায়ে তাওহীদ : লা-ইলাহা ইল্লা আনতা ওয়াহিদাল লা-ছানিয়ালাকা মুহাম্মাদুর রাসূলিল্লাহি ইমামুল মুত্তাক্বীনা রাসূলু রব্বিল আলামীন।

অর্থ ঃ তুমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তুমি একক এবং তোমার সমকক্ষ কেউ নেই। মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। তিনি মুত্তাকীগণের ইমাম এবং বিশ্বপালকের প্রেরিত রাসূল।

www.nagorikpathagar.org

(৪) কালেমায়ে তামজীদ : লা-ইলাহা ইল্লা আনতা নূরাই ইয়াহদীয়াল্লাহু লিনূরীহি মাইয়াশাউ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি ইমামুল মুরসালীনা ওয়া খতিমুন নাবিয়্যিন।

অর্থ ঃ তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তুমি যাকে ইচ্ছা নিজের জ্যোতি দ্বারা পথ প্রদর্শন কর। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা.) রাসূলগণের ইমাম এবং সর্বশেষ নবী।

(৫) কালেমায়ে রাদ্দে কুফর : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন আন উশরিকা বিকা শাইআউ ওয়া নু'মিনু বিহি, ওয়াসতাগ-ফিরুকা লিমা লা আ'লামুবিহি ওয়া মা লা আ'লামু বিহি, ওয়া আতুবু ওয়া আমানতু, ওয়া আকুলা আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার সাথে অন্য কাকেও শরীক করা থেকে এবং এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা থেকে পানাহ চাচ্ছি। আমার জানা এবং অজানা সব বস্তু থেকে তোমারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি আর আমি তোমারই নিকট তওবা করছি এবং তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি এবং বলছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল।

আল্লাহ মহাবিশ্বের একমাত্র অধিপতি। ভূপৃষ্ঠে ও আকাশে যা কিছু আছে সবই তার সৃষ্টি। কিন্তু কেউ কখনো তাঁকে দেখেনি। না দেখেও তাঁকে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা বলে বিশ্বাস করা ঈমানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁকে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে তাঁর যাবতীয় কার্যাবলীর প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। অদৃশ্য ফেরেশতাগণ, অজানা জান্নাত ও জাহান্নাম এবং শেষ বিচার দিবসে বিশ্বাস করতে হবে। আল্লাহ যেই সকল নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন তাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে এবং সেই সাথে তাঁর চারটি আসমানী কিতাব তথা হযরত দাউদ (আ.) এর প্রতি অবতীর্ণ যাবুর, হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ তাওরাত, হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ ইঞ্জিল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ কোরআনের প্রতি ঈমান আনতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তা'আলা বলেন : যারা অদৃশ্যে ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে ও তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে (যাকাত দেয়) এবং আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে ও আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে ঈমান আনে ও আখেরাতে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম (সূরা বাকারা # ২ : ৩-৫)।

স্বর্ণকার এসিড দিয়ে যেভাবে স্বর্ণ পরীক্ষা করে আল্লাহ তা'আলাও ঈমানদারদের ঈমান তেমনিভাবে পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষায় কেউ পাস করে আবার কেউ ফেলও করে। যার ঈমান যত দৃঢ় তার পরীক্ষাও তত কঠিন। যাদের ঈমান অত্যন্ত মজবুত পরীক্ষা যত কঠিনই হোক না কেন তারা উত্তীর্ণ হয়ে থাকে। মূর্তিপূজক পিতা আজরের সমর্থনে মূর্তিপূজক শাসক নমরূদ হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারেনি। আল্লাহর হুকুমে আগুন তাঁর জন্য শীতল হয়ে গেল এবং তিনি পরীক্ষায় পাস করলেন। আল্লাহ ঈমানদারদেরকে এভাবে সাহায্য করেন।

খোদায়ী দাবিদার রাজা ফেরাউনের স্ত্রী বিবি আসিয়া মূসা (আ.)-এর ধর্মের প্রতি ঈমান আনলে কাফের ফেরাউন ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত জমিনে ঊর্ধ্বমুখী শোয়ায়ে হাতে পায়ে লোহার খিল দিয়ে আটকিয়ে দিল। এই পৈশাচিক অত্যাচার সহ্য করেও ঈমান থেকে তিনি বিচ্যুত হননি। এই অবস্থায় তিনি আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন : হে আমার প্রতিপালক। তোমার নিকট জান্নাতে আমার জন্য একটি ঘর বানিয়ে দাও এবং আমাকে ফেরাউন ও তার কার্যকলাপ থেকে রক্ষা কর আর যালেম সম্প্রদায় থেকে আমাকে মুক্তি দাও (সূরা তাহরীম # ৬৬ : ১১)।

অনুরূপভাবে কৃতদাস হযরত বেলাল ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁর মনিব উমাইয়া বিন খালাফ তাঁকে মরুর উত্তপ্ত বালির উপর শোয়ায়ে বুকে পাথর চাপা দিত। কিন্তু তাঁর ঈমানের জোর এমনই প্রবল ছিল যে, তিনি সেই অত্যাচার সহ্য করেও ইসলাম ত্যাগ করেননি। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে খরিদ করে এনে মুক্ত করে দেন। তিনিই নবী (সা.) কর্তৃক

www.nagorikpathagar.org

ইসলামের প্রথম মুয়াযযিন নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে এই ধরনের বহু ঈমানদার নারী ও পুরুষের নাম রয়েছে।

হযরত ওসমান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : যেই ব্যক্তি অন্তরে এই বিশ্বাস রেখে মৃত্যু বরণ করল যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহা নেই, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে (সহীহ মুসলিম # ৪৪)।

যাদের ঈমান অত্যন্ত দুর্বল তাদেরকে বিভিন্ন প্রলোভন দিয়ে অথবা অর্থের লোভ দেখিয়ে ঈমান নষ্ট করে দিতে এমনকি ধর্মান্তরিত করতে ইহুদী-খৃষ্টানরা সদা সচেষ্ট থাকে। এরা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করে না আর নবী রাসূলদের দোষ-ক্রটি খুঁজতে থাকে এবং তাঁদের কোন না কোন খুঁত দেখিয়ে নড়-বড়ে ঈমানের লোকদের ঈমান একেবারে দুর্বল করে দেয়। মহান আল্লাহ বলেন : যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে ও তাঁর রাসূলদেরকেও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের মধ্যে ঈমানের ব্যাপারে তারতম্য করতে চায় এবং বলে আমরা কিছু সংখ্যককে বিশ্বাস করি এবং কিছু সংখ্যককে অবিশ্বাস করি আর তারা মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়, এরাই প্রকৃত কাফের এবং কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি (সূরা নিসা # ৪ : ১৫০-১৫১)।

ঈমান ঠিক রাখা অত্যন্ত কঠিন কাজ। মানুষের চিরশত্রু শয়তান মানুষকে খারাপের দিকে প্ররোচিত করতে থাকে। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : হামেশা লোকেরা নিজেদের পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসা করতে থাকে, সকল কিছুই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? কারো মনে এমন প্রশ্ন জাগলে অবশ্যই বলবে, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি (সহীহ মুসলিম # ২৫১)।

বিপথগামীদের প্রতি শয়তানের আগ্রহ কম। তারা তো তার বন্ধু হয়ে গেছে কিন্তু যারা আল্লাহর পথে চলতে চায়, শয়তান তাদের পেছনে লেগে থাকে। একবার একটি গল্প শুনেছিলাম। এক ব্যক্তি অন্যায় কাজে লিপ্ত হন না এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করেন। শয়তান সহজে তাঁকে পাপের

www.nagorikpathagar.org

পথে নিতে পারছিল না। তিনি নিয়মিত আজান দিয়ে ফজরের নামায আদায় করতেন। শয়তান এক ভোররাত্রে তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে রাখল। তিনি জেগে দেখলেন সূর্য উদিত হয়ে গেছে। তিনি অজু করে তখনই নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামায শেষে তাঁর অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আল্লাহর নিকট খুব কান্নাকাটি করলেন। এতে আল্লাহ্ খুশী হয়ে তাঁর পূর্বেকার অনেক গুনাহ্ মাফ করে দিলেন। শয়তান খুব নাখোশ হলো। কারণ লোকটির মন্দ করতে যেয়ে ভালো করে দিল। পরের দিন ভোর হওয়ার পূর্বেই শয়তান তাঁকে ডাকতে শুরু করল, হে ভাই! উঠুন। আপনার নামাযের সময় হয়ে গেছে। আজান দিয়ে নামায পড়ুন। এই গল্প বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশা করে, তারা যেন ঈমানের দৃঢ়তা বজায় রাখে।

আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহকে নিজের রব, ইসলামকে নিজের ধর্ম এবং মুহাম্মদ (সা.) কে রাসূল হিসেবে মেনে নিয়েছে, সে ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করেছে (সহীহ মুসলিম # ৫৯)।

প্রত্যেকটি সৎকাজই ঈমানের এক একটি শাখা। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : ঈমানের সত্তরটির অধিক শাখা রয়েছে। এদের সর্বোত্তম শাখা হচ্ছে : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহা নেই ঘোষণা করা এবং নিম্নতম শাখাটি হচ্ছে পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেয়া। আর লজ্জা হচ্ছে ঈমানের একটি বিশেষ শাখা (সহীহ্ মুসলিম # ৬১)।

ক্রমান্বয়ে মানুষের সামনে খারাপ সময় আসতে থাকবে। কেয়ামত ঘনিয়ে আসলে ঈমান উঠে যাবে। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : ঈমান শেষ পর্যন্ত) মদীনায় এমনভাবে গুটিয়ে আসবে যেমন সর্প তার গর্তের ভেতরে গুটিয়ে আসে (সহীহ মুসলিম # ২৮২, বোখারী শরীফ # ৯৬৭)।

www.nagorikpathagar.org

সালাত বা নামায

ইসলামের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভের মধ্যে ঈমানের পরেই নামাযের স্থান। নামায ফার্সী শব্দ। কোরআনের ভাষায় নামাযের নাম সালাত। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআনে সালাত শব্দটি অন্তত ৮২ বার উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ্ মানুষকে নামায আদায়ের জন্য যতবার তাগিদ দিয়েছেন অন্য কোন ফরয আদায়ের জন্য এত অধিক সংখ্যকবার তাগিদ দেননি। নামায ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক নর-নারীর উপর ফরয।

নামাযের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব এই দু'টি দিক রয়েছে। নামায ঈমানকে দৃঢ় করে, স্বীয় পাপসমূহকে জ্বালিয়ে দেয় এবং আমলের বিবেচনায় বেহেশত পাওয়ার পথ সুগম করে। এগুলো নামাযের আধ্যাত্মিক দিক। আর পার্থিব দিক এই যে, এটা বৈজ্ঞানিক উপায়ে শরীরের জন্য পূর্ণাঙ্গ ব্যায়াম। স্বাস্থ্য রক্ষায় নামাযের দান অপরিসীম।

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআনে নামায পড়তে না বলে নামায কায়েম বা প্রতিষ্ঠিত করতে বলেছেন। এর অর্থ যাবতীয় বিধি-বিধান মেনে নিয়মিতভাবে নামায আদায় করতে বলেছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তা'আলা নামায সম্পর্কে যা বলেছেন তা থেকে কয়েকটি আয়াতের বাংলা অনুবাদ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

(১) আর তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও আর বিনয়ীদের সাথে বিনয় প্রকাশ কর (সূরা বাকারা # ২ : ৪৩)।

(২) ধৈর্যের সাথে নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই এটা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু সেই সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষে তা কঠিন নয় (সূরা বাকারা # ২ : ৪৫)।

(৩) তোমরা নামায কায়েম কর ও যাকাত দাও (সূরা বাকারা # ২ : ১১০)।

www.nagorikpathagar.org

(৪) আর যারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে এরাই সত্যাশ্রয়ী এবং পরহেজগার (সূরা বাকারা # ২ : ১৭৭)।

(৫) সমস্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের। আর আল্লাহর সামনে একান্ত বিনয়ের সাথে দাঁড়াও। আর যদি তোমাদের আশঙ্কা হয়, তবে তোমরা দাঁড়িয়ে অথবা আরোহী অবস্থায় (নামায) পড়ে নাও, অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হয়ে যাও, তখন আল্লাহর স্মরণ সেরূপে কর যেরূপে তিনি তোমাদেরকে শিখিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না (সূরা বাকারা # ২ : ২৩৮-২৩৯)।

(৬) নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে আর নামায কায়েম করেছে ও যাকাত দিয়েছে, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট; এবং তাদের কোন আশঙ্কা থাকবে না এবং তারা চিন্তিত হবে না (সূরা বাকারা # ২ : ২৭৭)।

(৭) অতঃপর যখন তোমরা নামায সম্পন্ন কর, তখন দাঁড়িয়ে এবং বসে এবং শায়িত অবস্থায় মহান আল্লাহকে স্মরণ কর। অতঃপর যখন বিপদমুক্ত হও, তখন নামায ঠিক করে আদায় কর। নিশ্চয়ই নামায মুসলমানদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফরয করা হয়েছে (সূরা নিসা # ৪ : ১০৩)।

(৮) তোমাদের বন্ধুতো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং মুমিনগণ যারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং বিনয়ী (অর্থাৎ বিধর্মী মুসলমানের বন্ধু হতে পারে না) (সূরা মায়িদা # ৫ : ৫৫)।

(৯) অতএব যদি তারা (মুশরিকরা) তওবা করে নেয় এবং নামায আদায় করতে থাকে ও যাকাত আদায় করতে থাকে তবে তারা তোমাদের ধর্ম ভাই হয়ে যাবে (সূরা তওবা # ৯ : ১১)।

(১০) আর আপনি দিনের উভয় প্রান্তে এবং রাত্রির কিছু অংশে নামায কায়েম রাখবেন (সূরা হূদ # ১১ : ১১৪)।

(১১) সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া পর্যন্ত

www.nagorikpathagar.org

নামাযগুলো আদায় করতে থাকুন। আর প্রাতঃকালের নামায; নিশ্চয় প্রাতঃকালের নামায (ফেরেশতাদের) উপস্থিতির সময় (সূরা বনী ইসরাইল # ১৭ : ৭৮)।

(১২) আপনি নিজের নামায (ফজর, মাগরিব ও এশা) আদায়কালে উচ্চৈঃস্বরে পড়বেন না এবং নিঃশব্দে ও পড়বেন না, বরং এতদুভয়ের মধ্য পন্থা অবলম্বন করবেন (সূরা বনী ইসরাইল # ১৭ : ১১০)।

(১৩) অতএব তোমরা নামায কায়েম রাখ এবং যাকাত দিতে থাক। আর মহান আল্লাহকে দৃঢ়রূপে ধরে থাক (সূরা হজ্জ # ২২ : ৭৮)।

(১৪) আর নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও আর রাসূলের অনুসরণ কর যেন তোমাদের প্রতি পূর্ণ অনুগ্রহ করা যেতে পারে (সূরা নূর # ২৪ : ৫৬)।

উপরে বর্ণিত কোরআনের আয়াতগুলোতে প্রত্যেকের মনের অনেক প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাওয়া যায়। ২ নং কলামে দয়াময় আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে বলছেন, বিপদে-আপদে বান্দা যেন নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করে। নামাযের সেজদায় বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হয়। সেই সময়ের দোয়া আল্লাহর নিকট কবুল হওয়ার সম্ভাবনা অন্য সময় অপেক্ষা অনেক বেশী। তবে এর জন্য অত্যন্ত বিনয়ের প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ ৫ এবং ১০ নং কলামে সকল নামাযের প্রতি জোর দিলেও দিনের উভয় প্রান্ত এবং মধ্যবর্তী সময়ের নামাযের প্রতি বিশেষ জোর দিয়েছেন। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞদের মতে দিনের উভয় প্রান্তের নামায বলতে ফজর এবং আসরের নামাযকে বুঝানো হয়েছে। মধ্যবর্তী নামায বলতেও এই দুই সময়ের নামাযকে বুঝায়। কারণ এই দুই সময়ের নামায দিন ও রাতের মধ্যবর্তী সময়ে অবস্থিত। এ সময়ের মধ্যে জোহরের নামায থাকলেও এর উপর কেউ জোর দেননি। ফজর ও আসরের সময় ফেরেশতারা বদল হয়ে থাকেন। আর ১১ নং কলামে আল্লাহ ফজরের সময়কে স্পষ্ট করে ফেরেশতাদের উপস্থিতির সময় উল্লেখ করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, দুনিয়ার কার্য পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের দুইটি দল রাত্রিকালের জন্য ও দিনের জন্য একের পর এক এসে থাকেন। উভয় দলই ফজর ও আসরের সময় দুনিয়ার বুকে একত্রিত হন। নতুন দল দুনিয়ার উপর থাকেন, পুরাতন দল আল্লাহ তা'আলার নিকট চলে যান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, তা সত্ত্বেও তিনি ফেরেশতা দলকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছ? তাঁরা উত্তর করে থাকেন; আমরা যেয়ে তাদেরকে নামাযরত পেয়েছি, ফিরে আসার সময় নামাযরতই দেখে এসেছি (বোখারী শরীফ # ৩৪১, সহীহ মুসলিম # ১৩১৭)।

আর রাত্রির কিছু অংশের নামায বলতে এশার নামাযকে বুঝায়। এই সময়গুলোর নামাযের ফযিলত অনেক বেশী।

পবিত্র কোরআনের সূরা বনী ইসরাইলের প্রথম আয়াতে উল্লেখ আছে : পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করেছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত– যার চারদিকে আমরা পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি– যাতে আমরা তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দিতে পারি। নিশ্চয় তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) কে স্বীয় সান্নিধ্যে নিয়ে তাঁর কুদরত দেখাবার জন্য জিব্রাইল (আ.)-এর সাথে এক রাত্রে বেহেশতী বাহন বোরাকে করে মসজিদুল হারাম (কা'বা শরীফ) থেকে শুরু করে মসজিদুল আকসা (বায়তুল মোকাদ্দাস, জেরুজালেম) হয়ে প্রথম আসমান থেকে একে একে সপ্তম আসমানে নিয়েছিলেন। নবী (সা.) প্রথম আসমানে হযরত আদম (আ.), দ্বিতীয় আসমানে ইয়াহইয়া (আ.) ও ঈসা (আ.), তৃতীয় আসমানে ইউসুফ (আ.), চতুর্থ আসমানে ইদ্রিস (আ.), পঞ্চম আসমানে হারুন (আ.), ষষ্ঠ আসমানে মূসা (আ.) এবং সপ্তম আসমানে ইব্রাহীম (আ.)-এর দেখা পান (বোখারী শরীফের ১৮০০ নম্বর হাদীস অনুসারে)। তাঁকে দেখানো হয়েছে বায়তুল মামুর (ফেরেশতাদের

www.nagorikpathagar.org

এবাদতের স্থান), সিদরাতুল মোনতাহা (এক প্রকার ফলের গাছ), হাউযে কাওসার (সুমিষ্ট পানির নহর যা থেকে কঠিন কেয়ামতের দিনে নবী (সা.) স্বীয় মুমিন উম্মতদেরকে পানি পান করাবেন), বেহেশত (বোখারী শরীফ # ১৮০২) এবং দোযখ (বোখারী শরীফ # ২৫)।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তারপর আমার শরীয়তে প্রত্যেক দিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার বিধান করা হলো। আমি ফেরার পথে মূসা (আ.) এর নিকটবর্তী পথ অতিক্রম করা কালে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বিশেষ আদেশ কি লাভ করেছেন? আমি বললাম, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায। মূসা (আ.) বললেন, আপনার উম্মত প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে সক্ষম হবে না। আপনি পরওয়ারদেগারের দরবারে আপনার উম্মতের জন্য এই আদেশ আরও সহজ করার আবেদন করুন।

হযরত (সা.) বলেন, আমি পরওয়ারদেগারের খাস দরবারে ফিরে গেলাম। তিনি দশ ওয়াক্ত কম করে দিলেন। আমি আবার মূসা (আ.) এর নিকট পৌঁছলাম। তিনি পূর্বের ন্যায় পরামর্শই আমাকে দিলেন। আমি পরওয়ারদেগারের দরবারে ফিরে গেলাম। এভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থবারে দশ-দশ ওয়াক্ত এবং পঞ্চমবারে আরও পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে সর্বশেষে পাঁচ ওয়াক্ত নির্দিষ্ট করে দিলেন। অতঃপর যখন আমি ফেরার পথে অগ্রসর হলাম তখন আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে একটি ঘোষণা জারি করা হলো, আমার নির্ধারিত সংখ্যা (পঞ্চাশ) বাকী রাখলাম, অবশ্য কর্মক্ষেত্রে বান্দাদের পক্ষে সহজ ও কম করে দিলাম। প্রতিটি নেক আমলে দশ গুন সওয়াব দান করব (অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সওয়াব পাবে) (বোখারী শরীফ # ১৮০০)। উল্লেখ্য মিরাজে নবী (সা.) আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখেননি। আল্লাহর উপহার এই নামায আমাদের মিরাজ– দিনে পাঁচবার মহান প্রভুর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ।

নামাযের সময় ঃ

দিনে পাঁচবার ফরয নামায পড়ার জন্য নির্দিষ্ট সময় আছে। কোন কোন ফরযের আগে বা পরে সুন্নাত নামায পড়তে হয়। তবে নফল

www.nagorikpathagar.org

নামাযের নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। নামাযের নিষিদ্ধ সময় বাদে যে কোন সময় নফল পড়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিম্নলিখিত হাদীসগুলো থেকে নামাযের শুরু এবং শেষ সময় জানা যাবে ঃ

(১) জাবের (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী (সা.) জোহরের নামায দুপুর সময়ে পড়তেন, আসরের নামায সূর্য নিস্তেজ হবার পূর্বে পড়তেন, মাগরিবের নামায সূর্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে পড়তেন, এশার নামায কখনো একটু বিলম্বে পড়তেন, কখনো সত্বর পড়ে নিতেন..., ফজরের নামায একটু অন্ধকার থাকতেই পড়তেন (বোখারী শরীফ # ৩৪৪)।

(২) সুলাইমান ইবনে বুরাইদা তাঁর পিতা বুরাইদা থেকে বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি নবী (সা.) এর কাছে এসে নামাযের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে নবী (সা.) তাকে বললেন : তুমি আমাদের সাথে নামায পড় (তা হলে জানতে পারবে)। ... নবী (সা.) ঊষার আলো প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে ফজরের নামায পড়লেন। পরে সূর্য আকাশের মধ্যভাগ থেকে হেলে পড়লে তিনি বেলাল (রা.) কে জোহরের নামাযের আজান দিতে বললেন এবং জোহরের নামায পড়লেন। অতঃপর সূর্য কিছু উপরে থাকতেই তিনি বেলাল (রা.) কে আসরের নামাযের আজান দিতে বললেন এবং আসরের নামায পড়লেন। ...সন্ধ্যা-গোধূলি অদৃশ্য হওয়ার পূর্বক্ষণে মাগরিবের নামাযের আজান দিতে বললেন এবং মাগরিবের নামায পড়লেন। অতঃপর রাতের এক-তৃতীয়াংশ অথবা কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর এশার নামাযের আজান দিতে বললেন এবং এশার নামায পড়লেন (সহীহ্ মুসলিম # ১২৭৯)। (হাদীসটি দ্বারা নামাযের সময় দেখানো উদ্দেশ্য। সে জন্য নামাযের সময়ের অতিরিক্ত কিছু কিছু অংশ উল্লেখ করা হয়নি)।

(৩) আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন, তোমরা যখন ফজরের নামায পড়বে, তখন জেনে রাখ ফজরের নামাযের সময় হল, সূর্যের প্রান্তভাগ বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত। তোমরা যখন জোহরের নামায পড়বে তখন জেনে রাখ যে এর সময় হল, আসরের ওয়াক্ত শুরু না হওয়া পর্যন্ত। তোমরা যখন আসরের নামায পড়বে তখন জেনে রাখ

www.nagorikpathagar.org

আসরের সময় হল, সূর্য বিবর্ণ হয়ে হলুদ বর্ণ ধারণ না করা পর্যন্ত। তোমরা যখন মাগরিবের নামায পড়বে তখন জেনে রাখ যে, মাগরিবের নামাযের সময় থাকে পশ্চিম দিগন্তের রক্তিম আভা বা লালিমা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত। আর তোমরা যখন এশার নামায পড়বে তখন জেনে রাখ এশার নামাযের সময় থাকে অর্ধেক রাত পর্যন্ত (সহীহ্ মুসলিম # ১২৭২)। হাদীসটিতে নামাযের শেষ সময় উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরে বর্ণিত হাদীসগুলো থেকে নামাযের যে সময় জানা গেল তাই নিম্নরূপ ঃ

(১) ফজরের নামায : পূর্বাকাশে আলো ফুটে উঠার সময় (সুবহে সাদেক) থেকে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

(২) জোহরের নামায : সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার সময় থেকে আসরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত।

(৩) আসরের নামায : সূর্য নিস্তেজ হবার পূর্ব থেকে অর্থাৎ কিছু উপরে থাকার সময় থেকে হলুদ বর্ণ ধারণের পূর্ব পর্যন্ত।

(৪) মাগরিবের নামায : সূর্যাস্তের পর থেকে পশ্চিমাকাশের লালিমা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত।

(৫) এশার নামায : পশ্চিমাকাশের লালিমা অদৃশ্য হওয়ার পর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত।

নামাযের নিষিদ্ধ সময় ঃ

দিনের মধ্যে তিনটি সময় আছে, এই সময়গুলোতে নামায পড়লে নামায হবে না। সময়গুলো হচ্ছে- সূর্যোদয়ের সময়, সূর্য মাথার উপরে থাকার সময় এবং সূর্যাস্তের সময়। নিম্নের হাদীস দু'টি থেকে এটা পরিষ্কার হবে ঃ

(১) উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) তিনটি সময়ে আমাদেরকে নামায পড়তে এবং আমাদের মৃতদেরকে দাফন করতে নিষেধ করেছেন ঃ সূর্য যখন আলোকোদ্ভাসিত হয়ে উদিত হতে

www.nagorikpathagar.org

থাকে তখন থেকে তা পরিষ্কারভাবে উপরে না উঠা পর্যন্ত, সূর্য যখন ঠিক মধ্যকাশে থাকে তখন থেকে (পশ্চিমাকাশে) ঢলে না পড়া পর্যন্ত এবং সূর্য ক্ষীণ আলোক হওয়া থেকে সম্পূর্ণ অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত (সহীহ্ মুসলিম # ১৮০৬)।

(২) ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সা.) বলেছেন– যখন সূর্যের কিনারা উদিত হওয়া আরম্ভ হয় তখন নামায থেকে বিরত থাক, যাবত পূর্ণ উদিত না হয় এবং যখন সূর্যের কিনারা অস্ত যেতে আরম্ভ করে, তখন নামায থেকে বিরত থাক, যাবত সূর্য পূর্ণ অস্তমিত না হয়ে যায় (বোখারী শরীফ # ৩৫৮)।

সুন্নাত নামাযের বিবরণ ঃ

আমাদের প্রিয় রাসূল মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) ফরয নামাযের আগে বা পরে যেই সকল নফল নামায নিয়মিতভাবে পড়তেন তাই আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক সুন্নাত (সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ্) নামায। আমি দেখে এসেছি যে, অনেকেই নিম্নলিখিত সুন্নাত নামাযগুলো পড়ে থাকেন ঃ

(১) ফজরের নামায ঃ এই নামাযে ফরয দুই রাকাত। সুন্নাত ফরযের পূর্বে দুই রাকাত পড়া হয়।

(২) জোহরের নামায ঃ ফরয চার রাকাত। ফরযের পূর্বে চার রাকাত এবং পরে দুই রাকাত, মোট ছয় রাকাত সুন্নাত পড়া হয়ে থাকে।

(৩) আসরের নামায ঃ ফরয নামায চার রাকাত। এর পূর্বে অনেকে চার রাকাত সুন্নাত পড়ে থাকে। এটা সুন্নাতে যায়েদা (মোস্তাহাব)।

(৪) মাগরিবের নামায ঃ ফরয নামায তিন রাকাত। ফরযের পরে সুন্নাত পড়া হয় দুই রাকাত।

(৫) এশার নামায ঃ এই নামাযে ফরয চার রাকাত। ফরযের পূর্বে চার রাকাত এবং পরে দুই রাকাত; মোট ছয় রাকাত সুন্নাত পড়া হয়। প্রথম চার রাকাত কেবল কেউ কেউ পড়ে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

(৬) জুমার নামায ঃ ফরয নামায দুই রাকাত। এর পূর্বে তাহিয়্যাতুল অযু দুই রাকাত, দুখুলুল মসজিদ দুই রাকাত, কাবলাল জুমা চার রাকাত এবং পরে বাদাল জুমা চার রাকাত, ওয়াক্তে সুন্নাত দুই রাকাত ও আখেরের জোহর চার রাকাত; মোট আঠারো রাকাত সুন্নাত কেউ কেউ পড়েন।

কিন্তু সহীহ মুসলিম ও বোখারী শরীফের হাদীসে আসরের চার রাকাত এবং এশার ফরযের পূর্বের চার রাকাত সুন্নাতের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। জুমার নামাযে রাসূলুল্লাহ (সা.) ফরযের পূর্বে দুই রাকাত এবং পরে চার রাকাত সুন্নাত নামায পড়ার নির্দেশ দিতেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) যেই নফল নামায (অর্থাৎ আমাদের জন্য সুন্নাত) নামায পড়তেন তা নিম্নরূপ ঃ

(১) ফজরের নামায ঃ ফরযের পূর্বে দুই রাকাত।

(২) জোহরের নামায ঃ ফরযের পূর্বে চার রাকাত এবং পরে দুই রাকাত; মোট ছয় রাকাত।

(৩) আসরের নামায ঃ ফরযের পূর্বে নফল পড়তেন না।

(৪) মাগরিবের নামায ঃ ফরযের পরে দুই রাকাত।

(৫) এশার নামায ঃ ফরযের পরে দুই রাকাত।

এইগুলো সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ বা বাধ্যতামূলক। এদের মধ্য থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনটি না পড়লে গুনাহ হবে। এই বার রাকাত নামাযের সমর্থনে নিম্নের হাদীসটি উদ্ধৃত করলাম ঃ

হাদীস ঃ আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নফল নামায সম্পর্কে আয়েশা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) জোহরের পূর্বে আমার ঘরে চার রাকাত নফল পড়তেন। তারপর যেয়ে মসজিদে লোকদের সাথে নামায পড়ে ঘরে এসে আবার দুই রাকাত নফল পড়তেন। অতঃপর লোকজনের সাথে মাগরিবের নামায পড়ে ঘরে এসে দুই রাকাত নফল পড়তেন। আবার এশার নামায পড়তেন। আর ফজরের সময় বা ভোর

www.nagorikpathagar.org

হলেও দুই রাকাত নফল পড়তেন [সহীহ মুসলিম # ১৫৭৬, বোখারী শরীফ # ৬২৫, বর্ণনায় ইবনে ওমর (রা.)] ।

(৬) জুমার নামাযে উল্লিখিত আঠারো রাকাতের স্থলে রাসূলুল্লাহ (সা.) ফরযের পূর্বে দুই রাকাত এবং পরে চার রাকাত সুন্নাত পড়তেন। নিম্নের হাদীস দুইটি থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

হাদীস ঃ আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে, বসার পূর্বে সর্বপ্রথম দুই রাকাত নামায পড়ে নেবে (বোখারী শরীফ # ২৮৯, সহীহ মুসলিম # ১৫৩১)।

হাদীস ঃ আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন জুমার নামায পড়ে, তখন সে যেন তার পরে চার রাকাত (সুন্নাত) নামায পড়ে (সহীহ মুসলিম # ১৯১৩)।

বেতের নামাযের বিবরণ ঃ

বেতের বেজোড় নামায। এশার নামাযের পর থেকে ফজরের নামাযের পূর্বে যে কোন সময় এই নামায পড়তে হয়। এই নামায পড়া ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ (সা.) এক, তিন, পাঁচ, সাত ও নয় রাকাত বেতের পড়েছেন, হাদীসে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বেতের সম্পর্কিত কিছু হাদীস নিম্নে উদ্ধৃত করা হল ঃ

হাদীস ঃ সারা রাতের মধ্যে যে কোন সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) বেতের নামায পড়েছেন। এমনকি তিনি শেষ রাতেও বেতের পড়েছেন (সহীহ মুসলিম # ১৬১৫)।

হাদীস ঃ শেষ রাত বেতের নামাযের সময়। আর বেতের নামায এক রাকাত মাত্র (সহীহ মুসলিম # ১৬৩৪)।

হাদীস ঃ বেতের প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে জরুরি। অবশ্য যে পাঁচ রাকাত বেতের পড়তে পছন্দ করে সে তা করতে পারে, যে তিন রাকাত

www.nagorikpathagar.org

বেতের পড়তে পছন্দ করে সে তা করতে পারে এবং যে এক রাকাত বেতের পড়তে পছন্দ করে সে তা করতে পারে (আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ, মেশকাত # ১১৯৬)।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তিন রাকাত পছন্দ করেছেন।

হাদীস ঃ ... তিনি নয় রাকাত নামায পড়তেন। এতে অষ্টম রাকাত ছাড়া বসতেন না। এই বৈঠকে তিনি আল্লাহকে স্মরণ করতেন, তারপর সালাম না ফিরিয়ে উঠে দাঁড়াতেন এবং নবম রাকাত পড়ে বসে এবারও আল্লাহকে স্মরণ করতেন, তাঁর প্রশংসা করতেন এবং তাঁর নিকট প্রার্থনা করে... সালাম ফিরাতেন। পরবর্তী সময়ে তিনি সাত রাকাত বেতের পড়তেন। এই ক্ষেত্রেও তিনি শেষের দুই রাকাত নামায পূর্বের মত করেই পড়তেন। এই হাদীসটির অপ্রাসঙ্গিক অংশ ডট চিহ্নের মাধ্যমে বাদ দিয়ে উদ্ধৃত করা হয়েছে (সহীহ মুসলিম # ১৬১৬)।

বি:দ্র: হানাফী মাযহাবের অনুসারীরা তিন রাকাত বেতের পড়েন। দুই রাকাত শেষে বসতে হয় এবং তৃতীয় রাকাত শেষে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করতে হয়।

নামায পড়ার নিয়ম ঃ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে নামায কায়েমের জন্য অনেকবার তাগিদ দিলেও নামায কিভাবে পড়তে হবে তার বর্ণনা দেননি। তিনি রাসূল (সা.) কে তা শিখিয়েছেন। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) যেভাবে নামায আদায় করতেন, সেটা নামায আদায়ের নিয়ম। তিনি কিভাবে নামায পড়তেন তা নিম্নের হাদীসগুলো থেকে বুঝা যাবে :

হাদীস : আবু হুমায়েদ সায়েদী একদা বললেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামায কিরূপ ছিল তা আমি তোমাদের তুলনায় বেশী জানি, আমি তাঁকে দেখেছি। নামায আরম্ভ করার জন্য যখন তাকবীর বলতেন তখন হস্তদ্বয় কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। রুকুতে যেয়ে হস্তদ্বয় হাঁটুর উপর শক্তভাবে রাখতেন এবং পিঠকে সমতলরূপে ঝাঁকাতেন (পিঠ, কোমর ও

www.nagorikpathagar.org

মাথা এক বরাবরে রাখতেন)। যখন রুকু থেকে উঠতেন তখন সোজা হয়ে দাঁড়াতেন, যেন মেরুদণ্ডের প্রত্যেকটি গিট নিজ নিজ স্থানে বসে যায়। যখন সেজদা করতেন তখন উভয় হাত জমিনের উপর বিছিয়ে দিতেন না বা শরীরের সঙ্গে মিশিয়েও রাখতেন না এবং পায়ের আঙ্গুলসমূহকে মুড়িয়ে কিবলামুখী রাখতেন। যখন দুই রাকাতের পর বসতেন তখন ডান পা খাড়া রেখে বাম পা বিছিয়ে দিয়ে এর উপর বসতেন। যখন শেষ রাকাতে বসতেন তখন ডান পা খাড়া রেখে বাম পা বের করে নিতম্ভ (পাছা) জমিনে রেখে বসতেন (বোখারী শরীফ # ৪৭৫)।

হাদীস ঃ আবু মূসা (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে নামায পড়া শিক্ষা দিয়েছেন। তা হচ্ছে তোমরা যখন নামায পড়বে, তোমাদের কাতারগুলো ঠিক করে নাও। অতঃপর তোমাদের কেউ তোমাদের ইমামতি করবে। সে যখন তাকবীর বলবে, তোমরাও তাকবীর বলবে। সে যখন "গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দল্লীন" বলবে, তোমরা তখন আমীন বলবে। আল্লাহ তোমাদের ডাকে সাড়া দেবেন। সে যখন তাকবীর বলে রুকুতে যাবে, তোমরাও তাকবীর বলে রুকুতে যাবে। ইমাম তোমাদের আগে রুকুতে যাবে এবং তোমাদের আগে রুকু থেকে উঠবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তোমাদের কিছুক্ষণ বিলম্ব করা ইমামের রুকু ও তাকবীরের সমান গণ্য হবে। সে যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবে, তোমরা তখন 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ' বলবে, আল্লাহ তোমাদের এই কথা শুনবেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (সা.)-এর ভাষায় বলেছেন ঃ সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ (আল্লাহ তার প্রশংসাকারীর প্রশংসা শুনেন)। সে যখন তাকবীর বলবে এবং সেজদায় যাবে, তোমরাও তার পরপর তাকবীর বলে সেজদায় যাবে, কেননা ইমাম তোমাদের আগে সেজদায় যাবে এবং তোমাদের আগে সেজদা থেকে উঠবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের তাকবীর ও সেজদা ইমামের পরে হবে। যখন তোমরা বৈঠকে বসবে তোমাদের প্রথম পাঠ হবে : আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি... ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহু (সহীহ মুসলিম # ৭৯৯)।

www.nagorikpathagar.org

হাদীস ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমাকে সাতটি অঙ্গের সাহায্যে সেজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং এই সময়ে চুল ও পরিধেয় বস্ত্র পড়া থেকে রুখে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। অঙ্গগুলো হলো, কপাল ও নাক, উভয় হাত, উভয় হাঁটু এবং উভয় পায়ের পাতা (সহীহ্ মুসলিম # ৯৯২, বোখারী শরীফ # ৪৬৯)।

উপরোল্লিখিত হাদীস তিনটিতে নামায আদায়ের সকল নিয়ম-কানুন বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর বাইরে কিছু নিয়ম ও শর্তাধীনে নামায আদায় করতে হয়। নামাযের জন্য শরীর, পোশাক ও স্থান পাক হওয়া অপরিহার্য। শরীরের বাহ্যিক নাপাকী দূর করার জন্য অজু বা গোসলের প্রয়োজন। অপরদিকে অভ্যন্তরীণ পাকের জন্য দরকার সৎ উপায়ে অর্জিত অর্থে সংগৃহীত হালাল খাদ্য গ্রহণ। হারাম উপার্জনের অর্থে সংগৃহীত খাদ্যে গঠিত শরীরে নামায কায়েম হয় না। পোশাক পরিষ্কার থাকলেও তা হালাল উপার্জনে খরিদ হওয়া আবশ্যক। নামাযের স্থান তথা জমিন ও জায়নামায পবিত্র হওয়া দরকার। মানুষ বা পশু-পাখীর, মল-মূত্রহীন স্থান নির্বাচন করে মাঠে-ঘাটেও নামায পড়া যায়। সন্দেহজনক স্থানে নামায পড়া উচিত নয়। এই বিষয়গুলো নিশ্চিত হওয়ার পর অজু বা তায়াম্মুম করলে নামাযের প্রস্তুতি শেষ। এবার নামায শুরু করা যায়।

(১) নামাযের স্থানে দাঁড়িয়ে বিছানার দোয়া পড়ার পক্ষে হাদীস নেই। কিবলামুখী হয়ে সোজাভাবে দাঁড়িয়ে সেজদার স্থানের দিকে দৃষ্টি রেখে নামাযের নিয়ত করতে হবে। [বর্তমান সময়ে কিছু আলেম দাবী করছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) মুখে "নাওয়াইতু আন..." বলে নামাযের নিয়ত করতেন না। মুখে নিয়ত পড়া নতুন প্রচলন। তাই এটা বিদআত। কোন সময়ের কোন নামায পড়া হচ্ছে তা মনে রাখাই নিয়ত কিন্তু কেউ কেউ বলেন, মুখে নিয়ত পড়তে কোন দোষ নেই]। নিয়ত করার জন্য তাকবীর অর্থাৎ আল্লাহু আকবার (অর্থ ঃ আল্লাহ মহান) বলে কানের লতি পর্যন্ত বৃদ্ধাঙ্গুলি উঠে এমনভাবে (সহীহ মুসলিম # ৭৬২) দুই হাত কাঁধ

www.nagorikpathagar.org

পর্যন্ত উপরে উঠাতে হবে। অতঃপর হাত নীচে নামিয়ে বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কবজি দৃঢ়ভাবে ধরতে হবে। ইমাম আবু হানিফা (র.) ও ইমাম আহমদ (র.) এর মতে হাত নাভীর নীচে এবং ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে হাত বুকের নীচে কিন্তু নাভীর উপরে যে কোন স্থানে বাঁধতে হবে (সহীহ মুসলিম # ৭৯১ নম্বর হাদীসের পাদটীকা)। এবার নিঃশব্দে পড়তে হবে ঃ

(ক) ছানা ঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা ওয়াতাবারাকাসমুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি পবিত্রময় এবং প্রশংসাময়, তুমি ভিন্ন কোন উপাস্য নেই।

(খ) তা'আউয ঃ আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রাজীম।

অর্থ : বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর সাহায্য চাই।

(গ) তাসমিয়া ঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

অর্থ : পরম দয়ালু ও দাতা আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।

(ঘ) অতঃপর পুরুষেরা ফজর, মাগরিব ও এশার ফরয নামাযে শব্দ করে এবং অন্যান্য নামাযে নিঃশব্দে এবং মহিলারা সকল নামাযে নিঃশব্দে সূরা ফাতিহার অর্থাৎ আলহামদু সূরার "গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দল্লীন" পড়ে "আমীন" বলতে হবে (কেননা যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে যাবে তার পূর্বেকার গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে (সহীহ মুসলিম # ৮১০, বোখারী শরীফ # ৪৫২)।

(ঙ) আমীন বলার পর নিঃশব্দে (সহীহ মুসলিম # ৭৮৫) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়ে কোরআনের যে কোন জায়গা থেকে কমপক্ষে বড় একটি আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত তিলাওয়াত করা ফরয।

(২) এবার আল্লাহু আকবার বলে নত হয়ে দুই হাতের তালু দুই হাঁটুতে শক্তভাবে স্থাপন করে পিঠ, কোমর ও মাথা এক সমতলে রেখে (বোখারী শরীফ # ৪৭৫) 'সুবহানা রব্বিয়াল আযীম।' অর্থ ঃ আমার মহান প্রভু পবিত্র। তিন, পাঁচ বা সাতবার পড়তে হবে।

www.nagorikpathagar.org

(৩) এখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ। অর্থ ঃ কেউ আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করলে তিনি তা শুনেন) একবার বলে সোজা হয়ে এমনভাবে দাঁড়াতে হবে যেন মেরুদণ্ডের প্রত্যেকটি গিট নিজ নিজ স্থানে বসে যায় (বোখারী শরীফ # ৪৭৫)। দাঁড়ানো অবস্থায় রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ (সমস্ত প্রশংসা আমার প্রভুর জন্য) একবার বলতে হবে।

(৪) অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে একে একে দুই হাতের তালু, দুই হাঁটু এবং নাক ও কপাল (সাত অঙ্গ তথা কপাল ও নাক উভয় হাত, উভয় হাঁটু এবং উভয় পায়ের পাতা (সহীহ মুসলিম # ৯৯২, বোখারী শরীফ # ৪৬)। জায়নামায বা জমিনে স্থাপন করে সেজদায় "সুবহানা রাব্বিয়াল আলা" (আল্লাহ পবিত্র ও মহান) তিন, পাঁচ বা সাতবার পড়তে হবে। দুই হাতের তালু জমিনে ফাঁক করে রেখে সেই ফাঁকে সেজদা করতে হয়। হাতের আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক ও সোজা করে দুই বাহু এমনভাবে উঁচু রাখতে হবে যেন একটি মেষ শাবক বাহুর ফাঁক দিয়ে যেতে পারে (সহীহ মুসলিম # ৯৯৯)। বাহুদ্বয়কে কুকুরের মত বিছিয়ে দিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিষেধ করেছেন (সহীহ মুসলিম # ৯৯৫)।

(৫) সেজদা শেষে মাথা উঠিয়ে বাম পায়ের পাতা পেতে ডান পা খাড়া রেখে স্থির হয়ে বসতে হবে (বোখারী শরীফ # ৪৭৫)। এবং ডান উরুর উপর ডান হাত এবং বাম উরুর উপর বাম হাত আঙ্গুল সোজা অবস্থায় রাখতে হবে।

(৬) পুনরায় আল্লাহু আকবার বলে উপুড় হয়ে প্রথম সেজদার ন্যায় সেজদা করে আল্লাহু আকবার বলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে প্রথম রাকাতের মত সূরা কিরাত পাঠ করে দ্বিতীয় রাকাতের দুই সেজদা শেষে আগের মত বসতে হবে। নামায দুইয়ের অধিক রাকাত হলে আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহ এর "আবদুহু ওয়া রসূলুহু" পর্যন্ত পড়ে আল্লাহু আকবার বলে উঠে দাঁড়িয়ে বাকী এক বা দুই রাকাত নামায শেষ করতে হবে। (ফরয নামাযে) তৃতীয় বা চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে অন্য কোন সূরা পড়তে হবে না (বোখারী শরীফ # ৪৪২)।

www.nagorikpathagar.org

শেষ রাকাতে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে দরূদ এবং দোয়া মাছুরা পড়ে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ বলে প্রথমে ডানদিকে এবং পুনঃ একইভাবে বামদিকে সালাম ফেরাতে হবে। সালাম ফেরাতে মাথা ডান ও বাম কাঁধ বরাবর ঘুরাতে হবে। নামায দুই রাকাত হলে দুই রাকাতের পরেই একই নিয়মে সালাম ফেরাতে হবে। আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় লা ইলাহা পড়ার সময় বৃদ্ধাঙ্গুলি ও শেষ তিন আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ করে শাহাদাত আঙ্গুল সোজা করে উপরে উঠিয়ে ইশারা করতে হবে এবং ইল্লাল্লাহু পড়ার সময় শাহাদাত আঙ্গুল নামিয়ে মুষ্টি খুলে হাত সোজা করতে হবে।

(৭) দিনের পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামায পড়ার সময় নামাযের স্থানে দাঁড়িয়ে নামায শুরুর পূর্বে পুরুষেরা শব্দ করে একামত বলতে হবে। একামত আজানের শব্দের অনুরূপ। তবে পার্থক্য এই যে শব্দগুলো দুইবারের পরিবর্তে একবার করে বলতে হবে (সহীহ মুসলিম # ৭৪০)। এবং হাইয়্যা আলাল ফালাহ এর পরে দুইবার কাদকামাতিস সালাহ বলতে হবে।

এই নিয়মে দিনের পাঁচ ওয়াক্তের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল নামায আদায় করতে হবে। ওয়াজিব ও সুন্নাত নামায আদায় না করলে গুনাহ হবে। তবে নফল নামায আদায় করলে সওয়াব হবে কিন্তু না করলে গুনাহ হবে না। নফল নামায যত খুশী তত পড়া যায়।

জামাতে নামায পড়া ঃ

জুমার ফরয, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামায জামাতে পড়তে হয়। জামাতে নামায পড়ার ফযিলত অনেক। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনায়, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, জামাতের নামাযে একাকী নামাযের তুলনায় পঁচিশ গুন বেশী সওয়াব (বোখারী শরীফ প্রথম খণ্ডের ৩১০ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা)।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, দুই বা তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক হলে জামাত হয় (ইবনে মাজাহ শরীফ # ৯৭২)। দুই জনে জামাত করতে

www.nagorikpathagar.org

গেলে মোক্তাদী ইমামের ডান পাশে একটু পেছনে দাঁড়াবে। ইমাম থেকে এগিয়ে গেলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। দুইয়ের অধিক হলে মোক্তাদীরা যথারীতি ইমামের পেছনে সারি সোজা করে দাঁড়াবেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেছেন, আমার (সা.) জন্য গোটা পৃথিবী পাক পবিত্র ও মসজিদ করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং নামাযের সময় হলে যে কোন লোক যে কোন স্থানে নামায আদায় করে নিতে পারে (সহীহ মুসলিম # ১০৫৪)।

ইমাম নির্বাচন ও তার অনুসরণ ঃ

জামাতে নামায পড়তে একজন উপযুক্ত ইমাম দরকার। কোরআন ও হাদীস সম্পর্কে যার সুষ্ঠু জ্ঞান আছে, যার ঈমান মজবুত, যিনি নিয়মিতভাবে নামায পড়েন, যিনি ইসলাম পরিপন্থী কোন কাজে সম্পৃক্ত নন, বয়সে যিনি বড়, তিনি ইমাম হওয়ার যোগ্য। সমবয়সী কয়েক ব্যক্তি জামাত করতে চাইলে তাদের মধ্যে যিনি বেশী জ্ঞানী তিনি ইমাম হবেন। আর সমজ্ঞানী হলে যিনি বয়সে বড় তিনি ইমাম হবেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সর্বাবস্থায় নামাযের সময় উপস্থিত হলে একজন আজান দিও এবং সর্বাধিক উপযুক্ত বা বয়স্ক ব্যক্তিকে ইমাম বানিয়ে নামায আদায় করো (বোখারী শরীফ # ৩৮৩)। কোন গৃহে কয়েকজন লোক একত্রিত হলে সে গৃহকর্তার ইমাম হওয়ার অগ্রাধিকার আছে। তিনি অনুরোধ করলে অন্যজন ইমাম হবে।

ইমাম যখন নামায পড়ান সে সময় সূরা কিরাত ভুল পড়লে অথবা ভুল করে নামাযের কোন নিয়ম ভঙ্গ করলে মোক্তাদীদের মধ্য থেকে কোন একজন "সুবহানাল্লাহ" বলে ইমামকে সতর্ক করবে (বোখারী শরীফ # ৬৩৬)। ইমামের পেছনে কিভাবে নামায পড়তে হবে তা নামায পড়ার নিয়মের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দ্বিতীয় হাদীসে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ আছে।

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের নামায পড়ালেন। তিনি নামায শেষ করে আমাদের দিকে মুখ

www.nagorikpathagar.org

ফিরিয়ে বসে বললেন, হে লোকেরা! আমি তোমাদের ইমাম। অতএব তোমরা আমার পূর্বে রুকু-সেজদা, উঠা-বসা করবে না এবং সালামও ফেরাবে না (সহীহ্ মুসলিম # ৮৫৬)। তাই ইমামকে অনুসরণ করে নামায শেষ করতে হবে।

নামাযীর সামনে দিয়ে যাতায়াত ও সুতরার ব্যবহার ঃ

মসজিদে মুসল্লীরা যখন নামায পড়ে, তখন কিছু কিছু লোক দেরিতে এসে সামনে যাওয়ার জন্য কোন নামাযীর কাঁধের উপর দিয়ে এবং কোন নামাযীর সামনে দিয়ে এগুতে থাকে। এটা নামাযের শৃঙ্খলার পরিপন্থী কাজ। আবার ফরযের পরে যখন কিছু মুসল্লী সুন্নাত পড়তে থাকে সে সময়ে সামনের দিক থেকে কিছু লোক বের হয়ে যাওয়ার জন্য অনুরূপভাবে চলে যায়। এটা খুব বড় গুনাহের কাজ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, নামাযরত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে যাতায়াতকারী যদি উপলব্ধি করতে পারত যে, এরূপ করা কত বড় গুনাহ, তবে চল্লিশ (দিন বা মাস বা বছর) দাঁড়িয়ে থাকতে হলেও সে নামাযের সম্মুখ দিয়ে কখনো যেত না (বোখারী শরীফ # ৩১৮, সহীহ্ মুসলিম # ১০২৪)।

আবু সায়ীদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ে সে যেন নিজের সামনে দিয়ে কাউকে যেতে না দেয়। সে সাধ্যমত তাকে বাধা দেবে। সে যদি এটা থেকে বিরত থাকতে অস্বীকার করে তবে সে যেন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কেননা, সে একটা শয়তান (সহীহ্ মুসলিম # ১০২০)।

কেউ যখন কোন খোলা জায়গায় নামায পড়েন তিনি তাঁর নামাযের সামনে যেন কমপক্ষে পৌনে এক হাত লম্বা কোন কিছু দাঁড় করে দেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি নিজের সামনে হাওদার (উঠের পিঠে আসনের পেছন ভাগে দাঁড় করানো) কাঠের ন্যায় কিছু রেখে দিয়ে নিশ্চিন্তে নামায পড়তে পারে। এই সুতরার পেছন দিয়ে কেউ অতিক্রম করলে সেদিকে তাকে ভ্রুক্ষেপ করতে হবে না (সহীহ্ মুসলিম # ১০০৩)।

www.nagorikpathagar.org

খোতবার সময় কথা না বলা ঃ

জুমার ফরয নামায শুরুর আগে এবং ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা নামাযের শেষে ইমাম খোতবা দিয়ে থাকেন। জুমার খোতবা নামাযের অংশ বিশেষ। খোতবা শুনা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, জুমার দিন একদল ফেরেশতা মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে ধারাবাহিকরূপে আগন্তুক মুসল্লীগণের নাম লিখতে থাকেন। যে ব্যক্তি প্রথম ওয়াক্তে আসল সে যেন একটি উট সদকা করল। তারপরের সময়ের আগন্তুক যেন একটি গরু, তারপর যেন একটি দুম্বা, তারপর যেন একটি মোরগ, তারপর যেন একটি ডিম সদকা করল। তারপর যখন ইমাম খোতবার জন্য অগ্রসর হন, তখন ফেরেশতাগণ সবকিছু গুটিয়ে খোতবার মধ্যে আল্লাহর যিকির শুনার জন্য চলে যান (বোখারী শরীফ # ৫১৯ ও সহীহ্ মুসলিম # ১৮৪১)।

আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, জুমার দিন খোতবা দানকালীন তুমি যদি কাউকেও বল চুপ কর" তবে তুমিও নিয়ম লজ্ঘনকারী সাব্যস্ত হবে (বোখারী শরীফ # ৫২২)।

পৃথিবীর সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ খোতবা হযরত মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিদায় হজ্জের খুতবা।

সাহু সেজদা ঃ

কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন শয়তান এসে তাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। সে ভাবতে শুরু করে কোথায় কি করেছে, কাউকে কিছু বলতে ভুলে গেছে, ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দরজার তালা বন্ধ করেছে কি, নামাযের পরে কি কি কাজ করবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকল বিষয়গুলো মনে ঘুরপাক খেতে থাকলে সে নামায সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যায় এবং ভুলে যায় কত রাকাত নামায পড়েছে বা কয়টি সেজদা দিয়েছে। এমন অবস্থায় কি করা দরকার তা জানা অতীব জরুরি।

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তিন রাকাত পড়া হলো না চার রাকাত পড়া হলো- নামাযের মধ্যে তোমাদের কারো এরূপ সন্দেহ হলে সে যে কয় রাকাত পড়ছে বলে নিশ্চিত হবে সে কয় রাকাতকে ভিত্তি ধরে অবশিষ্ট করণীয় করবে। এর পর সালাম

www.nagorikpathagar.org

ফিরানোর পূর্বে দুইটি সেজদা করবে। সে যদি আগে পাঁচ রাকাত পড়ে থাকে তাহলে এ দুই সেজদা দ্বারা তার নামাযের জোড়া পূর্ণ হয়ে যাবে। আর যদি তার নামায চার রাকাত হয়ে থাকে তা হলে সেজদা দুইটি শয়তানের মুখে মাটি নিক্ষেপের শামিল হবে (সহীহ মুসলিম # ১১৬১, মেশকাত # ৯৪৯)।

আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন নামাযে খাড়া হয়, তখন শয়তান এসে নানা প্রকার বাধা সৃষ্টি করে, এমনকি কত রাকাত পড়েছে তা সে ভুলে যায়। কেউ এ অবস্থার সম্মুখীন হলে শেষ বৈঠকে দুইটি সেজদা করবে (বোখারী শরীফ # ৬৪৮)।

প্রথম হাদীসটির ব্যাখ্যায় মেশকাত শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহু সেজদা হুযুর (সা.) কখনো সালাম ফেরার আগে করেছেন আর কখনো পরে করেছেন বলে দুই রকমের হাদীস রয়েছে। ইমাম আযম (আবু হানিফা) রহমাতুল্লাহ আলাইহি আগে করার হাদীসটিকে গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন যে, আত্তাহিয়্যাতু পড়ে শুধু ডান দিকে একটি সালাম ফেরাবে, অতঃপর সাহুর জন্য দুইটি সেজদা করবে, তারপর তাশাহহুদ, দরূদ ও দোয়া পড়ে রীতিমত দুইদিকে সালাম ফেরাবে।

অনেকে দীর্ঘ রোগ ভোগের সময়ে নামায আদায় করে না। এই অবস্থায় মারা গেলে তাদের আত্মীয়-স্বজন সে অনাদায়ী নামাযের কাফফারা আদায় করার জন্য বিভিন্ন জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। কাফফারা হিসেবে কেউ কেউ কোরআন শরীফ দান করে অথবা মিসকীনকে খাওয়ায় ও দান খয়রাত করে। আসলে অনাদায়ী নামাযের কোন কাফফারা হয় না। কারণ হুঁশ থাকা অবস্থায় নামায আদায় করা বাধ্যতামূলক। হুঁশ থাকলে যে কোন পন্থায় অর্থাৎ শুয়ে, বসে এমনকি চোখের ইশারায় নামায আদায় করতে হবে। অজ্ঞান অবস্থায় থাকলে সেই সময়ের নামাযের জন্য কোন দায় নেই অর্থাৎ সেই সময়ের নামায মাফ। অনাদায়ী নামাযের জন্য তার আত্মীয়-স্বজন তার পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারে এবং তার নামে দান খয়রাত করতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

যাকাত

ইসলামের প্রধান পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে যাকাতের স্থান তৃতীয়। গুরুত্বের বিবেচনায় নামাযের পরেই এর স্থান। পবিত্র কোরআনে দানের উল্লেখ বহু স্থানে আছে। দানকে ঐচ্ছিক ও বাধ্যতামূলক এ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ঐচ্ছিক দান দাতার সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে। কিন্তু বাধ্যতামূলক দান অবশ্যই আদায় করতে হবে, অন্যথা পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। বাধ্যতামূলক এ দানকেই যাকাত বলে। এটা সম্পদের সদকা। আল্লাহ্ যাদেরকে সম্পদশালী করেছেন, তাদের সম্পদের মধ্যে গরীবদের জন্য অংশ রেখেছেন। সকল মানুষ সমপরিমাণ সম্পদের অধিকারী নয় বলেই ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার সম্পদের বৈষম্য কমানোর জন্যই ইসলামে যাকাতের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যাকাত মালকে পবিত্র করে। এটা আদায় করা ফরয। এটা কারো দয়ার দান নয় বরং গরীবের পাওনা।

আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে নামায কায়েম করার জন্য যখনই তাগিদ দিয়েছেন এদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যাকাত পরিশোধের তাগিদও দিয়েছেন। তিনি বলেন : নামায কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর। যাকাত আদায়ের তাগিদ সম্পর্কিত কোরআনের এ আয়াতগুলোর উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ সূরা বাকারা # ২ : ৪৩, ৮৩, ১১০, ১৭৭ ও ২৭৭; সূরা নিসা # ৪ : ৭৭ ও ১৬২; সূরা মায়েদা # ৫ : ১২ ও ৫৫; সূরা আ'রাফ # ৭ : ১৫৬; সূরা তওবা # ৯ : ১১, ১৮ ও ৭১; সূরা আম্বিয়া # ২১ : ৭৩; সূরা হজ্জ # ২২ : ৪১ ও ৭৮; সূরা নূর # ২৪ : ৫৬; সূরা হা-মীম-সেজদা # ৪১ : ৭ এবং সূরা বায়্যিনা # ৯৮ : ৫। এগুলো ছাড়াও আরো আয়াত আছে।

যাকাত নির্ধারণের পদ্ধতি ঃ

যাকাত নির্ধারণের মাপকাঠির নাম নিসাব। নিসাবের পরিমাণ সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য। এদের মধ্যে যেটির দাম কম সেটিকে ভিত্তি হিসাবে ধরতে হবে। বর্তমানে সাড়ে বায়ান্ন তোলা

www.nagorikpathagar.org

রৌপ্যের দাম সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের দাম অপেক্ষা কম। অতএব সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের দামই যাকাতের নিসাব।

প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) হযরত আনাস (রা.)-কে বাহরাইনের শাসক নিযুক্ত করে পাঠাবার সময় এক সনদ পত্রে লিখে দিলেন : রূপা চল্লিশ ভাগের একভাগ হারে যাকাত দিতে হবে। কিন্তু শুধু মাত্র রৌপ্য থাকলে দুই শত দিরহাম (সাড়ে বায়ান্ন তোলা) থেকে মাত্র এক কম একশত নিরান্নব্বই দিরহাম ওজনের হলেও এতে যাকাত ফরয হবে না। অবশ্য মালিক ইচ্ছা করলে কিছু দান করতে পারে (বোখারী শরীফ # ৭৬৪)।

সোনার যাকাতের ক্ষেত্রে এতে কত ক্যারেট খাঁটি সোনা আছে এবং এর বাজার দর কত তা ঠিক করে সে দাম অনুসারে যাকাত দিতে হবে। ব্যক্তিগত ব্যবহারী অলংকারের পাথরের যাকাত দিতে হবে না। পাথর বাদ দিয়ে সোনার দাম নির্ণয় করতে হবে। এর অর্থ এই যে, অলংকারে সোনার খাদ ও পাথর বাদ দিয়ে বাকী সোনার দাম নির্ণয় করে নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত দিতে হবে।

সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের অধিক টাকা নগদে, ব্যাংকে জমা বা আদায়যোগ্য পাওনা হিসাবে থাকলে সব টাকার চল্লিশ ভাগের একভাগ অর্থাৎ শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দিতে হবে। তবে ঐ সময়ের ভেতর পরিশোধযোগ্য কোন দেনা থাকলে তা বাদ দিয়ে যাকাত হিসাব করতে হবে।

মহিলাদের ব্যবহারে থাকা সোনা ও রূপার অলংকারের যাকাত দিতে হবে কিনা এ নিয়ে মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে নিসাব পরিমাণ সোনা ও রূপার অলংকারের উপর যাকাত বাধ্যতামূলক। হযরত আমর (রা.)-এর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। এক ইয়ামানী মহিলা ও তার কন্যা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। তার কন্যার হাতে মোটা দুই গাছি সোনার কাঁকন ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি এগুলোর যাকাত দিয়েছ? মহিলা বলল, না। রাসূলুল্লাহ

www.nagorikpathagar.org

(সা.) বললেন, তুমি কি পছন্দ কর যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা এর পরিবর্তে তোমাকে এক জোড়া আগুনের কাঁকন পরান (আবু দাউদ শরীফ # ১৫৬৩ ও নাসাঈ শরীফ # ২৪৮২)।

এ প্রসঙ্গে অন্য আরেকটি হাদীসের উল্লেখ করা যেতে পারে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন শাদ্দাদ ইবনুল হাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার নিকট উপস্থিত হয়ে আমার হাতে রূপার বড় বড় আংটি দেখতে পান। তিনি বলেন, হে আয়েশা! একি? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উদ্দেশ্যে রূপচর্চা করার জন্য তা পরেছি। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি এর যাকাত পরিশোধ করে থাক? আমি বললাম না। তিনি বললেন, তোমাকে দোযখে নিয়ে যাবার জন্য এটা যথেষ্ট। অলংকারের যাকাত সম্পর্কিত এমন একটি বিষয়ে উমার ইবনে ইয়ালা থেকে এ সূত্রেও আংটি সম্পর্কিত পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করা হল, কিভাবে এর যাকাত দিতে হবে? তিনি বলেন, যাকাতের অন্যান্য মালের সাথে যোগ করে (আবু দাউদ শরীফ # ১৫৫৬ ও ১৫৬৬)। অপরদিকে মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের মতে মহিলাদের অলংকারের যাকাত নেই তা যত দামিই হোক না কেন? এমতাবস্থায় নিজের নিরাপত্তার জন্য নিসাব পরিমাণ অলংকারাদির যাকাত পরিশোধ করাই শ্রেয়। প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

ভাড়াবাড়ী অথবা বাড়ী হতে প্রাপ্ত ভাড়ার যাকাত নিয়ে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। এ সম্পর্কে কোন হাদীস পাওয়া যায় না। তাই বিশেষজ্ঞদের এক একজন এক এক রকমের মত দিয়েছেন। যেহেতু বাড়ীটি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছে সেহেতু বাড়ীর মূল্যের উপর যাকাত দিতে হবে। কেউ বলেন, বাড়ী হতে প্রাপ্ত সব আয়ের উপর যাকাত দিতে হবে। আবার কেউ বলেন, বাড়ীকে ভাড়া পাওয়ার উপযুক্ত রাখার জন্য সে সকল খরচ করা হয় তা বাদ দিয়ে অর্থাৎ নীট আয়ের উপর যাকাত হবে। আবার এমন মতও পাওয়া যায় যে, বাড়ী হতে প্রাপ্ত আয় মালিকের

www.nagorikpathagar.org

অন্যান্য আয়ের সাথে যোগ করার পর বছরান্তে যা জমা থাকে তা যাকাতযোগ্য। তাই বিভিন্ন রকমের মতের কারণে মনগড়া কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে যারা ফতোয়া দেয়ার মত জ্ঞানী তাঁদের কারো মত নিয়ে যাকাত দেয়া উচিত।

যাকাত পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে ফকীর, মিসকীন এবং নিজের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের দাবি অগ্রগণ্য। হযরত সালমান (রা.) থেকে বর্ণিত। 'তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন : মিসকীনকে সদকা দিলে একটি সদকার সওয়াব পাওয়া যাবে। আর আত্মীয়কে সদকা দিলে দুইটি সদকার সওয়াব পাওয়া যাবে, একটি সদকার এবং অপরটি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার (ইবনে মাজাহ শরীফ # ১৮৪৪)।

উল্লিখিত খাতগুলো ছাড়াও অনেক কিছুর তথা গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, জমির ফসলের উপরও বিভিন্ন হিসাবে যাকাত দিতে হয়।

রমাযান মাসের দানে অনেক বেশী সওয়াব পাওয়া যায়। এ জন্য অনেকে রমাযান মাসে যাকাত আদায় করেন। বছরের যে কোন তারিখকে ভিত্তি করে পূর্ণ এক বছর হিসাব করে সেই বছরের যাকাত হিসাব করতে হয়। অনেকে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্ণ বছর গণনা করে। কোন সম্পদ অর্থাৎ নগদ টাকা, ব্যাংকে রক্ষিত টাকা, ব্যবসায়ের মাল, সোনা রূপা ইত্যাদি নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত দিতে হবে। নিসাবের কম হলে যাকাত দিতে হবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন সম্পদের যাকাত নেই (ইবনে মাজাহ শরীফ # ১৭৯২)। তবে যাকাত অগ্রিম আদায় করা যায়। হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা.) থেকে বর্ণিত। আব্বাস (রা.) তাঁর মালের বর্ষপূর্তির পূর্বে যাকাত আদায় করার ব্যাপারে নবী করীম (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি (সা.) তাঁকে এ ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেন (ইবনে মাজাহ শরীফ # ১৭৯৫)। তবে বছরান্তে যাকাত হিসাব করে অগ্রিম দেয়া টাকা বাদ দেয়া যাবে।

www.nagorikpathagar.org

যারা যাকাত পাওয়ার যোগ্য ঃ

যারা যাকাত পাওয়ার যোগ্য তাঁদেরকে যাকাতের "মাসরাফ" বলে। যাকাতের মাসরাফ সর্বসমেত আটটি (তফসীরে আশরাফী : সূরা তওবার ষাট নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা)। পবিত্র কোরআনের কয়েক স্থানে যাকাত পাওয়ার যোগ্যদের বর্ণনা আছে। নিম্নে তিনটি আয়াতের বাংলা অনুবাদ দেয়া হলো সেগুলো থেকে যাকাত পাওয়ার যোগ্যদের পূর্ণ তালিকা পাওয়া যাবে :

মহান আল্লাহ্ বলেন : অতএব আত্মীয়-স্বজনকে তাঁদের প্রাপ্য দান কর, আর মিসকীন ও মুসাফিরকেও। যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য এটা শ্রেয় এবং তারাই সফলকাম (সূরা আররূম # ৩০ : ৩৮)।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : আর তারা (আল্লাহ্র) মহব্বতে সম্পদ দান করে আত্মীয়-স্বজনকে এবং এতীমদেরকে এবং মিসকীনদেরকে এবং মুসাফিরদেরকে এবং ভিক্ষুকদেরকে আর মুক্তিকামী দাসদের জন্য (সূরা বাকারা # ২ : ১৭৭)।

মহান আল্লাহ্ আরোও বিস্তারিতভাবে বলেন : সদকাগুলোর (যাকাতের) হক হচ্ছে কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী, যাদের মন আকর্ষণ প্রয়োজন, মুক্তিকামী দাসদাসী, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী এবং মুসাফিরদের। এই হল, আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় (সূরা তওবা # ৯ : ৬০)।

উপরের আয়াতগুলোতে বর্ণিত নামানুসারে শুধুমাত্র নিম্নের আট শ্রেণীর ব্যক্তি যাকাত পাওয়ার যোগ্য–

(১) **ফকীর ঃ** যাদের সহায়-সম্বল অতি সামান্য। ভিক্ষুক সেজে এরা মানুষের কাছে সাহায্যের জন্য হাত পাতে। তবে প্রকৃত ভিক্ষুক খোঁজে পাওয়া অনেক সময় কঠিন। এমন কিছু লোক আছে যারা ভিক্ষার জন্য অন্যের নিকট হাত পাতে। প্রকৃতপক্ষে এরা ভিক্ষুক নয় বরং প্রতারক-ব্যবসায়ী। এমনও উদাহরণ আছে, সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক

www.nagorikpathagar.org

আরোও সম্পদ বাড়ানোর জন্য রেল ষ্টেশনে, ট্রেনে, লঞ্চ-ষ্টিমারের ঘাটে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেইটে ভিক্ষা করে বেড়ায়। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য মানুষের কাছে ভিক্ষা চায়, সে তো জাহান্নামের আগুন ভিক্ষা চায়। এখন তার ইচ্ছা, সে এ আগুন কম করে সংগ্রহ করুক বা বেশী করে সংগ্রহ করুক (ইবনে মাজাহ্ শরীফ # ১৮৩৮)। তাই অপরিচিত ভিক্ষুককে যাকাত না দিয়ে নিজ এলাকার পরিচিত ও সত্যিকার অভাবী ফকীরকে যাকাত দেয়া উচিত।

(২) মিসকীন ঃ আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সা.) বলেছেন : ঐ ব্যক্তি বস্তুতঃ মিসকীন নয় যে এক-দুই লোকমা পাবার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়। প্রকৃত মিসকীন ঐ ব্যক্তি যার অভাব আছে কিন্তু মানুষের কাছে হাত পাতায় লজ্জাবোধ করে তা থেকে বিরত থাকে (বোখারী শরীফ # ৭৭৮ ও সহীহ্ মুসলিম # ২২৬৩)।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, প্রকৃত দাবি সে অভাবীদেরই যারা অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে আল্লাহর পথে তাদের পক্ষে দেশের কোথাও বিচরণ করা সম্ভব হয় না; যারা ওয়াকেফহাল নয়, তারা এদেরকে ধনী মনে করে, এরা যাঞ্ঝা করা থেকে বিরত থাকার দরুন। তোমরা এদেরকে চিনে নিতে পারবে; এদের লক্ষণের দ্বারা, এরা লোকের নিকট ব্যাকুলভাবে যাঞ্ঝা করে বেড়ায় না; আর যে অর্থ তোমরা ব্যয় করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এর পূর্ণ খবর রাখেন (সূরা বাকারা # ২ : ২৭৩)।

(৩) যাকাত আদায়কারী ঃ যারা যাকাত আদায় করে এবং যাকাত তহবিল থেকে বেতন পেয়ে থাকে। আমাদের দেশে যাকাত আদায়কারী যাকাতের টাকা জমা দেয়। এ টাকা থেকে অনেকে প্রভাব খাটিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা বড় অঙ্কের টাকা নিয়ে যাকাত পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদেরকে না দিয়ে ভুয়া ভাউচার তৈরি করে টাকা খরচ দেখিয়ে সে প্রতিষ্ঠানের অসৎ ব্যক্তিরা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়। আবার কেউ কেউ নিজের নাম জাহির করার লক্ষ্যে ঘোষণা দিয়ে যাকাতের

www.nagorikpathagar.org

টাকা বা কাপড় ইত্যাদি বিতরণ করে। এটা পাবার জন্য গরীবরা সেখানে ভিড় জমায়। আগে পাবার লক্ষ্যে বা না পাওয়ার আশঙ্কায় হুড়াহুড়ি শুরু করে। ফলে পদ-দলিত হয়ে অনেক অসহায় নারী ও শিশু মারা যায়। এ সকল ঘটনা সংবাদ মাধ্যমে প্রায়ই দেখা যায়। লোক দেখানো যাকাত বিতরণকারীদের অনেকের সম্পদ অবৈধভাবে উপার্জিত। তারা মনে করে যাকাত দিলে তা বৈধ হয়ে গেল। আসলে এ দান আল্লাহর নিকট গৃহীত হয় না। হুসায়ন মুহাম্মাদ (র.), হযরত আবুল মলীহ (র.)-এর পিতা উসামাহ ইবনে উমায়র (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে আমি বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা ছাড়া নামায কবুল করেন না এবং খিয়ানতের মালের সদকাও কবুল করেন না (নাসাঈ শরীফ # ২৫২৭)।

(৪) যাদের মন আকর্ষণ প্রয়োজন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময়ে কাফেরদের অত্যাচার ও শঠতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং ভবিষ্যতে তাদের মুসলমান হবার আশায় তাদের মন ইসলামের দিকে আকর্ষণের জন্য তাদেরকে যাকাত দেয়া হতো। বর্তমানে এমন লোকদের মন জয় করে মুসলমান করার সম্ভাবনা থাকলে তাদেরকে যাকাত দেয়া যেতে পারে।

(৫) মুক্তিকামী দাস-দাসী ঃ ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় আরবে দাস প্রথা ছিল। অনেক সময় মনিবেরা তাদের দাস-দাসীদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করত। যারা ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ত তাদেরকে মরুভূমিতে উত্তপ্ত বালির উপর চিত করে শোয়ায়ে দিয়ে বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে শাস্তি দিত। এমন অমানবিক অত্যাচার থেকে কোন দাস বা দাসীকে মুক্ত করে মুসলমান বানাবার সম্ভাবনা বিবেচনা করে তাদেরকে মুক্ত করার জন্য যাকাত দেয়া হত। ইসলামের ইতিহাসের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, সকল মুসলমানের নিকট অতি পরিচিত এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক নিয়োজিত মুয়াযযিন হযরত বেলাল (রা.) তেমনি একজন ক্রীতদাস ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে তাঁর নিষ্ঠুর মনিব উমাইয়া বিন খালাফের নিকট থেকে মুক্ত করেছেন। বর্তমানে দাস প্রথা নেই। তাই এ জন্য যাকাতের দরকার নেই।

www.nagorikpathagar.org

(৬) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঃ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যার ঋণ অপেক্ষা সম্পদের পরিমাণ কম, সে ঋণ পরিশোধের জন্য যাকাত পেতে পারে। তবে যদি সে কোন খারাপ কাজের জন্য ঋণ করে তাকে তা হলে তাকে যাকাত দেয়া যাবে না। এ ক্ষেত্রে নিকট আত্মীয়দের দাবি অগ্রগণ্য বিবেচিত হবে।

(৭) আল্লাহর পথে জিহাদকারী ঃ ইসলাম বিরোধী কাজকে বাধাদানকারী, ইসলামের প্রসারে আল্লাহর ওয়াস্তে নিঃস্বার্থ কর্মী অর্থাৎ জিহাদকারী যাকাত পাবে। তবে বর্তমানে ইসলামের নামে জিহাদের ঘোষণা দিয়ে যারা মানুষ হত্যা করে অথবা অন্যান্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত তারা এর আওতাভুক্ত নয়। বরং তাদেরকে সে সকল কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করাই সত্যিকারের জিহাদ।

(৮) মুসাফির ঃ যারা সৎ উদ্দেশ্যে ভ্রমণের সময় আর্থিক সঙ্কটে পড়ে বাড়ীতে সম্পদ থাকলেও তারা যাকাত পাওয়ার যোগ্য।

যাকাতের অযোগ্য ক্ষেত্র ঃ

যে সকল ক্ষেত্রে যাকাত দেয়া হারাম তাদের কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

(১) মসজিদ, এতীমখানা বা হাসপাতাল নির্মাণের জন্য।

(২) মৃতের দাফন অথবা তার দেনা পরিশোধের জন্য।

(৩) পিতা-মাতা, দাদা, দাদী, নানা ও নানী।

(৪) স্বামী-স্ত্রীকে বা স্ত্রী-স্বামীকে; কারণ পরস্পর একে অপরের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

(৫) যে ব্যক্তি যাকাত দেয়ায় সক্ষম।

(৬) রাস্তা-ঘাট বা সেতু নির্মাণের জন্য।

(৭) হাশেমী বংশের অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বংশের লোককে। আবদুল মুত্তালিব ইবনে রাবী'আ ইবনে হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : মুহাম্মদ (সা.)-এর পরিবার-পরিজন তথা বংশধরদের জন্য যাকাত গ্রহণ করা সমীচীন নয়। কেননা যাকাত হল, মানুষের (সম্পদের) ময়লা (সহীহ মুসলিম # ২৩৪৯)।

www.nagorikpathagar.org

যাকাত আদায় না করার শাস্তি ঃ

যাকাত আদায় না করলে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে আপনি রাসূল (সা.) অতি যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তির সংবাদ শুনিয়ে দিন। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের কপাল, পার্শ্ব এবং পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে এবং বলা হবে, এটা তাই যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রাখতে, এখন এর স্বাদ গ্রহণ কর (সূরা তওবা # ৯ : ৩৪-৩৫)।

আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে সকল ধনাঢ্য ব্যক্তি নিজেদের ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করে না, কেয়ামতের দিন তাদের সে সম্পদ দোযখের আগুনে গরম করে পাত তৈরি করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের দেহের উভয় পার্শ্ব ও ললাটে দাগ দেয়া হবে। তাদের শাস্তি বান্দাদের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। এ সময়ের একদিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অতঃপর কেউ পথ ধরবে বেহেশতের দিকে আর কেউ দোযখের দিকে (সহীহ মুসলিম # ২১৬৩)।

---

www.nagorikpathagar.org

সিয়াম বা রোযা

রমাযান মাসের রোযা ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ। রমাযান হিজরী সনের নবম মাস। চাঁদের হিসাবে হিজরী মাস গণনা করা হয়। এই এক মাস রোযা রাখা প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরয। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস থাকার নামই রোযা নয়। রোযার প্রকৃত উদ্দেশ্যে হল, রোযাদারকে কথা ও কাজে সংযমী করা, রিপুকে দমিয়ে সমস্ত খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখা, ক্ষুধার্তের ক্ষুধার কষ্ট উপলব্ধি করাইয়া দান-খয়রাতে উৎসাহিত করা এবং নামায ও অন্যান্য ফরয, সুন্নাত ও সৎকাজের প্রতি মনোযোগী করে তোলা। বিশ্বের অধিকাংশ উন্নত দেশের চিকিৎসকেরা তাদের কোন কোন রোগীকে উপবাস করার উপদেশ দিয়ে থাকেন। কারণ উপবাসের ফলে অনেক রোগ সেরে যায়। ইহুদী, খৃষ্টান এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের কেউ কেউ বছরের নির্দিষ্ট সময়ে উপবাস করে থাকে। তবে তাদের উপবাস আর মুসলমানের রোযা এক নয়।

রোযা ফরয হওয়া ঃ

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা মোত্তাকী হতে পার। তিনি আরো বলেন, রমাযান মাস সেই মাস যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন যা মানুষের জন্য হেদায়াত এবং সত্য সন্ধানীর জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্যকারী। অতএব তোমাদের মধ্যে যে লোক এই মাসটি পাবে, সে এ মাসে রোযা রাখবে (সূরা বাকারা # ২ : ১৮৩, ১৮৫)।

রোযার মাসের শুরু ও শেষ ঃ

শাবান মাসের শেষ দিন রমাযানের চাঁদ উদিত হয়। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) নতুন চাঁদ সম্পর্কে

www.nagorikpathagar.org

আলোচনা করলেন। তিনি বলেন, তোমরা (রমাযানের) চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং (শাওয়ালের) চাঁদ দেখে রোযা পরিত্যাগ কর। আর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে ত্রিশ দিন গণনা কর (বোখারী শরীফ # ৯৮২)।

এই ত্রিশ দিনে গণনার মাধ্যমে রোযার শুরু এবং শেষ নির্ণয় করা যায়। শাবানের ঊনত্রিশ তারিখে রমাযানের চাঁদ দেখা না গেলে, ত্রিশ তারিখে চাঁদ দেখা না গেলেও পর দিন থেকে রোযা শুরু করতে হবে। অন্যদিকে রমাযান মাসের ঊনত্রিশ তারিখে চাঁদ দেখা না গেলে ত্রিশ রোযা পূর্ণ করে পর দিন ঈদ করতে হবে। দেশের কোন এক স্থানে চাঁদ দেখা গেলে সমগ্র দেশ জুড়ে রোযা শুরু অথবা রোযা শেষ করার রেওয়াজ রয়েছে। কেউ কেউ সৌদী আরবে চাঁদ দেখা যাওয়ার ভিত্তিতে অন্য দেশে রোযা শুরু অথবা শেষ করার পক্ষপাতী। কিন্তু এটা উল্লিখিত রেওয়াজ ও হাদীসের পরিপন্থী। রাসূলুল্লাহ (সা.) দুই ঈদের দিনে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন (বোখারী শরীফ # ২১৬৩)।

ছয় রোযার ফযিলত ঃ

রমাযান মাসের ফরয রোযার শেষে শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়। অতঃপর ঐ মাসের মধ্যে ছয়টি নফল রোযা রাখার বিধান আছে। এই রোযাগুলো ছয় রোযা নামে পরিচিত। এগুলো একটানা বা ফাঁক দিয়ে দিয়ে রাখা যায়। এই রোযাগুলোর ফযিলত অনেক।

আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রমাযান মাসের রোযা রেখেছে এবং তার সাথে শাওয়াল মাসেও ছয়টি রোযা রেখেছে- এটি তার জন্য সারা বছর রোযা রাখার সমান হবে (সহীহ মুসলিম # ২৬২৪)।

রোযার নিয়ত করা ঃ

যে কোন কাজের জন্য নিয়তের প্রয়োজন। হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই জেনে রাখ, আল্লাহর

www.nagorikpathagar.org

নিকট কাজের ফলাফল মানুষের নিয়ত অনুসারে হয়। প্রত্যেক মানুষ তার কাজের ফলাফল আল্লাহর নিকট সেরূপই পাবে, যেরূপ সে নিয়ত করবে (বোখারী শরীফ # ১)।

হযরত হাফসা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ফজর হওয়ার পূর্বে নিয়ত করেনি তার রোযা হয়নি (মেশকাত শরীফ # ১৮৯০, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও দারেমী)। অতএব সেহেরী খাওয়ার পর পরই মনে মনে ফরয রোযার নিয়ত করা অবশ্যক।

রোযার পুরস্কার ঃ

যে কোন নেক আমলের পুরস্কার আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন দান করেন। রোযার পুরস্কার তিনি কি দেবেন তা গোপন রেখেছেন। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ মানব সন্তানের প্রতিটি নেক কাজের সওয়াব দশ গুন হতে সাতশত গুন পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়। মহান আল্লাহ্ বলেন, "কিন্তু রোযা আমারই জন্য এবং আমি নিজেই এর প্রতিফল দান করব। বান্দা আমারই জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং পানাহার পরিত্যাগ করেছে। রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছে। একটি তার ইফতারের সময় এবং অপরটি তার প্রভু আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়। রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ তা'আলার কাছে মেশকের সুগন্ধির চেয়ে অধিক সুগন্ধময় (সহীহ্ মুসলিম # ২৫৭৩, বোখারী শরীফ # ৯৭৭)।

সেহেরীর বরকত ঃ

শেষ রাতে কিছু খেয়ে রোযা শুরু করতে হয়। এই খাওয়াকে সেহেরী বলে। সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত পানাহার করা যায়। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন, আর পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা হতে ভোরের সাদা রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত (সূরা বাকারা # ২ : ১৮৭)।

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) একদা

www.nagorikpathagar.org

বর্ণনা করলেন, আমরা এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সেহেরী খেয়েছি যে সেহেরী শেষ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) নামাযের জন্য প্রস্তুত হলেন। আনাস (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, ফজরের নামাযের আজান ও সেহেরী শেষ করার মধ্যে কি পরিমাণ ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, কোরআন শরীফের পঞ্চাশটি আয়াত তেলাওয়াত করা যায় এই পরিমাণ সময় ছিল (বোখারী শরীফ # ৯৯১; সহীহ মুসলিম # ৪১৮)।

অনেকে সন্ধ্যা রাতে কিছু খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। অলসতাবশতঃ হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক তারা সেহেরী খেতে উঠে না। সেহেরী না খেলে রোযার অবস্থা কি হবে তা আলোচনা না করে বলতে চাই, তারা বিশেষ বরকত থেকে বঞ্চিত হলো। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমরা সেহেরী খাবে, কেননা সেহেরীতে বরকত আছে (সহীহ মুসলিম # ২৪১৫, বোখারী শরীফ # ৯৯৩)। তদুপরি, আমাদের রোযা এবং ইহুদী ও খৃষ্টানদের রোযার মধ্যে পার্থক্য হল, সেহেরী খাওয়া (সহীহ মুসলিম # ২৪১৬)।

সময়মত ইফতার করা ঃ

সূর্য পশ্চিমাকাশে অস্ত যাবার সাথে সাথে ইফতার করতে হয়। ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন রাত আসে দিন শেষ হয়ে যায় এবং সূর্য ডুবে যায় তখনই রোযাদার ব্যক্তি ইফতার করবে (সহীহ মুসলিম : ২৪২৪, বোখারী শরীফ # ১০১৫)। ইফতারের সময় সম্পর্কে যাদের সঠিক জ্ঞান নেই তারা মনে করে দেরিতে ইফতার না করলে রোযার ক্ষতি হবে। তারা কিছুটা অন্ধকার না হওয়ার পূর্বে ইফতার করে না। অনেককে এমনও দেখেছি হাতের বাহু চোখের কাছাকাছি এনে লক্ষ্য করে হাতের পশম দেখা যায় কিনা। পশম দেখা যাওয়া পর্যন্ত ইফতার করে না। সাহল ইবনে সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, মানুষ যতদিন বিলম্ব না করে ইফতার করবে ততদিন তারা কল্যাণের সাথে থাকবে (সহীহ মুসলিম # ২৪২০)।

www.nagorikpathagar.org

ভুলে পানাহার করলে ঃ

মেঘাচ্ছন্ন দিনে সন্ধ্যা হয়ে গেছে এমন ভেবে ইফতার করে ফেললে এবং পরে সূর্য দেখা গেলে সেই রোযার কাযা আদায় করতে হবে। আবু বকর (রা.)-এর কন্যা আসমা (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যমানায় এক মেঘাচ্ছন্ন দিনে আমরা ইফতার করলাম। ইফতার করার পর সূর্য পুনরায় দেখা গেল। তাঁকে (আসমা) জিজ্ঞাসা করা হল, এই ঘটনার দিনের রোযার কাযা আদায়ের আদেশ দেয়া হয়েছিল কি? তিনি বললেন, এমতাবস্থায় কাযা থেকে অব্যাহতি আছে কি (বোখারী শরীফ # ১০১৭)?

কিন্তু ভুলবশতঃ কেউ কিছু খেয়ে ফেললে ঐ দিনের রোযা নষ্ট হবে না। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় ভুলে কিছু খেয়েছে বা পান করেছে, সে যেন তার রোযা পূর্ণ করে। কেননা, আল্লাহই তাকে খাইয়েছেন অথবা পান করিয়েছেন (সহীহ মুসলিম # ২৫৮২, বোখারী শরীফ # ৯৯৯)। এর অর্থ তার রোযা নষ্ট হয়নি।

অসুস্থ বা মুসাফিরের রোযা ঃ

মহান আল্লাহ তার বান্দাকে সাধ্যাতীত কষ্ট দিতে চান না। তাই তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে রোযার কড়াকড়ি শিথিল করে দিয়েছেন। অসুস্থতার কারণে কেউ রোযা রাখতে অক্ষম হলে অথবা মুসাফির অবস্থায় রোযা না রাখলে তা পরে পূরণ করে দেয়ার অনুমতি আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। তিনি পবিত্র কোরআনে বলেন, গণনার কয়েকটি দিনের জন্য। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে, তার পক্ষে অন্য সময় সেই রোযা পূরণ করে দিতে হবে। আর এটি যাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। আর যদি রোযা রাখ, তবে তা তোমাদের জন্য বিশেষ কল্যাণকর, যদি তোমরা তা বুঝতে পার। আর যেই লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে (সূরা বাকারা # ২ : ১৮৪-১৮৫)।

www.nagorikpathagar.org

হায়েযের কারণে ভাঙ্গা রোযা মহিলাদের পরে পূরণ করতে হয়।

হামযা ইবনে আমর আল-আসলামী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সফর অবস্থায়ও আমি আমার মধ্যে রোযা রাখার মত শক্তি রাখি। রোযা রাখলে কি আমার কোন অসুবিধা আছে? রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, রোযা না রাখা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সুযোগ বিশেষ। অতঃপর যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করল তার জন্য তা উত্তম। আর যে ব্যক্তি রোযা রাখতে পছন্দ করে এর জন্য তার কোন গুনাহ হবে না (সহীহ মুসলিম # ২৪৯৫)।

কোন পুরুষ বা মহিলা যদি এরূপ হয়ে যায় যে, সে রোযা রাখায় সক্ষমই নয় তবে সে প্রতিদিন রোযার বিনিময়ে এক জন মিসকীনকে দুই ওয়াক্ত পরিপূর্ণরূপে খাইয়ে দেবে (বোখারী শরীফ # ১৮৮৫)।

রোযা ভাঙ্গার কাফফারা ঃ

ইচ্ছা করে অথবা অবহেলাবশতঃ রোযা ভাঙ্গলে এর জন্য কাফফারা দিতে হয়। এর কাফফারা বেশ কঠিন। তাই রোযা ভঙ্গ করা হতে বিরত থাকা সকলের উচিত! হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান (রা.) বর্ণনা করেন, আবু হোরায়রা (রা.) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রমাযান মাসে একটি রোযা ভেঙ্গে ফেলল। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে একটি কৃতদাস মুক্ত করে দিতে বা দুই মাস বিরতিহীনভাবে রোযা রাখতে অথবা ষাটজন মিসকীনকে পানাহার করাতে নির্দেশ দেন (সহীহ মুসলিম # ২৪৬৫)।

মৃত ব্যক্তির রোযার কাফফারা ঃ

কোন ব্যক্তি রমাযান মাসে রোগ ভোগ অথবা অন্য কারণে রোযা রাখতে অক্ষম থাকা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলে তার রোযা কাযা থেকে যায়। যেই পর্যন্ত এই কাযা আদায় না হবে সেই পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির উপর এর দায় থেকে যাবে। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কোন ব্যক্তি কাযা রোযা বাকী রেখে মরে গেলে তার উত্তরাধিকারীগণ তার পক্ষ হতে সেই রোযা পূরণ করবে (বোখারী শরীফ # ১০১৩, সহীহ মুসলিম # ২৫৫০)।

www.nagorikpathagar.org

হাসান বসরী (র.) বলেছেন, (সম্পূর্ণ রমাযান মাসের রোযা কাযা রেখে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে) ত্রিশ ব্যক্তি এক একটি করে রোযা রাখলে মৃত ব্যক্তির পক্ষে এর কাযা আদায় হয়ে যাবে।

ইমাম আবু হানিফা (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম মালেক (র.) এবং অধিকাংশ আলেমগণের মতে উপরের হাদীসে বর্ণিত উত্তরাধিকারী কর্তৃক রোযা আদায় করার নিয়ম-পদ্ধতি এই যে, প্রতি রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে দুই ওয়াক্ত পেট ভরে খাওয়াবে বা সদকায়ে ফিতর পরিমাণের বস্তু বা এর মূল্য গরীবকে প্রদান করবে।

মিথ্যাবাদীর রোযা ঃ

মিথ্যা বলা মহাপাপ। কিন্তু মিথ্যা বলা যাদের অভ্যাস রোযা রেখেও তারা মিথ্যা বলতে দ্বিধাবোধ করে না। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও মিথ্যা কার্য পরিত্যাগ না করবে ঐ ব্যক্তির পানাহার পরিত্যাগ করার কোন মূল্য আল্লাহর নিকট নেই (বোখারী শরীফ # ৯৭৬)। এই হাদীসের মর্মার্থ অনুধাবন করে মিথ্যাবাদীদের উচিত মিথ্যা পরিত্যাগ করে রোযার প্রকৃত সুফল লাভের চেষ্টা করা।

ঋতু, হায়েয বা মাসিকের কারণে ভাঙ্গা রোযা ঃ

ঋতু হায়েয বা মাসিকের সময় মেয়েদের শরীর অপবিত্র হয়ে যায়। এই সময় রোযা রাখা যায় না। কিন্তু পরে এ রোযার জন্য কাযা করতে হয়। মুআযা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি একদিন আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ঋতুবতী মহিলা তার রোযা কাযা করবে অথচ তাকে নামায কাযা করতে হবে না এটা কেমন কথা? এ কথা শুনে আয়েশা (রা.) বললেন, তুমি কি হারুরীয়ার অধিবাসিনী? মুআযা বলেন, আমি বললাম, না, আমি হারুরীয়ার অধিবাসিনী নই। বরং আমি শুধু ব্যাপারটি জানতে চেয়েছি। আয়েশা (রা.) বললেন, নবী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময়ে আমরা ঐ অবস্থায় পতিত হলে আমাদেরকে রোযা কাযা করার হুকুম

www.nagorikpathagar.org

দেয়া হত কিন্তু নামায কাযা আদায়ের জন্য আদেশ করা হত না (সহীহ মুসলিম # ৬৬৯)।

অন্য এক হাদীসে আবু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা.)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমার রমাযান মাসের রোযা অবশিষ্ট থেকে যেত। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে ব্যস্ত থাকার কারণে আমি শাবান মাস ছাড়া অন্য কোন সময়ে তা আদায় করার সুযোগ পেতাম না (সহীহ মুসলিম # ২৫৫৩)।

তারাবীর নামায পড়া ঃ

তারাবীর নামায রমাযান মাসের চাঁদ উদিত হওয়ার রাত থেকে শাওয়ালের চাঁদ উদিত হওয়ার পূর্ব রাত্রি পর্যন্ত পড়তে হয়। নামাযের রাকাত সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ এ নামায আট রাকাত কেউবা বারো রাকাত এবং অধিকাংশ লোকেরা বিশ রাকাত পড়ে থাকেন। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ প্রমুখ একবাক্যে তারাবীর রাকাত সংখ্যার মতভেদ ব্যক্ত করতে যেয়ে বলেন, আলী (রা.), ওমর (রা.) এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অন্যান্য সাহাবাগণ থেকে প্রাপ্ত বর্ণনার উপর ভিত্তি করে অধিকাংশ আলেম বিশ রাকাতের সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন (বোখারী শরীফ ২য় খণ্ডের ১৯৫ পৃষ্ঠা)।

আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি রমাযানের রাত্রে এর বিশেষ নামায (তারাবীর নামায) ঈমানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ এবং সওয়াবের আশায় অনুপ্রাণিত হয়ে আদায় করবে, তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ হয়ে যাবে (বোখারী শরীফ # ১০৪৭)।

আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) একদা রমাযানের মধ্যে গভীর রাতে বের হয়ে মসজিদে গেলেন এবং নামায পড়তে লাগলেন, কতক লোক তার সঙ্গে নামাযে শরীক হলো। ভোর হলে পর সকলের মধ্যেই এই বিষয় চর্চা হলো, তা দ্বিতীয় দিন আরো অধিক লোকের সমাবেশ হলো এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে নামায পড়ল। ঐ দিন

www.nagorikpathagar.org

ভোরে আরোও অধিক চর্চা হলো এবং তৃতীয় রাত্রে আরও অধিক লোক সমবেত হলো। ঐ দিন রাসূলুল্লাহ (সা.) মসজিদে এসে নামায পড়লেন এবং উপস্থিত সকলেই তার সাথে একত্রে জামাতে নামায পড়ল। চতুর্থ রাত্রিতে লোকের সমাগম এত অধিক হল যে, মসজিদে রাসূলুল্লাহ (সা.) সে নামাযের জন্য আসলেন না। যখন ফজর নামাযের সময় উপস্থিত হলো তখন তিনি মসজিদে আসলেন।

ফজরের নামাযান্তে সকলকে সম্বোধন করে খোতবা পাঠে ভাষণ দান করলেন এবং বললেন, তোমাদের উপস্থিতি আমার অজ্ঞাত নেই কিন্তু আমি আশঙ্কা করলাম যে, তা তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া হতে পারে। সেই অবস্থায় তোমরা অক্ষম হয়ে পড়বে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইহজীবন পর্যন্ত এরূপই থাকল (বোখারী শরীফ # ১০৪৮)।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর তারাবী ফরয হওয়ার আশঙ্কা না থাকায় হযরত ওমর (রা.) তারাবীর জন্য ইমাম নির্দিষ্ট করলেন, রাকাত সংখ্যা বিশ সাব্যস্ত করলেন এবং জামাতের ব্যবস্থা করলেন। (এটা উপরের হাদীসের ব্যাখ্যা)

তারাবী নামায পড়ার নিয়ম ঃ

তারাবী নামায পড়া সুন্নাত। এর দুই দুই রাকাত করে বিশ রাকাত পড়তে হয়। প্রতি চার রাকাত পর এ দোয়া পড়া মোস্তাহাব।

দোয়া ঃ সুবহানাযিল মুলকি ওয়াল মালাকুতি সুবহানাযিল ইজ্জাতি ওয়াল আজমাতি ওয়াল হায়বাতি ওয়াল কুদরাতি ওয়াল কিবরিয়াই ওয়াল জাবারুতি। সুবহানাল মালিকিল হাইয়্যাল্লাযি লা ইয়ালামু ওয়ালা ইয়ামুতু আবাদান আবাদান সুবুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালাইকাতি ওয়াররূহ।

এই দোয়া তিনবার পড়ে নিম্নের মুনাজাত করা হয়।

মুনাজাত ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকাল জান্নাতা ওয়া নাউযুবিকা মিনান্নারি ইয়া খলিকাল জান্নাতি ওয়ান্নারি বিরহমাতিকা ইয়া আযীযু ইয়া

www.nagorikpathagar.org

গফফারু ইয়া কারীমু ইয়া সাত্তারু ইয়া রাহীমু ইয়া জাব্বারু ইয়া খলিকু ইয়া বাররু। আল্লাহুম্মা আজিরনা মিনান্নারি ইয়া মুজিরু ইয়া মুজিরু ইয়া মুজিরু বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

শেষ মুনাজাতের মধ্য দিয়ে নামায শেষ হয়।

লাইলাতুল কদর ঃ

রমাযানের শেষ দশ দিনের গুরুত্ব অনেক। এ দশ দিনের কোন এক রজনীতে লুকিয়ে আছে লাইলাতুল কদর বা কদরের রাত। লাইলাতুল কদর অর্থ মহিমান্বিত রাত। এ রাতে আল্লাহ পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন। আল্লাহ সূরা কদরে বলেন ঃ আমি একে (পবিত্র কোরআন) নাযিল করেছি কদরের রাতে। লাইলাতুল কদর কিরূপ ফযিলতের রাত তা কি জান? লাইলাতুল কদর হাজার মাস অপেক্ষা অধিক উত্তম। সে রাতে ফেরেশতাগণ এবং রূহ (জিব্রাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর আদেশে (দুনিয়ায়) অবতরণ করে থাকেন সকল মঙ্গল ও কল্যাণ নিয়ে। সে রাতটি প্রভাত পর্যন্ত শান্তিই শান্তি।

তাই ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা এ রাতে এবাদতে মশগুল থাকেন ফজরের সময় পর্যন্ত। কিন্তু এটা কোন রাত তা কেউ জানে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) রমাযানের শেষ দশদিনের বেজোড় রাতকে খোঁজতে বলেছেন।

আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) রমাযানের শেষ দশদিনে এতেকাফ করতেন এবং বলতেন, তোমরা লাইলাতুল কদরকে রমাযানের শেষ দশ দিনে তালাশ কর (বোখারী শরীফ # ১০৫১)।

ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কতিপয় সাহাবাকে এক রাতে স্বপ্নে দেখানো হল যে, কদরের রাত রমাযানের শেষ সপ্তাহে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন ঃ আমি দেখছি তোমাদের সকলের স্বপ্ন একই রকম– শেষ সাত রাতে সীমাবদ্ধ। সুতরাং যে ব্যক্তি তা অন্বেষণ করে সে যেন শেষ সাত রাতে অন্বেষণ করে (সহীহ মুসলিম # ২৬২৭)।

সালেম থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি

www.nagorikpathagar.org

স্বপ্নে দেখতে পেল, লাইলাতুল কদর (রমাযানের) সাতাশতম রাত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ আমি দেখছি তোমাদের স্বপ্নগুলো রমাযানের শেষ দশ রাতের মধ্যে মিলিত হয়েছে। অতএব তোমরা তা শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে তালাশ করো (সহীহ মুসলিম # ২৬২৯)।

উপরের হাদীসটির মর্মানুসারে রমাযানের একুশ, তেইশ পঁচিশ, সাতাশ ও উনত্রিশতম রাতে লাইলাতুল কদর খোঁজ করা উচিত। বিশেষ করে এই হাদীসে সাতাশতম রাতের কথা উল্লেখ আছে আর অধিকাংশ লোকের অভিমতও সাতাশতম রাতের পক্ষেই। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ্য যে সাতাশতম রাত বলতে ছাব্বিশ রমাযানের দিবাগত রাতকে বুঝায়।

এতেকাফ করা ঃ

রমাযানের নির্দিষ্ট কয়েকদিনের জন্য মসজিদে আবদ্ধ থেকে আল্লাহর এবাদতে মশগুল থাকার নাম এতেকাফ। এ জন্য দিনের সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। তবে যারা এতেকাফ করেন তাদের অনেকেই কমপক্ষে সাতদিন এতেকাফ করেন। এতেকাফের মূল উদ্দেশ্য লাইলাতুল কদরের সন্ধান লাভ করে এর ফযিলত লাভ করা। যেহেতু নবী রাসূলুল্লাহ (সা.) কদর রমাযানের শেষ দশ দিনের মধ্যে সন্ধান করতে বলেছেন, তাই এ দিনগুলোর মধ্যেই এতেকাফ করা হয়।

ইমাম আবু হানিফার মতে এমন মসজিদে এতেকাফ করতে হবে যেখানে জুমা ও পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় করা হয়। এতেকাফ অবস্থায় সাংসারিক কোন কাজে মসজিদের বাইরে যাওয়ার নিয়ম নেই। তাঁর মতে স্ত্রীলোকেরা নিজেদের ঘরে নামাযের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে এতেকাফ করতে পারে। এতেকাফের স্থান ঘেরা দিয়ে রাখার নিয়ম রয়েছে।

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বীয় জীবনের প্রতি বছর রমাযানের শেষ দশ দিন এতেকাফ করতেন। তাঁর ওফাতের পর তাঁর স্ত্রীগণও ঐরূপ এতেকাফ করেছেন (বোখারী শরীফ # ১০৫৫, সহীহ মুসলিম # ২৬৫০)।

www.nagorikpathagar.org

তিনি আরও বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) রমাযানের শেষ দশকে এবাদতের জন্য যে কঠোর সাধনা করতেন অন্য কোন সময় এতটা করতেন না (সহীহ্ মুসলিম # ২৬৫৪)।

ফিতরার বিবরণ ঃ

রোযার শেষে পরিবারের সকল লোকের জন্য ফিতরা দিতে হয়। এটা রোযাকে পবিত্র করে। ইমাম আবু হানিফার মতে ফিতরা ওয়াজিব। ইমাম মালেক ও অন্যান্যের মতে এটা সুন্নাতে মোয়াক্কাদা। এটা ঈদের জামাতে যাওয়ার পূর্বেই পরিশোধ করতে হয়। এটা গরীবের প্রাপ্য। ফিতরা পরিশোধ না করলে গুনাহ্ হবে।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আযাদ, গোলাম, পুরুষ, স্ত্রী, বড়, ছোট সকলের উপর ফিতরা ধার্য করেছেন মাথা পিছু এক সা (প্রায় চার সের) খেজুর অথবা এক সা বার্লি। রাবী বলেন, লোকেরা এর বিনিময় ধার্য করেছেন অর্ধ সা' (প্রায় দুই সের) গম বা আটা (সহীহ্ মুসলিম # ২১৫১, বোখারী শরীফ # ৭৯১)।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) লোকদেরকে ঈদের নামাযের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই সদাকায়ে ফিতর পরিশোধ করার নির্দেশ দিয়েছেন (সহীহ্ মুসলিম # ২১৬০)।

ঈদুল ফিতরের নামায ঃ

রোযার শেষে করণীয় ঈদুল ফিতরের দুই রাকাত ওয়াজিব নামায জামাতের সাথে আদায় করা। এ নামাযের নিয়ম অন্যান্য নামায থেকে কিছুটা ভিন্ন। এটা ছয় তাকবীরের সাথে পড়তে হয়। প্রথমে নামাযের নিয়ত করার সময় তিন তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাতে রুকুতে যাবার পূর্বে তিন তাকবীর বলতে হয়। নামায শেষে ইমাম খোতবা দিয়ে থাকেন। এ নামাযে আজান বা একামত দিতে হয় না। কেউ কেউ প্রথম রাকাতের শুরুতে সাত এবং দ্বিতীয় রাকাতের শুরুতে পাঁচ তাকবীর দিয়ে থাকেন।

www.nagorikpathagar.org

হজ্জ ও ওমরা

ইসলামের চতুর্থ রোকন বা স্তম্ভ হজ্জ। মক্কায় গিয়ে পবিত্র কা'বা ঘর তাওয়াফ অর্থাৎ প্রদক্ষিণ করা, তালবিয়া পড়া, মীনায় অবস্থান করা, আরাফাতের ময়দানে গুনাহ্ মাফের জন্য আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করা, মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা, শয়তানকে কঙ্কর মারা, কোরবানী করা, পুরুষদের মাথার চুল কামানো, সাফা-মারওয়া পর্বতে সায়ী করা অর্থাৎ দৌড়ানো ইত্যাদি অনুষ্ঠানাদি পালনের নাম হজ্জ। আরাফার ময়দানে অবস্থানের দিনকেই হজ্জের দিন বলা হয়। যিলহজ্জ মাসের নয় তারিখ হজ্জের দিন।

হজ্জ নামায বা রোযার মতো সকল মুসলমানের উপর ফরয নয়। এটা কেবল স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক, শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ, যাতায়াতে ও অনুষ্ঠানাদি পালনে সক্ষম, পরিবারের ভরণ-পোষণ এবং হজ্জের ব্যয়ভার বহনে সক্ষমদের উপর জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয। অপ্রাপ্ত বয়সীরা হজ্জ করতে পারে। তবে তা ফরয হজ্জ হিসেবে গণ্য হবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা মক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়াত ও বরকতময়। তার মধ্যে প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহের অন্যতম মাকামে ইব্রাহীম বিদ্যমান। আর যে ব্যক্তি উক্ত গৃহে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হয়ে যাবে। আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ গৃহে হজ্জ করা মানুষের উপর ফরয, যেই লোকের সামর্থ আছে এ পর্যন্ত পৌছার। আর যে লোক তা মানে না, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্ববাসী থেকে প্রত্যাশামুক্ত (সূরা আলে ইমরান # ৩ : ৯৬-৯৭)।

মহান আল্লাহ আরোও বলেন ঃ আর যখন আমি ইব্রাহীমকে কা'বা গৃহের স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়ে বলেছিলাম, আমার সাথে কাকেও শরীক করো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখ তাওয়াফকারীদের জন্য, নামাযে

www.nagorikpathagar.org

দণ্ডায়মানদের জন্য এবং রুকু সেজদাকারীদের জন্য। আর মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা করে দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং দুর্বল উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত থেকে (সূরা হজ্জ # ২২ : ২৬-২৭)।

হজ্জ তিন প্রকার ঃ

(১) **হজ্জে ইফরাদ ঃ** শুধু হজ্জের নিয়তে এহরাম বেঁধে হজ্জ করা।

(২) **হজ্জে তামাত্তু ঃ** ওমরার নিয়তে এহরাম বেঁধে ওমরা শেষে এহরাম খুলে আবার হজ্জের নিয়তে এহরাম বেঁধে হজ্জ করা।

৩। **হজ্জে কিরান ঃ** হজ্জ ও ওমরার জন্য একই সাথে এহরাম বেঁধে ওমরা ও হজ্জ করা।

সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অগণিত মুসলমান নারী ও পুরুষ হজ্জ করতে মক্কায় গমন করেন। হজ্জে গমনকারীরা মুহাম্মদ মোস্তাফা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রওজা শরীফ যিয়ারতের জন্য মদীনায় যান। অনেকেই সেখানে মসজিদে নববীতে (নবীর মসজিদে) কমপক্ষে ৪০ ওয়াক্ত ফরয নামায আদায় করেন।

মসজিদে নববীতে নামায আদায়ের সওয়াব (কা'বা বাদে) অন্যান্য মসজিদে নামায আদায়ের তুলনায় এক হাজার গুন বেশী। হজ্জ উপলক্ষে একই আল্লাহর রহমত লাভের আশায় মক্কা শরীফে লক্ষ লক্ষ মুসলমানের সমাবেশ বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইসলাম পূর্ব সময়ে হজ্জ পালন ছিল ভিন্ন ধরনের। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুয়ত লাভের পর থেকেই বর্তমান সময়ের হজ্জ ও ওমরা পালন করা শুরু হয়।

আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি নবী (সা.)-কে এরূপ বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ করতে যাবে এবং সর্বপ্রকার অশোভনীয় ও গুনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকে, সে ব্যক্তির সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে এরূপ হবে যেরূপ মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন ছিল (বোখারী শরীফ # ৭৯৫)।

www.nagorikpathagar.org

হজ্জের উদ্দেশ্যে এহরাম বাঁধার সময় থেকে যিলহজ্জের দশ তারিখে বড় শয়তানকে পাথর মারার পূর্ব পর্যন্ত তালবিয়া পড়তে হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তালবিয়া হল ঃ লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান নিমাতা লাকা ওয়াল মুলকা, লা শারীকা লাকা (সহীহ মুসলিম # ২৬৭৭, বোখারী শরীফ # ৮১১)।

অর্থ ঃ আমি হাজির হে আল্লাহ! আমি হাজির, আমি হাজির তোমার কোন অংশীদার নেই, সকল প্রশংসা ও নেয়ামতের মালিক একমাত্র তুমি, রাজত্ব তোমার, তোমার কোন শরীক নেই।

হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা যে স্থান থেকে শুরু হয় একে মীকাত বলে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন পথে হজ্জের উদ্দেশ্যে আগত লোকদের জন্য নির্দিষ্ট মীকাত রয়েছে। নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে হজ্জের নিয়তে কিবলামুখী হয়ে বিশেষ কাপড় পরতে হয়, এটা এহরাম বাঁধা। কা'বা এলাকায় বসবাসকারী লোককেও নির্দিষ্ট মীকাতে গিয়ে এহরাম বেঁধে আসতে হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, এহরামওয়ালা (পুরুষ) কোন প্রকার জামা, পায়জামা, পাগড়ি, টুপি ইত্যাদি পরিধান করতে পারবে না। মোজাও ব্যবহার করতে পারবে না (বোখারী শরীফ # ৮০৬)।

পায়ের টাখনু গিরা খোলা রেখে জুতা ও মোজা পরা যায়। পুরুষেরা কমপক্ষে চার হাত লম্বা মোটা চাদর বা লুঙ্গি পরে উপরের অংশে আরেকটি চাদর ডান হাত বাইরে রেখে পরতে হয়। মহিলারা তাদের সাধারণ শাড়ি-ব্লাউজ বা সালোয়ার-কামিজ পরতে পারে তবে মুখ খোলা রেখে মাথা ঢাকতে হবে। আয়েশা (রা.) বলেছেন, মহিলারা এহরাম অবস্থায় অলঙ্কার পরতে পারে।

হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা যিলহজ্জ মাসের সাত তারিখে শুরু হয়ে তের তারিখে শেষ হয়। আনুষ্ঠানিকতা ধারাবাহিকভাবে কখন কিভাবে শেষ করতে হবে তার বিবরণ নিম্নে দেয়া হল ঃ

www.nagorikpathagar.org

৭ই যিলহজ্জ ঃ

(১) মীকাতে পৌঁছে গোসল ও অজু করা।

(২) হজ্জের নিয়তে কিবলামুখী হয়ে এহরাম বাঁধা।

(৩) দু'রাকাত নামায পড়া।

(৪) তালবিয়া পড়া শুরু করা।

(৫) কা'বায় পৌঁছে তাওয়াফ (কা'বার চারদিকে সাতবার প্রদক্ষিণ) করা এবং তাওয়াফের সময় প্রতিবার হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা। ভিড়ের জন্য এর নিকট পৌঁছতে না পারলে এটা অতিক্রম করার সময় বাম হাত সেদিকে বাড়িয়ে দিয়ে মাথা ঘুরিয়ে আল্লাহ আকবার বলে ইশারা করতে অথবা বাহুতে চুম্বন করতে হবে। তাওয়াফে ঘড়ির কাঁটার উল্টাদিকে ঘুরতে হবে।

(৬) তাওয়াফ শেষে মাকামে ইব্রাহীমের নিকটে সূরা ফাতেহার পর প্রথম রাকাতে কাফেরূন ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা এখলাস তিলাওয়াত করে দু'রাকাত নামায আদায় করা।

(৭) সাফা ও মারওয়া পাহাড় দুইটির মধ্যবর্তী স্থানে সায়ী (সাতবার দৌড়ান) করা [শিশু ইসমাঈল (আ.)-কে পানি পান করানোর জন্য পানির সন্ধানে মাতা বিবি হাজেরা (রা.) এ দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়া-দৌড়ি করেছেন এ ঘটনার স্মরণে এটা করা হয়]

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) হজ্জ বা ওমরার জন্য প্রথম তাওয়াফের তিন চক্করে রমল (দৌড়ানো) করতেন এবং অবশিষ্ট চার চক্করে স্বাভাবিকরূপে চলতেন। অতঃপর মাকামে ইব্রাহীমের নিকটবর্তী ওয়াজেবুত তাওয়াফে দু'রাকাত নামায পড়তেন। এরপর সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সায়ী করতেন (বোখারী শরীফ # ৮৪৮, সহীহ মুসলিম # ২৯১৪)।

www.nagorikpathagar.org

৮ই যিলহজ্জ ঃ

(১) মসজিদুল হারামে (কা'বা) ফজরের নামায পড়া।

(২) নামাযের পর মীনায় গমন।

(৩) মীনায় জোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায পড়া।

৯ই যিলহজ্জ ঃ

(১) মীনায় ফজরের নামায পড়া।

(২) দুপুরের পূর্বে আরাফাতে হাজির হয়ে গোসল করা।

(৩) আরাফাতে জোহর ও আসরের নামায আদায় করা।

সালেম (রা.)-এর শাগরেদ ইমাম যুহরী (র.) সালেমকে জিজ্ঞাসা করলেন, আরাফাতের দিন জোহরের ওয়াক্তে আসর নামায পড়ে নেয়া কি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) করেছেন? সালেম (রা.) বললেন, এরূপ ব্যাপারে মুসলমানগণ একমাত্র রাসূলের আদর্শ অনুসরণ করে থাকে (বোখারী শরীফ # ৮৬১)। তবে এটা কেবল আরাফাতের ময়দানের মসজিদে নামিরাতে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি তথা বাদশা বা তাঁর নিয়োজিত প্রতিনিধির ইমামতিতে জামাতের সাথে জোহর নামায পড়ে সঙ্গে সঙ্গে আসরেরও জামাত পড়া হবে। কিন্তু অন্য স্থানে অন্য ইমামের জামাতে অথবা এক নামায পড়লে আলাদাভাবে জোহর ও আসরের নামায পড়তে হবে।

(৪) আরাফাতে পোঁছানো থেকে বিদায় হওয়া পর্যন্ত সর্বক্ষণ দোয়া, দরূদ, যিকির, তালবিয়া এবং নফল নামাযে মশগুল থাকা।

(৫) সূর্যাস্তের পর আরাফাত থেকে মুযদালিফায় গমন।

(৬) মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়া।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার নামায (মুসলিমের বর্ণনায় একই একামতে এবং বোখারীর বর্ণনায় ভিন্ন ভিন্ন একামতে) একই ওয়াক্তে (মুসলিমের

www.nagorikpathagar.org

বর্ণনায় মাগরিব তিন রাকাত এবং এশা দু'রাকাত) পড়েছেন (সহীহ মুসলিম # ২৯৭৭, বুখারী শরীফ # ৮৬৭)।

(৭) জামরায় (শয়তানের প্রতি) নিক্ষেপের জন্য মটর সাইজের ৪৯টি কঙ্কর সংগ্রহ করা।

(৮) ফজরের নামায পড়ে আকাশ ফর্সা হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে মীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা।

১০ই যিলহজ্জ ঃ

(১) মুযদালিফা থেকে মীনায় ফিরে এসে দ্বিপ্রহরের পূর্বে জামরাতুল আকাবায় (বড় শয়তানকে) আল্লাহ্ আকবার বলে ৭টি কঙ্কর মারা এবং তালবিয়া পড়া বন্ধ করা।

(২) কোরবানী সম্পন্ন করা। বিদেশী হাজীরা সাধারণত ঃ কোরবানীর টাকা নিজ নিজ এজেন্টের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষকে দিয়ে নিজে কোরবানী স্থানে যান না।

(৩) ডান দিক থেকে শুরু করে আর বাম দিকে শেষ করে মাথা মুড়ানো এবং এহ্রাম খুলে ফেলা।

আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রথমে জামরায়ে আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন। তারপর কোরবানীর উটের কাছে গেলেন এবং তা যবেহ করলেন। তখন নাপিত বসা ছিল। তিনি হাতের ইশারায় তাঁর মাথা মুড়ানোর নির্দেশ দিলে সে তদনুযায়ী ডান দিকের চুল কামাল। যারা তখন তাঁর কাছে ছিলো তিনি তাদের মধ্যে এই চুল বিতরণ করলেন। তারপর তিনি অপর অংশের চুল মুড়ানোর নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, "আবু তালহা কোথায়? তাকেই এই চুল দাও" (সহীহ মুসলিম # ৩০১৭)।

(৪) মীনা থেকে গিয়ে কাবা শরীফ তাওয়াফ (তাওয়াফে ইফাদা) করে মীনায় রাত যাপনের জন্য ফিরে আসা।

www.nagorikpathagar.org

১১ই যিলহজ্জ ঃ

দ্বিপ্রহরের পরে ছোট শয়তানকে ৭টি, মধ্যম শয়তানকে ৭টি এবং বড় শয়তানকে ৭টি কঙ্কর আল্লাহ্ আকবার বলে মারা। মীনায় রাত্রি যাপন করা।

১২ই যিলহজ্জ ঃ

(২) এদিন অপরাহ্নে তিনটি জামরায় ছোট, মধ্যম ও বড় শয়তানকে আল্লাহু আকবার বলে ৭টি করে মোট ২১টি কঙ্কর মারা।

(২) সূর্যাস্তের পূর্বে মীনা ত্যাগ করা। সূর্যাস্ত হয়ে গেলে মীনাতে রাত্রি যাপন করা।

সূর্যাস্তের পূর্বে মীনা ত্যাগ করতে পারলে হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়ে যাবে। শুধু বিদায়ী তাওয়াফ অবশিষ্ট থাকবে।

১৩ই যিলহজ্জ ঃ

মীনায় ১২ তারিখে রাত কাটিয়ে থাকলে অপরাহ্নে তিন জামরায় পূর্বের মত ৭টি করে কঙ্কর মেরে মীনা ত্যাগ করা।

জাবের (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী রাসূলুল্লাহ (সা.) ১০ই যিলহজ্জ কোরবানীর প্রভাতে সূর্যোদয়ের এক প্রহর বেলার পর কঙ্কর মেরেছেন এবং অবশিষ্ট কয়দিন দ্বিপ্রহরের সূর্য মধ্য আকাশ অতিক্রম করবার পর কঙ্কর মেরেছেন (বোখারী শরীফ # ৮৯৩)।

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, লোকেরা বিভিন্ন পথ ধরে প্রত্যাবর্তন করতেছিল। এতে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমাদের কেউ যেন শেষবারের মত বায়তুল্লাহর তাওয়াফ না করে রওয়ানা না হয় (সহীহ মুসলিম # ৩০৮২)।

ইবনে আব্বাস (রা.) আরো বলেন, সকলের প্রতি এই আদেশ যে, প্রত্যেকের মক্কা শরীফ ত্যাগ করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে বিদায়ের সময় বায়তুল্লাহর সাথে শেষ মোলাকাত তাওয়াফের দ্বারা অনুষ্ঠিত করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

এটাকে বিদায়ী তাওয়াফ বলে। অবশ্য ঋতুবতী নারীকে এই আদেশ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে (বোখারী শরীফ # ৮৯৮, সহীহ্ মুসলিম # ৩০৮)।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইব্রাহীম (আ.)-এর মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে মক্কায় হজ্জ করার দাওয়াত দিয়েছেন। এই দাওয়াতে সাড়া দিয়ে লক্ষ লক্ষ মুসলমান পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হজ্জ করতে যান। এই দাওয়াতী মেহ্মানরা বিদায় নেয়ার আগে তাঁর ঘর কাবার সাথে মোলাকাত করবে এটাই স্বাভাবিক।

হজ্জের মধ্যে তাওয়াফ তিনবার করতে হয়। মক্কায় পৌঁছে প্রথমবার যেই তাওয়াফ করা হয় এটাতে তাওয়াফে কুদুম বলে। এটা সুন্নাত। মীনা থেকে ফিরে এসে যে তাওয়াফ করা হয় একে তাওয়াফে ইফাদা বলে। এই তাওয়াফ ফরয। আর বিদায়কালে যে তাওয়াফ করা হয় এটাকে তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ী তাওয়াফ বলে। এটা ওয়াজিব। মক্কায় অবস্থানকালে এই তিনটি তাওয়াফ ছাড়া যতবার খুশী ততবার তাওয়াফ করা যায়। এগুলো নফল তাওয়াফ।

হজ্জ করার আর্থিক সামর্থ আছে কিন্তু শারীরিক সামর্থ নেই এমন লোকেরা অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা তাদের হজ্জ করাতে পারেন। আবার মানসিক, শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ থাকা অবস্থায় হজ্জ করার পূর্বে মৃত্যু হয়েছে এমন লোকদের হজ্জও অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা করানো যেতে পারে। তাদের ওয়ারিশগণ এই হজ্জ করাবেন। এই হজ্জকে বদলা হজ্জ বলে। যিনি কারো পক্ষে বদলা হজ্জ করবেন তিনি আগে নিজের হজ্জ করবেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন ঃ আমি শুবরোমার পক্ষ থেকে হজ্জের নিয়ত করছি। হুজুর বললেন, শুবরোমা কে? সে বলল, আমার এক ভাই অথবা বলল, আমার এক আত্মীয়। তখন হুজুর জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি নিজের হজ্জ করেছো কি? সে বলল, না। হুজুর বললেন, প্রথমে নিজের হজ্জ কর। পরে শুবরোমার হজ্জ করবে (মেশকাত শরীফ # ২৪১৪, শাফেয়ী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)।

www.nagorikpathagar.org

নবীকুল শ্রেষ্ঠ হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে আল্লাহ রহমত হিসেবে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আল্লাহর পরে তার স্থান। কঠিন কেয়ামতের দিনে তিনি হবেন আমাদের সুপারিশকারী। কারো অন্তরে তাঁর প্রতি গভীর ভালবাসা না থাকলে সে মুমিন হতে পারবে না। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেন, আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর জন্য রহমতের তরে দোয়া কর এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর (সূরা আহযাব # ৩৩ : ৫৬)। আল্লাহর এ আহ্বানে সাড়া দেয়া প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য।

আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যেই ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত নাযিল করেন (সহীহ মুসলিম # ৮০৭)।

নবী (সা.)-এর রওজা যিয়ারত করা হজ্জের অংশ নয়। কিন্তু নবীর প্রেমের টানে হাজীগণ তাঁর রওজা যিয়ারত করতে মদীনা শরীফে যান। হজ্জের অনেক পূর্বে যারা সৌদী আরবে পৌছান তাঁরা প্রথমে মদীনায় গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রওজা যিয়ারত করেন, মসজিদে নববীতে নামায পড়েন এবং কিছুদিন সেখানে অবস্থান করেন। অনেকে সেই মসজিদে চল্লিশ ওয়াক্ত ফরয নামায আদায় করেন। অতঃপর তাঁরা মক্কায় এসে হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা শুরু করেন। আর যাঁরা দেরিতে পৌছান তাঁরা হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে নবী (সা.)-এর রওজা যিয়ারত করতে মদীনায় যান। অপরদিকে ভিন্ন মতাবলম্বী এক শ্রেণীর বিপথগামী লোক কবর যিয়ারত হারাম (শেরেকী) আখ্যা দিয়ে মদীনায় গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রওজা যিয়ারত করে না।

হজ্জের সময় ওমরা করা অনেকটা বাধ্যতামূলক। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত নবী রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ কেয়ামত পর্যন্ত হজ্জের মধ্যে ওমরাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে (তিরমিযী শরীফ # ৮৭৩)। প্রত্যেক হাজী হজ্জের আগে বা পরে অথবা উভয় সময়ে ওমরা করে থাকেন।

www.nagorikpathagar.org

হজ্জ করা ফরয কিন্তু ওমরা করা ফরয বা ওয়াজিব নয়। তবে তা করলে অনেক সওয়াব পাওয়া যায়। হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত নবী রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞাসা করা হল, ওমরা করা কি ওয়াজিব? তিনি বললেন ঃ না, তবে তোমরা ওমরা করলে তা ভাল (তিরমিযী শরীফ # ৮৭২)। বছরের যে কোন সময় ওমরা করা যায়। তবে রমাযান মাসের ওমরা সর্বোত্তম। হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা.) বলেছেন ঃ রমাযান মাসের ওমরা হজ্জের সমতুল্য (ইবনে মাজাহ শরীফ # ২৯৯৫ ও তিরমিযী শরীফ # ৮৮০)।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ এক ওমরা অপর ওমরা পর্যন্ত সংঘটিত গুনাহের কাফফারাস্বরূপ। কবুল হজ্জের প্রতিদান বেহেশত ছাড়া আর কিছুই নয় (তিরমিযী শরীফ # ৮৭৪ এবং নাসাঈ শরীফ # ২৬৩২)।

হজ্জের মত ওমরা করার সময়েও তালবিয়া পড়া হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ ওমরাকারী হাজরে আসওয়াদে চুম্বন না দেয়া পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকবে (আবু দাউদ শরীফ # ১৮১৭)। তবে হাজরে আসওয়াদে সরাসরি চুম্বন করতে না পারলে, পূর্বে উল্লিখিতভাবে সেদিকে বাম হাত বাড়িয়ে মাথা ঘুরিয়ে আল্লাহু আকবার বলে বাহুতে চুম্বন করা যেতে পারে।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) নবুয়ত লাভের পরে মোট চারবার ওমরা ও একবার হজ্জ করেছেন। তাঁর এই হজ্জ ইসলামের ইতিহাসে বিদায় হজ্জ নামে পরিচিত। হিজরতের দশম বছরে প্রায় দুই লক্ষ সঙ্গী নিয়ে মদীনা থেকে মক্কায় এসে তিনি এ হজ্জ করেন। হিজরতের পরে এটাই তাঁর প্রথম ও শেষ হজ্জ। আবু ইসহাক বলেন, মক্কায় অর্থাৎ হিজরতের আগেও তিনি একটি হজ্জ করেছেন (সহীহ্ মুসলিম # ২৯০০)।

বিদায় হজ্জ উপলক্ষে নবী (সা.) অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ভাষণ দিয়েছেন যা বিদায় হজ্জের ভাষণ নামে পরিচিত। এটার কিছু অংশ এখানে দেয়া হল ঃ

www.nagorikpathagar.org

তিনি বলেছেন ঃ হে আমার ভক্তবৃন্দ! আজ যে কথা তোমাদেরকে বলব, মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তোমাদের সাথে একত্রে হজ্জ করার সুযোগ আর আমার হবে না।

সাবধান! ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করো না। বাড়াবাড়ির ফলে অতীতে বহু জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

হে মুসলমানগণ! দাস-দাসীদের প্রতি সর্বদা সদ্ব্যবহার কর। তাদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করো না। তোমরা যা খাবে তাদেরকে তা খাওয়াবে। ভুলবে না তারাও তোমাদের মত মানুষ।

সাবধান! পৌত্তলিকতার পাপ যেন তোমাদেরকে স্পর্শ না করে। শেরেক করো না, চুরি করো না, মিথ্যা কথা বলো না, ব্যভিচার করো না। সর্বপ্রকার মলিনতা থেকে নিজকে মুক্ত করে পবিত্রভাবে জীবন যাপন কর। চিরদিন সত্যাশ্রয়ী হও।

হে আমার উম্মতগণ! আমি যা রেখে যাচ্ছি, তা যদি তোমরা দৃঢ়ভাবে ধরে রাখ তবে কিছুতেই তোমাদের পতন হবে না। সে গচ্ছিত সম্পদ আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের আদেশ।

মনে রেখো, একদিন তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট চলে যেতে হবে। সেদিন তোমাদের কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। বংশের গৌরব কর না। যে ব্যক্তি নিজ বংশকে হেয় মনে করে অপর কোন বংশের নামে আত্মপরিচয় দেয়, আল্লাহর অভিশাপ তার উপর নেমে আসে।

নিশ্চয় জেনো, আমার পরে আর কোন নবী নেই। আমি শেষ নবী। যারা উপস্থিত আছ, তারা অনুপস্থিত সকল মুসলমানের নিকট আমর এ সকল বাণী পৌঁছে দেবে।

আকাশের দিকে মুখ তুলে তিনি বলতে লাগলেন ঃ হে আল্লাহ, হে আমার প্রভু, আমি কি তোমার বাণী পৌঁছে দিতে পারলাম? আমি কি আমার কর্তব্য সম্পাদন করতে পারলাম? শ্রোতামণ্ডলী বলে উঠলেন ঃ

www.nagorikpathagar.org

নিশ্চয়! নিশ্চয়!! আমরা সাক্ষ্য দেব যে, আপনি আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন এবং আমাদেরকে সত্যের পথ দেখিয়েছেন।

এটা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বীয় শাহাদাত অঙ্গুলি আকাশের দিকে তুললেন এবং জনতার দিকে ইশারা করে বলে উঠলেন ঃ হে প্রভু! শ্রবণ কর, সাক্ষী থাক, এরা বলছে আমার কর্তব্য আমি পালন করেছি।

এ সময় কোরআনের আয়াত নাযিল হল ঃ আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম (সূরা মায়েদা # ৫ : ৩)।

নবী (সা.) ক্ষণকাল ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকলেন। কিছুক্ষণ পরে চোখ খুলে বিশাল জনতার দিকে চেয়ে বললেন ঃ বিদায়! বন্ধুগণ বিদায়।

ইসলাম পূর্ব যুগ থেকে হজ্জ পালন করা হয়েছে। তবে সে সময়কার হজ্জ ছিল ভিন্ন ধরনের। হজ্জ করা এক সময় বন্ধ হয়ে যাবে। আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী (সা.) বলেছেন ঃ (কেয়ামত ঘনিয়ে আসলে) এক হাবশী নিগ্রো লোক যার পায়ের গোছা অপেক্ষাকৃত সরু হবে। সে বায়তুল্লাহ শরীফকে বিধ্বস্ত করবে (বোখারী শরীফ # ৮৩১)। এর পর থেকে বন্ধ হয়ে যাবে।

নির্দিষ্ট মীকাতে হজ্জের উদ্দেশ্যে এহরাম বাঁধার মধ্য দিয়ে হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়ে বিদায়ী তাওয়াফের মধ্য দিয়ে হজ্জ শেষ হয়। কা'বা এবং অন্যান্য স্থানে হজ্জের যে সকল আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয় সেগুলো কেন করা হয় সে সম্পর্কে হজ্জে গমন ইচ্ছুদের ধারণা থাকা দরকার। এগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হল ঃ

(১) কা'বা ঃ আল্লাহর আদেশে হযরত আদম (আ.) সর্ব প্রথম কা'বা গৃহ নির্মাণ করেছেন। হযরত নূহ (আ.)-এর সময়ের তুফান ও জলোচ্ছ্বাসে এটা ধ্বংস হয়ে যায়। হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ.) এটা পুনঃনির্মাণ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে

www.nagorikpathagar.org

কুরাইশগণ এটা আবার নির্মাণ করেন। সে সময় তাদের বৈধ অর্থের সঙ্কটের কারণে এটার উত্তর দিকের কিছু অংশ নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি।

(২) হাতীম ঃ কা'বার উত্তরাংশের অর্ধবৃত্তাকার নিচু প্রাচীরের মধ্যকার খালি অংশের নাম হাতীম। এতে হযরত ইসমাঈল (আ.) ও তাঁর মাতা হাজেরা (রা.)-এর কবর রয়েছে। অতি সওয়াবের আশায় এ অংশে অনেকে দুই রাকাত নামায পড়ে। অথচ কবরের উপর নামায পড়া অবৈধ।

(৩) তাওয়াফ ঃ কা'বা গৃহ সপ্তম আসমানে অবস্থিত মসজিদ বায়তুল মামুরের প্রতিচ্ছবি। সেটা ফেরেশতাদের মসজিদ। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা। সেটাতে নামায পড়েন এবং এর চারদিকে তাওয়াফ করেন। এটাই তাদের হজ্জ। যারা একবার এ মসজিদে আসেন তারা আর দ্বিতীয়বার আসেন না। নতুন দল এসে নামায পড়েন ও তাওয়াফ করেন। এর অনুকরণে কা'বার চারদিকে তাওয়াফ করা হয়। এটা হজ্জ ও ওমরার অংশ বিশেষ।

(৪) এহ্‌রাম ঃ প্রায় চার হাত লম্বা এক জোড়া সাদা মোটা চাদর পরিধান করে হজ্জের নিয়ত করার নাম এহ্‌রাম বাঁধা। এর মধ্য দিয়ে হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। এ কাপড় দুইটির একটি লুঙ্গির মত পরিধান করে ডান হাত বাইরে রেখে অপরটি চাদরের ন্যায় গায়ে দেয়া হয়। এগুলো কাফনের কাপড়ের ন্যায় সেলাইহীন। এ কাপড় দুইটি পরিধানের পর থেকে মৃত ব্যক্তির ন্যায় জগতের সাথে তথা পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, কর্মক্ষেত্র এক কথায় সকল কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পর জীবনের প্রস্তুতি পর্ব শুরু করা হয়। এ জীবনে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও মৃত্যুর পর যেরূপ সকলেই সমান হয়ে যায় তেমনি এহ্‌রামের কাপড় পরার পর সকলেই সমান হয়ে যায়।

(৫) মাকামে ইব্রাহীম ঃ হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর দু'পায়ের ছাপযুক্ত একটি স্বর্গীয় পাথর গ্রীল দিয়ে ঘেরা অবস্থায় কা'বা শরীফের পূর্ব পাশে রক্ষিত আছে। ইব্রাহীম (আ.)-এর উপর দাঁড়িয়ে কা'বাগৃহ

www.nagorikpathagar.org

পুনঃনির্মাণ করেন। কথিত আছে, নির্মাণের সুবিধার জন্য এ পাথর তাঁর নির্দেশে উপরে বা নীচে উঠা-নামা করত। তাঁর দাঁড়ানো অবস্থায় এটা নরম থাকত। ফলে এতে তাঁর পায়ের ছাপ পড়েছে। নির্মাণ কাজ শেষ হলে তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের জন্য এর নিকট দু'রাকাত নামায আদায় করেছিলেন। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ স্মরণ করুন সে সময়কে যখন কা'বা গৃহকে মানবজাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম এবং বলেছিলাম, তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে সালাতের (নামাযের) স্থান বানাও (সূরা বাকারা # ২ : ১২৫)।

তাই হাজীগণ মাকামে ইব্রাহীমের নিকটে দু'রাকাত নামায আদায় করেন।

(৬) হাজরে আসওয়াদ ঃ এটা বেহেশতী একটি পাথর যা কা'বা গৃহের পূর্ব কোণে নীচ থেকে প্রায় পাঁচ ফুট উপরে দেয়ালের গায়ে লাগানো আছে। এ পাথর কিভাবে পৃথিবীতে আসল তা নিয়ে মতভেদ আছে। কারো মতে আদম (আ.) বেহেশত থেকে নেমে আসার সময় তাঁর সাথে এসেছে; কেউ বলেন, কা'বা পুনঃনির্মাণের সময় আল্লাহ্ জিব্রাইল (আ.)-এর মারফতে এটা ইব্রাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.)-এর নিকট পাঠিয়েছেন। আবার কেউ বলেন, আদম (আ.)-এর সময় কা'বা ঘরের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করে এটা বেহেশত থেকে পৃথিবীতে ফেলা হয়েছে। আসল ঘটনা কি, আল্লাহ্ তা'আলা ভাল জানেন। প্রথমে এটা ছিল অতি উজ্জ্বল সাদা একটি পাথর। কালক্রমে মানুষের চুম্বনের দরুন তাদের পাপ আসায় এটা কালো হয়ে গেছে। নবী (সা.)-এর নবুয়ত লাভের পূর্বে কা'বা পুনঃনির্মাণের সময় তিনি নিজ হাতে এটা দেয়ালে স্থাপন করেছেন।

(৭) সায়ী ঃ বিবি হাজেরা (রা.) তাঁর শিশু পুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে পান করার জন্য পানির সন্ধানে সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাতবার দৌড়াদৌড়ি করেছেন। এর স্মরণে হাজীগণ এ দু'পাহাড়ের মাঝে সাতবার দৌড়িয়ে থাকেন। এটা সায়ী। পাহাড় দু'টির মধ্যকার দূরত্ব ৯৮০ ফুট।

www.nagorikpathagar.org

(৮) যমযম কূপ ঃ হাজেরা (রা.) শিশু পুত্র ইসমাঈলের জন্য পানি খুঁজতে সাফা থেকে মারওয়া পাহাড়ে উঠার পর শিশু পুত্রের অবস্থা দেখার জন্য শিশুর নিকট চলে আসার ইচ্ছা করলে হঠাৎ একটা শব্দ শুনলেন। তিনি ঐ শব্দের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিলে পুনরায় শব্দ শুনলেন। এবার তিনি বললেন, তোমার আওয়াজ তো শুনাচ্ছ, সাহায্য করার কোন ব্যবস্থা তোমার নিকট থাকলে সাহায্য কর। তখন তিনি (বর্তমান) যমযম কূপের স্থানে জিব্রাইল (আ.)-কে দেখলেন। তিনি পায়ের গোঁড়ালির আঘাতে তথায় গর্ত করলে তা থেকে পানি উঠতে লাগল। বিবি হাজেরা (রা.) চমকিত হলেন এবং মাটি দ্বারা চারদিকে বাঁধ দিয়ে হাউজের ন্যায় বানালেন। এটা যমযম কূপ (বুখারী শরীফ, ৪র্থ খণ্ড– বিবি হাজেরার বনবাস অধ্যায়)। হাজীগণ এ কূপের পানি পান করেন, এর পানি দ্বারা অজু ও গোসল করেন এবং হজ্জ শেষে ফেরত যাবার সময় কিছু পানি সঙ্গে নিয়ে যান।

(৯) আরাফাত ঃ কা'বা থেকে মীনার দূরত্ব পাঁচ মাইল। মীনা থেকে নয় মাইল দূরে জাবালে রহমাহ বা রহমতের পাহাড় নামে যে পাহাড়টি রয়েছে, এর চারদিকের বিশাল মাঠটি আরাফাতের ময়দান নামে পরিচিত। এ পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বিদায় হজ্জের ভাষণ দিয়েছেন। যতটুকু জানা যায় বেহেশত থেকে হযরত আদম (আ.)-কে সিংহলে এবং বিবি হাওয়া (রা.)-কে জেদ্দায় নামিয়ে দেয়া হয়েছিল। দীর্ঘ খোঁজাখুঁজির পর উভয়ে আরাফাতের ময়দানে একত্রিত হয়েছেন। বেহেশতে থাকা অবস্থায় নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে অনেক কান্নাকাটির পর আল্লাহ উভয়কে সেখানে ক্ষমা করেছেন। হাজীগণ ৯ই যিলহজ্জ তারিখে সে ময়দানে যেয়ে জোহর ও আসরের নামায পড়েন এবং গুনাহ মাফের জন্য আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করেন। এটা হজ্জের দিন। এদিন আল্লাহ তা'আলা লক্ষ লক্ষ বান্দাকে ক্ষমা করেন।

(১০) মুযদালিফা ঃ হজ্জ শেষে সূর্যাস্তের সময় হাজীগণ আরাফাতের ময়দান ত্যাগ করে মীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। পথিমধ্যে মুযদালিফা

www.nagorikpathagar.org

নামক স্থানে খোলা আকাশের নীচে দোয়া দরূদ পড়ে এবং কিছু সময় নিদ্রা যেয়ে রাত্রি যাপন করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ স্থানে বিদায় হজ্জের সময় রাত্রি যাপন করেছেন। এ স্থান আরাফাত থেকে সাড়ে চার মাইল দূরে অবস্থিত। শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের জন্য মটর সাইজের ৪৯ টি কংকর এ স্থান থেকে সংগ্রহ করতে হয়। ফজরের নামায পড়ে আকাশ ফর্সা হওয়া পর্যন্ত এ স্থানে অবস্থান করতে হয়।

(১১) শয়তানকে কংকর মারা ঃ হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর প্রস্তাবে তাঁর ৭ বছরের শিশু পুত্র ইসমাঈল (আ.) যখন নিজে কোরবানী হতে সম্মত হলেন তখন শয়তান তাঁদেরকে প্রতারিত করবার চেষ্টা চালাতে থাকে। ইতিহাস ও তফসীর ভিত্তিক কোন কোন রেওয়ায়েতে জানা যায় যে, শয়তান তিনবার ইব্রাহীম (আ.)-কে প্রতারিত করার চেষ্টা করে এবং ইব্রাহীম (আ.) প্রত্যেকবারই তাকে সাতটি কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে তাড়িয়ে দেন। অদ্যাবধি এ প্রশংসনীয় কাজের স্মৃতি মীনায় তিনবার কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে উদযাপিত হয় (তফসীর মা'আরেফুল কোরআন : সূরা আস সফফাতের তফসীর)। যিলহজ্জের ১০ তারিখে ৭টি, ১১ তারিখে ৭ X ৩ = ২১ টি এবং ১২ তারিখে ৭ X ৩ = ২১টি করে মোট ৪৯টি কংকর শয়তানকে মারা হয়।

(১২) কোরবানী ঃ ইব্রাহীম (আ.) তাঁর প্রিয় বস্তু কোরবানী করবার জন্য আদিষ্ট হলে নিজের সবচেয়ে প্রিয় সন্তান ইসমাঈলকে কোরবানী করার চিন্তা করলে পুত্রও তাতে সম্মত হলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যখন পিতা-পুত্র উভয়েই আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইব্রাহীম তাকে যবেহ করবার জন্য শায়িত করল তখন আমি তাকে ডেকে বললাম, হে ইব্রাহীম! তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখালে। আমি এভাবেই সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তার পরিবর্তে যবেহ করার জন্য দিলাম এক মহান জন্তু (সূরা আস সফফাত # ৩৭ : ১০৩-১০৭)। বর্ণিত আছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) উপরোক্ত গায়েবী আওয়াজ শুনে উপরের দিকে তাকালে হযরত জিব্রাইল

www.nagorikpathagar.org

(আ.)কে একটি ভেড়া নিয়ে দাঁড়ানো দেখলেন। ইব্রাহীম (আ.) পুত্রের পরিবর্তে এ ভেড়া কোরবানী করেছেন (তফসীর মা'আরেফুল কোরআন-সূরা আস সফফাতের তফসীর)। এ ঘটনার স্মরণে মুসলমানেরা পশু কোরবানী করেন।

(১৩) মাথা মুড়ানো ঃ কোরবানী শেষে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর মাথার চুল নাপিতকে দিয়ে মুড়িয়ে ছিলেন। হাজীগণ এর স্মরণে ১০ই যিলহজ্জ মাথা মুড়িয়ে থাকে।

হজ্জ করতে গেলে মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রওজা শরীফ অবশ্যই যিয়ারত করবেন এবং মসজিদে নববীতে ৪০ ওয়াক্ত ফরয নামায আদায় করবেন। এটা ছাড়াও সুযোগ পেলে এবং সময় থাকলে জান্নাতুল বাকী, কুবা মসজিদ, মসজিদ কিবলাতাইন, ওহুদ পাহাড় ও শহীদদের কবর, জাবালে নূর ও হেরা গুহা, সওর গুহা, খাদিজা (আ.)-এর কবর, আয়েশা মসজিদ ইত্যাদি দেখে আসবেন।

---

www.nagorikpathagar.org

অজু ও তায়াম্মুম

নামাযের জন্য পবিত্রতা অপরিহার্য। অজু বা ফরয গোসলের মাধ্যমে শরীরের পবিত্রতা অর্জিত হয়। হযরত ইবনে সা'দ (রা.)-এর বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছেন; পবিত্রতা ছাড়া নামায কবুল হয় না (সহীহ্ মুসলিম # ৪৪২)। আর আবু মালেক আল-আশয়ারী (রা.)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক (সহীহ্ মুসলিম # ৪৪১)। অজু সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হও তখন নিজেদের মুখমণ্ডলসমূহ ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত কর এবং মস্তকসমূহ মাসেহ কর এবং পাসমূহকে টাখনুসহ (সূরা মায়েদা # ৫ : ৬ এর প্রথমাংশ)। শরীরের এ চারটি অঙ্গ ধৌত করা ফরয। এটা ছাড়াও পূর্ণাঙ্গ অজুর জন্য আরো কিছু অঙ্গ ধৌত করতে হয় যাদের কিছু সুন্নাত এবং কিছু মোস্তাহাব।

অজু শুরু করার পূর্বে মনে মনে নিয়ত করে বিসমিল্লাহিল আলিয়িল আযীম। ওয়ালহামদু লিল্লাহি আলা দীনিল ইসলাম। আলইসলামু হাক্কুন ওয়াল কুফরু বাতিলুন আলইসলামু নূরুন ওয়াল কুফরু যুলুমাতুন। অর্থ : মহান ও শ্রেষ্ঠতম আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। দ্বীন ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। ইসলাম সত্য এবং কুফরি মিথ্যা। ইসলাম আলোকময় এবং কুফরি অন্ধকারময়। এ দোয়া পড়ার রীতি প্রচলিত আছে। কিন্তু কোরআন বা হাদীসে এ দোয়া সম্পর্কে কোথাও উল্লেখ নেই।

অথচ হাদীসে বিসমিল্লাহ বলে অজু শুরু করার কথা উল্লেখ আছে। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : সে ব্যক্তির নামায আদায় হয় না যে পূর্ণাঙ্গভাবে অজু করে না এবং ঐ ব্যক্তির অজু হয় না যে অজুর সময় বিসমিল্লাহ পড়ে না (আবু দাউদ # ১০১, ইবনে মাজাহ # ৩৯৯)।

www.nagorikpathagar.org

মানুষ প্রতিনিয়ত কোন না কোনভাবে গুনাহের কাজ করতে থাকে। মহান আল্লাহ্ বান্দার অজুর সময় সে সকল গুনাহের মধ্য থেকে বহু গুনাহ দূর করে দেন। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : কোন মুসলিম বান্দা অজুর সময় যখন মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন তার চোখ দিয়ে অর্জিত গুনাহ্ পানির সাথে অথবা (তিনি বলেছেন) পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায়। যখন সে দু'খানা হাত ধৌত করে, তখন তার দু'হাতের স্পর্শের মাধ্যমে অর্জিত সকল গুনাহ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়। অতঃপর যখন সে পা দু'টি ধৌত করে, তখন তার দু'পা দিয়ে হাঁটার মাধ্যমে অর্জিত সকল গুনাহ্ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়।এভাবে সে যাবতীয় গুনাহ্ থেকে মুক্ত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় (সহীহ্ মুসলিম # ৪৮৪)।

অজু করার জন্য শরীরের যে সকল অঙ্গ ধৌত করতে হয় তার বর্ণনা হযরত ওসমান (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস থেকে জানা যাবে। হযরত ওসমান (রা.) বলেন, একবার তিনি এরূপে অজু করলেন : তিনবার তাঁর হাতের কব্জির উপর উত্তমরূপে পানি ঢাললেন, অতঃপর কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন, অতঃপর মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করলেন, তৎপর তিনবার ডান হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করলেন, তৎপর বাম হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন। অতঃপর মাথা মাসাহ করলেন, তৎপর তিনবার ডান পা ধৌত করলেন এবং এভাবে তিনবার বাম পা ধৌত করলো। অতঃপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখেছি, আমার এ অজুর ন্যায় অজু করলেন এবং পরে বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার এ অজুর মত অজু করার পর দাঁড়িয়ে একাগ্রচিত্তে দুই রাকাত নামায পড়বে, আর এ সময় তার অন্তরে কোন চিন্তার উদয় হবে না, তা হলে তার পূর্বের সকল গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে (সহীহ্ মুসলিম # ৪৪৫)।

যেই সকল অঙ্গ ধৌত সম্পর্কে উপরের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে সে সকল অঙ্গ ধৌত করার নিয়ম রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়।

হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করার সময় আঙ্গুল খিলাল করতে হয়।

www.nagorikpathagar.org

হযরত লাকীত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তুমি যখন অজু কর তখন পরিপূর্ণরূপে অজু কর এবং আঙ্গুল খিলাল কর (নাসাঈ শরীফ # ১১৪, তিরমিযী শরীফ # ৩৮)। ডান হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করার সময় বাম হাতের আঙ্গুল দিয়ে এবং বাম হাতের কব্জি পর্যন্ত ধোয়ার সময় ডান হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে পানি ঢুকাতে হবে।

গড়গড়া করে কুলি করার প্রচলন থাকলেও হাদীসে এর কোন প্রমাণ আমি পাইনি। তবে অজুর পূর্বে মিসওয়াক করা উত্তম। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন : যদি আমি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হবে তা মনে না করতাম, তাহলে আমি তাদের প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম (ইবনে মাজাহ # ২৮৭)। মিসওয়াক করলে মুখের গন্ধ দূর হয়।

নাকে পানি দেয়ার সময় নাকের ভেতরে পানি ঢুকাতে হয়, যাতে ভেতরের ময়লা পরিষ্কার হয়ে যায়। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যখন অজু করবে তখন যেন সে তার নাকে পানি দেয় এবং নাক পরিষ্কার করে ফেলে (নাসাঈ শরীফ # ৮৬, সহীহ মুসলিম # ৪৬৭)।

মুখমণ্ডল ধৌত করার সময় যাদের মুখে দাড়ি আছে তাদের খেয়াল রাখতে হবে যেন প্রত্যেক দাড়ির গোড়ায় পানি পৌঁছায়। এ জন্য দু'হাতের আঙ্গুল দিয়ে দাড়ি খিলাল করতে হবে। হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) যখন অজু করতেন, তখন তিনি তাঁর কপালের দু'পাশ ধীরে ধীরে রগড়াতেন। অতঃপর তিনি তাঁর আঙ্গুল দিয়ে নীচের দিক থেকে দাড়ি খেলাল করতেন (ইবনে মাজাহ # ৪৩২)।

দু'হাতের কনুই পর্যন্ত ধৌত করার জন্য বিশেষ কোন নিয়ম নেই। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন কনুই পর্যন্ত কোন স্থান শুষ্ক না থাকে।

মাথা মাসেহ করার সময় দু'কানের ভেতরে ও বাইরে আঙ্গুল দিয়ে মাসেহ করতে হয়। এটা সুন্নাত। এ সময় দু'হাতের পিঠ দিয়ে ঘাড় মাসেহ করা মোস্তাহাব। কান মাসেহ করার সময় দু'হাতের শাহাদাত আঙ্গুলি দিয়ে

www.nagorikpathagar.org

দু'কানের ভেতর এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির পেট দিয়ে কানের পেছন দিক মাসেহ করতে হয়। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) মাথা মাসেহ করলেন এবং দু'কানের ভেতরে ও বাইরে মাসেহ করলেন (তিরমিযী শরীফ # ৩৬)।

দু'পায়ের টাখনু গিরা পর্যন্ত ধৌত করতে হয়। সে সময় পায়ের আঙ্গুলগুলো হাতের আঙ্গুলের ন্যায় খিলাল করতে হয়। হযরত মুস্তাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ ফিহরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী পাক (সা.) কে অজু করার সময় কনিষ্ঠ আঙ্গুলি দিয়ে পায়ের আঙ্গুলিসমূহ ঘষতে দেখেছি (তিরমিযী শরীফ # ৪০)। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে সমস্ত গোড়ালি শুষ্ক থাকবে সেগুলো দোযখে পুড়বে (বোখারী শরীফ # ১২৬, নাসাঈ শরীফ # ১১০)।

অজু করার সময় পা ধৌত করার পরিবর্তে মোজার উপর মাসেহ করা যায়। তবে মোজা পরার সময় পা পবিত্র থাকতে হবে। হযরত উরওয়া ইবনুল মুগীরা ইবনে শোবা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে উষ্ট্রে সফর করলাম। এ সময় আমার নিকট (পানির) পাত্র ছিল। তিনি (সা.) পায়খানায় গেলেন এবং সেখান থেকে ফিরে আসলে আমি তাঁর সামনে (পানির) পাত্র হাজির করি। অতঃপর আমি পানি ঢাললে তিনি (সা.) তাঁর উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত এবং মুখমণ্ডল ধৌত করলেন, অতঃপর হাত বের করার জন্য জুব্বার আস্তিন গুটাতে না পেরে তা খুলে ফেললেন। আমি তাঁর পায়ের মোজাদ্বয় খোলার চেষ্টা করলে তিনি বললেন ঃ মোজা খোল না। কেননা আমি যখন মোজা পরি, তখন আমার উভয় পা পবিত্র ছিল। অতঃপর তিনি মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করেন (আবু দাউদ # ১৫১)।

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) মাসেহ করার ব্যাপারে মুসাফির অবস্থায় তিন দিন তিন রাত এবং মুকীম অবস্থায় একদিন এক রাত সময় নির্ধারণ করেছেন (নাসাঈ শরীফ # ১২৮, ইবনে মাজাহ # ৫৫৮)।

www.nagorikpathagar.org

একই অজুতে কয়েক ওয়াক্তের নামায আদায় করা যায়। অজু নষ্ট হলে পুনরায় অজু করতে হয়। তবে এক অজু থাকতে আবার অজু করায় অতিরিক্ত সওয়াব পাওয়া যায়। হযরত বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) প্রত্যেক নামাযের জন্য অজু করতেন। কিন্তু মক্কা বিজয়ের দিন একই অজুতে সবকয়টি নামায আদায় করেছেন আর মোজায় মাসেহ্ করেছেন।

হযরত ওমর (রা.) তখন তাঁকে বললেন ঃ আপনি আজ এমন একটি কাজ করলেন যা পূর্বে কখনো করেননি। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন ঃ হ্যাঁ, আমি ইচ্ছা করে এমন করেছি (তিরমিযী শরীফ # ৬১)।

অন্য হাদীসে ওমর (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন ঃ যদি আমি ফজরের নামাযের জন্য অজু করতাম, তাহলে অবশ্যই তা দিয়ে সমস্ত নামায আদায় করতাম, যতক্ষণ না আমার অজু ভঙ্গ হয়। ওমর (রা.) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আরো বলতে শুনেছি ঃ যে প্রতিবার অজু থাকা অবস্থায় অজু করবে তার জন্য রয়েছে দশটি নেকী (ইবনে মাজাহ # ৫১২)।

অজুর সময় শরীরের কোন অঙ্গ কতবার ধৌত করতে হবে তার সংখ্যা নিরূপণের জন্য বুখারী শরীফের ১৩৯, সহীহ্ মুসলিমের ৪৬২, আবু দাউদের ১০৬, তিরমিযী শরীফের ৪৮, ইবনে মাজাহের ৪৩৪ এবং নাসাঈ শরীফের ৯৫ নম্বর হাদীসগুলো পর্যালোচনা করে দেখা গেল, কুলি করা, নাকে পানি দেয়া, মুখমণ্ডল ধৌত করা এবং দু'পা ধৌত করার মধ্যে কোন মত পার্থক্য নেই। এ সকল অঙ্গগুলো তিনবার ধৌত করতে হবে।

সহীহ্ মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাঈ শরীফের হাদীসে দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধোয়ার কথা বলা হয়েছে। আর বোখারী শরীফ এবং ইবনে মাজাহে দু'বার ধৌত করার উল্লেখ আছে। তিরমিযী শরীফে কিছু উল্লেখ নেই।

কনুই পর্যন্ত দু'হাত তিনবার ধৌত করার উল্লেখ আছে তিরমিযী শরীফ, আবু দাউদ ও নাসাঈ শরীফে। আর দু'বার ধৌত করার কথা বলা

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে বোখারী শরীফ, সহীহ্ মুসলিম ও ইবনে মাজাহ্ শরীফে। মাথা মাসেহ সম্পর্কে সকল হাদীসে একবারের উল্লেখ আছে।

অজুর অঙ্গগুলো তিন তিনবার করে ধৌত করার নিয়ম প্রচলিত আছে এবং এটা সঠিক বলে স্বীকৃত। হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা.) একবার একবার করে অজুর অঙ্গগুলো ধৌত করে বললেন, এটা এমন অজু যা ছাড়া আল্লাহ্ নামায কবুল করেন না। এটার পর তিনি দু'বার দু'বার করে অজুর অঙ্গ ধৌত করে বললেন : এ অজুই যথেষ্ট। অতঃপর তিনি তিনবার তিনবার করে অজুর অঙ্গ ধৌত করলেন এবং বললেন ঃ এটা হয়েছে পরিপূর্ণ অজু। এটা আমার অজু এবং আল্লাহ্র খলিল ইবরাহীম (আ.) এরও অজু। যে লোক এভাবে অজু করবে এবং অজুর শেষে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে, সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করবে (ইবনে মাজাহ্ # ৪১৯)।

কোন স্থানে অজুর জন্য পানি পাওয়া না গেলে অথবা পানি স্পর্শ করলে কারো কোন রোগের বৃদ্ধি হতে পারে এমন আশঙ্কা থাকলে অজুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করা যায়। তায়াম্মুম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক তবে সারা দেহ পবিত্র কর; আর যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ প্রস্রাব পায়খানা সেরে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীসহবাস করে থাক, অতঃপর পানি না পাও তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও এবং এটা তোমাদের মুখমণ্ডলে ও হস্তসমূহে মাসেহ করবে (সূরা মায়েদা # ৫ : ৬ এর শেষাংশ এবং সূরা নিসা # ৪ : ৪৩ এর শেষাংশ)।

www.nagorikpathagar.org

আবু মূসা আশয়ারী (রা.) থেকে বর্ণিত। হযরত আম্মার (রা.)-কে তায়াম্মুমের নিয়ম দেখানোর জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) দু'হাত মাটিতে মারলেন এবং একটু ঝাড়া (অন্য বর্ণনায় ফুঁক) দিয়ে ডান হাতের দ্বারা বাম হাত ও বাম হাতের দ্বারা ডান হাত এবং মুখমণ্ডল মাসেহ করলেন (বোখারী শরীফ # ২৩২ এবং সহীহ মুসলিম # ৭১৮)। তায়াম্মুমে দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত ও মুখমণ্ডল মাসেহ করা কোন কোন ইমামের মত। কিন্তু আবু হানিফা (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.) এবং অধিকাংশ ওলামাগণের মতে অজুর মত হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ করতে হয় (বোখারী শরীফ পৃষ্ঠা # ১৬৩)।

প্রয়োজনে অনেক দিন পর্যন্ত তায়াম্মুম করা যায়। হযরত আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ পবিত্র মাটি মুমিনের অজুর উপকরণ, যদিও সে দশ বছর পানি না পায় (নাসাঈ শরীফ # ৩২৩)।

অজু নষ্ট হলে আবার অজু করে নামায বা কোরআন পড়তে হয়। যে সকল কারণে অজু নষ্ট হয় তাদের মধ্যে কয়েকটি এ যে,

(১) পায়খানা বা প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে কিছু বের হলে

(২) শরীরের কোন স্থান থেকে রক্ত বা পুঁজ গড়িয়ে পড়লে,

(৩) মুখ ভরে বমি হলে,

(৪) কাত, চিত বা হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লে,

(৫) কোন কারণে বেহুঁশ হয়ে গেলে ইত্যাদি।

www.nagorikpathagar.org

আজান ও একামত

ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় নামাযের জামাতে আসার জন্য মানুষকে ডাকার নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি ছিল না। হযরত আবু উমায়ের ইবনে আনাস (রা.) থেকে কোন একজন আনসার সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) এই জন্য চিন্তিত ও অস্থির হয়ে পড়েন যে, লোকদেরকে নামাযের জন্য কিরূপে একত্রিত করা যায়। কেউ কেউ পরামর্শ দেন যে, নামাযের সময় হলে পতাকা উড়িয়ে দেয়া হোক। যখন লোকেরা তা দেখবে তখন একে অন্যকে নামাযের জন্য ডেকে আনবে। কিন্তু তা নবী করীম (সা.)-এর মনপূতঃ হয় নাই। অতঃপর কেউ প্রস্তাব করল যে শিংগা ফুঁকা হোক। শিংগা ইহুদীদের ধর্মীয় প্রতীক। কাজেই রাসূলুল্লাহ (সা.) তা অপছন্দ করেন। অতঃপর একজন নাকুস (ঘণ্টা) ব্যবহারের পরামর্শ দেন। উপাসনার সময় ঘণ্টা ধ্বনি করা নাসারাদের (খৃষ্টানদের) রীতি। এজন্য নবী (সা.) তা অপছন্দ করেন। অতঃপর কোন সিদ্ধান্ত ছাড়া সে দিনের বৈঠক শেষ হয় এবং সকলে নিজ নিজ গৃহে ফিরে যান। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) ও রাসূলুল্লাহ (সা.) চিন্তিত থাকার কারণে ব্যথিত হৃদয়ে স্বগৃহে ফিরে যান (আবু দাউদ # ৪৯৮)।

পরবর্তী দিনের ঘটনা। সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) বলেছেন, আমি নিদ্রিত অবস্থায় ছিলাম। স্বপ্নে দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি আমার নিকট ঘুরাফিরা করছে, তার হাতে একটি নাকুস আছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি কি এই নাকুসটি বিক্রয় করবে? সে আমাকে প্রশ্ন করল, আপনি এর দ্বারা কি করবেন? আমি বললাম, এটা বাজিয়ে লোকদেরকে নামাযের জন্য আহ্বান জানাব। সে বলল, এ কাজের জন্য আমি নাকুস বাজানো অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট একটি ব্যবস্থা শিক্ষা দেব কি? আমি বললাম, হ্যাঁ, নিশ্চয়। সে বলল, আপনি উচ্চৈঃস্বরে বলবেন, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। এরূপে আমাকে আজানের সমস্ত বাক্যগুলো পূর্ণরূপে শুনাল এবং তারপর একামতও তদ্রূপ শিক্ষা দিল। সকাল বেলা নিদ্রা থেকে উঠে আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর

www.nagorikpathagar.org

খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং আমার স্বপ্নের ঘটনা পূর্ণ ব্যক্ত করলাম। হযরত (সা.) বললেন, ইনশাআল্লাহ্ এটা নিশ্চয় খাঁটি সত্য স্বপ্ন; তুমি বেলালের সঙ্গে দাঁড়িয়ে তাকে এই বাক্যগুলো শিক্ষা দাও, সে এরূপে আজান দেবে। কারণ বেলালের স্বর তোমার অপেক্ষা উচ্চ। তখন আমি তাই করলাম, বেলাল আজান দিতে লাগল। এদিকে ওমর (রা.) তাঁর গৃহ থেকে দ্রুতবেগে ছুটে আসলেন এবং আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি শপথ করে বলছি অবিকল এ স্বপ্ন আমিও দেখেছি। রাসূলুল্লাহ (সা.) তখন আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করলেন (বুখারী শরীফ # ৩৭২)।

এই থেকে মুসলমানের মধ্যে আজানের প্রচলন শুরু হয়।

আজান সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : হে মুমিনগণ! জুমার দিনে যখন নামাযের জন্য আহ্বান করা হয় (আজান দেয়া হয়) তখন তোমরা বেচা-কেনা পরিত্যাগ করে আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও (সূরা জুমা # ৬২ : ৯)।

আজানের বাক্যসমূহ এই যে,

(১) আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার (অর্থ : আল্লাহ্ মহান আল্লাহ্ মহান)।

(২) আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু (অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই)।

(৩) আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল)।

(৪) হাইয়্যা আলাস সালাহ (অর্থ : সালাতের জন্য আস)।

(৫) হাইয়্যা আলাল ফালাহ (অর্থ : কল্যাণের দিকে আস)।

(৬) আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার (অর্থ : আল্লাহ্ মহান আল্লাহ্ মহান)।

(৭) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (অর্থ : আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নেই)।

ফজরের নামাযে "হাইয়্যা আলাল ফালাহ"-এর পরে বলতে হয়–

www.nagorikpathagar.org

(৮) আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম (অর্থ : ঘুম থেকে নামায উত্তম)।

আজানের বাক্যগুলোর মধ্যে ৬ এবং ৭ নম্বরে উল্লিখিত বাক্যগুলো একবার এবং অবশিষ্ট বাক্যগুলো দু'বার করে বলতে হয়। শরীর কিবলামুখী রেখে "হাইয়্যা আলাস সালাহ্" বলার সময় মুখ ডানদিকে এবং "হাইয়্যা আলাল ফালাহ্" বলার সময় মুখ বামদিকে ঘুরাতে হয়।

আজান শুনলে প্রত্যেক শ্রোতা মুয়াযযিনের বলার পরে প্রত্যেক বাক্যের উত্তর দিতে হয়। আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : যখন তোমরা আজান শুনতে পাও তখন মুয়াযযিন যা বলে তোমরাও তাই বল (সহীহ মুসলিম # ৭৪৭, বোখারী শরীফ # ৩৭৬)। একজন সাহাবী আজানের হাইয়্যা আলাস সালাহ্" শুনে "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" বললেন এবং নবী (সা.)-এর মুখে এরূপ শুনছেন বলে উক্তি করলেন (বোখারী শরীফ # ৩৭৭)।

হাইয়্যা আলাস সালাহ্ এবং হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ এই উভয় বাক্যের উত্তরে লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন শক্তি বা ক্ষমতা নেই) বলতে হয়। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্ শুনে উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলতে হয়। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আ'স (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ্ তা'আলা এর বিনিময়ে তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন (সহীহ্ মুসলিম # ৭৪৮, নাসাঈ শরীফ # ৬৮১)।

আজান শেষ হলে মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর জন্য আল্লাহর নিকট একটি বিশেষ দোয়া করতে হয়। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ আজান শুনবার পর যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবে, কেয়ামতের দিন সে অবশ্যই শাফায়াত লাভের যোগ্য হবে। দোয়াটি এই ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ দাওয়াতিত তাম্মাতি ওয়াস সালাতিল কায়িমাতি, আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাদীলাতা, ওয়াবআছহু মাকামাম মাহমুদা নিল্লাযী ওয়াআতত্তাহু [ইন্নাকা লা তুখলিফুল মী'য়াদ] (আবু দাউদ # ৫২৯)।

www.nagorikpathagar.org

অর্থ : হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং আসন্ন নামাযের তুমিই প্রভু! হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে দান কর সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান, সুমহান মর্যাদা এবং (বেহেশতের সর্বোচ্চ স্থান) মাকামে মাহমুদে তাঁকে অধিষ্ঠিত কর, যার প্রতিশ্রুতি তুমিই তাঁকে দিয়েছ [নিশ্চয় তুমি ভঙ্গ করো না অঙ্গীকার]।

আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আ.) কা'বা শরীফ পুনঃনির্মাণ করলে আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দেন ঃ মানুষের নিকট হজ্জের ঘোষণা (আজান) দাও (সূরা হজ্জ # ২২ : ২৭)। মুসলমানদের সন্তান জন্মের পর তার কানের কাছে আজান দেয়ার রীতি প্রচলিত আছে। বিশ্বাস এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আজানের মত এই আজান সন্তানটিকে ধার্মিক করবে এবং হজ্জে যাবার সৌভাগ্য দেবে।

আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ মুয়াযযিন যখন আজান দেয় তখন শয়তান পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে দ্রুত বেগে পলায়ন করে (সহীহ মুসলিম # ৭৫৪)।

আজান তাড়াহুড়া করে অতি দ্রুত শেষ করা যেমন কাম্য নয় আবার অতি দীর্ঘায়িত করাও পছন্দনীয় নয়। এই দুইয়ের মাঝামাঝি অবস্থায় সুন্দর ও উচ্চৈঃস্বরে ধীর লয়ে শেষ করা উত্তম। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বেলাল (রা.)-কে বললেন, হে বেলাল, যখন আজান দেবে তখন ধীর লয়ে দেবে আর যখন একামত দেবে তখন দ্রুত দেবে (তিরমিযী শরীফ # ১৯৫)।

আজান দেয়ার সময় কেউ দুই হাতে দুই কান চেপে ধরে রাখে, আবার কেউ দুই হাত পাশে ঝুলিয়ে রাখে। অথচ হযরত সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসূল (সা.) বেলাল (রা.)-কে তাঁর দুই কানের ছিদ্রপথে আঙ্গুল প্রবেশ করানোর নির্দেশ দেন এবং বলেন : এতে তোমার আওয়াজ আরো বুলন্দ হবে (ইবনে মাজাহ # ৭১০)।

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বেলালকে আজানের শব্দ জোড় সংখ্যায় এবং একামতের শব্দ বেজোড় সংখ্যায় বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইয়াহইয়া তাঁর বর্ণনায় ইবনে উলাইয়ার সূত্রে বলেছেন, তিনি

www.nagorikpathagar.org

আইউবের কাছে এই হাদীস বর্ণনা করলে তিনি বললেন, কিন্তু "কাদ কামাতিস সালাত" দুইবার বলতে হবে (সহীহ মুসলিম # ৭৩৭)।

কখনো কখনো এক ব্যক্তি আজান দিলে অন্য ব্যক্তি একামত দিয়ে থাকে। তা ঠিক নয়। হযরত যিয়াদ ইবনুল হারিছ আস-সুদাঈ (রা.) বলেন, যখন আজানের প্রথম সময় উপনীত হয়, তখন নবী করীম (সা.) আজান দেয়ার নির্দেশ দিলে আমি আজান দেই। অতঃপর আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একামত দেব কি? তিনি (সা.) পূর্ব দিগন্তের দিকে লক্ষ্য করে বললেন : না। অতঃপর পূর্বাকাশ পরিষ্কার হলে তিনি বাহন থেকে নেমে প্রস্রাব করে এসে অজু করেন। এই সময় হযরত বেলাল একামত দিতে চাইলে তিনি (সা.) নিষেধ করে বললেন ঃ তোমার ভাই যিয়াদ আস-সুদাঈ আজান দিয়েছে এবং যে ব্যক্তি আজান দেবে সে একামত দেয়ার অধিকারী। অতঃপর আমি একামত দেই (আবু দাউদ # ৫১৪)।

আজান এবং একামতের মধ্যে কিছু মিল ও কিছু অমিল রয়েছে। নামাযের সময় আসন্ন হলে লোকদেরকে ডাকার জন্য আজান দেয়া হয়। আর একামত দেয়া হয় একত্রিত লোকদেরকে নিয়ে নামায শুরুর পূর্বক্ষণে। আজানের প্রত্যেক বাক্যের উত্তর দিতে হয় কিন্তু একামতে বাক্যগুলোর উত্তর দিতে হয় না। তবে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ শুনার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলতে হয়। এটা না বলা দোষণীয়। আজানে কাদকামাতিস সালাহ বলতে হয় না কিন্তু একামতে এটা দু'বার বলতে হয়। ফজরের আজানে আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম বলতে হয় কিন্তু একামতে এটা বলতে হয় না।

হযরত ওসমান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন : মসজিদে আজান হওয়ার পর যে ব্যক্তি কোন প্রয়োজনে বের হয়ে যাবে এবং ফিরে আসার ইচ্ছা না করবে, সে মোনাফেক (ইবনে মাজাহ # ৭৩৩)।

www.nagorikpathagar.org

জানাযার নামায

সদ্যজাত শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত যে কোন বয়সের মুসলমান মৃত নর-নারীর জন্য জানাযার নামায আদায় করতে হয়। এটা মৃতকে দুনিয়া থেকে বিদায় দেয়ার পূর্বে পরকালের সুখ লাভের জন্য দোয়ার অনুষ্ঠান। এটাকে নামায বললেও অন্যান্য নামায থেকে এটা স্বতন্ত্র। এটাতে রুকু বা সেজদা নেই। দাঁড়িয়ে এটা শেষ করা হয়। তবে অন্যান্য নামাযের ন্যায় তাকবীর দিতে হয়, সূরা ফাতিহা ও দরূদ পড়তে হয় এবং সালাম ফেরাতে হয়। জানাযার নামায খোলা জায়গায় বা প্রয়োজনে মসজিদে পড়া হয়। এটার জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। তবে নামাযের নিষিদ্ধ সময়ে তথা সূর্যোদয়ের সময় সূর্য মাথার উপর স্থির হলে এবং সূর্যাস্তের সময় এই নামায পড়া মাকরূহ।

মৃতকে অজু ও উত্তমরূপে গোসল করিয়ে সাদা কাপড়ে কাফন পরিয়ে জানাযার নামাযের জন্য প্রস্তুত করা হয়। অতঃপর কিবলা সামনে করে ডানদিকে মাথা রেখে খাটিয়ায় শোয়ানো হয়। ইমাম লাশ সামনে রেখে নামায শুরু করেন। এই নামায শুধু পুরুষেরা পড়ে থাকেন। উম্মে আ'তিয়া (রা.) (যিনি নবী (সা.)-এর এক মৃত কন্যার গোসল দিয়েছিলেন) বর্ণনা করেছেন, বিশেষ জোর তাগিদের সাথে না হলেও (রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময়) আমাদেরকে (নারীগণকে) শববাহকের সঙ্গে যেতে নিষেধ করা হত (বোখারী শরীফ # ৬৬৮)।

যে কোন বেজোড় সংখ্যায় কাঁতার করে এই নামায আদায় করার জন্য কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতে হয়। যেহেতু এই নামাযে রুকু বা সেজদা নেই সে জন্য সারিগুলো ঘন হলে কোন দোষ নেই। সামুরা ইবনে জুন্দুব (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পেছনে একটি মহিলার জানাযার নামায পড়েছি। সন্তান প্রস্রব সংক্রান্তে মহিলাটির মৃত্যু হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) মহিলাটির মধ্য বরাবরে দাঁড়িয়েছিলেন (বোখারী শরীফ # ৬৯৪)। হানাফী মাযহাব মতে নারী-পুরুষ উভয়ের জানাযার নামাযে ইমাম মৃতের বক্ষ বরাবর দাঁড়াবেন।

www.nagorikpathagar.org

জানাযার নামায চার তাকবীরে সমাপ্ত করা হয়। ইমাম কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠিয়ে প্রথম তাকবীর অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলে হাত বাঁধবেন। পেছনের লোকেরাও অনুরূপভাবে আল্লাহু আকবার বলে হাত বেঁধে সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা ওয়া ত'বারাকাসমুকা ওয়াতায়ালা জাদ্দুকা ওয়ালা ইলাহা গইরুকা পড়বে। অতঃপর আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম; বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম পড়ে সূরা ফাতিহা পড়বে। তালহা ইবনে আবদুল্লাহ (র.) বর্ণনা করেছেন। একদা আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর পেছনে জানাযার নামায পড়লাম। তিনি এতে সূরা ফাতেহা পাঠ করলেন এবং বললেন, তোমাদের জানা উচিত এটা সুন্নাত বটে (বোখারী শরীফ # ৬৯৫)। অন্য নামাযের মত এটা অবশ্যই পড়তে হবে।

ইমাম দ্বিতীয় তাকবীর বলবেন। পেছনের লোকেরা দরূদে ইব্রাহীম অর্থাৎ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহীম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহীম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ; পড়বে।

ইমাম তৃতীয় তাকবীর বলবেন। এবার মৃতের জন্য দোয়া করতে হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) জানাযায় পড়েছেন এমন একটি দোয়া এই যে ঃ

আল্লাহুম মাগফির লাহু ওয়ারহামহু ওয়া আফিহি ওয়াফু আনহু ওয়া আকরিম নুজুলাহু ওয়া ওয়াসসি মুদখালাহু ওয়াগসিলহু বিলমায়ি ওয়াসসালজি ওয়ালবারাদি ওয়ানাককিহি মিনাল খতাইয়া কামা নাক্কাইতাস সাওবাল আবয়াদা মিনাদ দানাসি, ওয়াআবদিলহু দারান খইরান মিন দারিহি, ওয়া আহলান খয়রান মিন আহলিহি, ওয়া যাওজান খায়রান মিন যাওজিহি, ওয়া আদখিলহুল জান্নাতা, ওয়া আয়িযহু মিন আযাবিল কবরি ওয়া আযাবিন্নার (সহীহ মুসলিম # ২১০৬)।

অর্থ : হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা কর, তার উপর রহম কর, তাকে নিরাপদ রাখ এবং তাকে মার্জনা কর। তাকে উত্তম সামগ্রী দান কর এবং

www.nagorikpathagar.org

তার প্রবেশদ্বার প্রশস্ত করে দাও। তাকে পানি, বরফ ও শিশির দিয়ে ধৌত করে দাও এবং গুনাহ্ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার কর যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। তাকে তার ঘরের তুলনায় উত্তম ঘর, তার পরিবার থেকে উত্তম পরিবার এবং তার জোড়া থেকে উত্তম জোড়া দান কর। তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাও এবং কবর আজাব ও দোযখের আযাব থেকে বাঁচাও।

উপরে বর্ণিত দোয়া যাদের জানা নেই তারা নিজের মন থেকে মৃতের জন্য দোয়া করবেন। প্রত্যেকের কাম্য এটা যে, কবর আজাব না হউক, দোযখের শাস্তি না হোক এবং বেহেশতের সুখ নসীব হোক। এই কথা স্মরণে রেখে আন্তরিকভাবে দোয়া করলে আল্লাহ্ তা কবুল করতে পারেন।

ইমাম সর্বশেষে চতুর্থ তাকবীর বলবেন। এবার অন্য কিছু পড়ার দরকার নেই। ইমাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্ বলে প্রথমে ডানে এবং পরে বামে সালাম ফেরাবেন। অন্যরাও তদ্রূপভাবে সালাম ফেরাবেন। উল্লেখ্য যে প্রথম তাকবীরে হাত উঠাবার পরে অন্যান্য তাকবীরে হাত উঠাবার প্রয়োজন নেই। তবে কেউ উঠালে তাতেও দোষ নেই। এভাবে জানাযার নামায শেষ হয়।

মৃতের লাশ সামনে না রেখে কোন মৃতের জানাযা পড়া যায়। এটাকে গায়েবানা জানাযা বলে। রাসূলুল্লাহ (সা.) গায়েবানা জানাযা পড়েছেন। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজ্জাশী ইন্তেকাল করলে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন : আজ আল্লাহর একজন নেককার বান্দা ইন্তেকাল করেছেন। এর পর তিনি উঠে গিয়ে আমাদের সামনে ইমাম হয়ে তাঁর জন্য নামায আদায় করলেন (সহীহ্ মুসলিম # ২০৮০)। উল্লেখযোগ্য যে, আসহামাহ নাজ্জাশী ছিলেন তৎকালীন আবিসিনিয়া এবং বর্তমান ইথিওপিয়ার খৃষ্টান শাসক। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদেশে ১৫ জন সাহাবা মুশরিকদের অত্যাচার থেকে জনগণকে রক্ষার জন্য সেখানে যান। সে সময় নাজ্জাশী মুসলমান হন।

মৃতকে দাফন করার পরে গায়েবানা জানাযা দেয়ার কোন বিধান আছে বলে আমার জানা নেই। তবে কবরের নিকট জানাযা পড়ার প্রমাণ

www.nagorikpathagar.org

পাওয়া যায়। বোখারী শরীফের জানাযা অধ্যায়ে উল্লেখ আছে, কবরের নিকট নিয়মিত জানাযার নামায আদায় করার জন্য শর্ত এই যে, শবদেহ ফাটিয়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নাই এরূপ অবস্থায় হতে হবে। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। এক কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা অথবা যুবক মসজিদে নববীতে ঝাড়ু দিত। কিছুদিন তাকে রাসূলুল্লাহ (সা.) না দেখে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। সাহাবাগণ বললেন, সে তো মারা গেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন ঃ তোমরা আমাকে খবর দিলে না কেন? আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। তারা তাঁকে কবর দেখিয়ে দিলে তিনি তার কবরের উপর জানাযা আদায় করলেন (সহীহ মুসলিম # ২০৮৭)।

জানাযার নামায পড়া অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন : যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়ে, তাকে এক কীরাত সওয়াব দান করা হবে, আর যে ব্যক্তি মৃতকে কবরে রাখা পর্যন্ত এর অনুসরণ করে তাকে দেয়া হবে দুই কীরাত সওয়াব। প্রতি কীরাত ওহুদ পাহাড়ের সমান (সহীহ মুসলিম # ২০৬৬, বোখারী শরীফ # ৪৩)।

জাবের ইবনে সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) এর নিকট এক ব্যক্তির লাশ হাজির করা হলো। সে চেপ্টা তীরের আঘাতে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) তার জানাযা পড়েননি (সহীহ মুসলিম # ২১৩৪)। এই হাদীসের ভিত্তিতে অনেকের মতে আত্মহত্যাকারীর উপর জানাযার নামায পড়া জায়েয নয়। তবে হাসান বসরী, মালিক, আবু হানিফা, শাফেয়ী (র.) ও অধিকাংশ আলেমদের মতে আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়া জায়েয। সে ঈমানদার হলে অন্যান্য ঈমানদার মুসলমানের ন্যায় তার জানাযা পড়তে হবে। কেননা অন্য এক হাদীসে আছে সাহাবাগণ এই ধরনের ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানাযা পড়ার জন্য আদেশ দেন। এই ধরনের ঘৃণ্য কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি জানাযা পড়েননি। (উপরের হাদীসের টীকা)

কিন্তু কোন মোনাফেকের জানাযা পড়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আর তাদের (মোনাফেকদের) মধ্য থেকে কারো মৃত্যু

www.nagorikpathagar.org

হলে তার উপর কখনও নামায পড়বেন না এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না (সূরা তওবা # ৯ : ৮৪)। মোনাফেকরা ঈমানদারদের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। তাদেরকে চেনার সহজ উপায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসে পাওয়া যায়। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন মোনাফেকের আলামত তিনটি (১) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, (২) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং (৩) তার কাছে কোন আমানত রাখলে তা খেয়ানত (আত্মসাৎ) করে (সহীহ্ মুসলিম # ১১৯ ও বোখারী শরীফ # ২৯)। সহীহ মুসলিমের ১১৮ নম্বর এবং বোখারী শরীফের ৩০ নম্বর হাদীসে মোনাফেকের আরও একটি আলামত সম্পর্কে উল্লেখ আছে। কারো সাথে ঝগড়া করলে সে গালাগালি করে। কিছু সংখ্যক মোনাফেক মুখে মুসলমান দাবী করলেও অন্তরে ঈমান নেই, এরা খাঁটি মোনাফেক এবং চির দোযখী। আর কিছু সংখ্যক মোনাফেকের ঈমান আছে কিন্তু উক্ত লক্ষণগুলোও তাদের মধ্যে আছে, এরা কাফের নয়, ফাসেক; দোযখের আজাব ভোগ করে এক সময় বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে।

জানাযা শেষে লাশের খাটিয়ার চার কোণে ধরে লোকেরা কবরের স্থানের দিকে অগ্রসর হয়। আমর ইবনে রবীআহ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেন ঃ যখন তোমরা জানাযা নিয়ে যেতে দেখ তখন দাঁড়িয়ে যাও, যে পর্যন্ত তা তোমাদেরকে পেছনে ফেলে না যায় অথবা তা মাটিতে রেখে দেয়া না হয় (সহীহ মুসলিম # ২০৮৯)। এটা মৃতকে সম্মান দেখানোর উদ্দেশ্যে করা হয়। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেকের মতে এটা জরুরি না।

শবযাত্রীগণ জানাযার পেছনে চলা উত্তম। এটাতে নিজের মৃত্যুর কথা বেশী স্মরণ হবে। আলী (রা.) বলেছেন : জানাযাকে তোমার সম্মুখে রাখ, তোমার দৃষ্টি এর প্রতি নিবদ্ধ কর, এটা তোমার জন্য উত্তম ও আখেরাতের স্মারক এবং তোমাকে শিক্ষাদানকারী। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সা.) বলেছেন, জানাযা নিয়ে দ্রুত চলবে। কারণ মৃত ব্যক্তি যদি নেককার হয় তবে তার জন্য নেয়ামত সামগ্রী প্রস্তুত রয়েছে; যথাসত্বর তাকে এর জন্য নির্ধারিত স্থানে পৌছিয়ে দেয়া চাই। আর যদি সে বদকার হয় তবে এটা একটি অতি জঘন্য বস্তু; যথাসত্বর তা স্বীয় কাঁধ হতে অপসারিত করে দিতে সচেষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় (বোখারী শরীফ # ৬৯২)।

www.nagorikpathagar.org

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেন ঃ কোন মৃত ব্যক্তির উপর যখন একদল মুসলমান যাদের সংখ্যা একশত হবে, জানাযার নামায পড়ে এবং সকলে তার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে, তবে তার জন্য এই সুপারিশ কবুল করা হবে (সহীহ্ মুসলিম # ২০৭১)।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি ঃ কোন মুসলমান ব্যক্তি মারা গেলে, তার জানাযায় যদি এমন চল্লিশজন মানুষ দাঁড়িয়ে যায় যারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করে না, তবে মহান আল্লাহ্ তার অনুকূলে তাদের প্রার্থনা কবুল করেন (সহীহ্ মুসলিম # ২০৭২)।

যে ভাল লোক তার মৃত্যুর পরও মানুষ তাকে ভাল জানে, আর যে মন্দ লোক তার মৃত্যুর পর লোকেরা তাকে মন্দই বলে। আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, একদা সাহাবাগণ একটি জানাযার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁরা মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করলেন; নবী (সা.) বললেন, নির্ধারিত হয়ে গেছে। অতঃপর অন্য একটি জানাযার নিকট দিয়ে চলার সময় সাহাবাগণ মৃত ব্যক্তির নিন্দা করলেন; এবারও নবী (সা.) বললেন, নির্ধারিত হয়ে গেছে। ওমর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, কি নির্ধারিত হয়ে গেছে? নবী (সা.) বললেন, প্রথম মৃতের প্রতি তোমরা প্রশংসা করেছো, সেই অনুযায়ী তার জন্য বেহেশত নির্ধারিত হয়ে গেছে। দ্বিতীয় মৃতকে তোমরা খারাপ বলেছো, সেই অনুযায়ী তার জন্য দোযখ নির্ধারিত হয়ে গেছে। তোমরা জমিনের বুকে আল্লাহর সাক্ষী, তোমরা জমিনের বুকে আল্লাহর সাক্ষী, তোমরা জমিনের বুকে আল্লাহর সাক্ষী (বোখারী শরীফ # ৭০৬, সহীহ মুসলিম # ২০৭৩)।

তবে এই হাদীসের তাৎপর্য এই নয় যে, একজন ভাল লোককে মন্দ এবং একজন মন্দ লোককে ভাল বললে সেই অনুসারে তাদের পরকাল সাব্যস্ত হবে। বান্দার আমলই তার পরিণাম ফলকে নিশ্চিত করে থাকে। মানুষও সেই অনুসারে মন্তব্য করে।

www.nagorikpathagar.org

কবর আজাব

মৃত্যু প্রত্যেক মানুষের জন্য অবধারিত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তোমরা যেখানেই থাক না কেন; মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়াও করবে যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভেতরেও অবস্থান কর, তবুও (সূরা নিসা # ৪ : ৭৮)। মৃত্যুর পর মুসলমান, ইহুদী ও নাসারাদের লাশের কবর দেয়া হয়। তবে নাসারা তথা খৃষ্টানদের কেউ কেউ মৃতদেহ কবর দেয়ার পরিবর্তে পুড়িয়ে ফেলে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য কিছু ধর্মাবলম্বীরা মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলে। অর্থাৎ এদের কবর দেয়া হয় না।

একদা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে দিয়ে একটি লাশ বহন করা হতেছিল। তা লক্ষ্য করে তিনি বললেন, সে নিজে শান্তি পেয়েছে বা তার থেকে শান্তি লাভ হয়েছে। সাহাবাগণ এর তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, নেককার বান্দার মৃত্যু হলে সে দুনিয়ার ক্লান্তি, শ্রান্তি, অবসাদ এবং দুঃখ-যাতনা থেকে মুক্তি লাভ করে আল্লাহ্র রহমতের আশ্রয়ে গিয়ে শান্তি লাভ করে। পক্ষান্তরে বদকার বান্দার মৃত্যু হলে মানব-দানব, পশু-পাখী সবাই তার উৎপীড়ন ও নির্যাতন থেকে রক্ষা পায় (বোখারী শরীফ # ২৪৭০)।

কবর বলতে আমরা সাধারণতঃ কোন ব্যক্তির সমাহিত স্থানকে বুঝি। কবরের কথা যারা গভীরভাবে চিন্তা করে তারা ভয়ে শিহরিয়ে উঠে। গভীর অন্ধকার নিশ্ছিদ্র-নিঃশব্দ ছোট একটি কুঠরি, দাঁড়ানোর জায়গা নেই, প্রতিবাদের উপায় নেই, প্রতিরোধের ক্ষমতা নেই, বের হবার পথ নেই; এমনি ভয়ঙ্কর এই স্থান। আসলে কবর এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কবর বলতে আলমে বরযখ বা বরযখী জগতকে বুঝায়। এটা পার্থিব জগৎ থেকে বহু বহু গুন বড়। এর সীমা পরিসীমা এবং অবস্থান মানুষের জানার বাইরে। পার্থিব তথা ইহজগতে মানুষ যেমন জীবিত আলমে বরযখেও বরযখবাসীগণ তেমন জীবিত। সেখানে তাদের সুখ-দুঃখ সম্পর্কে

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তা'আলার আদেশাবলী কার্যকরী হতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, নিশ্চয় কবর আখেরাতের প্রথম ধাপ। যদি সে এটা থেকে মুক্তি পায় তবে এর পরে যা ঘটবে তা এটা থেকে সহজতর হবে। এটা থেকে মুক্তি না পেলে এর পরে যা ঘটবে তা অধিকতর তীব্র হবে। আমি এমন কোন ভীষণ স্থান দেখি নি যা কবর থেকেও অধিক ভীষণ (তিরমিযী শরীফ # ২২৫০, ইবনে মাজাহ শরীফ # ৪২৬৭)। তিনি আরও বলেছেন ঃ আমার নিকট অহী এসেছে যে, দাজ্জালের পরীক্ষার মত তোমাদেরকে কবরে পরীক্ষা করা হবে (বোখারী শরীফ # ৭১২, সহীহ মুসলিম # ১৯৭৯)।

মুমিনের মৃত্যু কষ্ট থেকে কাফেরের মৃত্যু কষ্ট অনেক সময় কম হতে দেখা যায়। অনেকে এতে ধাঁধায় পতিত হয়। কাফের বা বিধর্মীর মধ্যে অনেকে অনেক মহৎ কাজ করে থাকে। দান-খয়রাতে বা পরোপকারে অনেকে মুমিন বান্দা অপেক্ষাও অনেক অগ্রগামী। প্রত্যেক মহৎ কাজের পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে। যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেনি পরকালে তাদের জন্য আজাব ছাড়া আর কিছু থাকে না। তাই তাদের মহৎ কাজের পাওনা দুনিয়াতে দিয়ে দেয়া হয়। আর যা কিছু অবশিষ্ট থাকে মৃত্যু কষ্ট লাঘব করে দিয়ে তাদের পাওনা শেষ করে দেয়া হয়। অপর পক্ষে ঈমানদারের মৃত্যু কষ্টের দ্বারা অনেক ছোট-খাট গুনাহ মুছে দেয়া হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ যে কেউ পার্থিব জীবন ও এর চাকচিক্য কামনা করে, তাদের কাজ-কর্মের যাবতীয় ফল আমরা দুনিয়াতে তাদেরকে দান করি, আর তাতে তাদের প্রতি কোন রূপ কমতি করা হয় না। এরা সেই সকল লোক যাদের জন্য আখেরাতে আগুন ছাড়া আর কিছু নেই (সূরা হূদ # ১১ : ১৫-১৬)।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ যে কেউ পরকালের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য সেই ফসল বাড়িয়ে দেই আর যে ইহকালের ফসল কামনা করে, আমি তাকে তার কিছু দিয়ে দেই এবং পরকালে তার কোন অংশ থাকবে না (সূরা শূরা # ৪২ ঃ ২০)।

www.nagorikpathagar.org

মৃত্যুর পরে আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতারা নাম তালিকাভুক্তির জন্য রূহকে ইল্লিয়্যীন অথবা সিজ্জিনে নিয়ে যায়। আল্লাহর পরবর্তী নির্দেশে রূহকে কবরে এনে দেহে প্রবেশ করায়। এ সময় মুনকার ও নাকীর নামক আল্লাহর দুই বিশেষ ফেরেশতা কবরে আসে। কবর দেয়া হোক বা অন্য কোনভাবে মৃত দেহের ধ্বংস করা হোক না কেন এই দুই ফেরেশতার প্রশ্নের সম্মুখীন সকলকেই হতে হয়। তাদের চেহারা ও কণ্ঠস্বর প্রত্যেকের আমল অনুযায়ী হয়। তারা সমাহিত ব্যক্তিকে বসিয়ে (১) তোমার রব কে? (২) তোমার ধর্ম কি? এবং (৩) তোমার নবী কে? এই তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। নেককার বান্দা জবাবে বলে- (১) আমার সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ আমার রব (২) ইসলাম আমার ধর্ম এবং (৩) মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার নবী। ফেরেশতাদ্বয় দোযখের দিকে একটি ছিদ্র করে ইশারায় তাকে দেখিয়ে বলে, দোযখের মধ্যে ঐ স্থানটি তোমার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু তুমি নেককার হওয়ায় আল্লাহ এর পরিবর্তে তোমাকে বেহেশতে স্থান দিয়েছেন। তখন গায়েবী আওয়াজ হয়, আমার বান্দা ঠিক ঠিক উত্তর দিয়েছে, বেহেশতের বিছানা এনে দাও, বেহেশতের পোশাক পরিয়ে দাও এবং বেহেশতের দিকে দরজা খুলে দাও (বোখারী শরীফ # ৭০৮)।

উক্ত ফেরেশতাদ্বয় বীভৎস কালো চেহারা, নীল বর্ণ চক্ষু এবং অতি ভয়ঙ্কর দাঁত ধারণ করে লোহার বিরাট গুরুজ নিয়ে কাফের ও মোনাফেকের কবরে প্রবেশ করে উক্ত তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। সে প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিতে পারে না। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে বলে, আমি জানি না। তখন ফেরেশতাদ্বয় ভীষণ গর্জন করে গুরুজ দ্বারা তাকে এমন জোরে আঘাত করতে থাকে যার একটি আঘাত পাহাড়ে করলে তা ধুলায় পরিণত হয়ে যেত। সে তখন ভীষণ জোরে চিৎকার করে উঠে। সেই চিৎকার পশু-পাখী শুনতে পেলেও মানুষ ও জিনেরা শুনতে পায় না। অতঃপর একটি বধির জীব জ্বলন্ত অঙ্গারের চাবুক দিয়ে তাকে অবিরাম আঘাত করতে থাকবে। বেহেশতের দিকে একটি ছিদ্র করে তাকে দেখিয়ে বলা হয়, তুমি যদি

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মেনে চলে মুমিন হতে তবে এতে তোমার স্থান হত। অতঃপর দোযখের দিকে একটি ছিদ্র করে তা দেখিয়ে বলা হয়, এটা তোমার বাসস্থান। আসমান থেকে আদেশ দেয়া হয়, তাকে দোযখের পোশাক পরিয়ে দাও এবং দোযখের বিছানা পেতে দাও (বোখারী শরীফ # ৭০৮)।

মানুষ মাটি থেকে সৃষ্ট। সে মাটিতে ফিরে আসলে তা' আলিঙ্গন করে তাকে গ্রহণ করে যেমন বিদেশ থেকে সন্তান বাড়িতে ফিরে আসলে মা তাকে আলিঙ্গন করে। কবর পাপী-নিষ্পাপ, মুনাফেক-কাফের নির্বিশেষে সকলকে একবার চাপ দেয়। এই চাপ নেক আমলের পরিমাণ অনুযায়ী হয়ে থাকে। যারা নেককার তাদের উপর কবরের চাপ মায়ের বুকে সন্তানের আলিঙ্গনের মত মৃদু। নেকের পরিমাণ যাদের কম তাদের চাপের পরিমাণ হয় বেশী। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ এই সেই ব্যক্তি [হযরত সা'দ রা.] যার মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কাঁপছিল, যার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়েছিল তাঁর কবরও মিলিয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তা প্রশস্ত হয়ে গিয়েছিল (নাসাঈ শরীফ # ২০৫৯)। ঈমানদারদের কবর সংকুচিত হয়ে নেকের মাত্রানুযায়ী একবার চাপ দিয়ে পরে প্রশস্ত হয়ে যায় এবং কবরে বেহেশতী সুবাস আসতে থাকে। কিন্তু অবিশ্বাসী মোনাফেক ও কাফেরদের কবর এমনভাবে সঙ্কীর্ণ করা হয় যার চাপে তাদের পাঁজর একদিক থেকে অন্যদিকে চলে যায়। তাদের কবরে দোযখের ভীষণ তাপ আসতে থাকে (বোখারী শরীফ # ৭০৮)।

কবর আজাব তথা বরযখে কিভাবে আজাব দেয়া হয় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কয়েকটি হাদীসে তার চিত্র ফুটে উঠেছে। সামুরা ইবনে জুন্দুব (রা.) বোখারী শরীফের ৭২১ নম্বর হাদীসটি এইভাবে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর নিত্যদিনের নিয়মানুযায়ী একদিন ফজরের নামাযের পরে জিজ্ঞাসা করলেন, কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কিনা। সকলে যখন জানাল যে কেউ কোন স্বপ্ন দেখে নি, তখন তিনি জানালেন যে, তিনি একটি স্বপ্ন দেখেছেন। তিনি বর্ণনা করলেন, দুই ব্যক্তি (জিব্রাইল আ. ও

www.nagorikpathagar.org

মিকাঈল আ.) তাঁকে একটি পাক পবিত্র স্থানে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে তিনি যা দেখেছেন তা বরযখ তথা কবর আজাবের কিছু দৃশ্য। তিনি দেখেছেন ঃ

(১) মিথ্যা বলার শাস্তি ঃ একটি লোক বসে আছে, অপর এক লোক একটি বক্র মাথা বিশিষ্ট লোহার শিক বসা ব্যক্তির মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে তার মুখের চিবুক ফেড়ে গর্দান পর্যন্ত নিয়ে যায়, তদ্রূপ নাকের এক ছিদ্র ফেড়ে গর্দান পর্যন্ত নিয়ে যায় এবং চোখের ভেতর প্রবেশ করিয়ে তা ফেড়ে গর্দান পর্যন্ত নিয়ে যায়। এভাবে এক পার্শ্বের চিবুক, নাক ও চোখ ফাড়ার পর অপর পার্শ্ব ঐভাবে ফাড়ে। এক পার্শ্ব ফেড়ে অপর পার্শ্ব ফাড়তে ফাড়তে প্রথম পার্শ্ব পূর্বের ন্যায় অক্ষত হয়ে যায় এবং এটা পুনরায় ফাড়া হয়। পুনঃপুনঃ উভয় পার্শ্ব এভাবে ফাড়ছে। সে জীবিতাবস্থায় এমন এক একটি মিথ্যা বানিয়ে বলত যা তার মুখ থেকে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ত। এটা তার শাস্তি। এ শাস্তি হাশরের হিসাব-নিকাশ শুরুর পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকবে। [উল্লেখযোগ্য যে, মিথ্যা বলা মোনাফেকের চারটি লক্ষণের অন্যতম লক্ষণ]

(২) কোরআন শিখে আমল না করার শাস্তি ঃ একজন লোক চিত হয়ে শুয়ে আছে। অপর একজন লোক বিরাট ভারি একটি পাথরের আঘাতে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করছে। পাথরটি এত জোরে মারা হয় যে, এর আঘাতে মাথা চূর্ণ হয়ে পাথরটি ছিটকিয়ে দূরে সরে পড়ে; ঐ পাথরটি নিয়ে তার নিকট ফিরে আসতে আসতে তার মাথা পূর্বের ন্যায় অক্ষত অবস্থা প্রাপ্ত হয়; পুনরায় তাকে ঐরূপে আঘাত করা হয়। এরূপে পুনঃপুনঃ তাকে আঘাত করা হচ্ছে। এ ব্যক্তিকে আল্লাহ্ কোরআনের জ্ঞান দান করেছিলেন, কিন্তু সে এটা তেলাওয়াত করেনি এবং আমল করেনি। তার এ শাস্তি কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

(৩) যেনার শাস্তি ঃ তন্দুরের ন্যায় একটি অগ্নিকুণ্ড, এটার মুখটি সঙ্কীর্ণ এবং অভ্যন্তর ভাগ অতিশয় প্রশস্ত। এটার ভেতরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে এবং এতে ভয়ঙ্কর চিৎকার ও আর্তনাদ শুনা যাচ্ছে। এটার

www.nagorikpathagar.org

ভেতরে কতগুলো উলঙ্গ নর-নারী রয়েছে। যখন অগ্নিশিখাগুলো লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করে উপরের দিকে ঠেলে উঠে, তখন এর সঙ্গে সঙ্গে তারা উপরের দিকে চলে আসে, মনে হয় যেন এর মধ্য থেকে বাইরে এসে পড়বে, কিন্তু অগ্নিশিখা স্তমিত হলে আবার তারা এর তলদেশে পড়ে যায়। তারা যেনাকার ব্যভিচারী নর-নারী।

(৪) সুদ খাওয়ার শাস্তি ঃ একটি নদীতে পানির পরিবর্তে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। ঐ নদীর মধ্যস্থলে একটি লোক অবিরাম সাঁতার কাটছে এবং অপর একটি লোক সে নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে এবং তার সম্মুখে বহু পাথর খণ্ড স্তূপীকৃত। এমতাবস্থায় মধ্যস্থলীয় লোকটি সাঁতার কেটে কিনারার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। যখন সে উঠার চেষ্টা করে তখন দাঁড়ানো লোকটি পাথর দ্বারা তার মুখে এমন জোরে আঘাত করে যে সে পূর্বের স্থান নদীর মধ্যস্থলে চলে যায়। যতবার ঐ ব্যক্তি সে রক্তের নদী থেকে উঠে আসতে চেষ্টা করে ততবার তাকে আঘাত করে ফিরিয়ে দেয়। এ লোকটি সুদখোরদের একজন। এটা সুদ খাওয়ার শাস্তি।

(৫) গীবত ও কুৎসা রটনার শাস্তি ঃ হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ যখন আমাকে মিরাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, আমি একদল লোকের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলাম। তারা নখ দিয়ে নিজেদের মুখমণ্ডল ও চেহারা আঁচড়াতে ছিল। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি; হে জিব্রাইল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা মানুষের গোশত খেত (গীবত করত) এবং তাদের ইজ্জত নষ্ট-করত (আবু দাউদ # ৪৮০১)।

(৬) প্রস্রাবের অপবিত্রতার শাস্তি ঃ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, একদা নবী (সা.) একটি বাগানের নিকট দিয়ে যেতে ছিলেন। তথায় তিনি দু'টি কবরের মধ্য থেকে কবরবাসীদের বিকট চিৎকার শুনতে পেয়ে বললেন, কবরবাসীদেরকে আজাব দেয়া হচ্ছে. তা যদিও কোন কঠিন কাজের জন্য নয়, তবে গুনাহ অতি বড় ছিল। এক ব্যক্তি প্রস্রাব থেকে সতর্কতা অবলম্বন করত না (প্রস্রাবের ছিটা-ফোটা কাপড়ে ও শরীরে পড়ত) এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি চোগলখুরী করত (বোখারী শরীফ # ১৫৯, সহীহ মুসলিম # ৫৮৪)।

www.nagorikpathagar.org

(৭) আমলহীন বক্তার শাস্তি ঃ আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মিরাজ উপলক্ষে আমি এমন একদল লোকের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করলাম যাদের ঠোঁট দোযখের আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছে। ঠোঁট কাটার সঙ্গে সঙ্গে তা পুনঃ গজিয়ে উঠে এবং পুনরায় কেটে ফেলা হয়। জিব্রাইলকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কোন শ্রেণীর লোকের দৃশ্য? তিনি বললেন, এটা আপনার উম্মতের সে সকল বক্তার দৃশ্য যারা অপরকে সৎকাজের উপদেশ দেবে কিন্তু নিজে আমল করবে না (বোখারী শরীফ পৃষ্ঠা # ৩৬০)।

(৮) এতীমের মাল আত্মসাতের শাস্তি ঃ আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) স্বয়ং হযরত নবী (সা.) থেকে মিরাজের বর্ণনা করতে যেয়ে বলেছেন, হযরত (সা.) বলেন ঃ কিছু দূর অগ্রসর হয়ে দেখতে পেলাম একদল লোক যাদের ঠোঁট উটের ঠোঁটের ন্যায় মোটা ও বড় বড়; জবরদস্তিমূলক তাদের মুখ খুলে ভেতরে পাথর প্রবেশ করানো হয়। সে পাথর তাদের মলদ্বার দিয়ে বের হয় এবং তারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ভীষণ চিৎকার করছে। আমি জিব্রাইলকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোকগুলোর অবস্থা কোন শ্রেণীর লোকের দৃশ্য? তিনি বললেন, এটা আপনার উম্মতের সে সকল লোকের দৃশ্য যারা অন্যায়ভাবে এতীমের মাল আত্মসাত করবে (বোখারী শরীফ পৃষ্ঠা # ৩৬০-৩৬১)।

(৯) মিথ্যা অপবাদের শাস্তি ঃ আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) মিরাজের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ আরও কিছু দূর অগ্রসর হলাম এবং একদল লোক দেখতে পেলাম, তাদের বাহু কেটে গোশত বের করা হচ্ছে এবং সে গোশত তাদেরকে খেতে দিচ্ছে। আমি জিব্রাইলকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কোন শ্রেণীর লোকের দৃশ্য? তিনি বললেন, এটা সে সকল লোকের দৃশ্য যারা অপর ভাইয়ের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে (বোখারী শরীফ পৃষ্ঠা # ৩৬১)।

(১০) নামায আদায় না করার শাস্তি ঃ আবু হোরায়রা (রা.) থেকে

www.nagorikpathagar.org

বর্ণিত আছে, তিনি মিরাজের ঘটনা বয়ান করতঃ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ একদল লোককে দেখলাম, যাদের মাথা মস্ত বড় বড় পাথরের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হচ্ছে এবং চূর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গে আবার ভাল হয়ে যায়, তখন পুনরায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয়। তাদের এ অবস্থার ক্ষান্ত নেই। নবী (সা.) জিব্রাইলকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কোন শ্রেণীর লোকের দৃশ্য? তিনি বললেন, এটা সে সকল লোকের শাস্তির দৃশ্য যাদের মাথা নামাযের জন্য উঠতে চাইবে না (বোখারী শরীফ পৃষ্ঠা # ৩৬১)।

(১১) যাকাত-সদকা আদায় না করার শাস্তি ঃ আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। (নবী সা. সামনে গিয়ে) অতঃপর একদল নর-নারীকে দেখলেন, যাদের সম্মুখ ও পেছনের লজ্জাস্থানে নেকড়া ঠেসে রাখা হয়েছে এবং তারা গরু-ছাগলের ন্যায় বিচরণ করে দোযখের উদ্ভিদ "জারী" ও "যাক্কুম" গাছ এবং কাঁকর ও পাথর ভক্ষণ করছে। হযরত (সা.) জিব্রাইলকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কোন শ্রেণীর লোকের দৃশ্য? তিনি বললেন, এ দৃশ্য ঐ লোকদের যারা স্বীয় ধন-সম্পত্তির যাকাত-সদকা আদায় না করবে (বোখারী শরীফ পৃষ্ঠা # ৩৬১)।

(১২) বিবাহিত নর-নারীর যেনার শাস্তি ঃ আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা দিতে থাকলেন ঃ অতঃপর একদল লোক দেখলেন, তাদের সম্মুখে এক পাত্রে রান্না করা গোশত আর অপরপাত্রে পচা দুর্গন্ধময় কাঁচা গোশত রয়েছে। তারা প্রথমটি উপেক্ষা করে দ্বিতীয় পাত্র থেকে খাচ্ছে। হযরত (সা.) জিব্রাইলকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কোন শ্রেণীর লোকের দৃশ্য? তিনি বললেন, এটা আপনার উম্মতের ঐ সকল লোকের দৃশ্য যাদের বিবাহিতা স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও ফাহেশা নারীর নিকট রাত্রি যাপন করবে। নারীরাও হালাল স্বামী থাকা সত্ত্বেও হারাম বদমায়েশ পুরুষের নিকট রাত্রি যাপন করবে (বোখারী শরীফ পৃষ্ঠা # ৩৬২)।

আবু উমামা আল-বাহিলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সকালে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবাগণকে বললেন যে, তিনি একটি সত্য স্বপ্ন

www.nagorikpathagar.org

দেখেছেন। তিনি যখন নিদ্রা যাচ্ছিলেন তখন দু'জন লোক এসে তাঁর দু'বাহু ধরে তাঁকে একটি সুউচ্চ পাহাড়ে নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি কিছু লোককে আজাব ভোগ করতে দেখেছেন। Life in al-Barjakh গ্রন্থে বর্ণিত কয়েকটির বর্ণনা নিম্নে দেয়া হল ঃ

(১৩) ওয়াদা ভঙ্গের শাস্তি ঃ কিছু সংখ্যক নর-নারী যাদের পা উপরের দিকে দিয়ে মাথা নীচের দিকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের গাল কাটা এবং তথা থেকে রক্ত ঝরছে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রশ্নের জবাবে তাঁকে বলা হল যে, ঐ সকল নর-নারী ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করত (পৃষ্ঠা # ১৬৩)।

(১৪) সত্য অস্বীকারের শাস্তি ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন ঃ আমরা অগ্রসর হলাম এবং কিছু সংখ্যক নর-নারীর নিকট আসলাম, যাদের চক্ষু এবং কর্ণযুগল উত্তপ্ত লোহা দ্বারা পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তাঁরা বললেন, তারা কোন কিছু না দেখেও দেখেছি এবং কিছু দেখেও তা দেখিনি বলত (পৃষ্ঠা # ১৬৪)। এটা তার শাস্তি।

(১৫) সন্তানকে স্তন্যদানে অস্বীকৃতির শাস্তি ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন ঃ আমরা কিছু সংখ্যক নারীর নিকট আসলাম যাদেরকে উল্টা করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। সাপ তাদের স্তনে দংশন করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কে? জবাবে তাঁরা বললেন ঃ তারা সেই সমস্ত নারী যারা (বিনা ওজরে) সন্তানকে স্তন্য-দুগ্ধ পান করাতে অস্বীকৃতি জানাত (পৃষ্ঠা # ১৬৪)।

(১৬) বিনা ওজরে রোযা ভাঙ্গার শাস্তি ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন ঃ আমরা কিছু সংখ্যক নর-নারীর নিকটে আসলাম, যাদেরকে উল্টা করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তারা মাটি থেকে কাদাযুক্ত পানি, চাটছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কে? জবাবে তাঁরা বললেন, তারা সে সমস্ত নর-নারী যারা বিনা ওজরে খেয়াল খুশীমত রোযা ভঙ্গ করত (পৃষ্ঠা # ১৬৪)।

www.nagorikpathagar.org

(১৭) দর্পভরে চলার শাস্তি ঃ আবু হোরায়রা (রা.) এবং ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) বলেছেন ঃ কোন মানুষ যখন মূল্যবান পোশাক পরিধান করে তা হেঁচড়িয়ে দর্পভরে চলে; আল্লাহ মাটিকে ফাঁক করে তাদেরকে গ্রাস করার নির্দেশ দেবেন এবং তারা মাটি-গর্ভে কেয়ামত পর্যন্ত চিৎকার করতে থাকবে (পৃষ্ঠা # ১৭২)।

এমনি আরো অনেক অপরাধের শাস্তি বরযখী জীবনে দেয়ার বর্ণনা বিভিন্ন হাদীসে পাওয়া যায়। এ সকল পাপের কাজ যারা অতীতে করেছে বা এখনও করে চলেছে, তারা অত্যন্ত বিনীতভাবে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চেয়ে ভবিষ্যতে আর না করার ওয়াদা করলে আল্লাহ্ গফুরুর রহীম ক্ষমা করে দিয়ে কবর আজাব থেকে রক্ষা করতে পারেন।

www.nagorikpathagar.org

কবর যিয়ারত

প্রত্যেকের মৃত্যু অবধারিত জেনেও আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে মানুষ দুঃখ পায়। পিতা বা মাতা বৃদ্ধ হয়ে মারা গেলে সেই হারানোর বেদনা ততটা গভীর হয় না। কিন্তু নিজের বাল্যকালে তাদের একজনকে অথবা উভয়কে হারানোর বেদনা দুঃসহ হয়ে পড়ে। নিজের সন্তানের মৃত্যু আরোও বেশী কষ্টদায়ক। সকলেই ধারণা পোষণ করে যে, তার মৃত্যুর পরেই সন্তানের মৃত্যু হবে। কিন্তু সকল সময় এমন হয় না। মৃত্যুর ক্ষেত্রে বয়সের এ ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না। হারানো স্বজনের জন্য প্রাণ কাঁদে। যে জগতে তারা চলে গেছে তার খবর কেউ পায় না। তারা সুখে আছে নাকি আজাবে ভুগছে এটাও কেউ জানে না। তাই মানুষ কবর যিয়ারত করে। যিয়ারত অর্থ দেখা করা, বাস্তবে দেখা না হলেও অন্তর দিয়ে তাদেরকে দেখতে পায়। তাদের শান্তির জন্য জীবিতরা দোয়া করে।

দূরে থেকেও মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা যায়। তবে কবরের নিকটে দাঁড়িয়ে দোয়া-দরূদ পড়া এবং আল্লাহর কালাম থেকে তেলাওয়াত করে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দোয়া করলে মনের কষ্ট কমে আসে, ফলে শোকে ধৈর্য ধরতে সক্ষম হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আপনি (নবী সা.) সুসংবাদ দান করুন সে সমস্ত ধৈর্যশীল ব্যক্তিদেরকে যারা আপন বিপদ, দুঃখ-কষ্ট ও শোক-অশান্তির অবস্থায় বলে, "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" (আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমাদের সকলকেই আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে হবে) তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অফুরন্ত অনুগ্রহ ও বিশেষ রহমত এবং তারাই প্রকৃতপক্ষে হেদায়াত প্রাপ্ত (সূরা বাকারা # ২ : ১৫৬-১৫৭)।

যিয়ারতকালে মুর্দার জন্য দোয়া করার সময় নিজের মরণ ও আখেরাতের কথা স্মরণ হয়, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, লোভ-লালসা ও আসক্তির ভাবনা কমে যায়। যিয়ারতের জন্য কবরের ডান পাশে মুর্দার

www.nagorikpathagar.org

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকে এবং সে কবরের স্থানের সকল বাসিন্দাকে সালাম দেয়া হয়। অতঃপর কিছু দোয়া কালাম ও দরূদ পাঠ করে কালামের সওয়াব ও দরূদ নবী (স.) এর রূহ মোবারকের উপর পৌঁছানোর জন্য দোয়া করে কালামের সওয়াব কবরবাসীদের রূহের উপর পৌঁছানোর জন্য দোয়া করা উত্তম। কবরবাসীদের জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ চেয়ে এবং কোন আজাবে থাকলে তা মাফ করে তাকে জান্নাত দান করার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে বিনীতভাবে আবেদন করতে হয়।

কেউ কেউ বলে থাকে কবর যিয়ারত করা জায়েয নয়। এ ধারণা ভুল, কেননা আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সা.) তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত করতে গেলেন। তিনি কাঁদলেন এবং আশপাশের সকলকে কাঁদালেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আমি আমার প্রভুর নিকট মায়ের জন্য ইস্তেগফারের অনুমতি চাইলাম, কিন্তু অনুমতি দেয়া হলো না। আমি তাঁর কবর যিয়ারত করার জন্য তাঁর কাছে অনুমতি চাইলে, আমাকে অনুমতি দেয়া হলো। অতএব তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা কবর যিয়ারত তোমাদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় (সহীহ মুসলিম # ২১৩১)।

কবর যিয়ারতে মহিলাদের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : আল্লাহর লা'নত (অভিশাপ) হোক কবর যিয়ারতকারিণী নারীদের প্রতি (আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ, মেশকাত শরীফ # ১৬৭৮)। এর কারণ এই যে, নারীরা বেশী আবেগপ্রবণ। তারা চিৎকার করে কান্না করে, জামা-কাপড় এমনকি মাথার চুল টেনে ছিঁড়ে. পর্দার প্রতি খেয়াল রাখে না– সেগুলো গুনাহের কাজ। যদি কোন মহিলার কোন আপনজনের কবর যিয়ারতের প্রতি বিশেষ আবেগ জন্মে, তবে কদাচিৎ এবং অতি অল্প সময়ের জন্য যেতে পারে। তথায় ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং পর্দা ইত্যাদি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে (বোখারী শরীফ, প্রথম খণ্ড, কবর যিয়ারত অধ্যায়)। জীবিত অবস্থায় যাদের সামনে পর্দা করা হত, তাদের

www.nagorikpathagar.org

কবর যিয়ারতে গিয়েও অনুরূপ পর্দা করতে হবে। আয়েশা (রা.) বলেন, আমি আমার সে ঘরে প্রবেশ করতাম যাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) শায়িত আছেন, অথচ তখন আমি আমার চাদর রেখে দিতাম এবং বলতাম যে, ইনি হলেন আমার স্বামী, আর অপরজন হলেন আমার পিতা। কিন্তু যখন হযরত ওমর (রা.)কেও (এ ঘরে) দাফন করা হলো– আল্লাহর কসম, তখন থেকে আমি কখনো আমার শরীর বস্ত্রে না ঢেকে সেখানে প্রবেশ করিনি ওমর থেকে লজ্জার কারণে (আহমদ, মেশকাত শরীফ # ১৬৭৯)।

এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, নবী রাসূলগণ যে স্থানে ইন্তেকাল করেন, সে স্থানেই তাঁদেরকে সমাহিত করার বিধান রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাত আয়েশা (রা.)-এর কক্ষে হওয়ার কারণে সে কক্ষে তাঁকে সমাহিত করা হয়। এর উত্তর পাশে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কোমর বরাবর মাথা রেখে আবু বকর (রা.) কে দাফন করা হয়। এর উত্তর পাশে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পা বরাবর মাথা রেখে ওমর (রা.) কে দাফন করা হয়েছে। সেখানে কিবলা দক্ষিণ দিকে। তাই সকলের মাথা পশ্চিম দিকে অবস্থিত (বোখারী শরীফের ৭২৬ নম্বর হাদীসের ব্যাখ্যা)। শুনা যায়, সেখানে আরোও একটি কবরের জায়গা খালি আছে। হযরত ঈসা (আ.) দুনিয়ায় অবতরণের পরে মৃত্যুবরণ করলে সে খালি জায়গায় সমাহিত হবেন।

আবদুল্লাহ ইবনে কাসির ইবনে মুত্তালিব থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা.) বলেছেন, যখন ঐ রাত আসত যে রাতে নবী (সা.) আমার কাছে থাকতেন, তিনি এসে তাঁর চাদর রেখে দিতেন, জুতা খুলে পায়ের কাছে রাখতেন। পরে নিজ তহবন্দের (লুঙ্গির) একদিক বিছানায় ছড়িয়ে কাত হয়ে শুয়ে পড়তেন। অতঃপর মাত্র কিছু সময় যতক্ষণে তিনি ধারণা করতেন যে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, বিশ্রাম গ্রহণ করতেন। পরে আস্তে আস্তে দরজা খুলে বের হয়ে পড়তেন। অতঃপর কিছু সময় নিজেকে আত্মগোপন করে রাখতেন। একদিন আমি তাঁর পেছনে রওনা হলাম। যেতে যেতে তিনি যেয়ে জান্নাতুল বাকীতে (কবরস্থানে) পৌছলেন। সেখানে তিনি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর তিনি তিনবার হাত উঠিয়ে দোয়া

www.nagorikpathagar.org

করলেন। এরপর আবার গৃহের দিকে ফিরে রওনা করলে আমিও রওনা হলাম। আমি তাঁর আগেই ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়লাম। (তাঁর প্রশ্নের জবাবে) আমি ব্যাপারটা তাঁকে জানিয়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, যখন তুমি আমাকে দেখেছ সে সময় আমার কাছে জিব্রাইল (আ.) এসেছিলেন এবং আমাকে ডেকেছিলেন। অবশ্য তা তোমার কাছে গোপন রাখা হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ। তাই তোমাকে জাগানো সমীচীন মনে করিনি। জিব্রাইল (আ.) বললেন, আপনার প্রভু আপনার প্রতি আদেশ করেছেন, জান্নাতুল বাকী'র কবরবাসীদের নিকট যেয়ে তাদের জন্য দোয়া ইস্তেগফার করতে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাদের জন্য কিভাবে দোয়া করব? তিনি বললেন : তুমি বল, "এ বাসস্থানের অধিবাসী ঈমানদার মুসলমানদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। আমাদের মধ্য থেকে যারা আগে বিদায় গ্রহণ করেছে আর যারা পেছনে বিদায় নিয়েছে সকলের প্রতি আল্লাহ দয়া করুন। আল্লাহ চাহে তো আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব" (সহীহ মুসলিম # ২১২৮)।

কোন আপনজনের মৃত্যুকালে বা তার কবর যিয়ারতকালে অশ্রু ধরে রাখা যায় না। এ দু'ক্ষেত্রে অনেকে আবেগতাড়িত হয়ে চিৎকার দিয়ে কান্না শুরু করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, স্মরণ রেখ নয়নের অশ্রু ও প্রাণের বেদনার দরুন আল্লাহ তা'আলা শাস্তি দেবেন না, কিন্তু মুখের দরুন শাস্তি দেবেন। তিনি আরোও বলেছেন, স্মরণ রেখ ক্রন্দনকারী শুধু নিজেই শাস্তি পাবে না, কোন কোন ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তিও ক্রন্দনে শাস্তি ভোগ করবে (বোখারী শরীফ # ৬৮৫)। উম্মে আ'তিয়া (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমরা নবী (সা.) এর বায়আত নেয়াকালে তিনি বিশেষরূপে এ অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, আমরা কারো মৃত্যুতে বিলাপের ক্রন্দন করবো না (বোখারী শরীফ # ৬৮৬)।

আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সঙ্গে আবু সাইফ কাইনের বাড়ীতে উপস্থিত হলাম। ঐ ব্যক্তির গৃহেই রাসূলুল্লাহর (সা.)-এর শিশু পুত্র ইব্রাহীম (রা.) প্রতিপালিত হচ্ছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বীয় পুত্র ইব্রাহীমকে কোলে নিয়ে চুম্বন করলেন এবং বিশেষরূপে আদর করলেন। দ্বিতীয়বার পুনরায় একদিন ঐরূপে উপস্থিত হলেন। ঐদিন ইব্রাহীম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। তাঁকে দেখে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রু বইতে লাগল। আবদুর রহমান ইবনে আওফ সাহাবী বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও... (কাঁদেন)? রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তরে বললেন, হে ইবনে আওফ! এটা দয়ার নিদর্শন। রাসূলুল্লাহ (সা.) পুনরায় অশ্রু বর্ষণপূর্বক বললেন, নয়নে অশ্রু, প্রাণে বেদনা, কিন্তু মুখে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কোন শব্দ উচ্চারিত হবে না। হে ইব্রাহীম তোমার বিচ্ছেদে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত (বোখারী শরীফ # ৬৮৪)।

কবর যিয়ারত করতে যেয়ে অনেকে সেখানে কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়ে। এর উদ্দেশ্য কবরবাসীকে সন্তুষ্ট করা। কিন্তু কবরের উপরে বা কবরকে উদ্দেশ্য করে সেজদা করা শিরক করার শামিল। আবু মারসাদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা কখনো কবরের উপর বসবে না এবং কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়বে না (সহীহ মুসলিম # ২১২২)।

বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ কবরের স্থান পুকুরের পাড়ে, বাগানের মধ্যে, মসজিদের আশে-পাশে অথবা পথের নিকটে অবস্থিত। এদের মধ্যে মসজিদ সংলগ্ন এবং পথের পাশের কবরের স্থান উত্তম। কেননা মসজিদে যাতায়াতের সময় মুসল্লীরা কবরবাসীদের জন্য দোয়া করে এবং পথ দিয়ে চলার সময় কবর দেখলে পথচারীরা দোয়া করে। বড় কবরের স্থানে কবর দেয়া উত্তম। কারণ সর্বসময়ে কোন না কোন কবরবাসীর আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব যিয়ারত করতে যায়। যিয়ারতকারী দোয়া করার সময় একজনের জন্য দোয়া না করে সে কবরের স্থানের সকলের জন্যই দোয়া করে। বিশেষ করে বছরের দু'ঈদের দিনে প্রায় সকলেই নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের কবর যিয়ারত করে দোয়া করে।

www.nagorikpathagar.org

পিতা-মাতা সুসন্তান রেখে গেলে সন্তানেরা অধিকাংশ সময় তাদের কবর যিয়ারত করে দোয়া করে।

প্রতি বছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ মুসলমান হজ্জ করতে মক্কায় যায়। ভিন্ন মতাবলম্বী দু'একটি দল ছাড়া সকলেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রওজা শরীফ যিয়ারতের জন্য হজ্জের আগে অথবা পরে মদীনায় যান। এটা হজ্জের আনুষ্ঠানিকতার অংশ না হলেও এ সময় নবী প্রেমিক মুসলমানদের আনাগোনায় মদীনায় এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। রওজা শরীফ ঘিরে অবস্থিত মসজিদ-ই-নববীতে নামায পড়তে ও নবী (সা.)-এর কবর যিয়ারত করতে সারা বছর বহু মানুষ সেখানে যায়। সে মসজিদে নামায পড়লে কা'বা ছাড়া অন্যান্য মসজিদ থেকে পঞ্চাশ হাজার গুন সওয়াব বেশী পাওয়া যায়। এ মসজিদের খোতবার স্থান ও রওজার মধ্যবর্তী স্থানটি বেহেশতের বাগান নামে পরিচিত। সে অংশে নামায আদায় করে রওজা যিয়ারতের আনন্দ অপরিসীম।

www.nagorikpathagar.org

তওবা ও ক্ষমা

তওবা কি এবং কেন?

তওবা শব্দের অর্থ ফিরে আসা। কোন গুনাহ্ থেকে ফিরে আসাকেই তওবা বলে। তওবার শর্ত তিনটি। তওবা কবুলের জন্য শর্তগুলো অবশ্যই মানতে হবে।

(১) বর্তমানে যে গুনাহে লিপ্ত তা অবিলম্বে পরিত্যাগ করতে হবে।

(২) অতীতের গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে এবং

(৩) ভবিষ্যতে সে গুনাহ্ আবার না করার দৃঢ় সংকল্প করতে হবে।

বুজুর্গানে দ্বীনের মতে তওবার উপর টিকে থাকার জন্য সব সময় নেককারদের সাথে মেলা-মেশা করতে হবে এবং নেক কাজ করার জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে হবে।

দুনিয়াতে যেমন কারো নিকট কোন অপরাধ করলে তার জন্য ক্ষমা না চাইলে শাস্তি পেতে হয়, তেমনি আল্লাহর কোন বিধান লঙ্ঘন করলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা না চাইলে পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হবে। শাস্তি থেকে বাঁচার জন্যই তওবা করতে হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) নিষ্পাপ হয়েও প্রতিদিন বহুবার তওবা করতেন। আবু হোরায়রা (রা.) বলেছেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ (সা.) শপথ করে বলতেন, আমি প্রতিদিন সত্তর বার থেকে অধিক আল্লাহর দরবারে ইস্তেগফার এবং তওবা করি (বোখারী শরীফ # ২৩৮৭)।

গুনাহ্ কখন থেকে শুরু হয়েছে?

গুনাহের শুরু ইবলিস থেকে। সে ছিল ফেরেশতাকুলের সর্দার। আল্লাহর এবাদত বন্দেগি করে সে ঐ মর্যাদা লাভ করেছিল। আল্লাহর একটি মাত্র আদেশ অমান্য করে সে শয়তান হয়ে গেল। সেটি হচ্ছে, আল্লাহ ফেরেশতাগণকে আদেশ দিয়েছিলেন, আদম (আ.) কে সেজদা

www.nagorikpathagar.org

করতে, কিন্তু সে আগুনের তৈরি বলে মাটির তৈরি আদমকে সেজদা করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে গুনাহের কাজ করল। গুনাহের শুরু সে থেকেই। অতঃপর সে লেগে গেল আদম জাতিকে গুনাহের পথে ঠেলে দেয়ার কাজে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : আর আমি আদমকে হুকুম করলাম, তুমি ও তোমার স্ত্রী বেহেশতে বসবাস করতে থাক এবং তোমরা উভয়ে তা থেকে স্বাচ্ছন্দ্যে যে স্থান থেকে ইচ্ছা ভক্ষণ কর। কিন্তু এই গাছের (গন্ধম) নিকটবর্তী হয়ো না। অন্যথা তোমরা যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে (সূরা বাকারা # ২ : ৩৫)।

কিন্তু বিতাড়িত ও লাঞ্ছিত শয়তান তাদেরকে ফুসলিয়ে নিষিদ্ধ গাছের ফল খাইয়ে ছিল। ফলে আল্লাহর নিষেধ অমান্য করার কারণে গুনাহগার হয়ে গেলেন এবং বেহেশত থেকে দুনিয়ায় নেমে আসতে বাধ্য হলেন।

অতঃপর দুনিয়ার বুকে গুনাহ্ শুরু হল আদম (আ.) এর পুত্র কাবিলের মাধ্যমে। বিবাহের জন্য এক বোনের দাবিদার দু'ভাই হাবিল ও কাবিল। শয়তান কাবিলকে প্ররোচিত করিয়ে হাবিলকে খুন করে দুনিয়ায় খুনের গুনাহের জন্ম দিল। আর সমস্ত খুনের গুনাহের একাংশ কাবিলের উপর পতিত হয়।

গুনাহ্ প্রধানত: কত প্রকার ও কি কি?

গুনাহ্ প্রধানত: দুই প্রকার– কবীরা বা বড় গুনাহ্ এবং সগীরা বা ছোট গুনাহ। আল্লাহর সাথে কাকেও বা কোন দেব-দেবী ইত্যাদিকে তুলনা করা অথবা শরীক করা সবচেয়ে বড় গুনাহ। এটা ছাড়া ব্যভিচার বা যেনা, নরহত্যা, আত্মহত্যা, মোনাফেকী, ইসলাম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ ইত্যাদি কবীরা গুনাহ। চুরি-ডাকাতি, ঝগড়া-ফাসাদ, গালাগালি ইত্যাদি সগীরা গুনাহ। কারো অগোচরে বদনাম তথা গীবত করাকে যেনার সাথে তুলনা করা হয়েছে। তাই এটাও কবীরা গুনাহ।

তওবা করলে সকল গুনাহের ক্ষমা পেয়ে যাবে কি?

আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা তথা শেরেকের গুনাহ্ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। ব্যভিচার বা যেনার গুনাহের জন্য আন্তরিকভাবে তওবা

www.nagorikpathagar.org

করলে আল্লাহ্ দয়া করে ক্ষমা করতে পারেন। তবে কোন মুমিন যেনায় লিপ্ত হলে ঈমান তার নিকট থেকে দূরে সরে যায়। এই অবস্থায় তার মৃত্যু হলে সে বেঈমান হিসেবে দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে। কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা, আত্মহত্যা, ইসলাম ত্যাগ ও মোনাফেকীর গুনাহ আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন না। কাফের ও মোনাফেক সম্পর্কে আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলেন, আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন আর না করেন, যদি আপনি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তথাপি তাদেরকে আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন না। তা এ জন্য যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে। বস্তুত: আল্লাহ্ নাফরমানদেরকে পথ দেখান না (সূরা তওবা # ৯ : ৮০)।

আল্লাহর কোন বিধান অমান্য করার কারণে গুনাহ্গার হলে, অনুতপ্ত হয়ে তাঁর নিকট ক্ষমা চাইলে সগীরা গুনাহ্ তিনি ক্ষমা করে দেবেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, যে সমস্ত কাজ থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, যদি তোমরা সেসব বড় গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকতে পার, তবে আমি তোমাদের ছোট ছোট গুনাহ্গুলো ক্ষমা করে দেব এবং তোমাদেরকে একটি সম্মানিত স্থানে দাখিল করব (সূরা নিসা # ৪ : ৩১)।

কোন বান্দার হক নষ্ট করা জনিত গুনাহ্ সে বান্দার সাথে ফয়সালা করতে হবে। সে বান্দাকে খুঁজে পাওয়া না গেলে বা তার মৃত্যু হয়ে গেলে তার ওয়ারিশের সাথে ফয়সালা করতে হবে। তাও না পারলে এবং এটা কোন দেনা হলে তা সে ব্যক্তির সওয়াবের উদ্দেশ্যে দান করতে হবে।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! যে পর্যন্ত আমাকে স্মরণ কর এবং যা করেছ তার জন্য ক্ষমা চাও, আমি ক্ষমা করে দেব। হে আদম সন্তান! যদি তোমার পাপ আকাশের মেঘ পর্যন্ত পৌঁছত, অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে, আমি তোমাকে ক্ষমা করতাম। হে আদম সন্তান! যদি তুমি আমার সাথে কাউকে শরীক না করে পৃথিবী পূর্ণ পাপসহ আমার সম্মুখীন হতে, তবে আমি নিশ্চয় সে পরিমাণ ক্ষমাসহ তোমার নিকট আসতাম (হাদীসে কুদসী, তিরমিযী ও আহমদ)।

www.nagorikpathagar.org

বান্দা গুনাহ্ করবে এবং সে জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ্ তাই চান। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন, এক বান্দা পাপ করল এবং বলল, হে আল্লাহ্, আমার পাপ ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ তা'আলা বললেন : আমার বান্দা একটি গুনাহ্ করেছে এবং জানে যে, তার আল্লাহ্ গুনাহ ক্ষমা করেন এবং গুনাহের জন্য শাস্তি দেন। তখন সে আবার গুনাহ্ করল এবং বলল, হে প্রভু, আমার গুনাহ্ ক্ষমা করে দাও। তিনি বললেন : আমার বান্দা একটি গুনাহ্ করেছে এবং সে জানে যে তার একজন প্রভু আছেন যিনি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং এটার জন্য শাস্তি দেন। অতঃপর সে আবার গুনাহ করল এবং বলল, হে প্রভু, আমার গুনাহ মাফ কর। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বললেন : আমার বান্দা একটি গুনাহ্ করেছে এবং জানে যে, তার একজন প্রভু আছেন যিনি গুনাহ্ ক্ষমা করেন এবং গুনাহের জন্য শাস্তি দেন। তোমরা কি চাও না, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে থাকি (হাদীসে কুদসী, মুসলিম, বোখারী)। আল্লাহর ক্ষমা থেকে নিরাশ না হয়ে ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করেন।

কোন লোক কোন পাপ করে তওবা করল। দেখা গেল সে আবার একই পাপ করল এবং আবার তওবা করল। এভাবে পাপ করে চলেছে এবং তওবা করছে। এরূপ লোকদের তওবা আল্লাহ্ কবুল করতে নাও পারেন।

গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় কোন ব্যক্তি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে এবং তার বাঁচার আশা না থাকলে তার লোকজন মৌলভী সাহেব খোঁজে এনে তাকে তওবা করায়। এটা প্রকৃত তওবা নয়। তওবা সুস্থ-সবল অবস্থায় সর্বসময়েই করতে হয়– মৃত্যু আসন্ন জেনে নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর তওবা এরূপ লোকদের জন্য নয়, যারা পাপ করতে থাকে। এমনকি যখন তন্মধ্যে কারো সামনে মৃত্যুই এসে উপস্থিত হলো, তখন বলতে লাগল, আমি এখন তওবা করছি এবং ঐ ব্যক্তিদেরও না যাদের কুফরি অবস্থায় মৃত্যু এসে পড়ে। তাদের জন্য আমি

www.nagorikpathagar.org

যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি (সূরা নিসা # ৪ : ১৮)। অতএব সময় থাকতে তওবা করা বাঞ্ছনীয়।

তওবার দরজা কি কেয়ামত পর্যন্ত খোলা থাকবে?

কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার কিছু দিন পূর্বে তওবার দওজা বন্ধ হয়ে যাবে। সে সময়কার মানুষেরা কেয়ামতের উপর বিশ্বাস রাখবে না। সে সময়টি হচ্ছে, পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয় হওয়া এবং ভূগর্ভ হতে জন্তু বের হয়ে মানুষের সাথে কথা বলার সময়কাল। এ সময় এসে পড়লে এর পর থেকে তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ সে সকল লোকেরা তৎপূর্বে আল্লাহর বাণী বিশ্বাস করত না, প্রত্যক্ষ নিদর্শন দেখে বিশ্বাস করছে। যারা পূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা পরবর্তীতে তওবা করলেও তা কবুল হবে। তওবার দরজা তাদের জন্য বন্ধ হবে না।

তওবার জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় বা দোয়া আছে কি?

তওবার জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। ভুলবশতঃ কোন গুনাহ করে ফেললে তৎক্ষণাৎ তওবা করা দরকার। দিন বা রাতের যে কোন সময় তওবা করা যায়। মনকে আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট করার জন্য সর্বোত্তম সময় রাতের শেষ প্রহর। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা রাতের শেষ তৃতীয়াংশে পৃথিবীর সর্বাধিক নিকটস্থ আসমানে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন কে আমাকে ডাকবে? আমি সাড়া দেব। কে আমার নিকট প্রার্থী হবে? আমি তাকে দান করব। কে আমার নিকট ক্ষমা চাবে? আমি তাকে ক্ষমা করব (হাদীসে কুদসী–বোখারী শরীফ # ৬০৬)।

কোন লোককে পাপে লিপ্ত থাকতে দেখে অনেকে মন্তব্য করে বসে, তার জন্য ক্ষমা নেই। এরূপ মন্তব্য করা ঠিক নয়। আল্লাহ কার জন্য কি রেখেছেন, কেবল মাত্র তিনিই তা জানেন। হযরত জুন্দুব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর শপথ, আল্লাহ অমুক অমুককে ক্ষমা করবেন না। এতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ

www.nagorikpathagar.org

তা'আলা বললেন : আমি অমুক অমুককে ক্ষমা করব না, আমার নামে শপথ করে এই কথা বলার সে কে? অবশ্যই আমি অমুক অমুককে ক্ষমা করলাম এবং তোমার ভাল কাজগুলো বাতিল করে দিলাম (হাদীসে কুদসী– সহীহ মুসলিম # ৬৪৯৩)।

আল্লাহ তা'আলার রহমত এত প্রবল যে কোন কোন ক্ষেত্রে বান্দার আমল রহমতের দাবী না রাখলেও আল্লাহর রহমত তার নিকট পৌঁছতে থাকে। শেষ পর্যন্ত দোষী থেকে না গেলে আল্লাহ কাকেও শাস্তি দেবেন না। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টি করার পর মহান আরশের উপর লিখে দিয়েছেন : আমার রহমত আমার গযবের তুলনায় অধিক প্রবল আছে এবং থাকবে (হাদীসে কুদসী– বোখারী শরীফ # ১৪৮২)।

তওবার জন্য বিশেষ কোন দোয়া নেই। আদম ও হাওয়া (আ.) নিষিদ্ধ গাছের ফল (গন্ধম) খাওয়ার অপরাধের জন্য এ বলে ক্ষমা চেয়েছিলেন : রাববানা যলামনা আনফুসানা ওয়া ইললাম তাগফিরলানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরীন (সূরা আল-আরাফ # ৭ : ২৩)। অর্থ : হে আমাদের প্রভু! আমরা আমাদের নফসের উপর জুলুম করেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা ও দয়া না কর তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। নবী হযরত ইউনুস (আ.) নিজের অভিমানের অপারাধ স্বীকার করে মাছের পেটে থেকে দোয়া করেছিলেন : লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা, ইন্নি কুনতু মিনাযযলিমীন (সূরা আম্বিয়া # ২১ : ৮৭)। অর্থ : তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই তুমি পবিত্র, আমি অবশ্যই জালেমদের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি বলে : আসতাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কইয়ুম ওয়া আতুবু ইলাইহি (রিয়াদুস সালেহীন # ১৮৭৪, আবু দাউদ ও তিরমিযী)। অর্থ : আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি আল্লাহর কাছে যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী, আমি তার কাছে তওবা করছি। তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন,

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ (সা.) মৃত্যুর পূর্বে অধিক সংখ্যায় এ দোয়া পড়তেন : সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, আসতাগফিরুল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি। (রিয়াদুস সালেহীন # ১৮৭৭- বোখারী)। অর্থঃ আল্লাহ্ পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য। আমি আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তওবা করি।

আল্লাহকে দয়াময় ও ক্ষমাশীল জেনে নিজের অপরাধ স্বীকার করে বিনীতভাবে মনের ভাব প্রকাশ করে তওবা করাই উত্তম। যারা অন্য কিছু বলতে সক্ষম নয় তারা নিজের অপরাধ স্মরণে রেখে শুধু "আসতাগফিরুল্লাহ" পড়তে থাকলেও তওবা হয়। আল্লাহ্ বলেন : আল্লাহ এমন নন যে, তারা ক্ষমা চাবে আর তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন (সূরা আনফাল # ৮ : ৩৩)। তিনি আরো বলেন : যদি কেউ কোন পাপ কাজ করে ফেলে কিংবা নিজের উপর জুলুম করে বসে এবং পরে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে সে আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহশীল পাবে (সূরা নিসা # ৪ : ১১০)।

আল্লাহ্ তওবাকারীকে ভালবাসেন

যে ব্যক্তি অপরাধ করে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ তাকে ভালবাসেন। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : সে সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা যদি গুনাহ্ না করতে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে সরিয়ে নিতেন। অতঃপর এক জাতিকে পাঠাতেন, যারা গুনাহ্ করে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা চাইতো আর তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন (সহীহ্ মুসলিম # ৬৭৬৮)। তিনি আরোও বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দার তাওবায় এত অধিক সন্তুষ্ট হন যে, কোন ব্যক্তি মরু প্রান্তরে স্বীয় বাহন হারিয়ে তা হঠাৎ পেয়েও ঐরূপ সন্তুষ্ট হতে পারে না (বোখারী শরীফ # ২৩৮৯)।

www.nagorikpathagar.org

দোয়া বিফলে যায় না

প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী লোকেরাই নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী ইহ-পরকালের সুখ-শান্তি ও বিভিন্ন প্রাপ্তির জন্য স্রষ্টার নিকট প্রার্থনা করে। এটাই দোয়া। মুসলমানদের জন্য দোয়া এবাদতের শামিল। যারা এক আল্লাহতে বিশ্বাসী তারা অন্তরে এ বিশ্বাস রেখে দোয়া করে যে, আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করবেন। আল্লাহর প্রতি এ বিশ্বাস রাখার কারণেই দোয়াও এবাদত। হযরত নোমান ইবনে বশির (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন, দোয়া হচ্ছে এবাদত। তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমার নিকট দোয়া কর, আমি তা কবুল করব (আবু দাউদ # ১৪৭৯)।

বাস্তবে দেখা যায়, বান্দার কোন কোন দোয়ার ফল সাথে সাথেই পাওয়া যায়। আবার কোন কোন দোয়ার ফল বান্দা দেখতে পায় না। সে তখন হতাশ হয়ে আর দোয়া করে না। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : কারো দোয়া কবুল হওয়ার জন্য আবশ্যক এ যে, সে যেন তাড়াহুড়া না করে এরূপ ভেবে বা বলে দোয়া ক্ষান্ত না করে যে, কতবার দোয়া করলাম, কিন্তু ফল পেলাম না (বোখারী শরীফ # ২৪০১)। এর কারণ এ যে, আল্লাহ বান্দার প্রতিটি আবেদনই শুনে থাকেন। তিনি বলেন, তোমাদের প্রভু বলেছেন : আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব (সূরা মুমিন # ৪০ : ৬০)।

কিন্তু হালাল উপার্জন থেকে খাওয়া ও পরা দোয়া কবুলের একটি প্রধান শর্ত। হারাম উপার্জন দ্বারা যার রক্ত-মাংস গঠিত, আল্লাহর সাথে যারা অন্যকে শরীক করে, হারাম লাভের জন্য যারা দোয়া করে এবং রক্তের সম্পর্ক রয়েছে এরূপ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য যারা দোয়া করে তাদের দোয়া কবুল হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে পবিত্র রিযিক দিয়েছি তা খাও (সূরা বাকারা # ২ : ১৭২)।

www.nagorikpathagar.org

আবু হোরায়রা (রা.) এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : এক ব্যক্তি তার হাত দু'টি আকাশের দিকে প্রসারিত করে হে প্রভু! হে প্রভু! বলতে থাকে। অথচ সে যা খায় তা হারাম, যা পান করে তাও হারাম, যা পরিধান করে তাও হারাম। এক কথায় তার জীবন ধারণের সব কিছুই হারাম। সুতরাং কিভাবে তার দোয়া কবুল হতে পারে (সহীহ মুসলিম # ২২১৬)।

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : যে কোন লোক (মহান আল্লাহর কাছে) কোন কিছু চাইলে তিনি তাকে তা দান করেন অথবা সে ধরনের কোন অনিষ্ট তার নিকট থেকে দূর করেন, যে পর্যন্ত না সে কোন গুনাহ অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দোয়া করে (তিরমিযী শরীফ # ৩৩১৭)। অন্য এক হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী প্রার্থিত কিছু না দিলে বা কোন অনিষ্ট না সরালে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে তার দোয়ার জন্য সওয়াব দান করবেন। অতএব দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতে হবে যে, কোন দোয়া বিফলে যায় না।

একজন বিশিষ্ট আলেম আমাকে বলেছিলেন, দোয়া দু'প্রকারের– একটি ঠনঠনে এবং অন্যটি ভেজা। ঠনঠনে দোয়া এভাবে করা হয়, আল্লাহ আমাকে অমুকটি দাও অথবা আমার অমুক মুসিবত সরিয়ে দাও। আর ভেজা দোয়া হল, অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহর ভয়ে ও আশায় চোখের পানি বিসর্জন দিয়ে দোয়া করা। এ প্রকারের দোয়া আল্লাহ পছন্দ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন : তোমার রবকে ডাক বিনত হয়ে এবং চুপে চুপে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না (সূরা আরাফ # ৭ : ৫৫)।

দোয়া করার জন্য কিবলামুখী হওয়া শর্ত নয়। বিপদাপদে অজু ছাড়াও দোয়া করা যায়।

আল্লাহ তা'আলার দয়ার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রেখে দৃঢ়তার সাথে দোয়া করতে হয়। দোয়া কবুল হবে কি হবে না এমন চিন্তা করা ঠিক নয়। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

www.nagorikpathagar.org

তোমাদের কেউ দোয়া করলে আল্লাহর নিকট দৃঢ়ভাবে চাইবে। এরূপ বলবে না, হে আল্লাহ! তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে দাও (বোখারী শরীফ # ২৩৯৯)। আল্লাহকে নিকটে মনে করে আল্লাহর প্রশংসা করে, নবী (সা.) এর দরূদ পাঠ করে নিজের মনের ইচ্ছা আল্লাহর নিকট পেশ করলে তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। নামাযের মাধ্যমে দোয়া করা সর্বোত্তম। বান্দা সেজদায় আল্লাহর সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হয়। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন : হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর (সূরা বাকারা # ২ : ১৫৩)।

আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : বান্দার সেজদারত অবস্থাই তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ লাভের সর্বোত্তম অবস্থা। অতএব তোমরা অধিক পরিমাণে দোয়া পড় (সহীহ মুসলিম # ৯৭৬)।

আল্লাহ সর্বসময়ে বান্দার ফরিয়াদ শ্রবণ করলেও কোন কোন বিশেষ সময়ে তা বেশী ফলপ্রসূ। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ তা'আলা সর্বনিম্ন আকাশে অবতরণ করে ঘোষণা দিতে থাকেন, কে আছে যে আমাকে ডাকে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আছে যে আমার নিকট চায়? আমি তাকে দান করব। কে আছে যে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে? আমি তাকে ক্ষমা করব (বোখারী শরীফ # ২৩৯৫)।

সাতটি দিনের মধ্যে জুমার দিনের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। কথায় বলে জুমার দিন গরীবের হজ্জের দিন। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সা.) বলেন : সূর্য উদিত হওয়ার দিনগুলোর মধ্যে জুমার দিন সর্বোত্তম। এ দিন আদম (আ.) কে সৃষ্টি করা হয়েছে এ দিন তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং এ দিন তা থেকে তাঁকে বের করে দেয়া হয়েছে, জুমার দিনেই কেয়ামত সংঘটিত হবে (সহীহ মুসলিম # ১৮৫৪)। এ দিনটির মধ্যে এমন একটি সংক্ষিপ্ত সময় আছে যে সময়ে আল্লাহর নিকট কোন কিছু চাইলে তা পাওয়া যায়। আবু হোরায়রা (রা.)

www.nagorikpathagar.org

থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সা.) বলেন : জুমার দিনের মধ্যে অবশ্যই এমন একটি মুহূর্ত আছে যখন কোন মুসলমান আল্লাহর নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করলে নিশ্চয়ই তিনি তাকে তা দান করেন। তিনি বলেন, সে মুহূর্তটি অতি স্বল্প (সহীহ্ মুসলিম # ১৮৫০ এবং বোখারী শরীফ # ৫২৩)।

এই স্বল্প সময়টি কখন তা নিয়ে মত পার্থক্য আছে। কেউ বলেন এটা খোতবার আজান থেকে নামায শেষের মধ্যে, কেউ বলেন, এটা ইমামের প্রথম এবং দ্বিতীয় খোতবার মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ যখন ইমাম দু'খোতবার মধ্যবর্তী সময়ে বসেন, আবার কেউ বলেন আসর থেকে মাগরিবের মধ্যে।

আবু বুরদা ইবনে আবু মূসা আশআরী (রা.) বলেন, তিনি তাঁর পিতাকে জুমার দিনের বিশেষ মুহূর্তটি সম্পর্কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : ইমামের বসা থেকে নামায শেষ করার মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে সেই মুহূর্তটি নিহিত (সহীহ্ মুসলিম # ১৮৫৫)।

বারো মাসের মধ্যে রমাযান মাস শ্রেষ্ঠ। এ মাসের ফযিলত অন্যান্য মাসের অপেক্ষা অনেক বেশী। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : মানব সন্তানের প্রতিটি নেক কাজের সওয়াব দশ গুন থেকে সাতশত গুন পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়। মহান আল্লাহ বলেন : কিন্তু রোযা আমারই জন্য এবং আমি নিজেই এর প্রতিফল দান করব (সহীহ্ মুসলিম # ২৫৭৩)।

তাই এ মাসের ফযিলত কত বেশী তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। অতএব রোযাদার এ মাসে দোয়া করলে তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। বিশেষ করে রোযাদারের ইফতারের পূর্ব মুহূর্তের দোয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রোযার মাসের শেষ দশ রাত্রির মধ্যে কদরের রাত্রি রয়েছে। এ রাতে পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে।

আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : স্বপ্নযোগে আমাকে লাইলাতুল কদর দেখানো হয়েছিল। অতঃপর আমাকে আমার পরিবারের কেউ সজাগ করল। ফলে আমাকে তা ভুলিয়ে দেয়া

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে। সুতরাং তোমরা রমাযানের শেষ দশকে খোঁজ কর (সহীহ্ মুসলিম # ২৬৩৪)।

অন্য এক হাদীসে আছে : রমাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে অনুসন্ধান কর (সহীহ্ মুসলিম # ২৬৩২)।

এই রাতের এবাদত এক হাজার মাসের অর্থাৎ প্রায় চুরাশি বছরের এবাদতের সমান। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, শবে কদর এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (সূরা কদর # ৯৭ : ৩)।

এ রাতে গুনাহ্ মাফ চাইলে আল্লাহ্ তা'আলা তা মাফ করবেন, তা আশা করা যায়।

রমাযানের শেষে শাওয়াল মাসের পহেলা তারিখে ঈদুল ফিতর এবং যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখে ঈদুল আযহা অনুষ্ঠিত হয়। এই দু'টি দিনের দোয়া আল্লাহ কবুল করে থাকেন। এ দু'দিনে ঈদের নামায শেষে মুসলমানেরা নিজের ও পরিবার পরিজনের জন্য দোয়া করেন। তাঁরা মৃত আত্মীয়-স্বজনের কবর যিয়ারত করে তাদের জন্য দোয়া করেন। যিলহজ্জ মাসের নয় তারিখে আরাফার ময়দানে হাজীরা সমবেত হয়ে আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করে গুনাহ্ মাফ চান। এটাই হজ্জের দিন। এ দিনে আল্লাহ্ তা'আলা লক্ষ লক্ষ হাজীর গুনাহ্ মাফ করে দেন। এ দিনের দোয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দোয়ার জন্য আরেকটি পবিত্র দিন মুহররম মাসের দশ তারিখ। অনেকের ধারণা সেদিনে হযরত হুসাইন (রা.) কে এজিদের বাহিনী শহীদ করেছিল। এ জন্য এ দিনটি শোকের এবং দোয়া করার দিন। শিয়া সম্প্রদায় নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করে। আসলে প্রকৃত ঘটনা তা নয়। এ দিনে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর অনুসারীদেরকে ফেরাউনের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছেন। নদীতে পানি দু'ভাগ করে রাস্তা সৃষ্টি করে তাদেরকে অপর পাড়ে নিয়ে আসেন। ফেরাউন ও তার লোকজন তাদেরকে অনুসরণ করতে গেলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ডুবিয়ে মারেন। এ জন্য এ দিনটি স্মরণীয় এবং দোয়ার

www.nagorikpathagar.org

জন্য উত্তম দিন। মূসা (আ.) আল্লাহর শুকর আদায়ের জন্য এ দিন রোযা রেখেছেন। মুয়াবিয়া (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে বলতে শুনেছেন : এ দিনের রোযা তোমাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা ফরয করেননি বটে, কিন্তু আমি এ দিন রোযা রাখব। যার ইচ্ছা হয় সে এ রোযা রাখতে পারে এবং কারোও ইচ্ছা হলে এ রোযা ছাড়তেও পারে (বোখারী শরীফ # ১০৪২)। উল্লেখ্য যে, মুহররমের দশ তারিখ আশুরা নামে পরিচিত। মুসলমানের অনেকেই এ রোযা রেখে থাকে।

ফজর ও আসরের নামাযের গুরুত্ব অন্যান্য সময়ের নামায অপেক্ষা অনেক বেশী। কারণ এ দু'সময়ে ফেরেশতা বদল হয়ে থাকে। তাঁরা বান্দার কার্যাবলী সম্পর্কে মহান আল্লাহকে অবহিত করেন। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : দুনিয়ার কার্য পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের দু'টি দল রাত্রিকালের জন্য ও দিনের জন্য একের পর এক এসে থাকেন। উভয় দলই ফজর ও আসরের সময় দুনিয়ার বুকে একত্রিত হন। নতুন দল দুনিয়ার উপর থাকেন, পুরাতন দল আল্লাহ্ তা'আলার নিকট চলে যান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও ঐ ফেরেশতা দলকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছ? তাঁরা উত্তরে বলেন, আমরা যেয়ে তাদেরকে নামাযরত পেয়েছি, ফিরে আসার সময় নামাযরতই দেখে এসেছি (বোখারী শরীফ # ৩৪১)। অর্থাৎ এ দু'সময় যে যে কাজে নিয়োজিত থাকে ফেরেশতাগণ তাই আল্লাহকে অবহিত করেন। অতএব আল্লাহর নিকট দোয়া করার জন্য এ দু'সময় অতি উত্তম।

প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে দোয়া করা উত্তম। কা'ব ইবনে আজরা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : কিছু দোয়া আছে, প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে যে ব্যক্তি ঐগুলো পড়ে বা আমল করে সে কখনো নিরাশ বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। দোয়াগুলো হল : তেত্রিশবার তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) পড়া, তেত্রিশবার তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ) পড়া এবং চৌত্রিশবার তাকবীর (আল্লাহু আকবার) পড়া (সহীহ্ মুসলিম # ১২৩৮)।

www.nagorikpathagar.org

এ দোয়াগুলো যারা নিয়মিত পড়ে কেয়ামতের দিন তাদের নেকের পাল্লায় এগুলো অত্যন্ত ভারি হবে।

এ সমস্ত বিশেষ দিন বা সময় ছাড়াও সর্বসময়ে আল্লাহর নিকট দোয়া করা যায়। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : তোমাদের প্রত্যেকে, প্রত্যেক অভাব-অভিযোগের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর, এমনকি যখন জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায় তার জন্যও; লবণের জন্যও (তিরমিযী শরীফ # ৩৫৪৩)।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে কোন ধরনের আমল সবচেয়ে প্রিয়? জবাবে তিনি বলেছিলেন : কম হলেও যে আমল স্থায়ী (সহীহ মুসলিম # ১৭০৫)।

কোন পীড়িতকে দেখতে যাওয়া সওয়াবের কাজ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : যখন তুমি কোন পীড়িতকে দেখতে যাও, তাকে তোমার জন্য দোয়া করতে বল, কেননা তার দোয়া ফেরেশতার দোয়ার সমতুল্য (ইবনে মাজাহ # ১৪৪৯)।

বিনা সন্দেহে সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দোয়া গৃহীত হয়। নিজের জন্য বা সন্তানের জন্য কখনো বদদোয়া করতে নেই। সে বদদোয়া গৃহীত হয়ে যেতে পারে। নিঃস্বার্থ ব্যক্তির দোয়া, সফরের সময় হাজীদের দোয়া ও মুসাফিরের দোয়া আল্লাহ তা'আলা কবুল করে থাকেন। অত্যাচারের সময় অত্যাচারিতের দোয়া কবুল হয়ে থাকে।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : মজলুমের অভিশাপকে ভয় কর, কেননা তার ও আল্লাহর মাঝখানে কোন আড়াল নেই (সহীহ মুসলিম # ২৯ এবং বোখারী শরীফ # ১১৮২)।

আল্লাহর দরবারে আরবীতে দোয়া করার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। নিজ ভাষায় নিজের বা অন্য কারো জন্য দোয়া করতে পারেন। আপনি কি

www.nagorikpathagar.org

চাচ্ছেন তা নিজে বুঝে দোয়া করুন। দোয়া করার সময় শুধু নিজের জন্য নয় অন্যের জন্য করবেন।

হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছেন : যে কোন মুসলিম বান্দা তার ভাইয়ের জন্য যখন তার অসাক্ষাতে দোয়া করে ফেরেশতারা বলেন : আমীন, তোমার জন্যও অনুরূপ (মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন # ২৪৯৪-৯৫)।

সর্বশেষে বলুন, হে আমাদের রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল মুমিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব নেয়া হবে (সূরা ইব্রাহীম # ১৪ : ৪১)।

পিতা-মাতার জন্য বলুন, "রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানী সগীরা।" অর্থ : হে আমাদের প্রভু! তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন (সূরা বনী ইসরাইল # ১৭ : ২৪)।

www.nagorikpathagar.org

তকদীর বা ভাগ্য

তকদীরের অপর নাম ভাগ্য। এটা ঈমানের একটি বিশেষ শাখা। তকদীরে বিশ্বাস না করে মুসলমান হওয়া যায় না। অনেকে বলে থাকে তকদীরের লিখন তার নেই খণ্ডন। কেউ কেউ বলে তকদীর বলে কিছু নেই। যখন যা ঘটে তা নিজের চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফল। আবার অন্য কিছু সংখ্যক লোক মনে করে তকদীরে যা আছে তা অবশ্যই লাভ করব চেষ্টার কোন প্রয়োজন নেই। এ উভয় দলই বেঈমান। আর যারা তকদীর, চেষ্টা এবং পরিশ্রমে বিশ্বাসী তারাই ঈমানদার। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন : তকদীর ও তার ভাল-মন্দের উপর ঈমান না আনা পর্যন্ত কোন বান্দা মুমিন হতে পারবে না। এমনকি তার নিশ্চিত প্রত্যয় থাকতে হবে যে, যা তার ভাগ্যে ঘটার আছে তা কখনো তাকে ছাড়বে না এবং যা তার ভাগ্যে ঘটার নয় তা তাকে কখনো স্পর্শ করতে পারবে না (তিরমিযী শরীফ # ২০৯১)।

কোথায় জন্ম হবে, জীবনে কি কি করবে, কি পরিমাণ রিযিক লাভ করবে, কার সাথে বিবাহ হবে অথবা একেবারেই বিবাহ হবে না, জীবনে সুখী হবে কিংবা অসুখী থাকবে, কতকাল জীবিত থাকবে এবং কোথায় কিভাবে মৃত্যু হবে সবই প্রত্যেকের তকদীরে লেখা আছে।

হযরত উবায়দা ইবনুস সাবিত (রা.) এর বর্ণনায়, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছেন : আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে একে আদেশ করেন, লিখ। কলম বলল, কি লিখব? তিনি বললেন : তকদীর লিখ, যা হয়েছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত যা হবে সব কিছুই (তিরমিযী শরীফ # ২১০২)।

জীবনে যখন যা ঘটে এটাই তকদীর। ইচ্ছার বিপরীত কোন কিছু ঘটলে অনেকেই বলে, কপাল মন্দ তাইতো এমনটি ঘটল। আবার আশানুরূপ কিছু ঘটলে বলে, কপালে আছে বলেই এমনটি হলো। কপাল

www.nagorikpathagar.org

বলতে তারা তকদীরকেই বুঝিয়ে থাকে। যেহেতু সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তকদীর লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, তাই তকদীরে বিশ্বাস না করা স্রষ্টার বিধানকে অস্বীকার করার শামিল। এটা জঘন্য অপরাধ। তকদীরে বিশ্বাস করতে হবে এবং সে সাথে ভাল পরিণামের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। একই মাতার গর্ভের তিন সন্তান তকদীরের প্রভাবে একজন জ্ঞানী, ধনবান এবং সমাজে সুনামের অধিকারী, দ্বিতীয় জন হত দরিদ্র, নির্বোধ এবং সমাজে অবহেলিত আর তৃতীয় জন শিক্ষিত কিন্তু নেশাখোর, জুয়াড়ি বা সন্ত্রাসী হিসেবে সমাজে কুখ্যাত। এরূপ বিপরীতধর্মী স্বভাবের সন্তানদের মাতা হওয়া সে নারীর তকদীরের লিখন এবং সন্তানগণও তাদের নিজেদের তকদীরই লাভ করেছে।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ আসমান ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই তামাম মাখলুকাতের (সকল সৃষ্টির) তকদীর লিখে রেখেছেন। তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপর (সহীহ মুসলিম # ৬৫৫৮ এবং তিরমিযী শরীফ # ২১০৩)।

এ হাদীসের প্রেক্ষিতে বলা যায়, শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েই মায়ের দুগ্ধ পান করে এবং কালক্রমে নানাবিধ খাদ্য খেতে শুরু করে। সে এমন গাছের ফল খায় যার বয়স তার বয়স থেকে আশি বা একশত বছর বেশী। অর্থাৎ তার জন্মের পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তার রিযিক হিসেবে মায়ের দুধ থেকে শুরু করে গাছ ও তরু-লতায় ফল-মূল, শাক-সবজি, মাংসের জন্য পশু-পাখী এবং জলাশয়ে মাছ সৃষ্টি করে রেখেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : তোমাদের কারো সৃষ্টি মাতার গর্ভে মাংসপিণ্ডে পরিণত হলে আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে রূহ সঞ্চার করেন এবং চারটি বিষয়সহ একজন ফেরেশতা পাঠিয়ে তার রিযিক, কার্যক্রম, বয়স এবং সে ভাগ্যবান বা দুর্ভাগা তা লিখিয়ে দেন। যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই তাঁর শপথ! তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বেহেশতের অধিবাসীদের কার্য করতে থাকবে।

www.nagorikpathagar.org

এমনকি যখন তাদের এবং বেহেশতের মধ্যে মাত্র এক হাত দূরত্ব থাকবে, তখন পূর্বে লিখিত ও নির্ধারিত তকদীরের প্রভাবে তারা দোযখীদের কার্য করে তাতে প্রবেশ করবে। আবার কেউ কেউ দোযখবাসীদের কার্য করতে থাকবে। এমনকি যখন তাদের ও দোযখের মধ্যে মাত্র এক হাত দূরত্ব থাকবে, তখন তকদীরের প্রভাবে তারা বেহেশতবাসীদের কার্য করে তাতে প্রবেশ করবে (বোখারী শরীফ # ১৫৮৬ এবং তিরমিযী শরীফ # ২০৮৪)। কথায় বলে শেষ ভালো যার সকল ভালো তার। তাই শেষ ভালোর জন্য সচেষ্ট থাকা সকলের উচিত।

হযরত মুসলিম ইবনে জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা এক ব্যক্তি কোরআনের একটি আয়াত পাঠ করেন যার অর্থ– আর স্মরণ কর! তোমার প্রতিপালক যখন আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরগণকে বের করেন এবং তাদের নিজেদের উপর তাদেরকে সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলে, হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আমরা সাক্ষী রইলাম (সূরা আ'রাফ # ৭ : ১৭২)।

এ আয়াতের পাঠ শুনে ওমর (রা.) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে জবাবে তিনি (সা.) বলেন : মহান আল্লাহ আদম (আ.) কে সৃষ্টি করার পর তার পিঠকে স্বীয় ডান হাত দ্বারা মাসেহ করেন। ফলে অনেক আদম সন্তানের সৃষ্টি হয়। এর পর তিনি বলেন : আমি এদেরকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি। এরা জান্নাতীদের মতো আমল করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাত দ্বারা আদমের পিঠকে আবার মাসেহ করেন। ফলে তাঁর আরোও সন্তান সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন : আমি এদেরকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তখন এক ব্যক্তি বলে : ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে আমলের দরকার কি? রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : আল্লাহ পাক যখন কোন বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তিনি তাকে দিয়ে জান্নাতীদের আমল করিয়ে নেন। ফলে মৃত্যুর পরে সেই ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করান। আর যখন কোন বান্দাকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তিনি তাকে দিয়ে জাহান্নামীদের মতো

www.nagorikpathagar.org

আমল করান। **ফলে** সে মারা গেলে তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করান (আবু দাউদ শরীফ # ৪৬৩০)। এর তাৎপর্য এ যে, কোন বান্দার জন্মের পূর্ব থেকেই আল্লাহ তা'আলা ভালো করে জানেন, সে বান্দা কেমন আমল করবে এবং সে অনুযায়ীই তার তকদীর নির্ধারিত হয়ে থাকে।

সৌভাগ্যের সন্ধানে মানুষ পৃথিবীময় ঘুরে বেড়ায়। যার যা আছে, সে তা অপেক্ষা বেশী চায়। যার ঘরে একদিনের খাবার আছে, সে এক সপ্তাহের খাবার জমাতে চায়। লক্ষপতি হতে চায় কোটিপতি। কিন্তু কাকে কি দেবেন তা আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, নিশ্চয়ই তোমার প্রভু যাকে ইচ্ছা প্রচুর রিযিক দান করে থাকেন এবং তিনিই সংকীর্ণ করে থাকেন। তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত, সবকিছু দেখছেন (সূরা বনী ইসরাইল # ১৭ : ৩৯)। পবিত্র কোরআনে আরো বলা হয়েছে : আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অফুরন্ত রিযিক দান করেন (সূরা বাকারা # ২ : ২১২)। অন্যত্র বলা হয়েছে : আর আল্লাহ তা'আলা যদি তাঁর সকল বান্দাকে প্রচুর জীবিকা দিতেন তবে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত। কিন্তু যে পরিমাণ ইচ্ছা সে পরিমাণ অবতীর্ণ করেন। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর বান্দাদের খবর রাখেন ও সবকিছু দেখেন (সূরা আশ শূরা # ৪২ : ২৭)।

অফুরন্ত সম্পদের অধিকারী অনেক লোকই সম্পদের গর্বে আত্মহারা হয়ে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়। কোন কোন ধনবানের অত্যাচারে তার দরিদ্র প্রতিবেশী শান্তিতে বসবাস করতে পারে না; এমনকি অনেকে নিজের ভিটামাটি ধনী ব্যক্তিকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়ে অন্যত্র চলে যায়। এমন উদাহরণ বিরল নয়। সে সকল ধনবানেরা অনেক সময় আল্লাহর আদেশ-নিষেধ গ্রাহ্য করে না। আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ.) এর নিকট আত্মীয় (কারো মতে চাচাত ভাই) কারূনকে অফুরন্ত সম্পদ দিয়েছিলেন। কিন্তু মূসা (আ.)-এর আবেদনে গরীবকে সম্পদের যাকাত দিতে সে অস্বীকার করে। অবশেষে আল্লাহর গযবে পতিত হয়ে স্বীয় ধন-সম্পদসহ ভূগর্ভে তলিয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন : আর আমি কারূনকে তার

www.nagorikpathagar.org

প্রাসাদসহ ভূগর্ভে বিলীন করে দিলাম। তার পক্ষে আল্লাহ ছাড়া এমন কোন দল ছিল না যে তাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না (সূরা কাসাস # ২৮ : ৮৯)।

অপরদিকে বলখের বাদশা ইব্রাহীম বিন আদহাম সিংহাসন ছেড়ে অন্যত্র যেয়ে কাঠ কেটে এনে বিক্রয় করতেন এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থের অর্ধেক অন্যকে দান করে বাকী অর্থে রুটি খরিদ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এরূপ ছিল তাদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত ভাগ্য। ভাগ্যের প্রভাবেই তারা নিজ নিজ পরিণতি লাভ করেছিল।

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জ্ঞান ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন। সে ভাল কাজ করতে পারে আবার মন্দ কাজও করতে পারে। যে পথে সে চলতে চায় আল্লাহ সে পথে তাকে এগিয়ে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি। এখন সে কৃতজ্ঞ হবে। না হয় অকৃতজ্ঞ হবে (সূরা আদ-দাহর # ৭৬ : ৩)। কোরআনে আরো বলা হয়েছে : তিনি (আল্লাহ) সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে অবগত, মহোত্তম, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। তোমাদের মধ্যে কেউ গোপনে কথা বলুক বা তা সশব্দে প্রকাশ করুক, রাতের অন্ধকারে সে আত্মগোপন করুক বা প্রকাশ্য দিবালোকে বিচরণ করুক, সবই তাঁর নিকট সমান। তাঁর পক্ষ থেকে অনুসরণকারী রয়েছে, তাদের অগ্রে এবং পশ্চাতে, আল্লাহর নির্দেশে তারা এদের হেফাযত করে (সূরা রাদ # ১৩ : ৯-১১)। মানুষ ভাল বা মন্দ যাই করুক এর বিচার হবে এবং শেষ ফল তার নির্ধারিত ভাগ্য দ্বারা সাব্যস্ত হবে।

কোন মানুষের সারা জীবন একইভাবে কেটে যেতে খুব কমই দেখা যায়। এক সময়ের বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি শেষ জীবনে সহায়-সম্বলহীন হয়ে যায়। আবার কোন নাম-গোত্রহীন ব্যক্তি অগাধ সম্পদ বা বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক হয়ে বসে। এটাই তকদীর, পথে পরিত্যক্তা নূর জাহান বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের অধিপতি মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সহধর্মিণী হয়েছিলেন। অথচ সে সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ চরম দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। পবিত্র কোরআনে বলা

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা যা ইচ্ছা বাতিল করেন এবং যা ইচ্ছা বহাল রাখেন, মূল কিতাব তাঁর কাছে রয়েছে (সূরা রাদ # ১৩ : ৩৯)। এখানে মূল কিতাব বলতে লওহে মাহফুজকে বুঝানো হয়েছে। যাতে সমস্ত সৃষ্টির যাবতীয় বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে।

কোরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সৃষ্ট জীবের তকদীর আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টির পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। অতঃপর সন্তান জন্মগ্রহণের সময় ফেরেশতাদেরকে লিখে দেয়া হয় এবং প্রতি বছর শবে কদরে সে বছরের ব্যাপারাদির তালিকা ফেরেশতাদেরকে সোপর্দ করা হয়। মোটকথা এ যে, প্রত্যেক সৃষ্ট জীবের বয়স, রিযিক, গতিবিধি ইত্যাদি সবই নির্ধারিত ও লিপিবদ্ধ। আল্লাহ্ তা'আলা এ ভাগ্যলিপি থেকে যতটুকু ইচ্ছা বাদ দেন এবং যতটুকু ইচ্ছা বহাল রাখেন। যা অবশিষ্ট থাকে তাতে কোন পরিবর্তন হয় না।

যাদের ঈমান মজবুত তারা আল্লাহর বিধানে সর্বদাই সন্তুষ্ট থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা যখন যা দেন তারা এটাই খুশী মনে মেনে নেয়। পেলাম না, খেলাম না, সুখভোগ করতে পারলাম না, এমন হা-হুতাশ তারা কখনো করে না। হা-হুতাশ করা দুর্বল ঈমানের লোকদের কাজ যা শয়তানের প্ররোচনার ফল। এতে মানুষ অন্যায় কাজে লিপ্ত হতে আগ্রহী হয়। ফলে তকদীরের কথা বেমালুম ভুলে যায়। পরকালের ভাবনা মাথায় আসে না।

আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন : মজবুত ঈমানদার আল্লাহর নিকট দুর্বল ঈমানদার অপেক্ষা প্রিয়। অবশ্য প্রত্যেকের মধ্যেই ভালো বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তোমার পক্ষে যা উপকারী ও কল্যাণপ্রদ, সে বিষয়ে আগ্রহ করো। আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করো। হিম্মতহারা হয়ো না, কোন বিপদে পড়লে এরূপ বলো না, যদি এটা করতাম তাহলে এরূপ এরূপ হত (বা হত না)। বরং বলো : আল্লাহর নির্ধারিত তকদীরে এটাই ছিল। তিনি যা চেয়েছেন তাই হয়েছে। কারণ 'যদি' শব্দ শয়তানের কাজ সহজ করে দেয় (সহীহ্ মুসলিম # ৬৫৮৪)।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্ তা'আলা কারো ভাগ্যলিপিতে যে বয়স রিযিক ইত্যাদি লিখে দিয়েছেন, তা কোন কর্মের দরুন কম অথবা বেশী হতে পারে এবং দোয়ার কারণেও তা পরিবর্তিত হতে পারে। এ পরিবর্তিত ভাগ্যকে ঝুলন্ত ভাগ্য বলা হয় (তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন)। অতএব জীবনে বিরূপ অবস্থা চলতে থাকলে বেশী বেশী করে মহান দয়ালু আল্লাহর দরবারে দোয়া করা উত্তম এবং তা নামাযের মাধ্যমে হওয়া সর্বোত্তম। কারণ নামাযের সেজদায় বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হয়ে থাকে। তাই সে সময়ের দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। হযরত সালমান (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : দোয়া ব্যতীত আর কিছুই তকদীর রদ করতে পারে না এবং সৎকাজ ব্যতীত কিছুই হায়াত বাড়াতে পারে না (তিরমিযী শরীফ # ২০৮৬ ও ইবনে মাজাহ # ৯০)।

---

www.nagorikpathagar.org

সকল মুসলমানই মুমিন নয়

প্রত্যেক মুমিনই মুসলমান, কিন্তু সকল মুসলমানই মুমিন নয়। মুসলমান মাতা-পিতার পরিবারে জন্মগ্রহণকারী সন্তান মুসলমান হওয়ার দাবীদার। যারা এক আল্লাহ, আল্লাহর নবী-রাসূলগণ, আল্লাহর ফেরেশতাগণ, আসমানী কিতাবসমূহ এবং শেষ বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাসী তারা নিজকে মুসলমান দাবী করতে পারে। এ সকল বিশ্বাস থাকার পরেও অনেকে ইসলামের করণীয় বিষয়সমূহে গাফেল থাকে। এরা নামে মাত্র মুসলমান।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় নামায পড়বে, আমাদের কিবলাকে কিবলারূপে গ্রহণ করবে এবং আমাদের যবেহকৃতকে খাবে, তাকে মুসলমান গণ্য করা হবে (বোখারী শরীফ # ২৬১)।

হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : যার জিহ্বা ও হাতের অনিষ্ট থেকে মুসলমান নিরাপদে থাকে, সে-ই প্রকৃত মুসলমান (সহীহ মুসলিম # ৭০)।

অপরদিকে মুমিন হওয়ার জন্য অত্যন্ত কঠিন সাধনার দরকার। মুমিন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, কেবল তারাই আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে, যারা আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং অহংকারমুক্ত হয়ে তাদের প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে। তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের প্রভুকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে (সূরা সেজদা # ৩২ : ১৫-১৬)। আর যারা সেজদা এবং দণ্ডায়মান অবস্থায় রাত্রি যাপন করে, আর যারা প্রার্থনা করে, হে আমাদের প্রভু, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের আজাব সরিয়ে দাও, নিশ্চয়ই এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ, নিশ্চয় উক্ত দোযখ মন্দ নিবাস এবং নিকৃষ্ট স্থান (সূরা ফোরকান # ২৫ : ৬৪-৬৬)।

www.nagorikpathagar.org

যারা আল্লাহর বিধি-বিধানসমূহ মেনে চলে তথা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয়, রোযা রাখে, সামর্থ থাকলে হজ্জ করে, গরীব-দুঃখীকে দান করে, আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করে, এতীমের হক আত্মসাৎ করে না, অপর মুসলমানের এমনকি সকল মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা দেয়, বিপদাপদে আল্লাহর সবর করে, আল্লাহর দানে সন্তুষ্ট থাকে ও শোকরিয়া আদায় করে এবং লোভ-লালসামুক্ত হয়ে আল্লাহর এবাদত করে তারাই মুমিন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, সৎকর্ম শুধু এ নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ এ যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রাসূলগণের উপর আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই (আল্লাহর) মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতীম, মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী কৃতদাসদের জন্য। আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা রক্ষাকারী এবং রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণকারী, তারাই পরহেযগার (সূরা বাকারা # ২ : ১৭৭)। মুমিন তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ (সূরা হুজুরাত # ৪৯ : ১৫)।

মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে সম্বোধন করে বলেন, হে মুমিনগণ, তোমরা রুকু কর, সেজদা কর, তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর এবং সৎকাজ সম্পাদন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। তোমরা আল্লাহর জন্য জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি। তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের ধর্মে কায়েম থাক। তিনি তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন পূর্বেও এবং এ কোরআনেও যাতে রাসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষী হন এবং তোমরা সাক্ষী হও মানবমণ্ডলীর জন্যে। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের মালিক। অতএব তিনি কত উত্তম মালিক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী (সূরা হজ্জ # ২২ : ৭৭-৭৮)। এখানে

www.nagorikpathagar.org

উল্লেখ্য যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) এবং হযরত ইয়াকুব (আ.)ও নিজ নিজ সন্তানদেরকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, হে আমার সন্তানগণ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্যে এ (ইসলাম) ধর্মকে মনোনীত করেছেন। কাজেই তোমরা মুসলমান না হয়ে কখনো মৃত্যুবরণ করো না (সূরা বাকারা # ২ : ১৩২)।

রাসূল (সা.) মুসলমানদের সাক্ষী অর্থাৎ তিনি হাশরের ময়দানে সাক্ষ্য দেবেন, আমি আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধান এ উম্মতের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম। তখন উম্মতে মুহাম্মদী তা স্বীকার করবে। কিন্তু অন্যান্য পয়গম্বরগণ যখন এ দাবী করবেন, তখন তাঁদের উম্মতেরা অস্বীকার করে বসবে। সে সময় উম্মতে মুহাম্মদী সাক্ষ্য দেবে যে, সকল পয়গম্বরগণ নিশ্চিতরূপেই তাঁদের উম্মতের কাছে আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলী পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। অন্যান্য পয়গম্বরগণের উম্মতেরা বলবে, আমাদের সময়ে উম্মতে মুহাম্মদীর অস্তিত্বই ছিল না। অতএব কিভাবে তারা আমাদের সাক্ষী হবে? উম্মতে মুহাম্মদীরা বলবে, আমরা আমাদের নবী (সা.) এর মুখে শুনেছি, যাঁর সত্যবাদিতায় কোন সন্দেহ নেই। অতএব আমরা সাক্ষ্য দিতে পারি। অতঃপর তাদের সাক্ষ্য কবুল করা হবে। [এ বিষয়বস্তু বোখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে হযরত আবু সাঈদ খুদরীর হাদীসে বর্ণিত আছে– তফসীর মা'আরেফুল কোরআন : সূরা হজ্জের তফসীর]।

যারা নামে মাত্র মুসলমান তারা প্রয়োজনের তাগিদে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং বাকী সময় তাঁকে ভুলে থাকে। বান্দার ঈমানের পরিমাণ তার কাজের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে আল্লাহর এবাদত করে। যদি সে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, তবে এবাদতের উপর কায়েম থাকে এবং যদি কোন পরীক্ষায় পড়ে তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহকাল ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি (সূরা হজ্জ # ২২ : ১১)। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে অন্যত্র বলেন, আর মানুষ যখন কোন কষ্টের সম্মুখীন হয়; শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে

www.nagorikpathagar.org

আমাকে ডাকতে থাকে। তারপর আমি যখন তা হতে মুক্ত করে দেই, সে কষ্ট যখন চলে যায়, তখন মনে হয়, কখনো কোন কষ্টের সম্মুখীন হয়ে যেন আমাকে ডাকেইনি... (সূরা ইউনুস # ১০ : ১২)।

যাদের ঈমান সুদৃঢ় নয়, মৃত্যু ভয় এবং পরকালের কঠিন অবস্থার বিষয় তারা ভুলে থাকে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, মুমিন ব্যক্তি গুনাহকে এত ভয়ঙ্কর মনে করে থাকে যে, গুনাহ সংঘটিত হয়ে গেলে তার অবস্থা এমন হয় যেন সে একটি পাহাড়ের তলদেশ এবং পাহাড় তার উপর ধসে পড়ার আশঙ্কা করছে। পক্ষান্তরে বদকার ব্যক্তি গুনাহকে এত তুচ্ছ ও হালকা মনে করে যেন একটি মাছি তার নাকের সামনে উড়ছে, হাত নাড়া দিলেই দূর হয়ে যাবে (বোখারী শরীফ # ২৩৮৮)।

মুমিনরা ভুলবশত: পাপ করে ফেললে সাথে সাথে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে। মহান আল্লাহ বলেন, তারা কখনো কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে; এসব লোক জেনে শুনে বারবার পাপের কাজ করে না (সূরা আলে ইমরান # ৩ : ১৩৫)। আল্লাহ তা'আলা আরোও বলেন, আল্লাহ এমন নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন (সূরা আনফাল # ৮ : ৩৩)। ঘন ঘন তওবা করা মুমিনের স্বভাব। রাসূলুল্লাহ (সা.) দৈনিক সত্তর থেকে একশতবার তওবা করতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা (মুমিনরা) তওবাকারী, এবাদতকারী, শোকরগুজার, (দুনিয়ার সাথে) সম্পর্কচ্ছেদকারী, রুকু ও সেজদা আদায়কারী, সৎ কাজের আদেশ দানকারী ও মন্দ কাজ থেকে নিবৃত্তকারী এবং আল্লাহর দেয়া সীমাসমূহের হেফাযতকারী, অতএব সুসংবাদ দাও মুমিনদেরকে (সূরা তওবা # ৯ : ১১২)।

অপরদিকে পাপীরা পরকাল ভুলে দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তারা মনে করে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, দুনিয়াকে উপভোগ করার জন্য। দেহে শক্তি-সামর্থ থাকা অবস্থায়ই দুনিয়া উপভোগের সময়। এ

www.nagorikpathagar.org

সকল লোকদের পাপ-পুণ্য বিচারের ক্ষমতা লোপ পেয়ে যায়। তাই তারা যা ইচ্ছা তাই করে বেড়ায় এবং দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টি করে।

পাপের ক্ষেত্রসমূহ অত্যন্ত চাকচিক্যময়, আকর্ষণীয়, লোভনীয় এবং সহজলভ্য। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : দোযখকে ঘিরে রাখা হয়েছে চিত্তাকর্ষ কার্যাবলীর দ্বারা, বেহেশতকে ঘিরে রাখা হয়েছে রুচিবিহীন কার্যাবলীর দ্বারা (বোখারী শরীফ # ২৪৫৫)। তাই পাপের পথের মন ভুলানো কার্যাবলীর আকর্ষণে সামনে অগ্রসর হতে চাইলে শয়তান খুশী হয় এবং তাকে সে কাজে উৎসাহ দিতে থাকে। মদ, জুয়া, নাচ-গান ইত্যাদি প্রায় সকলেরই হাতের নাগালের মধ্যে। নাইট ক্লাব, কলগার্ল ইত্যাদি ধনীদের সৌখিনতা। অবৈধ উপার্জনের জন্য ঘুষ, সুদের ব্যবসা, ডাকাতি, জালিয়াতি, প্রতারণা সর্বশ্রেণীর লোকের জন্য খোলা। এ সকল পাপীদের অনেকেই কথায় ও পোশাকে সাধু সেজে হাত উঠিয়ে দোয়া করে এবং দান-খয়রাতও করে। কিন্তু মুখে মদের গন্ধ, পেটে গরীবের হক আর হাতে দুর্বলের রক্ত নিয়ে আল্লাহু আল্লাহু ডাকতে থাকলে তিনি তার ডাকে সাড়া দেবেন কেমন করে? হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে রেওয়ায়াতে এমন এক লোক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) আলোচনা করলেন : যে দীর্ঘ পথ সফর করেছে। ফলে তার অবস্থা হয়েছে উসকু-খুসকু ও ধুলামলিন। এমতাবস্থায় সে তার হাত দু'টি আকাশের দিকে প্রসারিত করে হে প্রভু, হে প্রভু! বলতে থাকে। অথচ সে যা খায় তা হারাম, যা পান করে তাও হারাম, যা পরিধান করে তাও হারাম। কাজেই এমন ব্যক্তির দোয়া তিনি কেমন করে কবুল করতে পারেন (সহীহ মুসলিম # ২২১৬)। এ সকল লোকেরা মুসলমান হলেও মুমিন নয়।

বিশ্বের অনেক দেশেই ন্যায়নীতি বর্জিত, বেপরোয়া শাসক ছিল এবং এখনও আছে। এদের দুঃশাসন, শোষণ ও অত্যাচারে দেশের মানুষের দীর্ঘশ্বাস ফেলা এবং নীরবে অত্যাচার সহ্য করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। মহান আল্লাহ বলেন, আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেককে সঠিক পথ

www.nagorikpathagar.org

নির্দেশ দিতাম, কিন্তু আমার এ উক্তি অবধারিত সত্য যে, আমি জিন ও মানুষ দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব (সূরা সেজদা # ৩২ : ১৩)।

এর কারণ এ যে, তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করে জ্ঞান বা বিচার-বিবেচনার ক্ষমতা দিয়ে স্বাধীন করে দিয়েছেন।

হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত। আমরা সাহাবী হযরত মা'কাল (রা.) কে তার মৃত্যু শয্যায় দেখতে যাই। তখন বসরার গভর্নর ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ তথায় উপস্থিত হয়। সে ছিল একজন অত্যাচারী শাসক। সাহাবী (রা.) তাকে বললেন, আমি আপনাকে একটি হাদীস শুনাব যা আমি হযরত নবী (সা.) থেকে শুনেছি। হযরত নবী (সা.) বলেছেন, কোন বান্দাকে আল্লাহ শাসক নিযুক্ত করলে সে যদি তাদের অধিকার হরণকারী ও খেয়ানতকারীরূপে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন (বোখারী শরীফ # ২৬৭৩ ও সহীহ্ মুসলিম # ২৭১)।

শুধু জনগণের শাসকই নয়, প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তিকেই কেয়ামতের দিন তার দায়িত্ব পালন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল। আর (কেয়ামতের দিন) তোমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর পুরুষও তার পরিবারের একজন দায়িত্বশীল। তাকে তার এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। স্ত্রীও তার স্বামীর ঘর-সংসার এবং সন্তানের উপর দায়িত্বশীল। তাকেও এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এমনকি কোন ব্যক্তির গোলাম বা দাসীও তার প্রভুর সম্পদের ব্যাপারে একজন দায়িত্বশীল। সেদিন তাকেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। অতএব সাবধান (সহীহ্ মুসলিম # ৪৫৭৬, তিরমিযী শরীফ # ১৬৫০)।

আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা কোন ব্যক্তির মঙ্গল চাইলে তাকে বালা-মুসিবতে পতিত করেন (বোখারী শরীফ # ২১৮৯)।

www.nagorikpathagar.org

মুমিনদের উপর পতিত বালা-মুসিবতের মাত্রা তাদের ঈমানের দৃঢ়তার মাত্রানুযায়ী হয়। ধর্মে যে যে পরিমাণ দৃঢ় সে পরিমাণে তার বালা-মুসিবত আসে। তাই বালা-মুসিবত মুমিনের নিত্য সঙ্গী। তারা জানেন এটা তাদের জন্য পরীক্ষা এবং গুনাহ মাফের অসিলা।

আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : মুসলমানের উপর যে কোন প্রকার বালা-মুসিবত আসলে আল্লাহ তা'আলা তার দ্বারা তার গুনাহ মাফ করে দেন, এমনকি একটি কাঁটা বিদ্ধ হলেও (বোখারী শরীফ # ২১৮৫)।

তাই তারা হাসিমুখে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে এবং অন্যদিকে আল্লাহকে স্মরণ করে গোপনে চোখের পানি ফেলে।

যাদের পাপের পাল্লা পুণ্য অপেক্ষা ভারী হবে তারা শাস্তি ভোগের জন্য দোযখে পতিত হবে। পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ স্বীকার করে থাকলে শাস্তি ভোগের পরে বেহেশতে যাবে। কোন মুসলমানই চিরস্থায়ী দোযখী হবে না। আর মুমিনদের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা দোযখ হারাম করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : কপালের ঘামসহ মুমিন ব্যক্তির মৃত্যু হয় (তিরমিযী শরীফ # ৯২২, নাসাঈ শরীফ # ১৮৩১)।

www.nagorikpathagar.org

মোনাফেক থেকে সাবধান

মোনাফেক অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এরা সাধারণ মানুষের মাঝে লুকিয়ে থাকে। তাদেরকে চেনার উপায় কি? আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : যার মধ্যে চারটি অভ্যাস আছে সে খাঁটি মোনাফেক। আর যার মধ্যে এগুলোর একটি বর্তমান রয়েছে তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মোনাফেকের স্বভাব আছে বলা হবে। (১) সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, (২) আমানতের খেয়ানত করে, (৩) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং (৪) ঝগড়া করলে গালাগালি করে (সহীহ্ মুসলিম # ১১৮, বোখারী শরীফ # ৩০ এবং নাসাঈ শরীফ # ৫০২০)।

মোনাফেক দু'প্রকারের। এক প্রকারের মোনাফেকেরা ধর্ম-কর্ম করে শুধু লোক দেখানোর জন্য, কিন্তু অন্তরে এর বিপরীত। অর্থাৎ এরা ঈমানদার নয়, শুধু ঈমানদারের ভান করে। এরা সত্যিকারের মোনাফেক। অপর শ্রেণীর লোকদের অন্তরে ঈমান আছে কিন্তু ইসলামের বরখেলাফ কাজ করে। এরা তওবা করলে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিতে পারেন। কোরআনে বলা হয়েছে, নিশ্চয়ই মোনাফেকগণ আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি করে, অথচ তিনি তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছেন, আর তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন শিথিলভাবে লোক দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং মহান আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে; এরা দোদুল্যমান ঝুলন্ত, এদিকে নয় সেদিকেও নয় আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন আপনি তার জন্য কখনো কোন পথ পাবেন না (সূরা নিসা # ৪ : ১৪২-১৪৩)।

মোনাফেকের যে চারটি স্বভাবের কথা বলা হলো, অনেক মানুষের মধ্যেই এদের কোন না কোনটি পাওয়া যায়। কেউ এমন যে, কথায় কথায় মিথ্যা বলে। মিথ্যা বলে তার কোন দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করে। অথবা কোন কথা এক সময় বলে ফেললে পরে তা অস্বীকার করে। এ সকল লোককে অন্যরা মিথ্যাবাদী হিসেবে চিনে। অতএব তার মধ্যে

www.nagorikpathagar.org

মোনাফেকের স্বভাব রয়েছে। তদুপরি মিথ্যা বলা মহাপাপ। কয়েকজনের মিথ্যা সাক্ষ্যের ফলে কোন একজন নিরপরাধ ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, একদা নবী (সা.) বললেন, আমি তোমাদেরকে বড় বড় গুনাহগুলো জ্ঞাত করব কি? এরূপ তিনবার প্রশ্ন করলেন। উপস্থিত সকলেই আরজ করল, নিশ্চয়ই ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)। নবী (সা.) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলার তুল্য মর্যাদা কারো জন্য প্রকাশ করা; মাতা-পিতার অবাধ্য চলা। এ পর্যন্ত তিনি হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন, অতঃপর তিনি উঠে বসলেন এবং বললেন, স্মরণ রাখো, মিথ্যা কথা বলা। এ তৃতীয় বিষয়টি নবী (সা.) বার বার বলতে লাগলেন, এমনকি আমরা তাঁর ক্ষান্ত হওয়ার আগ্রহ করতে লাগলাম (বোখারী শরীফ # ১২৫১)।

কোন ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গ অন্যের নিকট কিছু আমানত রাখতে পারে। এ আমানত রক্ষা করা সে ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য। নবুয়তের পূর্বে মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট মক্কার লোকেরা অর্থ-সম্পদ আমানত রাখত। তিনি তাদের আমানতী দ্রব্য ঠিকভাবে ফেরত দিতেন। তাঁর এ বিশ্বস্ততার জন্য লোকেরা তাঁকে আল-আমীন খেতাব দিয়েছিল। নবুয়তের পরে তাঁর প্রচারিত ধর্মে বিশ্বাস না করলেও তাঁকে বিশ্বাস করে তাঁর নিকট পূর্বের ন্যায় মক্কাবাসী অমুসলিমরা আমানত রাখত। তাঁর হিজরতের সময় মানুষের আমানতী অবশিষ্ট অর্থ-সম্পদ তাদেরকে ফেরত দেয়ার জন্য তিনি আলী (রা.)-এর নিকট রেখে গিয়েছিলেন। অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও বিশ্বস্ত লোক আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, কিতাবীদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যে বিপুল সম্পদ আমানত রাখলেও ফেরত দেবে, আবার এমন লোকও আছে যার নিকট একটি দীনারও আমানত রাখলে তার পেছনে লেগে না থাকলে সে ফেরত দেবে না (সূরা আলে-ইমরান # ৩ : ৭৫)।

বর্তমান সময়েও আমানত খেয়ানতের অনেক ঘটনা ঘটছে। কেউ কিছু আমানত রাখলে সে তা অস্বীকার করে। কাকেও কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করলে এটাও আমানত। সে যদি তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করে অথবা এটা থেকে কিছু আত্মসাৎ করে তবে তা আমানতের খেয়ানত। আমানতের খেয়ানত করা মোনাফেকী

www.nagorikpathagar.org

যা জঘন্য অপরাধ। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, সফর অবস্থায় নবী (সা.)-এর মাল-সামান, আসবাবপত্রের রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য একজন লোক নিয়োজিত ছিল। তার মৃত্যু হলো, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : সে দোযখে যাবে। লোকেরা খোঁজ করে জানতে পারল, সে গনিমতের মাল থেকে একটি জুব্বা আত্মসাৎ করেছিল (বোখারী শরীফ # ১৩৮৪)। আল্লাহ তা'আলা আমানত খেয়ানতকারীদেরকে এরূপ শাস্তি দেবেন।

ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করা মোনাফেকের আরেকটি স্বভাব যা জঘন্য অপরাধ। মানুষের সর্বপ্রথম ওয়াদা ছিল সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর সাথে। পবিত্র কোরআনে যা উল্লিখিত আছে : স্মরণ করুন, আপনার প্রতিপালক আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তার বংশধরকে বের করেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি তোমাদের রব (পালনকর্তা) নই? তারা বলল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমরা (এ কথার) সাক্ষী থাকলাম (সূরা আরাফ # ৭ : ১৭২)। এ ওয়াদা দেয়ার পরে বহু আদম সন্তান নিজের রবের এবাদত না করে দেব-দেবী ও অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর এবাদত বা পূজা করে ওয়াদা ভঙ্গ করছে।

ওয়াদা ভঙ্গের উদাহরণের অভাব নেই। স্বার্থের জন্য ওয়াদা করা হয়। স্বার্থ হাসিল হয়ে গেলে তা ভঙ্গ করে। ওয়াদা ভঙ্গকারী অভিশপ্ত এবং কেয়ামতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতিকে (ওয়াদাকে) ভঙ্গ করল তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সকল মানুষের অভিশাপ বর্ষিত হবে। কেয়ামতের দিন তার কোন ফরয বা নফল এবাদত কবুল করা হবে না (সহীহ মুসলিম # ৩১৯১)।

যার মধ্যে মোনাফেকীর স্বভাব বর্তমান সে কারো সাথে ঝগড়া করলে গালাগালি করে। গালি দেয়া খারাপ কাজ। অনেকে হারামজাদা, শূকরের বাচ্চা ইত্যাদি অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করে অন্যকে গালি দেয়। এ ধরনের গালি প্রকৃতপক্ষে যাকে দেয়া হচ্ছে তার পরিবর্তে তার মাতা-পিতার উপর যেয়ে পড়ছে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে গালি দিলে সে ফাসেকের কাজ করল বলে সাব্যস্ত হয় (বোখারী শরীফ # ৪৪)।

www.nagorikpathagar.org

উপরে বর্ণিত লক্ষণগুলো যাদের মধ্যে দৃশ্যমান তাদেরকে মোনাফেক সাব্যস্ত করা সহজ হলেও এমন কিছু সংখ্যক মোনাফেক আছে যাদেরকে চেনার উপায় নেই। এরা ঈমানদারদের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আপনি (নবী সা.) যখন তাদেরকে দেখেন, তখন তাদের দেহাকৃতি আপনার নিকট প্রীতিকর মনে হয়। আর যখন তারা কথা বলে আপনি তাদের কথা শুনেন যদিও তারা দেয়ালে ঠেকানো কাঠের স্তম্ভ সদৃশ; শোরগোলকে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারা শত্রু, অতএব তাদের থেকে সাবধান হোন। আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করুন। বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলছে (সূরা মুনাফিকুন # ৬৩ : ৪)।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সহচরদের মধ্যেও মোনাফেক ছিল। কিন্তু সাহাবা (রা.)গণ তাদেরকে মোনাফেক হিসেবে জানতেন না। আম্মার (রা.) বলেন, হুযাইফা (রা.) স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করে আমাকে একটি কথা শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, নবী (সা.) বলেছেন, আমার সহচরদের মধ্যে বারজন মোনাফেক আছে। তন্মধ্যে আটজন কস্মিনকালে বেহেশতে প্রবেশ করবে না। তা এমনই অসম্ভব যেমন সুচের ছিদ্রে উট প্রবেশ করা। এদের আটজনের জন্য দোযখের জ্বলন্ত অগ্নিশিখাই যথাযোগ্য শাস্তি। বাকী চারজনের ব্যাপারে আমার স্মরণ নেই (সহীহ মুসলিম # ৬৮৩৩)।

পবিত্র কোরআনে উল্লিখিত আছে, মোনাফেক নর ও মোনাফেক নারী একে অপরের অনুরূপ, এরা অসৎ কর্মের নির্দেশ দেয় এবং সৎকর্মে নিষেধ করে, এরা হাত বন্ধ রাখে (দান করে না), তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে তিনিও তাদেরকে ভুলে গেছেন, নিঃসন্দেহে মোনাফেকরা পাপাচারী। মোনাফেক নর, মোনাফেক নারী ও কাফেরদেরকে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জাহান্নামের আগুনের যেখানে এরা স্থায়ী হবে, এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ্ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি (সূরা তওবা # ৯ : ৬৭-৬৮)।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময়ে সবচেয়ে কুখ্যাত মোনাফেক ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। সে ছিল মোনাফেকদের সর্দার। আনসার ও

www.nagorikpathagar.org

মুহাজেরদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে সংঘর্ষ লাগানোর জন্য সে গভীর ষড়যন্ত্র করেছিল। তার সে চক্রান্তের প্রেক্ষিতে পবিত্র কোরআনের সূরা মোনাফেকুন নাযিল হয়েছিল। এ কুখ্যাত মোনাফেক হযরত আয়েশা (রা.)-এর গলার হার হারানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর চরিত্রের উপর মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মান-মর্যাদা নষ্ট করারও চেষ্টা করেছিল। সূরা "নূর"-এর ১১ থেকে ২৩ নম্বর আয়াতে এর বর্ণনা রয়েছে।

সে মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের পুত্র আবদুল্লাহ (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একজন বিশ্বস্ত সাহাবী। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেল। তার পুত্র আবদুল্লাহ (রা.) নবী (সা.)-এর নিকট এসে এ আবেদন জানালেন যে, তিনি যেন তাঁর পিতাকে কাফন দেয়ার জন্য তাঁর একটি জামা দান করেন, তার জানাযার নামায পড়ান এবং তার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করেন। তিনি তাঁর জামা দিয়ে দিলেন এবং বললেন, সময় হলে আমাকে সংবাদ দিও, আমি জানাযার নামায পড়িয়ে দেব। যখন জানাযা তৈরি হলো এবং নবী (সা.) জানাযার নামাযের জন্য অগ্রসর হলেন, তখন ওমর (রা.) তাঁকে পেছন থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করলেন এবং বললেন, আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহ তা'আলা মোনাফেকদের উপর জানাযার নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এটা আল্লাহ আমার ইচ্ছাধীন করে দিয়েছেন এবং বলেছেন, আপনি তাদের জন্য ইস্তেগফার করুন আর না করুন, যদি সত্তরবারও ক্ষমা প্রার্থনা করেন আল্লাহ এদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না (সূরা তওবা # ৯ : ৮০)। এ বলে নবী (সা.) জানাযার নামায পড়লেন। অতঃপর আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন : মোনাফেকদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে আপনি কখনো তার উপর জানাযার নামায পড়বেন না এবং তার কবরের কাছেও দাঁড়াবেন না (সূরা তওবা # ৯ : ৮৪। বোখারী শরীফ # ৬৬৩ ও সহীহ মুসলিম # ৬৮২৫)।

মোনাফেকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করতে আল্লাহ অন্য আয়াতেও নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, আপনি এদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা না করুন তাদের জন্য উভয়ই সমান। আল্লাহ এদেরকে

www.nagorikpathagar.org

কখনো ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না (সূরা মোনাফেকুন # ৬৩ : ৬)।

মোনাফেকরা কত জঘন্য এবং নিকৃষ্ট একটি হাদীস থেকে তার নমুনা পাওয়া যায়। আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে বনী নাজ্জারের এক ব্যক্তি ছিল, সে সূরা বাকারাহ্ ও আলে-ইমরান পাঠ করেছে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাতিব (লিখক) ছিল। হঠাৎ বিশ্বাসঘাতকতা করে সে পালিয়ে গিয়ে ইহুদীদের সাথে যোগ দিল। জাবের (রা.) বলেন, তারা তাকে স্বসম্মানে গ্রহণ করে বলল, এ ব্যক্তি তো মুহাম্মদ (সা.)-এর লিখকের কাজ করত। অতএব তোমরা তাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ কর। এরপর অবশ্য বেশী দিন বিলম্ব হয়নি। মহান আল্লাহ্ তাদের মধ্য থেকে তাকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। অতঃপর তারা তার জন্য কবর খুঁড়ে তাকে দাফন করল। কিন্তু জমিন তাকে ভেতর থেকে নিক্ষেপ করে উপরে উঠিয়ে দিল। এরপর তারা আবার কবর খুঁড়ে তাকে দাফন করল। এবারও জমিন তাকে নিক্ষেপ করে উপরে ফেলে দিল। তার পর আবার তারা কবর খুঁড়ে তাকে দাফন করল। এবারও জমিন তাকে উপরে উঠিয়ে ফেলে দিল। অতঃপর তারা তাকে আর দাফন না করে নিক্ষিপ্ত অবস্থায়ই রেখে দিল (সহীহ্ মুসলিম # ৬৮৩৮)।

অতএব মোনাফেকের অবস্থা পরকালে কত ভয়াবহ হবে এ হাদীসে তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, সকলকে হাশরের বিভিন্ন মনযিল ও স্থান অতিক্রম করতে হবে। এক মনযিলে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে কিছু মুখমণ্ডলকে সাদা ও উজ্জ্বল করে দেয়া হবে এবং কিছু মুখমণ্ডলকে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ করে দেয়া হবে। অপর এক মনযিলে সমবেত সকল মুমিন ও কাফেরকে গভীর অন্ধকার আচ্ছন্ন করে ফেলবে। কিছুই দৃষ্টিগোচর হবে না। এরপর নূর বণ্টন করা হবে। প্রত্যেক মুমিনকে নূর দেয়া হবে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক মুমিনকে তার আমল পরিমাণ নূর দেয়া হবে। (তফসীর

www.nagorikpathagar.org

মা'আরেফুল কোরআন– সূরা হাদীদের তফসীর) এই নূরের সাহায্যে মুমিনগণ পথ চলবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, সেদিন মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক নারীরা মুমিনদেরকে বলবে, তোমরা আমাদের জন্য একটু থামো, যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করতে পারি। বলা হবে, তোমরা তোমাদের পেছনে ফিরে যাও এবং আলোর সন্ধান কর। অতঃপর উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, এর ভেতরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে শাস্তি।

মোনাফেকরা মুমিনদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? তারা বলবে, হ্যাঁ,। কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ। তোমরা প্রতীক্ষা করেছ (আমাদের অমঙ্গলের), সন্দেহ পোষণ করেছ এবং অলীক আশার পেছনে বিভ্রান্ত হয়েছ, অবশেষে আল্লাহর আদেশ আসল। আর (শয়তান) তোমাদেরকে আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রতারিত করেছিল (সূরা হাদীদ # ৫৭ : ১৩-১৪)।

মোনাফেকদের জন্য আল্লাহ্ জাহান্নাম নির্ধারিত করে রেখেছেন। কিছু ঈমানদার জাহান্নামের আযাব ভোগ করে বেহেশত লাভ করবে। কিন্তু মোনাফেকরা চির জাহান্নামী বলে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ আরোও বলেন : মোনাফেকেরা তো জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে এবং তাদের জন্য আপনি কোন সাহায্যকারী পাবেন না (সূরা নিসা # ৪ : ১৪৫)।

যারা পূর্ণ মোনাফেক তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত। কিন্তু যাদের মধ্যে মোনাফেকের এক বা একাধিক স্বভাব রয়েছে তারা অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, দয়ালু। মোনাফেকরা যেহেতু ছদ্মবেশে সকলের সাথে ঘুরে ফিরে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে, তাই অন্যরা মোনাফেক থেকে সাবধান থাকা দরকার।

www.nagorikpathagar.org

অন্তরের ভাবনা

মানুষ যখন জাগ্রত থাকে তখন তার অন্তরে কোন না কোন ভাবনার উদয় হতে থাকে। পরের মুহূর্তে সে কি করবে, কোন কাজটি কিভাবে সম্পন্ন করতে হবে, কে তার শত্রুতা করছে ইত্যাদি ভাবনা অন্তরে ঘুরপাক খেতে থাকে। এ সকল ভাবনা দুনিয়ার স্বার্থের জন্য, পরকালের মুক্তির জন্য, কোন ভাল বা মন্দ কাজের জন্য হতে পারে। যে অন্তরে কোন ভাবনার উদয় হয় না, সে অন্তর মৃত। সকল কাজের ফলাফল তার অন্তরের ভাবনা বা নিয়তের উপর নির্ভরশীল। ওমর (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় জেনে রেখ, আল্লাহর নিকট কাজের ফলাফল মানুষের নিয়ত অনুসারে হয়। প্রত্যেক মানুষ তার কাজের ফলাফল আল্লাহর নিকট তদ্রূপ পাবে, যদ্রূপ সে নিয়ত করবে। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে হিজরত করবে, সে আল্লাহ এবং রাসূলের সন্তুষ্টি নিশ্চয়ই পাবে। পক্ষান্তরে টাকার লোভে বা কোন রমণীর প্রতি আসক্ত হয়ে তাকে বিবাহ করার এবং কামরিপু চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে করলে তার ফল তদ্রূপ সে পাবে, যদ্রূপ সে নিয়ত করেছে (বোখারী শরীফ # ১)।

মহান আল্লাহ মানুষের অন্তরের খবর রাখেন। আল্লাহ বলেন, বলুন (হে রাসূল), তোমাদের অন্তরে যা আছে তা যদি তোমরা গোপন কর অথবা ব্যক্ত কর, আল্লাহ তা অবগত আছেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান (সূরা আলে ইমরান # ৩ : ২৯)। আল্লাহ আরোও বলেন ঃ কেউ আল্লাহর পথে হিজরত করলে সে দুনিয়ার বহু আশ্রয়স্থল এবং প্রাচুর্য লাভ করবে এবং কেউ আল্লাহ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে নিজ গৃহ থেকে মুহাজির হয়ে বের হলে এবং তার মৃত্যু ঘটলে তার পুরস্কারের ভার আল্লাহর উপর, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (সূরা নিসা # ৪ : ১০)।

আবু হোরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দেহ ও শারীরিক গঠন প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য করবেন

www.nagorikpathagar.org

না, বরং তোমাদের অন্তঃকরণের দিকে লক্ষ্য করবেন। আর এ কথা বলার সময় তিনি আঙ্গুলগুলো দিয়ে তাঁর বুকের দিকে ইঙ্গিত করেছেন (সহীহ মুসলিম # ৬৩৫৯)।

আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। সে কোন পুণ্যের কাজ করলে তিনি তার পুরস্কার বহুগুন বাড়িয়ে দিতে কুণ্ঠিত হন না কিন্তু সে কোন পাপের কাজ করলে দয়া করে তিনি পাপের শাস্তি বাড়ান না। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন নেক কাজ করার ইচ্ছা করে, কিন্তু তা কাজে পরিণত করেনি, তখন তার জন্য একটি নেকী লেখা হয়। আর যে ব্যক্তি কোনো নেক কাজ করার ইচ্ছা করার পর তা কাজে পরিণত করে তার জন্য দশ থেকে সাতশত পর্যন্ত নেকী লেখা হয়। আর যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ করার ইচ্ছা করে তা কাজে পরিণত করেনি, তার জন্য কিছুই লেখা হয় না। তবে যদি তা করে তখন আল্লাহ তা'আলা কেবল মাত্র একটি পাপই লিপিবদ্ধ করেন (সহীহ মুসলিম # ২৪৫)। ইবনে আব্বাস (রা.) বোখারী শরীফের ২৪৫৮ এবং সহীহ মুসলিমের ২৪৬ নম্বর হাদীসে একই রকম বর্ণনা করেছেন।

মানুষ যখন কোন কাজ করে তার পেছনে একটা উদ্দেশ্য থাকে। তার কার্যাবলী সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত আছেন। কিন্তু মানুষ তাঁকে দেখে না, না দেখে তাঁর এবাদত করে। কারণ অন্তর দিয়ে তাঁকে উপলব্ধি করে ভীত হয় এবং আশাও পোষণ করে। পূর্বে বর্ণিত বোখারী শরীফের ১ নম্বর হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুসলিম শরীফের একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন (একদল লোক থেকে) সর্বপ্রথম বিচারের জন্য এমন একজন লোককে হাজির করা হবে, যে স্বীয় জীবন কোরবানী করে শহীদ হয়েছিল। সে আল্লাহ তা'আলার যে সমস্ত নেয়ামত ভোগ করেছিল সেগুলো তাকে স্মরণ করে দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি এ সমস্ত নেয়ামতের শোকর কি করেছ? শোকরিয়াস্বরূপ কি কি কাজ করেছ? সে উত্তরে বলবে, হে প্রভু! আমি তোমার দ্বীনের জন্য নিজের জীবন কোরবানী করেছি, জিহাদ করে শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো, তুমি আমার জন্য বা ইসলামের জন্য জিহাদ করনি। তুমি জিহাদ করেছ নাম, যশ ও বীর পুরুষ সাজার জন্য। তুমি সে

www.nagorikpathagar.org

ফল পেয়েছ অর্থাৎ লোকে তোমাকে বীর পুরুষ বলেছে। আমার জন্য তুমি কোন কাজ করনি, সুতরাং আমার এখানে তোমার কোন পুরস্কার নেই। অতঃপর ফেরেশতাগণ আদেশ পেয়ে তাকে টেনে হেঁচড়িয়ে দোযখে নিক্ষেপ করবে। তারপর একজন আলেমকে হাজির করা হবে। তিনি কোরআন-হাদীস শিক্ষা করেছেন এবং প্রকাশ্যে বাহ্যিকভাবে তদ্রূপ আমল করতেন। তাঁকেও পূর্বোক্তরূপে জিজ্ঞাসা করা হবে। তিনি উত্তর দেবেন, দয়াময় প্রভু! আমি জীবনভর আপনার কোরআন এবং আপনার রাসূলের হাদীস শিক্ষা করেছি এবং শিক্ষা দিয়েছি। এসব আপনার সন্তুষ্টির জন্য করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো, তোমার উদ্দেশ্য ছিল লোক তোমাকে আলেম সাহেব, হাফেয সাহেব, মাওলানা সাহেব বলে সম্মান করুক (হাদিয়া নজরানা পেশ করুক) ইত্যাদি, সেসব তুমি পেয়েছ। লোক তোমাকে যথেষ্ট সম্মান ও তা'যীম করেছে। তুমি আমার জন্য বা আমার ইসলামের জন্য কিছু কর নি; কাজে আমার নিকট তোমার কোন পুরস্কার নেই। অতঃপর ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার আদেশে তাকে হেঁচড়িয়ে টেনে এনে দোযখে নিক্ষেপ করবে। তারপর একজন দানশীল ধনীকে উপস্থিত করা হবে। তাকেও ঐরূপ প্রশ্ন করা হবে এবং সে উত্তর করবে, হে দয়াময় প্রভু! যে যে স্থানে দান করলে তুমি সন্তুষ্ট হও, সে সমস্ত জায়গায় আমি দান-খয়রাত করেছি– একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যুক, তোমার নিয়ত ছিল যে, তোমার নাম হোক, লোকে তোমাকে দাতা বলুক, লোকে তা বলছে। সত্যিকারভাবে তুমি আমার উদ্দেশ্যে কিছু করনি; কাজেই আমার কাছে তোমার কোন পুরস্কার নেই। অতঃপর তাকেও ঐরূপে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

এ হাদীসে বর্ণিত লোকেরা বাহ্যতঃ অত্যন্ত মহৎ কাজ করে মৃত্যুবরণ করেছে কিন্তু তাদের অন্তরের ভাবনা ছিল অন্য রকমের। আল্লাহ জানেন এরা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সে সকল কাজগুলো করেছে– আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়, তাই তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

ওহোদের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় কিছু সংখ্যক যোদ্ধার অন্তরের ভাবান্তরের পরিণাম। মুসলমান যোদ্ধাদের আক্রমণের মুখে টিকতে না

www.nagorikpathagar.org

পেরে শত্রু সৈন্যরা পলায়ন করতে থাকে। তাদেরকে পলায়ন করতে দেখে ওহোদ পাহাড়ের পেছন দিকে নবী (সা.) কর্তৃক নিযুক্ত তীরন্দাজ বাহিনীর একাংশ তাঁর নির্দেশ অমান্য করে স্থান ত্যাগকরতঃ পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থানরত যোদ্ধাদের সাথে মিলিত হতে লাগলেন। জিহাদী ভাবনা থেকে তারা এ কালের লাভের আশা অর্থাৎ গনিমত লাভের ভাবনাকে প্রাধান্য দিলেন। এ অবস্থায় শত্রু সৈন্যরা সুযোগ বুঝে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে তাদেরকে পরাস্ত করে। আল্লাহ্ বলেন, তোমাদের সাথে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন যখন তোমরা আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিনাশ করছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারালে এবং নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করলে এবং যা তোমরা ভালবাস তা তোমাদেরকে দেখার পর তোমরা অবাধ্য হলে। তোমাদের কিছু সংখ্যক ইহকাল চাচ্ছিলে এবং কিছু সংখ্যক পরকাল চাচ্ছিলে (সূরা আলে ইমরান # ৩ : ১৫২)।

অন্তরে যেন মন্দ ভাবনার উদয় না হয় সে জন্য অন্তরকে পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার। আর সে জন্য প্রয়োজন নিয়মিত নামায আদায় করা। পবিত্র কোরআনে উল্লিখিত আছে ঃ নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ (সূরা আনকাবুত # ২৯ : ৪৫)। যারা নিয়মিত নামায আদায় করে তাদের অন্তরে আল্লাহভীতি বিরাজ করতে থাকে। অপরদিকে তারা আল্লাহ্কে ভালবেসে আনন্দবোধ করে। ফলে তারা কোন মন্দ কাজের ভাবনায় নিজেকে ব্যস্ত না রেখে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ভাল কাজে ব্যস্ত থাকে। আর কেউ কোন মন্দ কাজ করে ফেললেও নামায আদায় করে আল্লাহ্র ক্ষমার আশায় থাকে।

আবু ওসমান হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি একজন মহিলাকে চুমু দিয়েছিল। অতঃপর নবী করীম (সা.)-এর দরবারে হাজির হয়ে তাঁকে এ ঘটনা জানালেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ আকিমিস সালাতা, তারাফাইন্নাহারি, ওয়াযুলাফাম মিনাল্লাইলি, ইন্নাল হাসানাতি ইউযহিবনাস সাইয়িয়াতি, যালিকা যিকরা লিযযাকিরীন (সূরা হূদ # ১১ : ১১৪)।

www.nagorikpathagar.org

অর্থাৎ দিনের উভয় অংশে ও রাতের কিছু অংশে নামায কায়েম কর। নিশ্চয় সৎকর্ম অসৎকর্মকে মিটিয়ে দেয়। এটা হয়েছে উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশের বিষয়। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! এ আয়াতটুকু কি আমার জন্য (নাযিল হয়েছে)? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আমার উম্মতের যত লোক এর উপর আমল করবে তাদের সকলের জন্য (সহীহ মুসলিম # ৬৮০১)।

আল্লাহ তা'আলা মানুষের বাহ্যিক চেহারা বা ধন-সম্পদ দেখেন না বরং দেখেন তাদের অন্তর ও কার্যাবলী। আর মানুষের অন্তর রয়েছে আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীনে। আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্জি অনুসারে অন্তর গোমরাহি বা হেদায়াতের পথে ধাবিত হয়। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ বনী আদমের অন্তরসমূহের সমস্তই আল্লাহর (কুদরতের) অঙ্গুলিসমূহের দুই অঙ্গুলির মধ্যে মাত্র একটি অন্তরের ন্যায় অবস্থিত (তাঁর সম্পূর্ণ অধীন)। তিনি যেমন ইচ্ছা তাকে ঘুরিয়ে থাকেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ হে অন্তরসমূহের আবর্তনকারী আল্লাহ, আমাদের অন্তরসমূহকে তোমার এবাদত ও আনুগত্যের দিকে আবর্তিত করে দাও (সহীহ মুসলিম # ৬৫৬০)।

প্রত্যেকের কার্যাবলীর দ্বারা তার অন্তর পরিষ্কার অথবা কলুষিত হয়। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ মুমিন ব্যক্তি যখন কোন পাপ করে তখন তার কলবে (অন্তঃকরণে) একটি কালো দাগ পড়ে। অতঃপর সে যদি তওবা করে এবং সে কাজ ছেড়ে দেয় আর মাগফেরাত কামনা করে, তা হলে তার কলব পরিষ্কার করে দেয়া হয়। যদি সে আরোও পাপ করে তাহলে সে কালো দাগ বেড়ে যায়। এ জংয়ের কথা আল্লাহ কোরআনে উল্লেখ করেছেন ঃ না, এটা সত্য নয়, তাদের কৃতকর্মই তাদের কলবে (হৃদয়ে) জং ধরিয়েছে– (সূরা মুতাফফিফীন # ৮৩ : ১৪), (ইবনে মাজাহ # ৪২৪৪)।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে যা কিছু করা হয়, আল্লাহ তার বিনিময় দিয়ে থাকেন। নেক কাজের অসিলায় তিনি বিপদাপদ থেকে মুক্ত করেন। একটি হাদীসে এমন একটি ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : একবার তিন ব্যক্তি পথ চলাকালীন ঝড়বৃষ্টির দরুন এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। হঠাৎ পাহাড়ের উপর থেকে একটি বিরাট পাথর খণ্ড গুহার মুখে পড়ে তাদেরকে ঢেকে ফেলল। হঠাৎ এ বিপদে পড়ে নিরুপায় হয়ে একে অপরকে বলল, কেউ কোন পুণ্যের কাজ করে থাকলে এর অসিলা দিয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া কর। এতে আল্লাহ হয়তো বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন।

অতঃপর তাদের একজন বলল, হে আল্লাহ! আমার পিতা-মাতা উভয়ে ছিল খুব বৃদ্ধ। এটা ছাড়া আমার স্ত্রী ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে আমি রক্ষণাবেক্ষণ করতাম। আর যখন আমি গৃহপালিত পশুদেরকে মাঠ থেকে এনে দোহন করতাম, তখন আমার ছেলেমেয়েদের পূর্বে আমার পিতামাতাকে দুগ্ধ পান করাতাম।

একদিন একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ পড়ে যাতায়াতের পথ বন্ধ করার ফলে আমার গৃহে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। গৃহে ফিরে দেখলাম মাতাপিতা উভয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। অন্য দিনের মত এ দিনও আমি দুধ দোহন করে তাদের জন্য নিয়ে আসলাম এবং তাদের মাথার পাশে দুধ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। একদিকে তাঁদেরকে ঘুম থেকে জাগানো সমীচীন মনে করলাম না, অপরদিকে বাচ্চাদেরকে আগে পান করানোও সমীচীন মনে করলাম না। অথচ বাচ্চারা ক্ষুধায় আমার পায়ের কাছে চিৎকার করছে। এই অবস্থায় সকাল হয়ে গেল। হে আল্লাহ! তুমি যদি মনে কর একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমি এ কাজ করেছি তবে তুমি দয়া করে এই প্রস্তরখণ্ডের একাংশে সরিয়ে দাও যাতে মুক্ত আকাশ দেখতে পাই। এতে আল্লাহ এর একাংশ সরিয়ে দিলেন এবং তারা আকাশ দেখতে পেল।

www.nagorikpathagar.org

অপরজন বলল, হে আল্লাহ! আমার একটা চাচাতো বোন ছিল, তাকে আমি অত্যধিক ভালবাসতাম এবং তার কাছে যৌন আবেদন জানালাম। কিন্তু সে একশত স্বর্ণমুদ্রা না পাওয়া পর্যন্ত অসম্মতি জ্ঞাপন করল। অবশেষে আমি একশত স্বর্ণমুদ্রা যোগাড় করে তার কাছে নিয়ে আসলাম। এবার যখন আমি যৌন ক্ষুধা মেটাবার জন্য তার দু'পায়ের মাঝখানে বসলাম তখন সে বলে উঠল, হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহকে ভয় কর এবং এই আবরণকে ন্যায্য অধিকার ও বৈধ উপায় ছাড়া উন্মুক্ত করো না। এ কথা শুনে আমি তৎক্ষণাৎ উঠে আসলাম। হে আল্লাহ! তুমি যদি জান যে, একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এই কাজ করেছি, তবে দয়া করে এ পাথরের আরেকটি টুকরা সরিয়ে দাও। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ আরেক খণ্ড সরিয়ে দিলেন।

তৃতীয়জন বলল, আমি একবার একজন মজদুরকে কিছু ধান চাউলের বিনিময়ে কাজে রেখেছিলাম। কাজ শেষে আমি তাকে তার পাওনা দিলে সে তা না নিয়ে চলে গেল। এরপর আমি সে ধান জমিতে চাষ করতে লাগলাম। এমনকি তা দিয়ে অনেক গরু বাছুর জমা করলাম। অতঃপর একদিন সে এসে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহকে ভয় করুন এবং আমার হক নষ্ট করবেন না। তখন আমি বললাম, যাও, ঐ গরু বাছুরগুলো নিয়ে যাও। এ কথা শুনে সে বলল, আল্লাহকে ভয় করুন এবং আমার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবেন না। আমি বললাম, আমি ঠাট্টা করছি না, যাও ঐ সকল গরু বাছুর তোমার। এগুলো তুমি নিয়ে যাও। তখন সে সেগুলো নিয়ে গেল। হে আল্লাহ! তুমি যদি জান যে, আমি একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য এ কাজ করেছি তবে দয়া করে বাকী অংশটুকুও সরিয়ে দাও। তারপর আল্লাহপাক বাকী অংশটুকু সরিয়ে দিয়ে আমাদেরকে মুক্ত করে দিলেন (সহীহ মুসলিম # ৬৭৫২)।

পবিত্র কোরআনে উল্লিখিত আছে ঃ যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না, সেদিন উপকৃত হবে কেবল সে, যে আল্লাহর নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে (সূরা আশ-শুআরা # ২৬ : ৮৮-৮৯)।

---

www.nagorikpathagar.org

পীর, দরবেশ ও মাজার

পৃথিবীতে মানব বসতির শুরু থেকে তাদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্তরে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মধ্য দিয়ে তাঁদের আগমনের ধারা শেষ হয়ে গেছে। ইসলাম আল্লাহর মনোনীত ধর্ম। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম (সূরা আলে ইমরান # ৩ : ১৯)।

হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও হযরত ইয়াকুব (আ.) নিজ নিজ সন্তানদেরকে বলেছেন ঃ হে আমার সন্তানগণ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই ধর্মকে মনোনীত করেছেন (সূরা বাকারা # ২ : ১৩২)। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণের শেষাংশে বলেছেন ঃ হে আমার উম্মতগণ, আমি যা রেখে যাচ্ছি, তা যদি তোমরা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাক, তবে কিছুতেই তোমাদের পতন হবে না। সে গচ্ছিত সম্পদ আল্লাহর কোরআন এবং তাঁর রাসূলের আদেশ তথা হাদীস। নিশ্চয় জেনে রেখ, আমি শেষ নবী। যারা উপস্থিত আছ, তারা অনুপস্থিত সকল মুসলমানের নিকট আমার এ সকল বাণী পৌঁছিয়ে দিও। অতঃপর আকাশের দিকে মুখ তুলে তিনি বলতে লাগলেন ঃ হে আল্লাহ, আমি কি তোমার বাণী পৌঁছিয়ে দিতে পারলাম? উপস্থিত জনতা বলে উঠল ঃ নিশ্চয়, নিশ্চয়। নিশ্চয় ঃআপনি দ্বীনকে পূর্ণরূপে পৌঁছিয়েছেন। তখন নবী (সা.) স্বীয় শাহাদাত আঙ্গুল আকাশের দিকে উঠিয়ে বলতে লাগলেন ঃ হে আল্লাহ সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ সাক্ষী থাক (বিশ্ব নবী ও বোখারী শরীফ # ৯১১)।

এ সময় অহী নাযিল হল... আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম (সূরা মায়েদা # ৫ : ৩)।

www.nagorikpathagar.org

ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমার উম্মতের সর্বোত্তম যুগ ও জামাত আমার যুগ ও জামাত (অর্থাৎ সাহাবাদের যুগ)। অতঃপর ঐ যুগ সংলগ্ন যুগ (অর্থাৎ সাহাবাদের হাতে গঠিত তাবেয়ীনের যুগ ও জামাত)। তারপর এই দ্বিতীয় যুগ সংলগ্ন তৃতীয় যুগ ও জামাত (তাবেয়ীনের দ্বারা গঠিত তাবে তাবেয়ীনের যুগও জামাত (বোখারী শরীফ # ১৮১৩)।

তাবে তাবেয়ীনদের জমানার পরবর্তী উম্মতদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) সরাসরি কিছু বলেননি। তবে বিপথগামীর আধিক্যের ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন। হযরত আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ আমার পরে আমার উম্মতের মধ্যে বা অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে– তারা কোরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না, তীর যেভাবে শিকার ভেদ করে চলে যায় তারাও তেমনিভাবে দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে, আর ফিরে আসবে না। সৃষ্টিকুলের মধ্যে তারা নিকৃষ্ট ও অধম (সহীহ মুসলিম # ২৩৩৭)। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সেদিন অতি নিকটবর্তী– যখন একজন মুসলমানের জন্য উত্তম সম্পদ হবে মাত্র কয়েকটি বকরি, যেগুলো নিয়ে সে পাহাড়-পর্বতের চূড়ায়– যেখানে বৃষ্টির পানিতে ঘাস-পাতা জন্মায় এমন স্থান অনুসন্ধান করে সেখানে বসবাস করবে। সে স্বীয় দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য লোকালয় থেকে সরে পড়বে (বোখারী শরীফ # ১৮)।

ইসলামকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা এবং এর প্রসারের জন্য আলেম, পীর, ফকীর, আউলিয়া ও দরবেশগণের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। পীর ফার্সী শব্দ। এর অর্থ মুরব্বী বা শিক্ষক। কোরআন বা হাদীসে পীর ও মুরীদ এ শব্দ দু'টি নেই। কেউ কেউ বলে থাকে অবশ্যই পীরের মুরীদ হতে হবে কেননা মৃত্যুর সময় এবং কেয়ামতের দিনে পীর মুরীদকে সাহায্য করে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। মৃত্যুর সময় ঈমানের জোর ছাড়া অন্য কিছু সাহায্য করবে না। কেয়ামতের দিন নিজের আমল, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুপারিশ এবং আল্লাহর অসীম রহমত ছাড়া কোন কিছু কাকেও বেহেশতে

www.nagorikpathagar.org

নিতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বেহেশতে যাবেন, এ ঘোষণা আল্লাহ দিলেও রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ আমিও বেহেশত লাভ করতে পারব না যাবত না আল্লাহ আমাকে আপাদমস্তক তাঁর ক্ষমা ও রহমত দ্বারা আবৃত করে নেন (বোখারী শরীফ # ২৪৪০)। তাই মুরীদকে বেহেশতে নেয়া তো দূরের কথা পীর নিজে বেহেশতে যেতে পারবেন এমন নিশ্চয়তা কি তাঁর আছে? পীরের সত্যিকারের কাজ মুরীদকে কোরআন, হাদীস, ফিকাহ শিক্ষা দেয়া যাতে মুরীদরা সঠিক পথে থেকে সঠিক আমল করে বেহেশত পাওয়ার চেষ্টা করতে পারে।

বর্তমান সময়ে খাঁটি পীর অপেক্ষা স্বার্থান্বেষী ভণ্ড পীরের সংখ্যা অনেক বেশী। খাঁটি পীর সারা জীবন আল্লাহর পথে থেকে ধর্মের প্রচার ও প্রসারের চেষ্টা করেন এবং নিজের পরকালের পথ পরিষ্কার করেন। আর যারা ভণ্ড তারা মানুষকে গোমরাহির দিকে ঠেলে দেয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছাড়া অন্য সকল নবী কেয়ামতের দিন ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী বলতে থাকবেন। নিজের উম্মতেরা সুপারিশের জন্য আসলে নিজের অপারগতা প্রকাশ করবেন। অতএব সে কঠিন দিনে পীর-ফকীর মুরীদের জন্য সুপারিশ করবে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অবাস্তব।

কোন মানুষকে আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ করে সৃষ্টি করেননি। তাই অনেকেই পীরের কাছে কিছু না কিছু চাইতে যায়। তাদের ধারণা পীরের দোয়ায় অনেক চাহিদা পূরণ হতে পারে। তাই কেউ সম্পদ, কেউ সন্তান, কেউ রোগমুক্তি, কেউ চাকুরি বা ব্যবসায় উন্নতি অথবা কেউ মামলা-মোকদ্দমায় জয় লাভের জন্য পীরের কাছে যায়। ভণ্ড পীর-দরবেশ সে সুযোগ গ্রহণ করে মানুষকে প্রতারিত করে। অনেকের বহু ভক্ত বা মুরীদ থাকে। এদের আর্থিক সহায়তা ও সেবা-যত্নে তাদের দিন ভালই কাটে। আল্লাহ বলেন, জেনে রাখুন এবাদত শুধু আল্লাহর জন্য। যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে আউলিয়া (অভিভাবক) বানিয়েছে এবং বলে যে, আমরা তাদের এবাদত এ জন্য করি যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয় নিশ্চয় আল্লাহ তাদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ

www.nagorikpathagar.org

বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন। আল্লাহ্ মিথ্যাবাদী ও কাফেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না (সূরা যুমার # ৩৯ : ৩)। আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে পীরের পূজা করার লোকের অভাব নেই।

পীরের বাড়ীতে বছরে এক বা একাধিকবার মুরীদরা গরু, মহিষ, ছাগল বা ভেড়া যবাই করে ধুমধাম করে ওরস করে। কখনো কখনো ঢোল তবলা বাজিয়ে গান করে, গানের সাথে সাথে জযবা বা হক মাওলা বলে লাফাতে থাকে। বিদায়ের সময় পীরকে খুশী করার জন্য সাধ্যমত টাকা-পয়সা দিয়ে আসে। পীর মারা গেলে তার জন্ম দিবসে এবং মৃত্যু দিবসে অথবা উভয় দিবসে তার বংশধরদের সহায়তায় ওরস হয়। বংশানুক্রমে এটা চলতে থাকে। চাকুরি জীবনে আমার অধীনস্থ এক কর্মকর্তা এমনি একটি পরিবারের সন্তান। তিনিও ওরস করান। একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি পীর? তিনি বললেন, না। আবার জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে আপনি ওরস করান কেন? বিনয়ের স্বরে তিনি বললেন, স্যার, আমার দাদার দাদা পীর ছিলেন। তাঁর বংশধর হিসেবে আমাদের আটাশটি পরিবারে ওরস হয়। ওরসে পাওয়া টাকায় আমাদের সংসারের এক বছরের খরচ চলে।

এই প্রকারের পীর অপেক্ষা আরোও জঘন্য পীর দেখা যায়। ইসলামী শরীয়তের কোন কিছুই তাদের মধ্যে নেই। আমি তখন সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি। আমাদের গ্রামের দিনে এনে দিনে খাওয়া একটি পরিবার তাদের পীরকে বাড়িতে দাওয়াত করেছে। আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে তাদের বাড়ীতে যাবার পথ। পীর দেখার আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই পীরকে আসতে দেখা গেল। দেখলাম, দু'পাশে লম্বা বাঁশ বাঁধা একটি বড় চেয়ারে পীর বসা এবং ৮/১০ জন ভক্ত বাঁশে করে কাঁধে নিয়ে বহন করে আনছে। কাছে আসলে দেখলাম, বিশাল দেহের অধিকারী পীর পাঁচ-ছয় ইঞ্চি চওড়া একখণ্ড কাপড়ের টুকরার লেংটি পরে লজ্জাস্থান ঢেকেছে আর বাকী শরীরে কোন কাপড় নেই। এ অবস্থা দেখে কৌতূহলী হয়ে কিছুক্ষণ পরে আমার সমবয়সী কয়েকজনকে নিয়ে

www.nagorikpathagar.org

মুরীদের বাড়ীতে পীরকে দেখতে গেলাম। দেখলাম, পীর ঘরের একটি খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে আছে। এক যুবক তাকে হাত পাখা দিয়ে বাতাস দিচ্ছে এবং দুই-তিনজন নারী তার হাত-পা ও শরীর টিপে খেদমত করছে।

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার ধনিসকরা গ্রামে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় তিনদিকে বাঁশের বেড়া এবং একদিকে লোহার রডের ঘেরা দেয়া একটি কক্ষে এ শ্রেণীর এক ফকীর থাকত। এ ফকীর প্রথম কর্ম জীবনে কোর্টের দারোয়ান অথবা পিয়ন ছিল। পরে মাথা গরম হয়ে ফকীর হয়েছে। ভগ্নিপতির আশ্রয়ে ফকিরী করত। মানুষ মামলা-মোকাদ্দমার তদবীরের জন্য তার নিকট যেত। কখনো কখনো ফকীর মামলার রায় সম্পর্কে অগ্রিম বলে দিত। মানুষ তার জন্য খাবার দিত এবং ভগ্নিপতির হাতে টাকা দিত। তার এক শিষ্য কুমিল্লার লাকসাম উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামে উলঙ্গ অবস্থায় থাকত। মানুষ দোয়া চাইতে তার নিকট যেত। তাদের কাহিনী মানুষের মুখে শুনে স্বচক্ষে একবার দেখে এসেছি।

চট্টগ্রাম শহরের মাদার বাড়ীতে লেংটা ফকীর নামে খ্যাত আরেক ফকীরকে দেখেছি। এ ফকীর দিনের বেলায় যখন রাস্তায়-রাস্তায় বা অলি-গলিতে হেঁটে বেড়াত তখন বোরখা পরিহিত কিছু মহিলা তার পেছনে পেছনে হেঁটে চলত। কোন কোন পুরুষ বা নারী তার দোয়া নেয়ার জন্য তাকে অনুসরণ করত। রাতে তার বাড়ীতে ভক্তদের আনাগোনা হত। মানুষ দোয়া নিতে এসে কিছু টাকা-পয়সা পরিবারের লোকদের হাতে দিয়ে যেত।

প্রকৃতপক্ষে এ সকল লোকেরা পীর, ফকীর বা দরবেশ কিছুই নয়। বিজ্ঞ আলেমদের সাথে আলোচনা করে জানতে পারলাম, খারাপ জিন তাদের সঙ্গী। জিনের সাহায্যে কখনো কখনো কিছু সত্য কথা বলে মানুষের বিশ্বাস জন্মায়। ধর্মীয় পীর-ফকীর হিসেবে বিশ্বাস করে ভক্তেরা ঈমান হারায়। শেখ সাদী (র.) বলেছেন, এলেমবিহীন দরবেশ, পাখাবিহীন পাখী এবং বে-আমল আলেম ফলহীন বৃক্ষের ন্যায়। (মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সংকলিত কুড়ানো মানিক)

www.nagorikpathagar.org

যারা খাঁটি পীর তাঁরা ভক্তের অর্থ বা সেবার জন্য লালায়িত নন। তাঁদের কাজ মানুষের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করে তাদেরকে খাঁটি ঈমানদার বানিয়ে ইসলামের মধ্যে শামিল করা। ইসলামের জগতে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নাম শোনা যায় তাঁদের সকলেই কোন না কোন ওস্তাদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। সে সমস্ত ওস্তাদগণ অর্থ বা সেবার জন্য লালায়িত নন। হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) বাল্যকাল থেকে ছিলেন একজন সত্যবাদী এবং জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তি। তিনি বাগদাদের মাদ্রাসায়ে নিযামিয়া থেকে কামেল পরীক্ষায় পাস করেন। অতঃপর সেকালের বিশিষ্ট আলেমদের নিকট থেকে হাদীস শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন। শিক্ষা শেষে তিনি মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে শিক্ষাদান শুরু করেন। অবশেষে নিজে মাদ্রাসায়ে কাদেরিয়া নামে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্ররা এসে এ মাদ্রাসায় পড়াশুনা করত। রাতের বেশীর ভাগ সময় তিনি আল্লাহর ধ্যানে কাটিয়ে দিতেন। তিনি ১১৬৬ খৃষ্টাব্দে ৯১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইরাকের বাগদাদ শহরে তাঁর মাজার অবস্থিত।

হযরত খাজা মইনুদ্দীন চিশতী (র.) ইসলাম জগতের আরেক উজ্জ্বল নক্ষত্র। আফগানিস্তানের চিসতানে তাঁর জন্ম। তিনি তাঁর পাঠ্য জীবন শেষ করে সমরকন্দ ও বোখারা ভ্রমণ করেন। মধ্য বয়সে তিনি ওসমান হারুনী (র.)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। উভয়ে মক্কা ও মদীনাসহ মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণ করেন। কথিত আছে, একদা স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে তিনি লাহোর হয়ে আজমীর গমন করেন। সে সময় ভারতের হিন্দুরা খুবই মুসলিম বিদ্বেষী ছিল। কিন্তু খাজা সাহেবের অক্লান্ত চেষ্টায় বহু হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করেছিল। সম্ভবতঃ ১২৩০ খৃষ্টাব্দে ৮৯ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। আজমীরে তাঁর কবরের উপর মাজার গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ সে মাজার যিয়ারতে যায়। যিয়ারতে গিয়ে বিদআতী কাজ করে অনেকে গুনাহগার হচ্ছে। অর্থলোভী মাজার কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন কৌশলে সহজ সরল মানুষকে প্রতারিত করে অর্থ সংগ্রহ করে। তারা বিদেশীদের

www.nagorikpathagar.org

নিকট টাকা চেয়ে পত্র পাঠায়। কখনো কখনো পত্রে লিখে থাকে ঃ আপনার মনোবাসনা পূরণের জন্য খাজা বাবার মাজার যিয়ারত করা দরকার। আপনি আসতে না পারলে এ পরিমাণ টাকা আমাদের নিকট পাঠিয়ে দেন। আমরা আপনার পক্ষ থেকে এটা করে দেব। পত্রের শেষে লেখা থাকে ঃ নিবেদক খাজা বাবার বিশিষ্ট খাদেম খাজা অমুক চিশতী ইত্যাদি।

আউলিয়াদের মধ্যে অতি পরিচিত আরেক নাম হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.)। ইরানের বোস্তামে ৮০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। তিনি সত্যের সাধক। অধিকাংশ সময় আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। একবার শিষ্যদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, আল্লাহ ছাড়া কোন কিছু কামনা করো না। আল্লাহ যখন তোমাদের হয়ে যাবে, তখন দেখবে, সবকিছু তোমাদের। অজ্ঞতাবশতঃ মানুষ অনেক কিছু কামনা করে কিন্তু সেগুলো তাকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় (তাযকিরাতুল আউলিয়া)। তিনি ৭০ বছর বয়সে ৮৭৪ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি কোথায় মৃত্যুবরণ করেছেন, সেই সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। অনেকের মতে তিনি তার জন্মস্থান ইরানের বোস্তামে মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানে সমাহিত হন। অন্য তথ্যানুযায়ী তিনি সিরিয়ার দামেস্কে সমাহিত হয়েছেন। অন্যদিকে চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ এলাকার একটি পাহাড়ের উপরে তাঁর নামে একটি মাজার রয়েছে। এ স্থানে তিনি সমাহিত হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। এই মাজারের একটি পুকুরে বড় আকারের বহু কচ্ছপ দেখা যায়। মানুষ গরু-ছাগলের ফুসফুস বা নাড়িভুঁড়ি কিনে এগুলোকে খাওয়ায়। লোকে বলে বায়েজীদ বোস্তামী (র.) জিনকে কচ্ছপ বানিয়ে রেখেছেন। এ কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য কিনা জানি না। পাহাড়ের উপরে মাজারের নিকটবর্তী গাছে অসংখ্য রঙ্গিন সুতা ঝুলতে দেখা যায়। মানুষ নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য মাজারের নামে নিয়ত করে এ সকল সুতা বেঁধে রাখে এবং এক সপ্তাহ পরে গিয়ে খুলে দেয়। এসব মাজার কর্তৃপক্ষের রোজগারের পন্থা ছাড়া আর কিছু নয়। কিছু দালাল এই কাজ করার জন্য মানুষকে প্ররোচিত করে। এগুলো করে মানুষ গুনাহগার হচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

হযরত শাহ্ জালাল (র.) বাংলাদেশে অত্যন্ত পরিচিত একটি নাম। সিলেট শহরে তাঁর মাজার অবস্থিত। আরবের ইয়েমেনে ১৩২২ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে মাতা-পিতাকে হারিয়ে মামার নিকট মানুষ হন। মামা তাঁকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। একরাত্রে স্বপ্নযোগে তিনি ইসলাম প্রচারের নির্দেশ পান। তিনি মামাকে তা জানালে মামা সৈয়দ আহমদ কবীর ভাগিনাকে এক মুষ্টি মাটি দিয়ে বললেন, এটা নিয়ে তুমি পূর্বদিকে যাত্রা কর। যে স্থানে রাত্রি যাপন করবে সে স্থানের মাটির সাথে এটা মিলিয়ে দেখবে। যদি মিলে যায় তবে সে স্থানে তোমার আস্তানা তৈরি করবে। শাহ্ জালাল (র.) ১২ জন সঙ্গী নিয়ে যাত্রা করলেন। মামার দেয়া মাটি মিলাতে মিলাতে অবশেষে সিলেটের মাটির সাথে মিলে গেলে সেখানে আস্তানা তৈরি করলেন। সিলেটের মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু রাজা গৌর গৌবিন্দকে মোকাবেলা করতে তাঁকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। তথাপি তিনি ইসলামের প্রচারে আত্মনিয়োগ করে সফল হয়েছেন। তাঁর মাজার থেকে কয়েক মাইল দূরে তার ভাগিনা শাহ পরান (র.)-এর মাজার রয়েছে। হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.)-এর মাজারের মত শাহ্ জালাল (র.)-এর মাজারের একটি পুকুরে অনেক বড় বড় বহু গজার মাছ্ রয়েছে। এ স্থানেও বলা হয়ে থাকে এরা জিন। শাহ্ জালাল (র.) এদেরকে মাছ বানিয়ে রেখেছেন। এ কথার কতটুকু বিশ্বাসযোগ্যতা আছে তা একমাত্র আল্লাহ্ ভাল জানেন। এ মাজারেও বাৎসরিক ওরস হয়। লোকেরা দলে দলে ভাগ হয়ে গান-বাজনা করে। কাউকেও গাঁজা সেবন করতে দেখা যায়।

চট্টগ্রামের পাহাড়তলি এলাকায় ১২ আউলিয়ার মাজার নামে একটি কথিত মাজার রয়েছে। এটা ঢাকা-চট্টগ্রাম রোডের পূর্ব পাশে অবস্থিত। যাতায়াতের সময় বাস এর কাছাকাছি আসলে হেলপার বা কন্টাক্টার বারো আউলিয়া, বারো আউলিয়া বলে চিৎকার দিতে শুরু করে এবং ড্রাইভার বাসের গতি কমিয়ে দেয়। যাত্রীরা জানালা দিয়ে মাজারের দিকে টাকা-পয়সা ছুড়তে থাকে। কখনো কখনো কন্টাক্টার যাত্রীদের নিকট থেকে আগে টাকা-পয়সা সংগ্রহ করে নেয় এবং বাস মাজারে পৌছলে তা ছুড়ে দেয়।

www.nagorikpathagar.org

মাজারের লোকেরা তা কুড়িয়ে নেয়। মাজার কর্তৃপক্ষ বলে থাকে ১২ জন আউলিয়া সে স্থানে বসে বিশ্রাম করছিলেন। এই মাজার তাঁদের স্মরণে গড়ে উঠেছে। ধর্মভীরু সহজ-সরল মানুষকে ধোঁকা দেয়ার কি চমৎকার ফন্দি!

চট্টগ্রাম শহরের লাল দীঘির পূর্বদিকে আমানত শাহ্ (র.)-এর মাজারের পরে বদর শাহ্ (র.)-এর মাজার অবস্থিত। আমানত শাহ (র.)-এর মাজারে বহু লোকের সমাগম হলেও বদর শাহ (র.)-এর মাজারে লোকজন খুব কমই গিয়ে থাকে। অনেকে বলে এই মাজারে কেউ সমাহিত হননি। আমি যতদূর শুনেছি বদর শাহ (র.)-এর মাজার ত্রিপুরার উদয়পুরে অবস্থিত।

এমনও কাহিনী রয়েছে যে, এক পথিকের বাহনের উটটি পথিমধ্যে মারা গেলে সে মাটি খুঁড়ে এটাকে মাটি চাপা দিয়ে প্রিয় উটটির জন্য পাশে বসে কান্না করছিল। এমন সময় আরেক পথিক পাশে দিয়ে যাবার সময় থেমে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে ভাই? প্রথম পথিক উত্তর না দিয়ে কান্না করে চলছে। দ্বিতীয় পথিক ধারণা করল, হয়তো তার কোন প্রিয়জন মারা গেছে। সহানুভূতি দেখাবার জন্য প্রথম পথিকের সামনে কিছু অর্থ রেখে চলে গেল। অতঃপর যারা সেই পথে যাচ্ছিল তাদের অনেকেই কিছু না কিছু দিয়ে যেতে লাগল। পথিকটি বুঝতে পারল রোজগারের এটা একটি সহজ উপায়। সে এর উপর একটি ঘর তৈরি করে কল্যাণ শাহ্ মাজার এর মত একটি কাল্পনিক নাম লিখে দিয়ে স্থায়ী রোজগারের পথ করে নিল। অনুসন্ধান করলে এরূপ বহু মাজারের খোঁজ পাওয়া যাবে।

পীর-ফকীর মারা গেলে তার কবরের উপর মাজার গড়ে উঠে। হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কবর পাকা করতে, কবরের উপর বসতে ও কবরের উপর গৃহ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন (সহীহ্ মুসলিম # ২১১৭)। ভক্তরা কবরকে সামনে রেখে দোয়া চাইতে থাকে। অনেকে সেজদাবনত হয়ে কান্নাকাটি করে কবরবাসীর কাছে দোয়া চাইতে থাকে। ফেরার সময় কবরের দিকে মুখ রেখে পেছন দিকে হেঁটে

www.nagorikpathagar.org

বের হয়ে আসে। অন্যথা পীরের প্রতি অসম্মান করা হয়। কিন্তু তারা জানে না, মাজারের বাসিন্দা কারো কথা শুনতে পায় না এবং কাকেও কিছু দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। তদুপরি আল্লাহর নিকট না চেয়ে কবরবাসীর নিকট কিছু চাওয়া মারাত্মক গুনাহ বা শিরক। আল্লাহ বলেন : আপনি (মুহাম্মদ সা.) কবরে শায়িতদেরকে শুনাতে সক্ষম নন (সূরা ফাতির # ৩৫ : ২২)। যদি কেউ বলতে চান যে, কোরআনে বলা হয়েছে : আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদেরকে মৃত বল না বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা বুঝ না (সূরা বাকারা # ২ : ১৫৪)। অথবা আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত মনে কর না, বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও তাঁর নিকট থেকে জীবিকাপ্রাপ্ত (সূরা আলে-ইমরান # ৩ : ১৬৯)। তাদের বুঝতে হবে, আয়াত দু'টিতে শহীদগণকে বুঝানো হয়েছে। শহীদদের মর্যাদা নবী ও রাসূলগণের পরেই রয়েছে। তাঁরা কবর বা বরযখী জীবনে জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত, তবে কি অবস্থায় আছেন একমাত্র আল্লাহ তা জানেন, মানুষ জানে না।

আয়েশা (রা.) ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগকালীন যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় অস্থির ছিলেন, সে মুহূর্তে বলেছিলেন : ইহুদী ও নাসারাদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক, তারা পয়গম্বরগণের কবরকে মসজিদ বা সেজদার স্থান করে নিয়েছে। আর ইহুদীদের মত না করতে তিনি বার বার হুঁশিয়ার করে দিচ্ছিলেন (বোখারী শরীফ # ২৭৮, সহীহ মুসলিম # ১০৭৬)।

পীর খাঁটি হোক বা ভক্ত হোক কেউ মারা গেলে ভণ্ডরা তার সম্পর্কে বিভিন্ন কল্প-কাহিনী বানিয়ে তাকে অন্যদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) সম্পর্কে শুনা যায় তিনি একই দিনের একই সময়ে ৪০ জন ভক্তের বাড়িতে দাওয়াত খেয়েছিলেন। খাজা মইনুদ্দীন চিশতী (র.) সম্পর্কে শুনা যায় তাঁর মৃত্যুর পরে তিনি ছদ্মবেশে এসে নিজের জানাযা পড়িয়েছিলেন, অথচ মৃত ব্যক্তি কখনো স্বশরীরে ফিরে আসতে পারে না। বাস্তব সত্য এই যে, তাঁর পুত্র খাজা ফখরুদ্দীন (র.)

www.nagorikpathagar.org

পিতার জানাযা পড়িয়েছিলেন। হযরত নিজাম উদ্দীন আউলিয়া (র.) সম্পর্কে বলা হয়, তিনি প্রথম জীবনে ছিলেন ডাকাত এবং একশত একজন খুন করে আউলিয়া হয়েছেন। এটা ডাহা মিথ্যা কথা। বাল্যকাল থেকেই তিনি পড়া-লেখায় ব্রতী ছিলেন এবং বিভিন্ন পীর মোর্শেদের দরবারে গিয়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তিনি বহু ভক্ত রেখে ৮৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁর জানাযায় দিল্লীর তৎকালীন সম্রাট মুহাম্মদ তুঘলক শরীক হয়েছিলেন।

কেউ কেউ নিজের পীর সম্পর্কে বলে : আমার পীর সাহেব কিবলাকে আমাদের মাঝে দেখা যেত অথচ সে সময় তাঁকে কা'বা শরীফে নামায পড়তে দেখা গেছে। আবার কেউ বলে, আমার পীর সাহেবকে পানির উপর দিয়ে হাঁটতে দেখা গেছে ইত্যাদি।

বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তিকে দেখ যে, সে আকাশে উড়ছে অথবা পানির উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, আর তার আমল যদি হয় সুন্নাতের খেলাফ তবে তাকে জুতা পিটা কর। কেননা নিঃসন্দেহে লোকটি শয়তান এবং ভোজবাজির মাধ্যমে সে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছে। (মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সংকলিত কুড়ানো মানিক)

কোন কোন পীরের মুরীদকে দেখা যায় ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ বলে যিকির করে কিন্তু নামায পড়ে না এবং রোযা রাখে না। সেই ক্ষেত্রে ধরে নেয়া যায় হয়তো পীর ভণ্ড নয়তো মুরীদ। পীর খাঁটি হলেও মুরীদ লোক দেখানো ভক্ত সেজে অপকর্ম করতে পারে।

বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে ও শহরে-বন্দরে অসংখ্য পীর এবং মাজার রয়েছে। একমাত্র ঢাকা শহর ও এর আশেপাশে বিশ থেকে ত্রিশটি মাজার আছে। এদের মধ্যে মতিঝিলে শাহ পীর জঙ্গী (র.), গুলিস্তানে গোলাপ শাহ (র.), হাইকোর্ট প্রাঙ্গনে খাজা শরফুদ্দীন চিশতী (র.) এবং মিরপুরে শাহ আলী বোগদাদী (র.)-এর মাজার উল্লেখযোগ্য।

www.nagorikpathagar.org

দেশের অন্যান্য মাজারের মধ্যে চট্টগ্রাম শহরে শাহ আমানত (র.) ও শাহ গরীবুল্লাহ (র.), চট্টগ্রাম জেলার নাজীর হাটের মাইজ ভাণ্ডারে সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (র.) ও সৈয়দ গোলাম রহমান (র.), ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় শাহ পীর কল্লা শহীদ (র.), সিলেটে হযরত শাহ জালাল (র.) ও শাহ পরান (র.), বগুড়ার মহাস্থান গড়ে শাহ সুলতান বলখী (র.), রংপুরের পীরগঞ্জে বড় দরগা, রংপুর শহরে শাহ কেরামত (র.), খুলনার বাগেরহাটে খান জাহান আলী (র.) এবং রাজশাহীতে শাহ মখদুম (র.) এর মাজার উল্লেখযোগ্য। যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মাজারে যেতে কোন দোষ নেই। রাসূলুল্লাহ (সা.) জান্নাতুল বাকী কবরের স্থানে গিয়ে শহীদ ও অন্যান্যদের কবর যিয়ারত করতেন। তিনি বলেছেন : আমি আমার প্রভুর নিকট আমার মায়ের জন্য ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হলো না। আমি তার কবর যিয়ারত করার জন্য তার নিকট অনুমতি চাইলে আমাকে অনুমতি দেয়া হলো। অতএব তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা কবর যিয়ারত মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় (সহীহ মুসলিম # ২১৩১)। কিন্তু কবরবাসীর নিকট কিছু চাওয়া-পাওয়ার উদ্দেশ্যে মাজারে গেলে পরকালের দুর্ভোগ বেড়ে যেতে পারে।

যদি গাছের বড় কাঁঠালটি অথবা পুকুরের বড় মাছটি পীরের বাড়ীতে দিতে হয় সে পীরের কাছে না যাওয়াই নিরাপদ। যে পীর শুধু ওরস করা এবং মুরীদের পকেট খালি করার চিন্তা করে অথচ মুরীদকে ধর্মীয় এলেম শিক্ষা দেয় না সে ভণ্ড। আল্লাহর কোরআন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসের অনুসরণ বেহেশত পাওয়ার জন্য যথেষ্ট। আর মুসলমানের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) অপেক্ষা বড় পীর আর কেউ নেই। তদুপরি বান্দা নিজেই তার প্রভুর নিকট নিজের ফরিয়াদ পেশ করতে পারে। তাই পীরের সন্ধান করার কোন প্রয়োজন পড়ে না। তার পরেও কেউ পীরের মুরীদ হতে চাইলে পীরের সমস্ত গুণাবলি ও দোষ-ত্রুটি যাচাই-বাছাই করে নেয়া দরকার।

www.nagorikpathagar.org

মাতা-পিতা

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মাটি সংগ্রহ করে তা দ্বারা আদম (আ.)কে সৃষ্টি করেন। অতঃপর তিনি তাঁর বাম পাঁজরের হাঁড় থেকে তাঁর স্ত্রী বিবি হাওয়া (আ.)কে সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে আসার পর তাঁদের মিলনে জন্ম লাভ করেছে তাঁদের পুত্র ও কন্যাগণ। কথিত আছে যে, তাঁদের আঠারো জোড়া সন্তান জন্ম লাভ করেছিল। তাঁদের বর্ণ, স্বভাব ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ছিল। হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : মহান আল্লাহ আদম (আ.)কে এমন এক মুষ্টি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেন, যা তিনি পৃথিবীর সকল অংশ থেকে নেন। আর এ কারণেই আদম সন্তান সে মাটির স্বভাব অনুযায়ী কেউ সাদা, কেউ লাল, কেউ কালো আর কেউ মাঝামাঝি রংয়ের হয়েছে। আর এ জন্য তাদের কারো স্বভাব নরম, কারো কঠোর আর কেউ খাবীছ (কাফের, মুশরিক) এবং কেউ পবিত্র স্বভাবের অর্থাৎ মুসলমান (আবু দাউদ # ৪৬২০)। পৃথিবীর সকল মানুষ তাঁদেরই বংশধর।

বংশ বৃদ্ধির এ ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্যই আল্লাহ স্বামী-স্ত্রী যুগল সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন : হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে... (সূরা হুজুরাত # ৪৯ : ১৩)। পবিত্র কোরআনে আরোও বলা হয়েছে, আর তিনিই (আল্লাহ) সৃষ্টি করেন যুগল– পুরুষ ও নারী (সূরা নাজম # ৫৩ : ৪৫)। এ যুগল সন্তানের জন্ম দিয়ে মাতা ও পিতা হন। কোন দম্পতির সন্তান হয় না। কোন দম্পতি শুধু কন্যা, কোন দম্পতি শুধু পুত্র এবং কোন দম্পতি পুত্র ও কন্যা উভয়েরই জন্ম দিয়ে থাকেন। সন্তানের জন্ম সম্পূর্ণভাবেই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। কোরআনে বলা হয়েছে : তিনি (আল্লাহ) যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই আর যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বন্ধ্যা। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান (সূরা শূরা # ৪২ : ৪৯-৫০)।

www.nagorikpathagar.org

নারী ও পুরুষের যৌন মিলনের মাধ্যমে পুরুষের শুক্র এবং নারীর ডিম্ব মিলিত হলে সন্তান জন্মের সূত্রপাত হয়। কালক্রমে এই বীর্য বিভিন্নভাবে রূপান্তরিত হতে হতে পুত্র অথবা কন্যা সন্তানের পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করে। মায়ের ডিম্বে "XX" অর্থাৎ শুধুই কন্যার ক্রোমোজম থাকে। অপরদিকে পিতার শুক্রে "XY" অর্থাৎ কন্যা ও পুত্র এই উভয়ের ক্রোমোজম থাকে। মায়ের "X" এর সাথে পিতার "X" মিলিত হলে কন্যা সন্তান এবং মায়ের "X" এর সাথে পিতার "Y" মিলিত হলে পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। মহান আল্লাহ বলেন : আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান থেকে, অতঃপর আমি একে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে (মায়ের জরায়ুতে), পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি আলাকে (রক্তপিণ্ডে), অতঃপর আলাককে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিতে, অতঃপর অস্থিকে ঢেকে দেই গোশত দ্বারা; অবশেষে একে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান (সূরা মুমিনুন # ২৩ : ১২-১৪)। উল্লেখযোগ্য যে, সন্তান মাতার গর্ভে মাংসপিণ্ডে পরিণত হলে আল্লাহ চারটি বাক্যসহ একজন ফেরেশতা পাঠিয়ে তার কার্য, বয়স, জীবিকা এবং সে ভাগ্যবান বা দুর্ভাগা তা লিখে দেন (বোখারী শরীফ # ১৫৮৬)।

অধিকাংশ দম্পতি এবং তাদের পরিবার পুত্র সন্তান কামনা করে। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে, এর পেছনে রয়েছে জাগতিক স্বার্থের ভাবনা। তাইতো অধিকাংশ মাতা-পিতা পরকালের চিন্তা না করে বুদ্ধিমান ছেলেদেরকে পাঠায় স্কুল-কলেজে এবং বোকা ছেলেদেরকে মাদ্রাসায়। আর এ কারণে কন্যা সন্তানের জন্ম হলে অনেকের মুখে হাসি ফুটে না। আসলে এ লোকেরা নির্বোধ। আল্লাহর বিধানে তারা আস্থাশীল নয়। সৃষ্টির রহস্য তারা বুঝে না। তাই কন্যা সন্তান জন্ম দেয়ার জন্য তারা মাকে দায়ী করে। অথচ কন্যা সন্তানের জন্মের জন্য আল্লাহর ইচ্ছায় পিতার "X" ক্রোমোজম দায়ী। পত্র-পত্রিকা এবং রেডিও-টেলিভিশনের খবরে জানা যায়, কন্যা সন্তান জন্ম দেয়ার দায়ে মাকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা, তালাক দেয়া, শ্বাসরোধ করে অথবা গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়।

www.nagorikpathagar.org

শুক্র ও ডিম্বের মিলন থেকে শুরু করে বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ শিশুরূপে জন্মগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত সন্তান মায়ের গর্ভে সাধারণতঃ দুইশত আশি দিন অর্থাৎ নয় মাস দশ দিন অবস্থান করে। অতঃপর অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় দুনিয়ায় তার আগমন ঘটে। সে সময় সে চলতে পারে না, বলতে পারে না। মা তাকে আদর-যত্ন দিয়ে দু'বছর পর্যন্ত বুকের দুধ পান করান। তবে বর্তমান সময়ের অবস্থা ভিন্ন ধরনের। আধুনিকা মায়েরা চাকুরি করা, সংসার সামলানো, সভা-সমিতিতে যোগদান করার ব্যস্ততার অজুহাতে, কেউবা নিজের স্বাস্থ্যহানি বা রূপ-লাবণ্য নষ্ট হওয়ার ভয়ে শিশুকে বুকের দুধ পান না করিয়ে বাজার থেকে শিশু খাদ্য কিনে এনে খাওয়ান। অনেকে মনে করেন, এ কারণে মায়ের সাথে সন্তানের ভালোবাসার সম্পর্ক গভীর হয় না। মা বিনা ওজরে সন্তানকে স্তনদুগ্ধ পান না করালে বরযখী জীবনে তাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে (বিস্তারিত কবর আজাব অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকেই সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন এবং আল্লাহকে ভয় কর যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা কর এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতিবন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন (সূরা নিসা # ৪ : ১)। আল্লাহ আরো বলেন : আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি; আর তার মাতা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং দু'বছরে তার দুধ ছাড়ানো হয়। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি এবং তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে (সূরা লোকমান # ৩১ : ১৪)।

মাতা-পিতার সেবা যত্নে শিশু বড় হতে থাকে। শিশুকাল থেকে সে কৈশোরে পা বাড়ায়। এ সময় তার খাওয়া-দাওয়া ও শিক্ষা-দীক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা মাতা-পিতা করে থাকেন। তার ভবিষ্যতের ভিত্তি এ সময় স্থাপিত

www.nagorikpathagar.org

হয়। লেখা-পড়া শিখে অনেকে সমাজের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়। আবার কেউ কেউ যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত হয়ে অতি সাধারণ জীবন যাপনে বাধ্য হয়। যা হোক প্রত্যেকে নিজ নিজ তকদীরের প্রভাবে সামর্থ অনুযায়ী নিজের পায়ে দাঁড়ায়। অতঃপর যৌবনে পদার্পণ করে জীবন যাপন শুরু করে।

মানুষ নিজের দিকে এবং সামনে ও পেছনে তাকালে তার জীবনের প্রধান তিনটি কালকে চোখের সামনে দেখতে পায়। কাল তিনটি যথাক্রমে শিশু-কিশোর, যৌবন এবং বৃদ্ধ কাল। শিশু-কিশোর অবস্থায় সামনে তাকালে তার যৌবন দেখতে পাবে পিতা-মাতার মধ্যে এবং বৃদ্ধকাল দেখবে দাদা-দাদীর মধ্যে। যৌবনে পেছনে তাকালে তার শিশুকাল দেখবে নিজ সন্তানের মধ্যে এবং সামনে তাকালে নিজের বৃদ্ধকালে দেখতে পাবে পিতা-মাতার মধ্যে। আর বৃদ্ধকালে পেছনের দিকে তাকালে নিজের শৈশব দেখতে পাবে নাতি-নাতিনের মধ্যে এবং যৌবন কাল দেখতে পাবে নিজ সন্তানের মধ্যে। মানুষ এভাবে কৈশোর, যৌবন ও বৃদ্ধকাল পার করে পরপারে যাত্রা করে। কিন্তু মানুষ এভাবে চিন্তা করে না। যারা চিন্তা করে তারা পরকালের প্রস্তুতি নিতে সক্ষম হয়। আল্লাহ বলেন : আর আমি মানুষকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। যদি তারা আমার সাথে এমন কিছু শরীক করার জন্য তোমাকে চাপ দেয় যার সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের কথা মেনে নিও না। আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব তোমরা কি করছিলে (সূরা আনকাবুত # ২৯ : ৮)।

সন্তান যে সময় শক্তি-সামর্থ ও শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করে নিজের পায়ে দাঁড়ায় সে সময়ে মাতা-পিতা শক্তি হারিয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়। এ সময় তাদের প্রয়োজন অন্যের সাহায্য ও সহযোগিতার। এ সাহায্য ও সহযোগিতা দেয়ার প্রাথমিক দায়িত্ব সন্তানের। যারা সুসন্তান তারা মাতা-পিতার দিকে সাধ্যানুসারে সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু কুসন্তানেরা এর পরিবর্তে তাদেরকে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা দিতে শুরু করে।

www.nagorikpathagar.org

বর্তমান সময়ে এ রকম কুসন্তানের হার অনেক বেশী। তারা মাতা-পিতার অবাধ্য। এরা মাতা-পিতার যত্ন নেয়ার পরিবর্তে তাদের সাথে অশোভন আচরণ করে এমনকি তাদেরকে বকাবকি করে ঘর থেকে বের করে দেয়ার নজিরও অনেক আছে। বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে। অনেক সন্তান কথায় কথায় পিতা-মাতার উপর চটে যায়, ধমক দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করায় এমনকি গায়ে হাত তুলে থাকে। এ অবস্থায় অসহায় পিতা-মাতার কেউ কেউ আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়, কেউ কেউ চোখের পানি মুছতে মুছতে ঘর থেকে বের হয়ে নিজেই বৃদ্ধাশ্রমের পথ খোঁজে অথবা কোন আত্মীয় বা বন্ধু-বান্ধবের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। ভাগ্য বিড়ম্বিত অনেকে পথে-ঘাটে পড়ে থেকে এক সময় দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। এ অবস্থায় পতিত মাতা-পিতা সন্তানকে মুখে বদদোয়া না করলেও তাদের অন্তরের ব্যথা আল্লাহ জানেন। এ সকল সন্তানের উপর বালা-মুসিবত নাযিল করে আল্লাহ্ তাদের ইহকালের শান্তি যেমনি নষ্ট করে দেন তেমনি পরকালে আযাবেও নিক্ষেপ করতে পারেন। আল্লাহ্ বলেন : হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের দুশমন। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। যদি মার্জনা কর, উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময় (সূরা তাগাবুন # ৬৪ : ১৪)।

যারা শৈশবে মাতা-পিতাকে হারায় তারা সে হারানোর বেদনা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে। আক্ষেপ করে বলে : আহ্! যদি তাঁরা জীবিত থাকতেন, আমি তাদের জন্য এমন করতাম, তেমন করতাম। অথচ যারা স্বাবলম্বী হওয়ার পরেও পিতা-মাতাকে জীবিত পায় তাদের কতই না আনন্দ হওয়ার কথা। কিন্তু স্বাবলম্বী হয়ে অনেকেই এদের ত্যাগের কথা ভুলে গিয়ে অশোভন আচরণ করতে শুরু করে। আল্লাহ্ বলেন : তোমাদের প্রভু আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো এবাদত কর না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে একজন অথবা উভয়ে যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে "উহ্" পর্যন্ত বল না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং তাদের সাথে বিনয়সহকারে কথা

www.nagorikpathagar.org

বল। আর তাদের সম্মুখে ভক্তি ও বিনয়ের সাথে নত থাক এবং বল, রব্বির হামহুমা কামা রব্বাইয়ানী সগীরা (সূরা বনী ইসরাইল # ১৭ : ২৩-২৪)। অর্থ : হে প্রভু, তাদের উভয়ের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : তার নাক ধূলিতে মলিন হোক, তার নাক ধূলিতে মলিন হোক, তার নাক ধূলিতে মলিন হোক। প্রশ্ন করা হলো, কার? তিনি বললেন : ঐ ব্যক্তির যার বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তার পিতা-মাতা (একজন বা উভয়েই) জীবিত থাকে এবং সে তবুও বেহেশতে যেতে পারে না (সহীহ্ মুসলিম # ৬৩২৯)।

সন্তান-মাতা-পিতার জীবিতাবস্থায় তাদের সেবা-যত্ন করবে, ভালো ব্যবহার দিয়ে তাদেরকে খুশী রাখবে, তাদের মৃত্যুর পরে তাদের পরকালের শান্তির জন্য দোয়া করবে– এটাই স্বাভাবিক। তাদের মৃত্যুর পরে সন্তানের আরোও কিছু করণীয় থাকে। যাদের সাথে পিতা-মাতার বন্ধুত্ব ছিল তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা, তাদেরকে সম্মান করা এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখাও সন্তানের দায়িত্ব। হযরত মালিক ইবনে রাবী'আ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নবী করীম (সা.)-এর কাছে ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর এমন কোন সদাচরণ কি অবশিষ্ট আছে, যা তাদের সাথে আমি করতে পারি? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তাদের জন্য দোয়া ইস্তেগফার করা, তাদের মৃত্যুর পর তাদের কৃত ওয়াদাগুলো পূর্ণ করা এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা এবং সে আত্মীয়তাগুলো রক্ষা করা, যেগুলো শুধু তাদের বন্ধনের কারণে রক্ষা করা হয়ে থাকে (ইবনে মাজাহ্ # ৩৬৬৪)। আর এগুলো করাই পিতা-মাতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের সর্বোত্তম উপায়।

সন্তান জ্ঞানে-গরিমায়, ধন-সম্পদে, ভোগ-বিলাসে পিতা-মাতাকে ছাড়িয়ে যত উপরেই যেতে সক্ষম হোক না কেন তাদের সন্তুষ্টি অর্জন

www.nagorikpathagar.org

একান্ত অপরিহার্য। এতে যারা ব্যর্থ তাদের মত দুর্ভাগা আর কেউ নেই। আর কুসন্তানের পিতা বা মাতা হওয়ার চেয়েও দুর্ভাগ্য আর কিছু নেই। সুসন্তান মাতা-পিতার সদকায়ে জারিয়া। সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দোয়া যেমন আল্লাহ্ কবুল করেন, তেমনি রেখে যাওয়া সন্তানের দোয়াও আল্লাহ্ কবুল করেন এবং তা পিতা-মাতার আমলনামায় জমা করেন। প্রত্যেক পিতা-মাতা কামনা করেন তাদের সন্তানেরা সচ্চরিত্রের অধিকারী হোক, দীর্ঘজীবী হয়ে মহৎ কাজে লিপ্ত থাকুক, সুন্দর ব্যবহারকারী, ধর্মপরায়ণ, নিরহংকারী ও নির্লোভ হোক, অভাবহীন জীবন যাপন করুক, তাদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার বজায় রাখুক এবং তাদের মৃত্যুর পরে তাদের জন্য দোয়া করুক। রাসূলুল্লাহ (সা.) তিনবার বললেন, আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করব না যে, কবীরা গুনাহগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ কোনটি? তারপর তিনি বললেন : আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া বা তাদের নাফরমানি করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া অথবা মিথ্যা কথা বলা (সহীহ্ মুসলিম # ১৬৭)।

সুসন্তান পিতা-মাতার অতি বাধ্য, অতি মূল্যবান সম্পদ, সুনাম বৃদ্ধির সহায়ক এবং অসময়ের সম্বল। তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে অন্যতম এ যে, তারা সৎ, সত্যবাদী, নম্র, বিনয়ী, শান্ত, মিষ্টভাষী, দায়িত্বশীল, আত্মসংযমী, বিশ্বস্ত, পরোপকারী, আত্মবিশ্বাসী, নির্ভরযোগ্য, ধৈর্যশীল, নিরহংকারী, ক্রোধ সংবরণকারী, আত্মীয়তা রক্ষাকারী, ভাল কাজে উৎসাহ এবং মন্দ কাজে বাধাদানকারী, বন্ধুসুলভ, কথা কম বলে এবং বেশী শুনে, ধর্মপরায়ণ ইত্যাদি। যারা এ সকল গুণের অধিকারী তারা ইহকাল ও পরকালে সফলকাম। আর কুসন্তানেরা এদের সম্পূর্ণ বিপরীত। এক ব্যবসায়ী রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞাসা করল, সন্তানের উপর তার পিতা-মাতার হক আছে কি? তিনি বললেন : তারা উভয়েই তোমার বেহেশত ও তোমার দোযখ (বর্ণনায় হযরত আবু উমামা রা.- ইবনে মাজাহ # ৩৬৬২)।

www.nagorikpathagar.org

পিতা-মাতার সন্তুষ্টি লাভ ইহ-পরকালের উন্নতির সহায়ক। অপরদিকে অসন্তুষ্ট পিতা-মাতার দীর্ঘশ্বাস আল্লাহর আরশ পর্যন্ত যেয়ে পৌছে। পরিণামে সন্তানের ইহকাল ও পরকাল ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহর নির্দেশ এ যে, আল্লাহর এবাদত কর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক কর না এবং সদ্ব্যবহার কর মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম, অভাবগ্রস্ত নিকট ও দূর প্রতিবেশী, সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের দাস-দাসীগণের সাথে; নিঃসন্দেহে আল্লাহ ভালবাসেন না অহংকারী দাম্ভিক লোকদেরকে (সূরা নিসা # ৪ : ৩৬)।

পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে যে, হযরত লোকমান তাঁর ছেলেকে উপদেশ হিসেবে বলেন : হে পুত্র! কোন বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় অতঃপর তা যদি পাথরের মধ্যে বা আকাশে অথবা ভূগর্ভে থাকে আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ। হে পুত্র! নামায কায়েম কর, সৎ কাজের উপদেশ দাও, মন্দ কাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবর কর। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ। অহংকারবশে মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণা করো না। আল্লাহ কোন অহংকারীকে পছন্দ করেন না। আর চলাফেরায় সংযত হও এবং কণ্ঠস্বর নিচু কর, গাধার স্বর সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর (সূরা লোকমান # ৩১ : ১৬-১৯)।

মনীষী হযরত লোকমানের এ সকল উপদেশ নিজের পুত্রকে লক্ষ্য করে হলেও আসলে এগুলো নিজ নিজ সন্তানের প্রতি সকল পিতার উপদেশ।

মহান আল্লাহ ও পিতা-মাতার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ সকল উপদেশ মেনে চলা একান্ত প্রয়োজন।

---

www.nagorikpathagar.org

বিবাহ, তালাক ও হিল্লা

একজন পুরুষ ও একজন নারী পরস্পর ধর্মীয় বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নাম বিবাহ। শুনতে অবাক লাগলেও কিছু কাল পূর্বে আমেরিকার কয়েকটি রাষ্ট্রে সমলিঙ্গ তথা পুরুষে-পুরুষে এবং নারীতে-নারীতে বিবাহের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। যেনা অধ্যায়ে এর বিবরণ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ হযরত আদম (আ.)কে সৃষ্টি করে হাওয়া (আ.)কে তাঁর স্ত্রীরূপে সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে যমজ জন্মগ্রহণ করত। তাঁদের এক জোড়ার ছেলের সাথে অপর জোড়ার মেয়ের বিবাহ হত। হাবিলের জোড়ায় জন্ম হওয়া মেয়েটি কাবিলের স্ত্রী এবং কাবিলের জোড়ায় জন্ম হওয়া মেয়েটি হাবিলের স্ত্রী হওয়ার কথা। হাবিলের সাথে জন্ম হওয়া মেয়েটি অসুন্দরী আর কাবিলের সাথে জন্ম হওয়া মেয়েটি ছিল সুন্দরী। মানুষের চির শত্রু শয়তান এ সুযোগে গ্রহণ করে কাবিলের পেছনে লেগে গেল। সে তাকে এ বলে প্ররোচিত করল যে, তোমার যমজ সুন্দরী বোন তোমার ভাই হাবিলের স্ত্রী না হয়ে তোমার স্ত্রী হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাবিল সে সুন্দরী বোনকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিল। আল্লাহর বিধানের পরিপন্থী কাবিলের এ প্রস্তাবে আদম (আ.) রাজি না হয়ে বললেন, তোমরা দু'ভাই আল্লাহর নামে কোরবানী কর। যার কোরবানী আল্লাহর নিকট গৃহীত হবে, আমার সুন্দরী মেয়ের সাথে তার বিবাহ দেয়া হবে। হাবিল তার পাল থেকে একটি দুম্বা এবং কাবিল তার উৎপাদিত কিছু শস্য কোরবানীর উদ্দেশ্যে রাখল। সে সময়ের নিয়মানুযায়ী আকাশ থেকে আগুন এসে হাবিলের কোরবানী পুড়িয়ে দিল, অর্থাৎ তার কোরবানী গৃহীত হলো। কাবিল উত্তেজিত হয়ে শয়তানের উসকানিতে হাবিলকে খুন করল (তফসীর মা'আরেফুল কোরআনে সূরা মায়েদার তফসীর অবলম্বনে)। বিবাহে পরস্পরের দ্বন্দ্ব সে সময়ে শুরু হয়েছে। এর জের সমাজে এখনো আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

www.nagorikpathagar.org

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমি তোমাদেরকে জোড়া-জোড়া সৃষ্টি করেছি (সূরা নাবা # ৭৮ : ২)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন : তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও। আর তোমাদের দাস দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন, আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। যারা বিবাহে সামর্থ নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন (সূরা নূর # ২৪ : ৩২-৩৩)।

কিছু সংখ্যক নারীকে বিবাহ করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন : যে নারীকে তোমাদের পিতা-পিতামহ বিবাহ করেছেন, তোমরা তাদেরকে বিবাহ কর না,... তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভাতিজী, ভাগিনী, সেসব মাতা যারা তোমাদেরকে স্তন্য পান করিয়েছেন, তোমাদের দুধবোন, স্ত্রীদের মাতা, তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ, সে স্ত্রীর কন্যা– যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন পাপ নেই। তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দু'বোনকে একত্রে বিবাহ করা, কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালু (সূরা নিসা # ৪ : ২২-২৩)। আর তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ কর না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। অবশ্য মুসলমান ক্রীতদাসী মুশরিক নারী অপেক্ষা উত্তম যদিও তাদেরকে তোমাদের ভাল লাগে। আর তোমরা (নারীরা) কোন মুশরিকদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ো না। যে পর্যন্ত সে ঈমান না আনে (সূরা বাকারা # ২ : ২১)। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জন্য মুশরিক নারী বিবাহ করা হারাম করেছেন। কোন নারী যদি ঈসা (আ.)কে খোদা বলে তবে তা অপেক্ষা বড় শেরক আর কিছু আছে বলে আমি মনে করি না (বোখারী শরীফ # ২০৮৪)। আল্লাহ বলেন, তোমাদের জন্য হালাল সতী-

www.nagorikpathagar.org

সাধ্বী মুসলমান নারী এবং তাদের সতী-সাধ্বী নারী যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তোমাদের পূর্বে (সূরা মায়েদা # ৫ : ৫)।

পূর্বে বিবাহের সংখ্যা সীমিত ছিল না। অনেকে নিজের খেয়াল-খুশী মত যত ইচ্ছা বিবাহ করত। হযরত সোলায়মান আলাইহি ওয়াসাল্লামের নব্বইয়ের অধিক স্ত্রী ছিল। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বিবাহের সংখ্যা সীমিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন : আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতীম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিবাহ করে নাও দু'তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করে রাখতে পারবে না, তবে একটিই (সূরা নিসা # ৪ : ৩)।

বিবাহের পাত্র-পাত্রী নির্বাচন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ নির্বাচনে ভুল করলে সারা জীবন তার মাশুল দিতে হয়। কোন কোন পাত্র বা তার অভিভাবক মনে করে কোন ধনবান লোকের মেয়ে ঘরে আনলে লাভবান হওয়া যাবে। পরে দেখা যায় সে ধনীর দুলালির চাহিদা পূরণের সামর্থ স্বামীর থাকে না। একে কেন্দ্র করে সংসারে দেখা দেয় অশান্তি। তবে তাদের কথা ভিন্ন যারা টাকা দিয়ে জামাই কিনে নেয়। আবার কনে পক্ষ মনে করে ধনী জামাই পেলে মেয়ে সুখে শান্তিতে জীবন কাটাতে পারবে। তদুপরি অনেকের খায়েশ থাকে ধনবান জামাই জোগাড় করে জাতে উঠার। লোকে বলবে, অমুকের জামাই বড় লোক, মেয়ের রাজ কপাল। কিন্তু অনেক সময় তা হয়ে উঠে না। নামী-দামি স্বামী সাধারণ পরিবার থেকে আগত স্ত্রী এবং তার আত্মীয়-স্বজনকে অতি অবজ্ঞার চোখে দেখতে শুরু করলে সে স্বপ্ন ভেঙ্গে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়, সংসার হয়ে উঠে অশান্তিময়। তাই প্রয়োজন দু'পক্ষের মধ্যে সমতা এবং সহমর্মিতা।

বংশ মর্যাদা বা জাতের বিচার গুরুত্বের সাথে দেখা উচিৎ। যারা অবৈধ পন্থায় অর্থ-বিত্তের মালিক হয়ে যায় তারা ভাল-খারাপের বাছ-বিচার না করে মনে যা চায় তাই করে বসে। কারণ সংস্কৃতি একদিনে গড়ে উঠে

www.nagorikpathagar.org

না। কথায় বলে, কারো মধ্যে ভাল বা মন্দের পরিবর্তন আসতে কমপক্ষে তিন জনমের (জেনারেশনের) দরকার হয়। বুনেদী পরিবার যুগ যুগ ধরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠে। সে সকল পরিবারের পাত্র-পাত্রীর মধ্যে থাকে শিষ্টাচার, নম্রতা, ভদ্রতা ও সম্মানবোধ। তাদের দ্বারা খারাপ কিছু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অনেক কম। তাই হঠাৎ জাতে উঠা পরিবার অপেক্ষা অসচ্ছল হলেও বুনেদী পরিবার থেকে পাত্র বা পাত্রী নির্বাচন করা খুবই ভাল।

সুন্দর-অসুন্দরের বিবেচনা অযৌক্তিক নয়। পুরুষের সুন্দর-অসুন্দরের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয় না নারীরা। সুস্থ-সবল, সুঠাম দেহের অধিকারী পুরুষ তাদের কাম্য। আবার সুন্দরী নারীর বিবেচনা এক একজন পুরুষের এক এক রকম। একজনের চোখে যে মেয়েটি অসুন্দরী অন্যজনের চোখে সে হয়ে উঠতে পারে সুন্দরী। কেউ কেউ সুন্দরী নারী বলতে গায়ের রং ফর্সা এমন নারীকে বুঝায়। যদি তা হত তবে তো আমেরিকা বা ইউরোপের সকল নারীই সুন্দরী, কারণ তারা ফর্সা এবং আফ্রিকার সকল নারীই কালো বলে অসুন্দরী। আসলে তা নয়। সৌন্দর্য ফুটে উঠে মুখের আকৃতিতে। সে সাথে সচ্চরিত্র, গুণ ও গায়ের রং তাকে আরো সুন্দরী করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, বিবাহে নারীর চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা হয়ে থাকে– তার ধন-সম্পদ, তার গুণ (বংশ), তার রূপ এবং তার ধর্ম। তুমি দ্বীনদার রমণী লাভে সচেষ্ট হও, নতুবা তুমি কপাল পোড়া (বোখারী শরীফ # ২০১১)।

বিবাহে নারীর সম্মতি গ্রহণ করা ইসলামের বিধান। অনেক ক্ষেত্রে জোর করে তার সম্মতি নেয়া হয়। এ সকল ক্ষেত্রে অনেক দুর্ঘটনা ঘটার নজির রয়েছে। কোন ব্যক্তিকে সে পছন্দ করে না, তার সাথে বিবাহের জন্য জোর করে সম্মতি আদায় করলে কখনো কখনো সে নারীকে আত্মহত্যা করতে দেখা যায়। যে নারী সারা জীবন অন্য একজনের সাথে জীবন কাটাবে সে ব্যক্তিকে নির্বাচনের স্বাধীনতা নারীর থাকা বাঞ্ছনীয়। তার উপর জোর প্রয়োগ করা শুধু অবৈধ নয়, অপরাধও বটে। অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ের

www.nagorikpathagar.org

ক্ষেত্রে তার অভিভাবক সুবিবেচনার সাথে পাত্র নির্বাচন করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : একবার বিবাহ হয়েছে এরূপ নারীকে বিবাহ দানে তার স্পষ্ট অনুমতি গ্রহণ করতে হবেই এবং কুমারীকে বিবাহ দানেও তার সম্মতি নিতে হবে। সাহাবাগণ আরজ করলেন, কুমারীর সম্মতি লাভের উপায় কি? হযরত (সা.) বললেন, চুপ থাকাই তার সম্মতি (বোখারী শরীফ # ২০২৭, সহীহ মুসলিম # ৩৩৩৭)।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমি তোমাদেরকে জোড়া-জোড়া সৃষ্টি করেছি (সূরা নাবা # ৭৮ : ২)। আল্লাহর এ ঘোষণা অনুসারে প্রত্যেকের জোড়া তিনি পূর্বেই স্থির করে রেখেছেন। অতএব যার সাথে যার বিবাহ হওয়ার, তার সাথে সে বিবাহ অবশ্যই হবে। আমাদের রূপ, গুণ, বংশ, আভিজাত্য, ঐশ্বর্য ইত্যাদি বিচার কেবল ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি মাত্র। বিবাহ সম্পাদনের জন্য সাধারণতঃ পুরুষ পক্ষকে এগিয়ে আসতে হয়। পুরুষ মোহর দেয়ার শর্তে একজন উকিল বা অভিভাবকের মাধ্যমে নারীর নিকট বিবাহের ইজাব বা প্রস্তাব দেয় এবং নারী সে প্রস্তাব কবুল বা গ্রহণ করে। উভয় ক্ষেত্রে দু'জন সাক্ষী থাকে। কোন কোন মতে এ প্রস্তাব পুরুষ বা নারী যে কোন পক্ষ থেকে উত্থাপিত হতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আসল ব্যভিচারিণী তারাই যারা প্রমাণ (সাক্ষী) ব্যতীত নিজেদেরকে বিবাহ দেয় (তিরমিযী শরীফ # ১০৪০)। প্রস্তাব ও সম্মতির পরে খুতবা পাঠের মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন হয়।

ধার্যকৃত মোহর পরিশোধ করা স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক। আল্লাহ বলেন, আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর খুশী মনে দিয়ে দাও। তারা যদি খুশী হয়ে তা থেকে কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর (সূরা নিসা # ৪ : ৪)। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, কোন রমণীকে হালাল করা উপলক্ষে যে শর্ত (মোহর) করা হয় সেগুলো পূর্ণ করা সর্বাধিক অগ্রগণ্য (বোখারী শরীফ # ২০৩৩)। মোহর কত ধার্য করা হবে তার ধরা-বাধা কোন নিয়ম নেই। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সময়ে শুধু খেজুর মোহর দিয়ে এমনকি কোরআন শিক্ষা দেয়ার ওয়াদা করেও বিবাহ হয়েছে। তিনি

www.nagorikpathagar.org

বলেছেন, একটি লোহার অঙ্গুরি মোহররূপে দিয়ে হলেও তুমি বিবাহ কর (বোখারী শরীফ # ২০৩১)। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মোহর পুরুষের সাধ্যের মধ্যে ধার্য করা হয় না। কন্যা পক্ষ আভিজাত্যের দোহাই দিয়ে পাত্রের সাধ্যের শতগুনেরও বেশী মোহর ধার্য করে। ফলে তা পরিশোধ করা পাত্রের পক্ষে সম্ভব হয় না। মোহর অবশ্য পরিশোধযোগ্য, গ্রামাঞ্চলের সাধারণ লোকেরা তা ধারণাও করে না। তাই সাধ্য এবং সচেতনতার অভাবে মোহর পরিশোধ না করে বহু লোককে মৃত্যুবরণ করতে হয়। আবার অনেকে মোহর মাফ করে দেয়ার জন্য স্ত্রীকে চাপ দেয়। একত্রে সংসার করতে হলে স্বামীর মন রক্ষা করতে হয়। তাই নিরুপায় হয়ে স্ত্রী অনিচ্ছা সত্ত্বেও "মাফ করে দিলাম" বলে। এটা কতটা গ্রহণযোগ্য তা আল্লাহই ভাল জানেন।

মোহরানার বিপরীত আরেকটি চিত্র যৌতুক যা মহামারী আকারে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা-মাতার উপর চাপ সৃষ্টি করে যৌতুক আদায় করা হয়। কোন কোন পিতা-মাতা কন্যাকে বিবাহ দেয়ার জন্য নিজের সাধ্যের অতিরিক্ত যৌতুক দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। পরে যৌতুক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে কন্যার উপর তার স্বামী ও শ্বশুর পক্ষের লোকজনের অত্যাচার শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত তা এমন পর্যায়ে যেয়ে পৌছে যে, হয় কন্যা আত্মহত্যা করে নতুবা স্বামীর পক্ষ তাকে খুন করে। কেউ কেউ স্বামীর বাড়ী থেকে পালিয়ে এসে স্বামীকে তালাক দিয়ে আত্মরক্ষা করে। এ সকল হত্যা-আত্মহত্যা ও বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা পত্র-পত্রিকা বা টেলিভিশনে প্রায়ই দেখা যায়। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র পরিবারে যৌতুকের প্রচলন এখন খুব বেশী। যে ছেলে টেলিভিশন বানান করতে পারে না সেও বিবাহের পূর্বে কন্যা পক্ষের নিকট টেলিভিশন দাবী করে– যা অত্যন্ত দুঃখজনক। দেশে যৌতুক বিরোধী আইন থাকলেও তার প্রয়োগ নেই।

দাম্পত্য জীবন সকলের সুখের হয় না। বিভিন্ন কারণে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য, বাদানুবাদ, ঝগড়া-বিবাদ চরমে পৌছলে প্রয়োজন হয় বিবাহ বিচ্ছেদের। এটা উভয়ের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে বা এক তরফাভাবে

www.nagorikpathagar.org

হতে পারে। মনে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকলে হঠাৎ একদিন সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে এ ঘটনা ঘটাতে পারে। বিবাহের এ বিচ্ছেদের নাম তালাক। তালাক অর্থ ছেড়ে দেয়া। এর অধিকার শুধু পুরুষকে দেয়া হয়েছে। নারীর মধ্যে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার অভাব। অতি সামান্য কারণে তারা স্বামীকে তালাক দিত। এতে তালাকের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যেত। হয়তো এ কারণে নারীদের তালাকের অধিকার ইসলামে নেই। তবে তারা ইচ্ছা করলে নিজেকে "খোলা" বা মুক্ত করতে পারে। এর অর্থ এই যে, তাকে যে মোহর দেয়া হয়েছে তার কিছু অংশ ফেরত দিয়ে সে নিজেকে মুক্ত করতে পারে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, যে ক্ষেত্রে (স্বামী ও স্ত্রী) উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, অতঃপর যদি তোমাদের (বিচারকদের) ভয় হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না সে ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় তবে উভয়ের মধ্যে কারো কোন পাপ নেই। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা (সূরা বাকারা # ২ : ২২৯)। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত হালাল হল, তালাক (ইবনে মাজাহ # ২০১৮, আবু দাউদ # ২৯৭৫)। তালাক দাম্পত্য জীবনের দুঃখজনক সমাপ্তি।

কেউ কেউ তালাক দেয়া স্ত্রীর প্রতি আবার আকৃষ্ট হয় এবং পূর্বের ন্যায় মেলা-মেশা করে। এটা হারাম। কারণ তখন তারা একে অপরের নিকট বেগানা নারী বা পুরুষ। রাসূলুল্লাহ (সা.) ঐ ব্যক্তিকে অভিসম্পাত দিয়েছেন, যে তার তালাক দেয়া স্ত্রীকে হালাল জ্ঞান করে এবং যার জন্য তাকে হালাল জ্ঞান করা হয় (ইবনে মাজাহ # ২০১৭; বর্ণনায় আবু মূসা)। তালাক দেয়া স্ত্রীকে হালাল করা যায়। যে পদ্ধতিতে তা করা হয় একে "হিল্লা" বলে। এটা তালাক অপেক্ষা জঘন্য স্ত্রীকে ইদ্দত পালনের সময় দিতে হয়। সময়ান্তে সে অন্য পুরুষকে বিবাহ করে তার সাথে সহবাস করতে হয়। অতঃপর এ স্বামী তাকে স্বেচ্ছায় তালাক দিলে সে পূর্বের স্বামীকে ইদ্দত পালনান্তে আবার বিবাহ করতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্ বলেন : তারপর যদি সে স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে সেই স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীর সাথে বিবাহ্ না করে নেবে, তার জন্য হালাল নয়। অতঃপর যদি দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তাদের উভয়ের জন্যই পরস্পরকে পুনরায় বিবাহ্ করতে পাপ নেই, যদি আল্লাহর হুকুম বজায় রাখার ইচ্ছা থাকে। আর এ হল, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা (সূরা বাকারা # ২ : ২৩০)।

ইদ্দত অর্থ গণনা করা। তালাকের পরে পরবর্তী বিবাহের জন্য যে সময় অপেক্ষা করতে হয়, তাই ইদ্দতকাল। বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে এ সময় গণনা করতে হয়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলেন : (১) তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়েয পর্যন্ত (সূরা বাকারা # ২ : ২২৮)। (২) তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের ঋতুবতী হওয়ার আশা নেই [ঋতু বন্ধ হয়ে গেছে) তাদের ব্যাপারে সন্দেহ হলে তাদের ইদ্দত তিন মাস। আর যারা এখনও ঋতুর বয়সে পৌঁছায়নি, তাদেরও অনুরূপ ইদ্দতকাল হবে। গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত (সূরা তালাক # ৬৫ : ৪)। (৩) মুমিনগণ! তোমরা যখন মুমিন নারীদেরকে বিবাহ্ কর, অতঃপর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তখন তাদের ইদ্দত পালনে বাধ্য করার অধিকার তোমাদের নেই (সূরা আহযাব # ৩৩ : ৪৯)। (৪) আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষায় রাখা (সূরা বাকারা # ২ : ২৩৪)। তবে গর্ভবতীর ইদ্দত প্রসব হওয়া পর্যন্ত।

উল্লেখযোগ্য যে, তালাকের বিস্তারিত আলোচনা এ অধ্যায়ে করা হয়নি। বিশেষ বিশেষ অবস্থা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

দাম্পত্য সুখ-দুঃখ

স্বামী ও স্ত্রী এ দুইয়ে মিলে দম্পতি। তারা যে জীবন যাপন করে তা দাম্পত্য জীবন। এ জীবন সুখ ও দুঃখে ভরপুর। একটানা সুখ কারো ভাগ্যে জোটে না। সাধারণতঃ সুখের পরে দুঃখ আসে এবং দুঃখের পরে সুখ। বিবাহের পূর্বে অনেকে এটা চিন্তা করে না। যৌবনে পদার্পণের সাথে সাথে নারী ও পুরুষ সকলে ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। বিবাহের পরে বাস্তবতার আঘাতে অনেকের সে স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। পবিত্র কোরআন থেকে আমরা এর কিছু ইঙ্গিত পাই। মহান আল্লাহ আদম ও হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করে তাদেরকে স্বামী-স্ত্রী বানিয়েছেন এবং তাদেরকে বেহেশতে মহাসুখে অবস্থানের সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ ফল গন্ধম খাওয়ার ফলে আল্লাহ তাদেরকে বেহেশত থেকে দুনিয়ায় নামিয়ে দিলেন। আল্লাহ বললেন ঃ তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। পৃথিবীতে তোমাদের জন্য বাসস্থান আছে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ফল ভোগ আছে (সূরা আরাফ # ৭ : ২৪)। অন্য আয়াতে আছে ঃ তোমরা উভয়ে এখান থেকে এক সঙ্গে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। অতঃপর আমার পক্ষ থেকে যদি তোমাদের নিকট হেদায়াত আসে, তখন যে আমার উক্ত হেদায়াত অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না (সূরা ত্বহা # ২০ : ১২৩)। অতএব স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শত্রুতা ও কলহের ইঙ্গিত উল্লিখিত আয়াতগুলোতে রয়েছে। একটি প্রবাদ আছে ঃ নারীর বৈশিষ্ট্য এ যে, কুমারী স্বামী চায়, বিবাহিতাকে সন্দেহে পায় এবং বিধবায় প্রশংসা শুনায়। অর্থাৎ নারী বিবাহের পূর্বে স্বামী পেতে চায়, বিবাহ হলে স্বামীকে সন্দেহ করে এবং স্বামী মারা গেলে মানুষের কাছে তার প্রশংসা শুনায়।

দাম্পত্য জীবনে শতভাগ সুখী কারো এমন দাবী অসত্য। সৃষ্টির সেরা নবীকুল শ্রেষ্ঠ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাম্পত্য জীবনও শতভাগ সুখের ছিল না। একবার তিনি স্ত্রী যয়নব (রা.)-এর গৃহে মধু পান

www.nagorikpathagar.org

করলেন। এতে আয়েশা (রা.) ঈর্ষান্বিত হয়ে হযরত হাফসা (রা.)-এর সাথে পরামর্শ করে স্থির করলেন, নবী (সা.) যে স্ত্রীর গৃহে যাবেন তিনি যেন বলেন ঃ আপনি মাগফীর (দুর্গন্ধযুক্ত এক প্রকার তরল আঠা) পান করেছেন। তিনি হাফসা (রা.)-এর গৃহে গেলে, তিনি বললেন, আপনি মাগফীর পান করেছেন। এতে নবী (সা.) আর মধু পান করবেন না বলে কসম করলেন এবং কিছু কথা-বার্তার পর এটা অন্যের নিকট প্রকাশ করতে হাফসা (রা.)-কে নিষেধ করলেন, যাতে যয়নব (রা.) শুনে দুঃখিত না হন। কিন্তু হাফসা (রা.) এটা আয়েশা (রা.) এর নিকট প্রকাশ করে দিলেন। এ ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (সা.) মনে কষ্ট পেলেন। এ উপলক্ষে সূরা আত-তাহরীম নাযিল হয়। এর প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ হে নবী! আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদের খুশী করার উদ্দেশ্যে তা নিজের জন্য হারাম করছেন কেন (সূরা আত-তাহরীম # ৬৬ : ১)?

আরেকটি ঘটনা এ যে ঃ আহযাব যুদ্ধের পর বনু-নযীর ও বনু-কোরায়যার বিজয়ে গনিমতের মাল বন্টনের ফলে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসে। এতে নবী (সা.)-এর স্ত্রীগণ ভাবলেন যে, নবী (সা.) হয়ত এসব গনিমতের মাল থেকে নিজের অংশ রেখে দিয়েছেন। তাই তাঁরা সমবেতভাবে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! পারস্য ও রোমের সম্রাজ্ঞীরা নানাবিধ গহনা ও মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করে থাকে। তাদের সেবা-যত্নের জন্য অগণিত দাস-দাসী রয়েছে। আমাদের দারিদ্রপীড়িত অবস্থা তো আপনি স্বয়ং দেখতে পেয়েছেন। তাই মেহেরবানি করে আমাদের জীবিকা ও অন্যান্য খরচাদির পরিমাণ কিছুটা বাড়িয়ে দেন। এতে রাসূলুল্লাহ (সা.) মর্মাহত হলেন।

মুসলিমের বর্ণনায় মেশকাত শরীফের ৩১১১ নম্বর হাদীসে হযরত জাবের (রা.) বলেন ঃ হযরত আবু বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট যাওয়ার অনুমতি চাইতে এসে দেখলেন, বহু লোক তাঁর দরজায় বসে আছে, তাদের কাউকেও অনুমতি দেয়া হয় নাই। কিন্তু আবু বকর (রা.)-কে অনুমতি দিলেন এবং তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর ওমর

www.nagorikpathagar.org

(রা.) এসে অনুমতি চাইলে তাঁকেও অনুমতি দেয়া হলো। ওমর (রা.) নবী করীম (সা.)-কে বিমর্শ অবস্থায় চুপ করে বসে থাকতে দেখলেন, তখন তাঁর বিবিগণ তাঁর চারদিকে বসা। রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে হাসাবার উদ্দেশ্যে ওমর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আপনি দেখতেন আমার বিবি বিনতে খারেজা আমার কাছে এরূপ খরপোষ চেয়েছে, আমি উঠে তার ঘাড়ে কিছু লাগিয়ে দিতাম। এতে রাসূলুল্লাহ (সা.) হেসে দিলেন এবং বললেন ঃ এ যে এরা আমার চারপাশে যেভাবে ঘিরে আছে দেখছেন, তারা তাদের খরপোষ চাচ্ছে। এ সময় আবু বকর (রা.) উঠে তাঁর কন্যা আয়েশার ঘাড়ে মারতে শুরু করলেন এবং ওমর (রা.) উঠে তার কন্যা হাফসার ঘাড়ে মারতে শুরু করলেন এবং উভয়ে বলতে লাগলেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এমন কিছু চেয়েছো যা তাঁর নিকট নেই। তখন তাঁরা বললেন, আল্লাহর কসম, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এমন জিনিস চাইব না যা তাঁর নিকট নেই।

বোখারী শরীফের ৭৫ নম্বর দীর্ঘ হাদীসের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এ যে, হযরত ওমর (রা.) সংবাদ পেলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর স্ত্রীগণকে তালাক দিয়ে দিচ্ছেন। তিনি তাঁর কন্যা এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিবিদের একজন হাফসা (রা.)-এর নাম উল্লেখ করে বললেন, হাফসার সর্বনাশ হয়ে গেছে, সে সর্বহারা হয়েছে।

অতঃপর তিনি ছুটে যেয়ে হাফসা (রা.)-কে তালাকের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। হাফসা (রা.) ক্রন্দনরত অবস্থায় বললেন, তালাক সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না, তবে রাসূলুল্লাহ (সা.) বিবিগণ থেকে আলাদা হয়ে দ্বিতল কক্ষে অবস্থান করতে শুরু করেছেন। দ্বিতলের কোঠাটি স্টোরেজ হিসেবে ব্যবহৃত হত। ওমর (রা.) সেখানে যেয়ে দেখলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি চাটাইতে খেজুর গাছের ছোবড়াভরা চামড়ার একটি বালিশ হেলান দিয়ে শুয়ে আছেন। ওমর (রা.) তাঁর মানসিক অবস্থা হালকা করার জন্য বললেন, মক্কাবাসী নারীরা স্বামীর কথার প্রতি উত্তর করতে পারে না। কিন্তু মদীনাবাসী নারীরা এর বিপরীত। মক্কা থেকে আগত নারীরাও মদীনাবাসী নারীদেরকে অনুসরণ করতে শুরু করেছে। তাঁর স্ত্রীকে একদিন কোন

www.nagorikpathagar.org

বিষয়ে ধমক দিলে তিনি প্রতি উত্তর করলেন। এতে ওমর (রা.) চটে গেলে তাঁর স্ত্রী বললেন, আমার একটি মাত্র প্রতি উত্তরে আপনি এরূপ রাগান্বিত হয়ে উঠলেন। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রীগণও তো তাঁর সঙ্গে প্রতি উত্তর করে থাকেন, এমনকি কখনও কখনও কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে পৃথক ও দূরে থেকে দিন কাটিয়ে দেন। স্ত্রীর মুখে এটা শুনে তিনি হাফসা (রা.)-এর গৃহে গিয়ে তাঁকে বকাঝকা করে সতর্ক করেছেন। ওমর (রা.)-এর কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) মৃদু হাসলেন।

ওমর (রা.) আরও বললেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আরেক স্ত্রী (ওমর (রা.)-এর দূর সম্পর্কীয় খালা) বিবি উম্মে সালামা (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে নসিহত শুনাতে শুরু করলে তিনি ওমর (রা.)-এর এই ধরনের কার্যকে অনধিকার চর্চা আখ্যায়িত করে বললেন ঃ আপনি সর্বস্থানে স্বীয় অধিকার দেখাতে চান, এমনকি রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর স্ত্রীবর্গের ব্যাপারসমূহের মধ্যেও অধিকার খাটাচ্ছেন। এই ঘটনা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) আবার হাসলেন। ওমর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীর্ণদশা দেখে কেঁদে ফেললেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন।

মূল ঘটনা ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বীয় স্ত্রীগণের প্রতি কতিপয় পারিবারিক বিষয়ের দরুন রাগান্বিত হয়েছিলেন। সে জন্য তাঁদেরকে শায়েস্তা করার মানসে দীর্ঘ এক মাস কাল তাঁদের থেকে পৃথক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে দ্বিতীয় তলার ছোট একটি কুঠরিতে অবস্থানরত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রীগণের দাবী দাওয়ার প্রেক্ষিতে আল্লাহ বলেন ঃ হে নবী! আপনার স্ত্রীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও এর বিলাসিতা কামনা কর, তবে আস, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় দেই। পক্ষান্তরে যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং পরকাল কামনা কর, তবে তোমাদের সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আল্লাহ মহাপুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন (সূরা আহযাব # ৩৩ : ২৮-২৯)।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন, তবে সম্ভবতঃ তাঁর পালনকর্তা তাঁকে তোমাদের পরিবর্তে

www.nagorikpathagar.org

দেবেন তোমাদের অপেক্ষা উত্তম স্ত্রী, যারা হবে আজ্ঞাবহ, ঈমানদার, নামাযী, তওবাকারিণী, রোযাদার অকুমারী ও কুমারী (সূরা আত-তাহরীম # ৬৬ : ৫)।

দাম্পত্য জীবনের সুখ-দুঃখ পরস্পরের চাওয়া এবং পাওয়ার মাত্রার উপর নির্ভরশীল। তাঁদের প্রথম চাওয়া ভালবাসা। স্ত্রী চায় স্বামী তাঁকে প্রাণ ভরে ভালবাসুক। অন্য কোন মেয়ের দিকে না তাকাক, কারো দিকে তাকিয়ে না হাসুক। এর সামান্য ব্যতিক্রম হলে মনে সন্দেহের জন্ম নেয়। ফলে শুরু হয় পরস্পরে কথা কাটাকাটি এবং পরিণামে সৃষ্টি হয় অশান্তির। পক্ষান্তরে স্বামীও চায় তার স্ত্রী তাকে ভালবাসবে, পরপুরুষের সাথে মেলা-মেশা করবে না এবং তাঁর সুখ-দুঃখের সমভাগী থাকবে। স্বামী পছন্দ করে না অন্য কোন পুরুষ তার স্ত্রীর প্রশংসা করুক আর স্ত্রীও হিংসাবোধ করে অন্য কোন নারী তার স্বামীর প্রশংসা করলে। এসব বিষয়াদি নিয়ে যে সকল দম্পতির মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত নেই তারা সুখী।

নারীরা চায় সংসারে তাদের কর্তৃত্ব প্রাধান্য পাক। তারা চায় স্বামীরা তাদের কথামত উঠবে-বসবে এবং তাদের অনুগত হয়ে চলবে। অথচ আল্লাহ্ বলেন ঃ পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীলঃ এজন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এজন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সে মতে নেককার স্ত্রীগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ্ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন, লোক চক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে। আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান কর না। নিশ্চয় আল্লাহ সকলের উপর শ্রেষ্ঠ (সূরা নিসা # ৪ : ৩৪)।

অথচ বর্তমান সময়ের অধিকাংশ নারী আল্লাহর এ বিধান মানতে নারাজ। তাদের দাবী তারা পুরুষদের সমকক্ষ। ঘরে বাইরে সর্বত্র নারীরা পুরুষের সাথে সমানে পা ফেলতে সক্ষম। পুরুষের ন্যায় তাদের মধ্যে আছে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অফিস প্রধান, পুলিশ অফিসার, আর্মি জেনারেল,

www.nagorikpathagar.org

বিমানের পাইলট এমনকি রাষ্ট্রপ্রধান। তারা কম যায় কোন দিকে! তাই তারা সম অধিকারের দাবীতে সোচ্চার। কিন্তু তারা ভুলে যায় সৃষ্টিগতভাবে তারা ভিন্ন। পৈত্রিক সম্পত্তিতে একটি মেয়ে একটি ছেলের অর্ধেকের মালিক হয়। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে; আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সম্পদের সম্পর্কে আদেশ করেন : একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান (সূরা নিসা # ৪ : ১১)। আবার কোন আর্থিক লেন-দেনের সাক্ষীর ক্ষেত্রেও দেখা যায় দু'জন নারী একজন পুরুষের সমান। আল্লাহ বলেন, দু'জন সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্যে থেকে। যদি দু'জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন নারী (সূরা বাকারা # ২ : ২৮২)। কর্তৃত্বের এই দ্বন্দ্ব দাম্পত্য সুখের পরিপন্থী।

দাম্পত্য সুখের জন্য একে অপরকে জানা দরকার। দু'টি ভিন্ন পরিবেশের দু'জন, একত্রিত হয়ে সংসার গড়ে, দু'জনের পছন্দ-অপছন্দ, রুচি-অরুচি সাধারণতঃ এক রকম হয় না। এ ক্ষেত্রে একজন অপরজনকে বুঝার চেষ্টা করতে হয় এবং নিজকে কিছুটা ছাড় দিয়ে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে অন্যের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারলে উভয়ের জীবন সুখের হয়। নতুবা দু'জনের মধ্যে সবকিছুতে দূরত্ব বাড়তে শুরু করে। ফলে শুরু হয় মনোমালিন্য ও বাদানুবাদ। শয়তান এ সুযোগ গ্রহণ করে উভয়কে করে তোলে উত্তেজিত। এক পর্যায়ে গালাগালি, হাতাহাতি, মারামারি এমনকি খুনাখুনি, আত্মহত্যা অথবা তালাকের ঘটনা ঘটে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত ঐ ব্যক্তি যে অধিক বিবাদকারী হয় (বোখারী শরীফ # ১১৮৮)।

যারা আল্লাহকে ভয় করে, তারা এ ধরনের অবস্থা এড়িয়ে চলে কিন্তু যারা আল্লাহর বিধানের তোয়াক্কা করে না, অপরের উপর দোষ চেপে নিজের সাফাই গায় তারা প্রকৃতপক্ষে নাফরমান। আল্লাহ বলেন, হে মুমিনগণ! তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের দুশমন। তোমরা তাদের থেকে সতর্ক থাক (সূরা তাগাবুন # ৬৪ : ১৪)। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমার পরে পুরুষের ক্ষতি সাধনের জন্য নারীর সমতুল্য আর কোন কিছু হবে না (বোখারী শরীফ # ২০১২)।

www.nagorikpathagar.org

কথায় বলে ঃ ঘরের শত্রু অতি ভয়ঙ্কর। যারা একে অপরের শত্রুতা করে, তারা সুখী হতে পারে না।

দাম্পত্য অশান্তির আরেকটি কারণ অন্যকে নিজের মত করে নেয়ার অপচেষ্টা। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব থাকে। কেউ তার ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিতে চায় না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, নারী তোমার মন মোতাবেক পূর্ণ সোজা হয়ে চলবে না। অতএব তুমি তার দ্বারা উপকৃত হতে চাইলে তার (স্বভাবের) বক্রতাবস্থায় তার থেকে নিজের উপকার উদ্ধার কর। যদি তাকে পূর্ণ সোজা করতে চেষ্টা কর তবে ভেঙ্গে ফেলবে (তালাক হয়ে যাবে)। বুখারীতে উল্লেখ আছে, পুরুষের পাঁজরের বক্র হাড় থেকে নারীর সৃষ্টি (বোখারী শরীফ # ২০৪৫)। অতএব স্বামীর উচিত স্ত্রীকে নিজের মত করার চেষ্টা না করা এবং স্ত্রীরও উচিত স্বামীকে নিজের মত করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকা। তাহলে উভয়ের মধ্যে শান্তি বিরাজ করবে।

অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণে দাম্পত্য জীবনে শুভ অথবা অশুভ এ দু'প্রকার প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। কারো সৎ পরামর্শ গ্রহণ করে নিজের দোষ-ত্রুটি সংশোধন করে নেয়া অথবা ভাল কিছু শুরু করতে পারা খুব ভাল। অপরদিকে কুপরামর্শ গ্রহণ করে দু'জনের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করা অত্যন্ত খারাপ। অপরের পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীরা অগ্রগামী। কয়েকজন নারী একত্রিত হলে নিজের ঘরের কথা অন্যান্যদের নিকট প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করে না। কোন একজন খারাপ নারী সহানুভূতি বা সহমর্মিতা প্রকাশ করতে গিয়ে বলে উঠে, আহা! আপনার স্বামী কি রকম লোক, আপনাকে এমনটি বলতে পারল! আপনার এ আবদারটুকু রক্ষা করতে পারল না!! আমার স্বামী কিছুতেই এমনটি করতেন না। আরও দু'একজন তাতে সমর্থন দিল। এ ধরনের উসকানিমূলক কথাবার্তায় তার মন খারাপ হয়ে গেল। শুরু হল, স্বামীর সাথে দ্বন্দ্ব। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সে আমার দলের নয় যে কোন নারীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অথবা কোন দাসকে তার মনিবের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে (আবু দাউদ # ২১৭২)।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্ বলেন, তারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরাও তাদের পরিচ্ছদ (সূরা বাকারা # ২ : ১৮৭)। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যারা একে অপরকে বুঝে, একজনের চাহিদা অন্যজনের নিকট কম, যা আছে তাতে সন্তুষ্ট, একজন অপরজনের সুখ-দুঃখের সমভাগী, সর্বোপরি স্ত্রী স্বীয় স্বামীকে অন্য পুরুষ থেকে এবং স্বামী তার স্ত্রীকে অন্য নারী অপেক্ষা উত্তম মনে করে, তারা সত্যিকারের সুখী। পৃথিবীর সকল সম্পদের মধ্যে উৎকৃষ্ট সম্পদ সতী সাধ্বী স্ত্রী। কারণ দাম্পত্য সুখের কেন্দ্রবিন্দু সাধ্বী স্ত্রী। বিপরীত দিকে দুঃখের মূলে স্বেচ্ছাচারী অসাধ্বী স্ত্রী। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মুমিনদের মধ্যে পূর্ণতর মুমিন সে, যার ব্যবহার ভাল; আর তোমাদের মধ্যে ভাল সে, যে তার বিবিদের জন্য ভাল (তিরমিযী শরীফ # ১১০০)।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন মহিলা উত্তম? তিনি বললেন, যখন স্বামী তার দিকে তাকায় তখন সে তাকে আনন্দ দেয় এবং যখন তাকে কোন কাজের নির্দেশ দেয় তখন সে তা যথাযথ পালন করে। আর সে নিজের ব্যাপারে এবং তার মাল-সম্পদের ব্যাপারে এমন কোন কাজ করে না যা স্বামী না পছন্দ করে (নাসাঈ শরীফ # ৩২৩৪)। মোটের উপর দু'জনের মধ্যে যখন সম্প্রীতি থাকে, তখন তথায় স্বর্গীয় সুখ নেমে আসে। আর যখন দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত থাকে, তখন নরকসম দুঃখ তাদের সঙ্গী হয়।

---

www.nagorikpathagar.org

যেনা

ইসলামের বিধি-বিধান মোতাবেক বিবাহিত দম্পতি ছাড়া অন্য যে কোন পুরুষে-নারীতে, পুরুষে-পুরুষে বা নারীতে-নারীতে যৌনক্রিয়া সম্পাদনের নাম যেনা। কোন পশুর সাথে সঙ্গম করলে তা যেনা। এ অবৈধ যৌনাচার অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। যেনা শুধু যৌনক্রিয়াতে সীমাবদ্ধ নয়। বিপরীত লিঙ্গের পুরুষ বা নারীকে স্পর্শ করে সুখ লাভ, কুদৃষ্টিতে তাকিয়ে তৃপ্তি লাভ, শরীরের সুঘ্রাণ নিয়ে শান্তি লাভ ইত্যাদি যেনার পর্যায়ভুক্ত।

যেনার পথে পা বাড়ার সময় প্রধানত দুইটি ঃ একটি যৌবনের প্রথম দিকে অর্থাৎ মেয়েদের বার থেকে আঠার বছর এবং পুরুষের পনের থেকে বিশ বছর বয়সে আর আরেকটি বিবাহিত জীবন শুরুর পাঁচ থেকে আট বছরের পর থেকে।

প্রথম সময়টিতে যৌবনের উন্মাদনায় এবং অজানা কৌতূহলে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি চরম আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। এ সময়টি যারা নিজকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হয় তারা বিবাহপূর্ব যৌনাচারে লিপ্ত হয়। এরা বিবাহ পরবর্তী জীবনেও অন্যের সাহচর্য বেশী পছন্দ করে। পরের সময়টিতে দাম্পত্য সুখে যারা সুখী হয় না, সংসারে মতবিরোধ এবং কলহ সৃষ্টি হয় তারা অবৈধ প্রেমের সন্ধান করতে থাকে এবং কালক্রমে প্রেমে জড়িয়ে পড়ে এবং যৌনাচারে লিপ্ত হয়। পত্র-পত্রিকা ও টেলিভিশনের খবরে যে সকল পরকীয়া প্রেমের ঘটনা জানা যায়, তাতে দেখা যায় ঐ সময় তাদের সন্তানের বয়স আট বছরের নীচে থাকে। এ অবৈধ সম্পর্কের ফলে অনেকের সংসার ভেঙ্গে যায়, সন্তান হত্যা এবং আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে।

পাশ্চাত্য দেশসমূহ বিশেষ করে আমেরিকায় অবৈধ যৌন মিলনের ফলে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ জারজ সন্তানের জন্ম হয়। এখানে কুমারী মাতার সংখ্যা অগণিত। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট, আইওয়া, মাসাচুচেটস, নিউ হেমপশায়ার, ভারমন্ট ও ওয়াশিংটন ডিসিতে সমলিঙ্গ বিবাহ বা গে-ম্যারেজ বৈধ করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

আমেরিকার গঠনতন্ত্রের ধর্মীয় স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে ধর্মের তোয়াক্কা না করে কোথাও গণভোটে আবার কোথাও কোর্টের রায়ে এ বিবাহ বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। এর বিরোধিতাকারীরা আশঙ্কা প্রকাশ করে বলছে যে, এ বিবাহ বৈধ হওয়ার কারণে মানুষের বংশ বৃদ্ধির ধারায় বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। পৃথিবীতে মানব বসতি টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে আল্লাহ্ কেবলমাত্র নারী ও পুরুষের মধ্যে বিবাহ এবং যৌন ক্রিয়া সীমিত রেখেছেন।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে সরকার অনুমোদিত পতিতালয় আছে। যেখানে পতিতালয় নেই সেখানে ভাসমান পতিতারা হোটেল, বাসা বা অন্যান্য গোপন আস্তানায় যৌন ব্যবসা চালায়। এরা খদ্দের সংগ্রহের জন্য ই-মেইল অথবা টেলিফোন ব্যবহার করে। কখনো শপিং সেন্টারে গিয়ে খদ্দের খুঁজে নেয়। শোনা যায়, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন মেয়ে অভিভাবকের চোখ ফাঁকি দিয়ে দালালের মাধ্যমে এ ব্যবসায় লিপ্ত হয়। কলগার্ল হিসেবে এরা আখ্যায়িত। দামি হোটেল বা ক্লাবগুলোতে এদের আনাগোনা বেশী।

হযরত লূত আলাইহি ওয়াসাল্লামের কওমের লোকেরা ছিল সমকামী। এরা নিজেদের স্ত্রীকে বাদ দিয়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে যৌনকর্ম করত। লূত (আ.) আপ্রাণ চেষ্টা করে এমনকি আল্লাহর আজাবের ভয় দেখিয়েও তাদেরকে বিরত রাখতে পারেননি। অবশেষে আল্লাহ্ তাদেরকে আজাব দেয়ার জন্য দু'জন ফেরেশতা পাঠান। ফেরেশতাদ্বয় সুশ্রী যুবকের বেশে লূত (আ.)-এর গৃহে যান। তিনি তাদেরকে চিনতে পারেননি। লোকেরা সুশ্রী দু'জন মেহমানের আগমন সংবাদ পেয়ে সেখানে গিয়ে ভিড় জমায়। লূত (আ.) তাদেরকে বললেন, হে আমার কওম! এ আমার কন্যারা রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র। (বৈধ উপায়ে তাদের সাথে সঙ্গম করে তৃপ্ত হও) সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে লজ্জিত করো না (সূরা হূদ # ১১ : ৭৮)। কিন্তু তারা কন্যাদেরকে বিবাহ করার পরিবর্তে যুবক দু'জনকে তাদের নিকট সোপর্দ করার দাবী জানায়। তারা বলল, তোমার তো জানা আছে যে, তোমার কন্যাদের ব্যাপারে আমাদের কোন আগ্রহ নেই। আর তুমি

www.nagorikpathagar.org

এটাও জান যে, আমরা কি চাচ্ছি (সূরা হূদ # ১১ : ৭৯)। লূত (আ.)-এর পেরেশানি দেখে, ফেরেশতারা বললেন, হে লূত! আমরা তোমার রবের প্রেরিত ফেরেশতা। এরা তোমার কাছে পৌঁছতে পারবে না। তুমি কিছুটা রাত থাকতে নিজের লোকজন নিয়ে বের হয়ে যাও। আর তোমাদের কেউ যেন পেছনে ফিরে না তাকায়। কিন্তু তোমার স্ত্রীর উপরও তা আপতিত হবে যা তাদের উপর আপতিত হবে। এদের জন্য নির্ধারিত সময় সকালে, সকাল হতে আর দেরি বা কত। অতঃপর যখন আমাদের ফয়সালা এসে পৌঁছল, তখন আমরা উক্ত জনপদকে নীচ থেকে উপরে উল্টিয়ে দিলাম এবং তার উপর কাঁকর-পাথর বর্ষণ করলাম (সূরা হূদ # ১১ : ৮১-৮২)।

আল্লাহর গজবে ধ্বংসপ্রাপ্ত সেই স্থানটি বিশাল হ্রদে পরিণত হলো। এর অবস্থান জর্ডান ও ইসরাইলের মধ্যবর্তী স্থানে। এটা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৩০০ ফুট নীচে, ১২৪০ ফুট গভীর, ১৮ মাইল লম্বা এবং ২ মাইল থেকে ১১ মাইল চওড়া। এর পানি এত লবণাক্ত যে এর পানিতে মাছ বা কোন জলজ প্রাণী নেই, মানুষ পানিতে না ডুবে ভেসে থাকে।

সকল ধর্মে যেনা একটি অপরাধ। ইসলামের দৃষ্টিতে এটা অত্যন্ত কঠিন অপরাধ এবং কবীরা গুনাহসমূহের একটি। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এর অত্যন্ত মারাত্মক কুফল রয়েছে। জারজ সন্তানের পিতৃ পরিচয় থাকে না। সে পিতার ধন-সম্পদের অধিকারী হয় না। তার নিজের কোন অপরাধ না থাকলেও সমাজে সে থাকে ঘৃণিত। যেনার ফলে যেনাকারীদের পারিবারিক বন্ধন নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, যেনার কাছেও যাবে না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ (সূরা বনী ইসরাইল # ১৭ : ৩২)। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কোন ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন থাকা অবস্থায় ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে না। ব্যভিচারী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন সে মুমিন থাকে না (সহীহ মুসলিম # ১১০ এবং বোখারী শরীফ # ২৫৪৫)।

যেনার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। আল্লাহ বলেন, ব্যভিচারিণী নারী, ব্যভিচারী পুরুষ, তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকর করণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের দয়ার উদ্রেক না হয়,

www.nagorikpathagar.org

যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক (সূরা নূর # ২৪ : ২)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, তোমাদের মধ্য থেকে যে দু'জন কুকর্মে লিপ্ত হয়, তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর। অতঃপর যদি উভয়ে তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে, তবে তাদের থেকে হাত গুটায়ে নাও। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, দয়ালু (সূরা নিসা # ৪ : ১৬)।

আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) অবিবাহিত যেনাকারীর জন্য নির্ধারিত (একশত) বেত্রদণ্ডের সঙ্গে এক বছর নির্বাসনের ফয়সালা করেছেন (বোখারী শরীফ # ২৫৬৬)।

জাবের (রা.) বর্ণনা করেছেন, আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে স্বীকারোক্তি করল, সে যেনা করেছে এবং এ স্বীকারোক্তি সে চারবার করল। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে রজম করার আদেশ করলেন। সে মতে তাকে প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেলা হলো। লোকটি বিবাহিত ছিল [বিবাহিতের যেনার শাস্তি প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড] (বোখারী শরীফ # ২৫৫৭)।

আল্লাহ বলেন, আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারিণী তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন পুরুষকে সাক্ষী হিসেবে তলব কর। অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে তবে সংশ্লিষ্টদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ, যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে তুলে না নেয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন পথ নির্দেশ না করেন (সূরা নিসা # ৪ : ১৫)।

যেনা দু'জনের পরস্পরের শলা-পরামর্শের মাধ্যমে হতে পারে। আবার একজন অপরজনের উপর জোর প্রয়োগ করেও সংঘটিত করতে পারে। উভয় ক্ষেত্রে দু'জন যৌনক্রিয়ার অংশীদার হলেও শেষোক্ত ক্ষেত্রে শুধু জোর প্রয়োগকারী যেনাকার এবং যার উপর জোর প্রয়োগ করা হয়েছে তাকে নিরপরাধ গণ্য করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময় একটি স্ত্রীলোকের উপর বলাৎকার করা হয়েছিল। তিনি সেই স্ত্রীলোকটিকে নির্ধারিত শাস্তি থেকে অব্যাহতি দিয়ে বলাৎকারীর উপর তা (শাস্তি) প্রয়োগ করলেন (তিরমিযী, বর্ণনায় ওয়ায়েল বিন হোজর)।

যেনার শাস্তি যেমন কঠোর কোন সতী নারীর প্রতি যেনার মিথ্যা অপবাদ দেয়ার শাস্তি তেমনি কঠোর। আল্লাহ বলেন ঃ যারা সতী-সাধ্বী

www.nagorikpathagar.org

নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে; অতঃপর স্বপক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। এরা ফাসেক পরিগণিত কিন্তু যারা এরপর তওবা করে এবং সংশোধিত হয়, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান (সূরা নূর # ২৪ : ৪-৫)।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি ও বিরোধ দেখা দিলে একে অপরকে অপদস্থ করার জন্য বিভিন্ন কুট কৌশল অবলম্বন করে। এর মধ্যে যেনার অপবাদও একটি। আল্লাহ্ বলেন ঃ আর যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী নেই এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য এভাবে হবে যে, সে আল্লাহর কসম করে চারবার সাক্ষী দেবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী। আর পঞ্চমবারে বলবে যে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে তার উপর আল্লাহর লানত (সূরা নূর # ২৪ : ৬-৭)।

অপরদিকে স্ত্রী সত্যি নির্দোষ হলে তার অপবাদ খণ্ডনের জন্য আল্লাহ্ ব্যবস্থা দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ আর স্ত্রীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে যদি সে আল্লাহর কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী; এবং পঞ্চমবার বলে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তবে তার উপর আল্লাহর গজব নেমে আসবে (সূরা নূর # ২৪ : ৮-৯)।

পরবর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে, যারা ঈমানদার হয়েও অপবাদ শুনে প্রতিবাদ করে না, তারাও অপরাধী। এরূপ অপরাধ না করার জন্য আল্লাহ্ সতর্ক করেছেন। এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি ঈমানদার হও, তবে কখনো পুনরায় এ ধরনের আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না (সূরা নূর # ২৪ : ১৭)।

যেনাকারী নর-নারীকে কিভাবে কবরে আজাব দেয়া হয় তার একটি বিবরণ কবর আজাব অধ্যায়ে দেয়া হয়েছে।

---

www.nagorikpathagar.org

পর্দা

আল্লাহ নারী ও পুরুষের মধ্যে একের চোখে অপরকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করেছেন। তবে নারীকে পুরুষের চোখে বেশী আকর্ষণীয় করে রেখেছেন। চুম্বক যেভাবে অন্য ধাতুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে নারীও পুরুষকে সেভাবে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে। এ দু'য়ের মাঝে শয়তান তার জায়গা করে নেয়। সে উভয়কে অপকর্মের জন্য প্ররোচিত করতে শুরু করে। যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকে তারা এ ফাঁদ থেকে সরে পড়তে পারে। কিন্তু যাদের অন্তরে আল্লাহভীতি নেই এবং যারা স্বভাবে কামুক তারা এ ফাঁদে আটকা পড়ে। এরূপ একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে চোখ দেখাদেখি হতে শুরু করে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হতে থাকলে এক সময় উভয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে। উসামা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমার পরে পুরুষদের জন্য নারীগণই হবে সর্বাধিক ক্ষতিকারিণী। পুরুষদের জন্য নারীদের সমতুল্য পথভ্রষ্টকারী ক্ষতিকারক আর কোন কিছুই হবে না (বোখারী শরীফ # ২০১২)।

পশ্চিমা দেশ যেমন ইউরোপ ও আমেরিকায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সে সকল দেশে নারী ও পুরুষের মধ্যে দূরত্ব নেই। তারা অবাধে মেলামেশা করে। পরিণামে অগণিত জারজ সন্তানের জন্ম হচ্ছে। এ সকল সন্তানেরা জানে না তাদের জন্মদাতা পিতা কে। তাই তারা আমাদের দেশের মত পিতার পরিচয়ে পরিচিত না হয়ে মাতার পরিচয়ে পরিচিত হয়। স্বামী ছাড়া অবৈধভাবে যারা সন্তানের জন্ম দেয় তাদেরকে সিঙ্গেল মাদার (কুমারী মাতা) বলা হয়। আমেরিকায় সিঙ্গেল মাদার হওয়াকে কেউ দোষ মনে করে না। কিন্তু ইসলামের বিধানে এরা যেনার অপরাধে অপরাধী যার শাস্তি অবিবাহিতদের জন্য একশত বেত্রাঘাত এবং বিবাহিতদের জন্য রজম বা পাথর নিক্ষেপে হত্যা। সিঙ্গেল মাদারদের কয়েকজন সন্তান থাকতেও দেখা যায়।

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চম হিজরী সনে পর্দার আয়াত প্রথম নাযিল হয়েছে। পর্দা অর্থ আবরণ বা আড়াল। কথায় আছে যৌবনে সকল নারী সুন্দরী। নারীর সৌন্দর্য বা রূপ-লাবণ্য পুরুষের দৃষ্টি থেকে আড়াল করার জন্য পর্দার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। নারীর সম্ভ্রম রক্ষা করা পর্দার প্রধান উদ্দেশ্য। হযরত ওমর (রা.)-এর কন্যা হযরত হাফসা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিবিগণের একজন। ওমর (রা.) লক্ষ্য করলেন যে, নবী পত্নীগণের নিকট বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজন আসা-যাওয়া করে কিন্তু সে সকল লোকদের নিকট তাঁরা পর্দা করেন না। বোখারী ও মুসলিমে ওমর (রা.)-এর উক্তি বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি আমার পালনকর্তার সাথে তিনটি বিষয়ে একইরূপ মতে পৌঁছেছি–

১। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এই মর্মে বাসনা প্রকাশ করলাম যে, আপনি মাকামে ইব্রাহীমকে নামাযের জায়গা করে নিলে ভাল হত। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আদেশ নাযিল করলেন, তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে নামাযের জায়গা করে নাও।

২। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.) আপনার পত্নীগণের সামনে সৎ-অসৎ প্রত্যেক ব্যক্তি আসে। আপনি তাদেরকে পর্দার আদেশ দিলে ভাল হত। এর পরিপ্রেক্ষিতে পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হলো।

৩। নবী পত্নীগণের মধ্যে যখন পারস্পরিক আত্মমর্যাদাবোধ ও ঈর্ষা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, তখন আমি বললাম, যদি রাসূলুল্লাহ (সা.) তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দেন, তবে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অপেক্ষা উত্তম পত্নী তাঁকে দান করবেন। অতঃপর ঠিক এ ভাষায়ই কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়ে গেল।

অপরদিকে সহীহ্ বোখারীতে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত দ্বিতীয় ঘটনা এ যে, হযরত আনাস (রা.) বলেন, পর্দার আয়াতের স্বরূপ সম্পর্কে আমি সর্বাধিক জ্ঞাত। কারণ আমি ছিলাম এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.) বিবাহের পর বধূবেশে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গৃহে আগমন করেন এবং গৃহে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে

www.nagorikpathagar.org

উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ওলীমার জন্যে কিছু খাদ্য প্রস্তুত করান এবং সাহাবায়ে কেরামকে দাওয়াত করেন। খাওয়ার পর কিছু লোক পারস্পরিক কথাবার্তার জন্যে সেখানে অনড় হয়ে বসে রইল। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং যয়নব (রা.)ও ছিলেন। তিনি সঙ্কোচবশতঃ প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিলেন। লোকজনের দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) কষ্ট অনুভব করছিলেন। তিনি গৃহ থেকে বের হয়ে অন্য পত্নীগণের সাথে সাক্ষাৎ ও সালামের জন্য চলে গেলেন। তিনি ফিরে এসে দেখলেন যে, লোকজন তেমনি বসে রয়েছে তাঁকে ফিরে আসতে দেখে তাঁদের সম্বিৎ ফিরে আসলো এবং স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘরে প্রবেশ করে অল্পক্ষণ পরে পুনরায় বের হয়ে আসলেন। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তিনি পর্দার আয়াত পাঠ করে শুনালেন। (তফসীর মা'আরেফুল কোরআনে সূরা আহযাব এর তফসীর)। আয়াতটির অর্থ এই ঃ হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, যেন তারা তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু (সূরা আহযাব # ৩৩ : ৫৯)।

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার মধ্য দিয়ে পর্দা মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। মুসলমান নারীরা বোরখা পরিধান করে। এটা দ্বারা মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা থাকে। মুখের উপর ছোট ছোট ছিদ্র বিশিষ্ট একটি ঢাকনা যাতে দেখে পথ চলতে পারে। ঢাকনা সরিয়ে পানাহার করতে পারে। সাধারণতঃ কালো রংয়ের বোরখা মহিলারা ব্যবহার করে থাকে। এ বোরখা গ্রামাঞ্চলে বেশী ব্যবহার হয়ে থাকে।

বোরখা যারা পছন্দ করে না তারা হিজাব ব্যবহার করে। হিজাব একটি রুমাল বিশেষ যা দ্বারা মাথা ও ঘাড় ঢাকা হয়। এতে মুখ খোলা থাকে। হিজাব ব্যবহারকারীরা এর সাথে হাতের কব্জি বাদে সমস্ত শরীর ঢাকার জন্য জামা ব্যবহার করে। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। আবু

www.nagorikpathagar.org

বকর (রা.)-এর কন্যা আসমা (রা.) পাতলা পোশাক পরিধান করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট আসলেন। তিনি তাঁর নিকটে গিয়ে বললেন ঃ হে আসমা! কোন মেয়ে মাসিকের বয়সে উপনীত হলে এটা ছাড়া কোন কিছু খোলা থাকা সঠিক নয়। তিনি মুখমণ্ডল ও হাতের দিকে ইঙ্গিত করলেন (আবু দাউদ # ৪০৫৯)।

এতে বুঝা যায় মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি খোলা রাখা যায়। কিন্তু ইয়ামেন, সৌদী আরব, আফগানিস্তান এবং এদের অনুসারীরা নারীদের শরীরের কোন অঙ্গ খোলা রাখার পক্ষপাতী নয়। তাদের নারীরা হিজাবের সাথে নিকাব পরিধান করে। এতে চোখ বাদে সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা হয়। নিকাব উপরে বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থী। তদুপরি হজ্জের সময় নারীদের মুখমণ্ডল ও হাত খোলা রাখতে হয়। নামাযের সময়ে মুখ খোলা রেখে নামায পড়তে হয়। সূরা নূরের ৩০ আয়াতে পুরুষকে দৃষ্টি নত রাখতে বলা হয়েছে। যেহেতু নিকাব পরিহিতা নারীর চেহারা দেখা যায় না, তাই পুরুষকে দৃষ্টি নত রাখার জন্য কুরআনের নির্দেশের কোন যৌক্তিকতা থাকে না। সূরা নূরের ৩১ আয়াতে "যা সাধারণত প্রকাশমান" বলার মাধ্যমে মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি পর্যন্ত খোলা রাখার ইঙ্গিত আছে। এ সকল কারণে কেউ কেউ নিকাবকে বাড়াবাড়ি এবং বিদ'আত বলে থাকেন।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ আদেশ করেন ঃ ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভাতিজা, ভাগিনা, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত বাঁদি, যৌন কামনামুক্ত পুরুষ ও বালক যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সকলে আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও (সূরা নূর # ২৪ : ৩১)।

www.nagorikpathagar.org

ওকবা ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, খবরদার! বেগানা নারীদের সঙ্গে মেলামেশা দেখা-সাক্ষাৎ করো না। এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! স্বামীর ভ্রাতাগণ ভ্রাতাবধূর সাথে এরূপ করতে পারে কি? তদুত্তরে হযরত (সা.) বলেছেন, স্বামীর ভ্রাতাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ মৃত্যুতুল্য। (বুখারী শরীফ : ২০৬৬) এটার কারণ এই যে, বেগানা পুরুষ অপেক্ষা স্বামীর ভাই বা ভাইতুল্য অন্য আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভাবীর দূরত্ব খুব কম বা একেবারে নেই। এ ক্ষেত্রে শয়তান উভয়কে প্ররোচিত করা খুব সহজ। তাই এ ক্ষেত্রে অধিক সতকর্তা অবলম্বন করা খুব জরুরী।

পর্দা শুধু নারীর জন্য বাধ্যতামূলক নয়, এটা পুরুষের জন্যও বাধ্যতামূলক। কোন বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন ঃ মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং আপন যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এটাতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ্ তা অবহিত আছেন (সূরা নূর # ২৪ : ৩০)। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, দৃষ্টিপাত শয়তানের একটি বিষাক্ত শর। যে ব্যক্তি মনের চাহিদা সত্ত্বেও দৃষ্টি ফিরে নেয়, আমি তার পরিবর্তে তাকে সুদৃঢ় ঈমান দান করব, যার মিষ্টতা সে অন্তরে অনুভব করবে। সহীহ্ মুসলিমে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, ইচ্ছা ছাড়া হঠাৎ কোন বেগানা নারীর উপর দৃষ্টি পতিত হলে সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও (ইবনে কাসীর)। হযরত আলী (রা.)-এর হাদীসে আছে, প্রথম দৃষ্টি মাফ এবং দ্বিতীয় দৃষ্টিপাত গুনাহ্। এর উদ্দেশ্য এ যে, প্রথম দৃষ্টিপাতে গোপন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যায় (তফসীর মা'আরেফুল কোরআন, সূরা নূরের তফসীর)। নারী ও পুরুষের কাম প্রবৃত্তির প্রাথমিক পর্যায় দৃষ্টিপাত যা আকর্ষণ সৃষ্টি করে। অতঃপর দৃষ্টি বিনিময় ও পর্যায়ক্রমে ভাব বিনিময় এবং অবশেষে উত্তেজনা ও ব্যভিচার।

www.nagorikpathagar.org

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের রাতের বেলায় মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দাও। তখন তাঁর এক পুত্র (বেলাল) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি তাদেরকে রাতের বেলায় মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেব না। কেননা এটাতে তারা ফিতনা-ফাসাদে লিপ্ত হতে পারে (আবু দাউদ # ৫৬৮)। এটার কারণ এই হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর থেকে ঘরের বাইরে মহিলাদের কারো কারো চাল-চলন দৃষ্টিকটু পরিলক্ষিত হয়েছিল। আর এটা হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা.)-এর দৃষ্টিও এড়ায়নি। তাই আয়েশা (রা.) বলেছেন ঃ বর্তমান (তাঁর সময়ের) মহিলাদের আচার-আচরণ যদি রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বচক্ষে দেখতে পেতেন, তবে অবশ্যই তিনি তাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন। যেরূপ বনী ইসরাইলের স্ত্রীলোকদের মসজিদে যাওয়া নিষেধ করা হয়েছিল (আবু দাউদ # ৫৬৯)।

সাহাবাদেরকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহর বাঁদিদেরকে তোমাদের স্ত্রীদেরকে আল্লাহর মসজিদসমূহে যাতায়াতে বাধা দিও না। (আবু দাউদ : ৫৬৬) কিন্তু অপরদিকে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ মহিলাদের ঘরে নামায আদায় করা বৈঠকখানায় নামায আদায় করা থেকে উত্তম এবং মহিলাদের সাধারণ থাকার ঘরে নামায আদায় করা অপেক্ষা গোপন প্রকোষ্ঠে (কক্ষে) নামায আদায় করা অধিক উত্তম (আবু দাউদ # ৫৭০)। মহিলাদেরকে পুরুষদের সংস্পর্শের বাইরে রাখার উদ্দেশ্যে এ সকল কথা বলেছেন বলে প্রতীয়মান হয়।

হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে ছিলাম। মাইমুনাও তখন তাঁর কাছে ছিলেন। এমন সময় আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) আসল। এটা আমাদেরকে পর্দার হুকুম দেয়ার পরের ঘটনা নবী (সা.) বললেন ঃ

www.nagorikpathagar.org

তোমরা তাঁর সামনে পর্দা কর। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.) সে কি অন্ধ নয়? সে তো আমাদেরকে দেখতে পায় না, চিনতেও পারে না। নবী (সা.) বললেন ঃ তোমরা দু'জনও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখতে পাও না (আবু দাউদ শরীফ # ৪০৬৬ এবং তিরমিযী শরীফ # ২৭৭৯)? অতএব পর্দা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি দিয়ে একে অপরকে চিনতে পারে। পরিচিত কাকেও না দেখে তার কথার শব্দ শুনে তাকে চেনা যায়। পরিচিত না হলে অন্তরে তার কাল্পনিক ছবি ফুটে উঠে। অন্ধও অনুরূপভাবে কাউকেও চিনতে বা তার সম্পর্কে ধারণা করতে পারে। পর্দার জন্য অন্তরের ভাবনা বাস্তবে দেখার সমান গুরুত্ব বহন করে। সে জন্যেই চোখে দেখা কানে শুনা, মুখে আলাপ করা ও হাতের স্পর্শ দ্বারা ব্যভিচার হতে পারে। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ কান, চোখ ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটি (কেয়ামতে) জিজ্ঞাসিত হবে (সূরা বনী ইসরাইল # ১৭ : ৩৬)। গুনাহ্ থেকে বাঁচার জন্য এদেরও পর্দা করা প্রয়োজন।

www.nagorikpathagar.org

উপার্জনে বাছ বিচার

জীবনের চাহিদা মিটাতে উপার্জনের প্রয়োজন। চাহিদা বলতে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদিকে বুঝায়। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, তিনি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুষম করেছেন; অতএব তোমরা এর উপর বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার কর (সূরা মুলক # ৬৭ : ১৫)। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, মুমিনগণ! জুমার দিনে যখন নামাযের আজান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ছুটে যাও এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। অতঃপর নামায শেষ হলে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও (সূরা জুমা # ৬২ : ৯-১০)।

উপার্জনের পন্থা ঠিক করা খুব কঠিন। পন্থা ঠিক করার জন্য যে যেভাবে চিন্তা করে পরিবেশ পরিস্থিতি তার অনুকূলে নাও হতে পারে। ফলে ইচ্ছার বিপরীতে যে কোন কাজে লিপ্ত হতে হয়। ব্যবসা অথবা চাকুরি উপার্জনের প্রধান দু'টি বৈধ পথ। রাসূলুল্লাহ (সা.) ব্যবসা এবং চাকুরি উভয়টি করেছেন। ব্যবসার বহু শাখা-প্রশাখা রয়েছে। চাকুরিও তেমনি বহু প্রকারের হতে পারে। এই উভয়টির মধ্যে বৈধ এবং অবৈধ উপায় রয়েছে। সাধারণ জীবন যাপনে যারা সন্তুষ্ট তারা সৎপথে থেকে ব্যবসা অথবা চাকুরি করে। আর যারা বিলাসী জীবন যাপনের জন্য আগ্রহী, তারা কোন কিছুর ভাল-মন্দ, বৈধ-অবৈধ উপার্জনের মধ্যে বাছ বিচার না করে যেন তেন উপায়ে উপার্জনের লক্ষ্যে ছুটে চলে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সা.) আফসোস করে বলেছেন, এমন সময় আসবে, যখন মানুষ ধন-দৌলত হাসিল করার মধ্যে কোন বাছ বিচার করবে না যে হালাল সূত্রে হাসিল হলো, না হারাম সূত্রে হাসিল হলো (বুখারী শরীফ # ১০৬৩)।

একেবারে নিম্নস্তরে চিন্তা করলে, কৃষক জমি চাষ করে ফসল উৎপাদন করে, এটা তার ব্যবসা কিন্তু তার কাজে সাহায্য করার জন্য নিয়োজিত লোকদের জন্য এটা চাকুরি। কারণ, কাজের বিনিময়ে তারা

www.nagorikpathagar.org

মজুরি বা বেতন পায়। শিক্ষক, ব্যাংকার, সরকারী আমলা, ডিসি, এসপি, পিয়ন, দারোয়ান এরা চাকুরিজীবী। ব্যারিষ্টার, উকিল, মোক্তার এরা ব্যবসায়ী কিন্তু বিচারক চাকুরিজীবী। রপ্তানিকারক, আমদানিকারক, আড়তদার, দোকানদার এরা ব্যবসায়ী। তারা নিজ নিজ স্থানে থেকে উপার্জন করে। তাদের বৈধ উপার্জনের মধ্যেও অবৈধ উপার্জন ঢুকে পড়তে পারে।

একজন ক্ষেত মজুর একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজে নিয়োজিত হয়। সে তার সাধ্যমত কাজ করবে এটা কাম্য। কিন্তু যদি সে ধীরে চলো পলিসি নিয়ে চার ঘণ্টার কাজ করতে আট ঘণ্টা লাগায় তাহলে তার উপার্জনের মধ্যে অবৈধ উপার্জন ঢুকে গেল। কারণ, সে প্রকৃতপক্ষে চার ঘণ্টার কাজ করে আট ঘণ্টার টাকা নিল। তেমনিভাবে অফিসের কর্মকর্তা বা কর্মচারী তার উপার্জনে অবৈধ টাকা ঢুকিয়ে ফেলতে পারে। বাংলাদেশে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, অফিসে গিয়ে চেয়ারের পেছনে কোট ঝুলিয়ে দিতে পারলে কাজ যতটুকু করুক না কেন সেদিনের হাজিরা জায়েয হয়ে গেল। এটা অপেক্ষাও চমকপ্রদ ঘটনা আছে। খাগড়াছড়ি জেলা শহরে চাকুরি করাকালীন দেখেছি, উপজেলায় নিয়োজিত অধিকাংশ কর্মকর্তা মাসের প্রথম ও শেষ সপ্তাহ চাকুরিতে হাজির থাকতেন। মাঝখানের বাকী সময় নিজ পরিবারের সাথে অন্যত্র কাটাতেন। শেষ সপ্তাহে এসে নিজের বেতন নিতেন এবং অধীনস্থদের বেতন দিতেন। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহে অধীনস্থদের কাজ বুঝিয়ে দিয়ে চলে যেতেন পরিবারের কাছে। কাজ না করে যেই সময়ের বেতন তিনি নিলেন তা সম্পূর্ণ অবৈধ বা হারাম।

চাকুরির মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য যে বিষয়টি যোগ হয়েছে তা ঘুষের আদান-প্রদান। চাকুরি পেতে, চাকুরি রক্ষা করতে, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বদলী হতে এমনকি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পরেও ঘুষ দেয়া-নেয়ার রীতি সমাজে ঢুকে পড়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাকুরি পেতে তদবীর লাগে যা মামার জোর নামে সকলের নিকট পরিচিত। যাদের তদবীর করার কেউ নেই তাদের দিতে হয় মোটা অঙ্কের ঘুষ। চাকুরি পাওয়ার পরে এটা

www.nagorikpathagar.org

রক্ষার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে খুশী রাখতে বিভিন্ন পন্থায় ঘুষ দিতে হয়। এটা শেষ নয়। চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পরে চাকুরি পরবর্তী পেনশন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ইত্যাদি সময়মত পেতে অফিসে ঘুষ দিতে হয়। ঘুষের লেন-দেন সবচেয়ে বেশী পুলিশ বিভাগে। এই বিভাগের লোকেরা ঘুষের জায়গায় বদলী হওয়ার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ দেয় বলে শুনা যায়। থানা পর্যায়ের পুলিশের ছোট একটি ঘটনা। একবার একটি থানা কর্মকর্তা সমন্বয় মিটিংয়ে গিয়ে দেখি মিটিং হলের বারান্দায় লোক সম্মুখে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) একটি ব্যাংকের ম্যানেজারকে ধমক দিয়ে বলছে, আপনার বিরুদ্ধে ঘুষের অনেক অভিযোগ শুনা গেছে। ঘুষ আমিও খাই। আমি মাসের প্রথমে হিসাব করে দেখি, কত টাকা হলে আমার মাসের যাবতীয় খরচ চলবে। সে টাকা থেকে বেতনের টাকা বাদ দিয়ে বাকী টাকা আমি ঘুষ নিই। আপনি সীমা ঠিক না করে ঘুষ নেন। এমনটি করবেন না। নতুবা আপনার বিরুদ্ধে এ্যাকশন নেব। এরূপ চিত্র সভ্য সমাজের জন্য লজ্জার এবং দুঃখজনক। যে চাকুরিতে ঘুষের লেন-দেন বেশী, চাকুরি সন্ধানীরা সে চাকুরিকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। সরকারী এমন কিছু দপ্তর আছে যেখানে ঘুষ না দিয়ে কোন কাজ করানো যায় না। অনেক অফিসে ঘুষ আদায়ের জন্য দালাল নিয়োজিত থাকে। তাদেরকে ধরার কোন উদ্যোগ কেউ নেয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে সহজ-সরল ও সৎ মানুষকে অন্যায় কাজে লিপ্ত করা হয়। দেশের নিরাপত্তা রক্ষা ও চোরাচালান রোধের জন্য সীমান্তে প্রহরী নিয়োজিত থাকে। কখনো কখনো এ সকল প্রহরীরা সীমান্তের সহজ-সরল ও সৎ মানুষকে চোরাচালানী হতে বাধ্য করে। একবার চাকুরির সুবাদে ১৯৭৭ সালের শেষের দিকে সিলেটের জাফলং সীমান্তের একটি গ্রামে যাই এবং সেখানে এক বাড়ীতে রাত যাপন করি। রাতে বাড়ীর মালিকের নিকট তাদের জীবন যাপন সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি দুঃখ করে বললেন, বিডিআর (বর্তমান বিজিবি)-এর অত্যাচার সহ্য করে কোন রকমে বেঁচে আছি। তাদেরকে মাসিক চাঁদা দিতে হয়। না দিলে ঘরের মধ্যে অবৈধ মালমাল যেমন ভারতীয় ফেনসিডিল, মদ, বিড়ি পাতা ইত্যাদি ঢুকিয়ে দিয়ে চোরাচালানী বলে ধরে নিয়ে যায়। তাই এ চাঁদা

www.nagorikpathagar.org

বা ঘুষের টাকা জোগাড়ের জন্য অবৈধ মালামাল বর্ডার দিয়ে আনা-নেয়া করি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) উৎকোচ (ঘুষ) প্রদানকারী ও উৎকোচ গ্রহণকারী উভয়ের উপর লানত করেছেন (আবু দাউদ শরীফ # ৩০৪২, ইবনে মাজাহ শরীফ # ২৩১৩)।

বিচার বিভাগ অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল। কিন্তু এমন শুনা যায় গ্রাম্য বিচার হতে শুরু করে দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ে পর্যন্ত ঘুষের অভিযোগ আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং অপরের সম্পদের কিছু অংশ জেনে শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাতের উদ্দেশ্যে বিচারককে ঘুষ দিও না (সূরা বাকারা # ২ : ১৮৮)। হযরত বুবায়দা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ বিচারক তিন প্রকারের; এক প্রকারের জন্য জান্নাত এবং দু'প্রকারের জন্য জাহান্নাম অবধারিত। সে বিচারক জান্নাতে প্রবেশ করবেন যিনি সত্যটি উপলব্ধি করেছেন এবং তদনুযায়ী বিচার করেছেন। আর যে বিচারক সত্য উপলব্ধি করে বিচারের মধ্যে অন্যায় করল, সে বিচারক জাহান্নামী। অনুরূপভাবে সে বিচারক দোযখে প্রবেশ করবে, যে অজ্ঞতার সাথে মানুষের মধ্যে বিচার করল (আবু দাউদ শরীফ # ৩৫৩৫, ইবনে মাজাহ শরীফ # ২৩১৫)।

ঘুষের মত সুদও সমাজের প্রতিটি স্তরে এমনভাবে ঢুকে পড়েছে যে, এটা থেকে দূরে থাকা কষ্টকর। গ্রামাঞ্চলে সুদের ব্যবসায়ী ছোট ছোট এনজিও ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে সুদে টাকা খাটানো লোকের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে চলছে। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ লোকদের উপর এমন এক যুগ আসবে যখন একটি লোকও সুদের কারবার থেকে অব্যাহতি পাবে না। সে সরাসরি না খেলেও সুদের ধোঁয়া বা ধুলা তাকে স্পর্শ করবে (আবু দাউদ শরীফ # ৩২৯৮, ইবনে মাজাহ শরীফ # ২২৭৭)। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন ঃ যারা সুদ খায়। কেয়ামতের দিন তারা জিনের আছুরে পাওয়া লোকের মত দিশাহারা অবস্থায় দাঁড়াবে, তা এজন্য যে তারা বলে বেড়াতো ব্যবসাতো সুদ নেয়ার মতই। বস্তুতঃ আল্লাহ ব্যবসা হালাল এবং সুদ হারাম

www.nagorikpathagar.org

করেছেন। সুতরাং যে কেউ আল্লাহ্র আদেশ পাওয়ার পর তা থেকে বিরত হয়েছে তার ব্যাপার আল্লাহর হাতে, আর যারা পুনরাবৃত্তি করবে তারা দোযখে যাবে এবং সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে (সূরা বাকারা # ২ : ২৭৫)। হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) সুদ গ্রহণকারী, সুদ প্রদানকারী, এর হিসাব রক্ষক (বা চুক্তিপত্র লেখক) এবং এর সাক্ষীদ্বয় সকলকে অভিসম্পাত করেছেন। তিনি বলেছেন এরা সকলে সমান অপরাধী (সহীহ মুসলিম # ৩৯৪৭)। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সুদের গুনাহের সত্তর ভাগের ক্ষুদ্রতম ভাগ এই পরিমাণ যে, আপন মাকে বিবাহ করার সমান (ইবনে মাজাহ শরীফ # ২২৭৪)।

সুদ বর্জনের জন্য আল্লাহ মুমিনদেরকে তাগিদ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন পেয়ে যাবে (সূরা বাকারা # ২ : ২৭৮ ও ২৭৯)।

আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল ঘোষণা করলেও সকল ব্যবসা হালাল নয়। মদ, গাঁজা, জুয়া ইত্যাদির ব্যবসা সম্পূর্ণ হারাম। আল্লাহ বলেন, মদ ও জুয়া সম্পর্কে লোকে আপনাকে (রাসূল সা.-কে) প্রশ্ন করে, বলুন এতদুভয়ে শক্ত গুনাহ, এতে মানুষের উপকারও নিহিত, কিন্তু উভয়ের গুনাহ উপকার অপেক্ষা অধিক (সূরা বাকারা # ২ : ২১৯)। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সা.) বলেছেন, যে সমস্ত পানীয় বস্তুর মধ্যে মাদকতা থাকে এদের সব হারাম (বোখারী শরীফ # ১৭৩)। হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) মদ সংশ্লিষ্ট দশজনের প্রতি লানত করেছেন ঃ (১) যে মদ তৈরি করে (২) যে মদ তৈরির ফরমায়েশ দেয় (৩) যে মদ পান করে (৪) যে মদ বহন করে (৫) যার জন্য মদ বহন করা হয় (৬) যে মদ পান করায় (৭) যে মদ বিক্রি করে (৮) যে এর মূল্য ভোগ করে (৯) যে মদ ক্রয় করে এবং (১০) যার জন্য মদ ক্রয় করা হয় (তিরমিযী শরীফ # ১২৩২, ইবনে মাজাহ শরীফ # ৩৩৮১)।

www.nagorikpathagar.org

মদপানে এবং গাঁজা সেবনে নেশা হয়। নেশার ঘোরে হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। জুয়াও এক প্রকারের নেশা। গ্রামাঞ্চলে রাস্তা-ঘাট ও চায়ের দোকানে জুয়ার আড্ডা বসতে দেখা যায়। এতে অর্থের অপচয় ছাড়াও জুয়ারিদের পরস্পরের মনোমালিন্য, মারামারি এমনকি খুনাখুনী হয়ে থাকে। আল্লাহ্ বলেন, হে মুমিনগণ, মূলতঃ মদ, জুয়া, প্রতিমা ও ভাগ্য নির্ধারক তীর শয়তানের অপবিত্র কাজ। এগুলো থেকে বেঁচে থাক যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি করবে এবং আল্লাহ্র স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখবে (সূরা মায়েদা # ৫ : ৯০-৯১)।

অনেক ব্যবসায়ী অসৎ পন্থায় অধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যে সকল উপায় খোঁজে বের করে এদের মধ্যে মাপে হেরফের করা একটি। আল্লাহ্ বলেন, যারা মাপে কম করে তাদের জন্য দুর্ভোগ। যারা লোকের নিকট থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় নেয় এবং যখন লোকদেরকে মেপে বা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে মহাদিবসে, যেদিন সমস্ত মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব প্রতিপালকের সামনে (সূরা মুতাফফিফীন # ৮৩ : ১-৬)? আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন, মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ দেবে এবং সঠিক দাঁড়ি-পাল্টায় ওজন করবে। এটা উত্তম, এর পরিণাম শুভ (সূরা বনী ইসরাইল # ১৭ : ৩৫)।

হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর সম্প্রদায় মাদইয়ানবাসীরা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় মাপে হেরফের করত। শোয়ায়েব (আ.) আল্লাহ্র আজাবের ভয় দেখিয়েও তাদেরকে এ অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখতে পারেন নি। তারা তাদের অন্যায় কাজ চালিয়ে যেতে থাকলে আল্লাহ্ তাদেরকে পাকড়াও করলেন। আল্লাহ্ বলেন, আমার নির্দেশ আসলে রক্ষা করলাম শোয়ায়েব এবং তার উপর বিশ্বাসী সঙ্গীদেরকে আমার অনুগ্রহে, আর পাপিষ্ঠদের উপর ভীষণ গর্জন পতিত হলো। ফলে ভোর না হতেই তারা নিজেদের গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। যেন তারা সেখানে বসবাসই করেনি (সূরা হূদ # ১১ : ৯৪-৯৫)।

www.nagorikpathagar.org

অতিরিক্ত মুনাফা করার উদ্দেশ্যে কোন কোন বিক্রেতা তার মালের ক্রয়মূল্য প্রকৃত ক্রয়মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী বলে মিথ্যা দাবী করে। ক্রেতা তার কথা বিশ্বাস করে বেশী দামে তা ক্রয় করে। ফলে বিক্রেতা অধিক লাভ করতে সক্ষম হয়। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তিন ধরনের লোকের সাথে আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তিঃ (তাদের) একজন কোন ব্যক্তির নিকট তার পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করতে গিয়ে আল্লাহর নামে কসম করে বলল, আমি এগুলো এত এত দামে ক্রয় করেছি। ক্রেতা তা বিশ্বাস করল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তা উক্ত মূল্যে ক্রয় করেনি (সহীহ্ মুসলিম # ২০৫)।

অন্য প্রকারের বিক্রেতা আগ্রহী ক্রেতাকে শপথ করে মিথ্যা বলে থাকে যে, তার পণ্য অন্য ক্রেতা এত এত দামে ক্রয় করতে চেয়েছে। এরূপ মিথ্যা বলা জঘন্য অপরাধ। আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তিন প্রকার মানুষ আছে, যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের ভীষণ কঠিন দিনে দৃষ্টিপাত করবেন না, তাদেরকে পাক-পবিত্র করবেন না এবং ভীষণ কষ্টদায়ক আজাব তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ঃ এক প্রকারের মানুষ ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় বিক্রয় বস্তু বিক্রি করার জন্য উপস্থিত করেছে, আসরের নামাযের পরে (বিশেষ ফযিলতের সময়েও বিনা দ্বিধায়) এরূপ মিথ্যা শপথ করে যে, যে আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বুদ নেই তার কসম খেয়ে বলছি, এই বস্তুটির এত টাকা মূল্য বলা হয়েছে অন্য ব্যক্তি তার কথা বিশ্বাস করেছে এবং ধোঁকায় পড়ে বেশী মূল্য প্রদান করেছে (বোখারী শরীফ # ১১৫৪)। নিজের মালামাল বিক্রয়ের জন্য সত্য হোক বা মিথ্যা হোক কোনরূপ শপথ করা ঠিক নয়। এতে সাময়িক লাভ দেখা গেলেও পক্ষান্তরে ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি ঃ বিক্রির সময় অধিক শপথ বেশী বিক্রয়ের কারণ হতে পারে, কিন্তু তা উপার্জনের বরকত নিঃশেষ করে দেয় (বোখারী শরীফ # ১০৭৪, সহীহ মুসলিম # ৩৯৭৯)।

www.nagorikpathagar.org

উচ্চ মুনাফা অর্জনের আরেক ফন্দি নকল ক্রেতা সাজিয়ে জিনিসের দাম বাড়ানো। গ্রাম্য হাট-বাজারে বিশেষ করে কোরবানীর ঈদ উপলক্ষে গরু-ছাগলের হাটে এক শ্রেণীর দালাল বা নকল ক্রেতা দেখা যায়। কেউ একটি কোরবানীর পশু পছন্দ করে দাম করতে থাকলে আশে-পাশে অপেক্ষমাণ নকল ক্রেতা এসে প্রকৃত ক্রেতা অপেক্ষা দাম বাড়িয়ে দিয়ে বিক্রেতাকে বলে ঃ পশুটা (গরু বা ছাগল) আমার পছন্দ হয়েছে। আমি আরোও এত টাকা বেশী দেব। এটা আমাকে দিয়ে দিন। অতঃপর প্রকৃত ক্রেতার দিকে তাকিয়ে বলে ঃ আপনিও বোধ হয় দাম করতেছেন। আপনার দামাদামির মাঝে দাম বলা আমার ভুল হয়েছে। আমার বলা দামে দিলে আপনি এটা নিয়ে যান। প্রকৃত ক্রেতা এই ধোঁকা বুঝতে না পারলে নকল ক্রেতার বলা দামে বা এরও বেশী দাম করে পশুটি ক্রয় করে নিয়ে যেতে পারে। ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, প্রকৃত ক্রেতাদেরকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে নকল ক্রেতা সাজিয়ে পণ্যের মূল্য ঊর্ধ্বে উঠানোর অসদুপায় অবলম্বন করাকে নবী (সা.) নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। নবী (সা.) আরো বলেছেন, প্রতারণার প্রতিফল দোযখের শাস্তি ভোগ করা (বোখারী শরীফ # ১০৮৫)।

মালামালের সাথে ভেজাল মিশিয়ে অধিক মুনাফা অর্জনের ফন্দি নতুন নয়। উত্তম মালের সাথে নিম্নমানের মাল, তুলার সাথে এর বীচি সদৃশ মাস কলাই, গোল মরিচের সাথে পেঁপের বীচি ইত্যাদি মিশানো এমনকি ধান বা পাটের মধ্যে পানি বা বালি দেয়া অসাধু বিক্রেতাদের কাজ। এগুলো ধর্মীয় এবং সামাজিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে অপরাধ। একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) খাদ্য শস্যের একটি স্তূপের কাছ দিয়ে যাবার সময় স্তূপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো ভিজা মনে হলো। তিনি বললেন, হে শস্যের মালিক! এ কি? সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। তিনি বললেন ঃ তাহলে এগুলো উপরে রাখ না কেন? লোকে দেখে শুনে ক্রয় করত। যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয় (সহীহ মুসলিম # ১৯২)।

কোন কোন হাটে যাওয়ার পথের পাশে কিছু ক্রেতা মালামাল ক্রয়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। তারা হাটের ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা কম মূলে

www.nagorikpathagar.org

ক্রয় করে তা হাটে নিয়ে অধিক মূল্যে বিক্রয় করে। এতে মালের বিক্রেতাকে ঠকানো হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ সম্মুখে অগ্রসর হয়ে ব্যবসায়ী কাফেলার কাছ থেকে মালপত্র কিনে নিও না (বোখারী শরীফ # ১০৯২, সহীহ মুসলিম # ৩৬৭৭)।

মালামাল বিশেষ করে খাদ্য শস্য গুদামজাত করে বাজারে সঙ্কট সৃষ্টির মাধ্যমে দাম বাড়ানোর প্রবণতা ব্যবসায়ীদের মধ্যে দেখা যায়। কোন মালের একচেটিয়া ব্যবসায়ীর পক্ষে এটা করা খুব সহজ। বহুজনের হাতে সে মাল থাকলে জোট বেঁধে এটা করে থাকে। এটাকে সিণ্ডিকেট বলা হয়। হযরত মে'মার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ পাপাত্মা ছাড়া কেউ গুদামজাত করে না (সহীহ মুসলিম # ৩৯৭৭)। হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। অন্য একটি হাদীসে আছে ঃ যে ব্যক্তি খাদ্য শস্য (অধিক মুনাফার আশায়) চল্লিশ দিন গুদামজাত করে রাখবে তার সম্পর্ক আল্লাহ থেকে এবং আল্লাহর সম্পর্ক তার থেকে ছিন্ন হয়ে যাবে (বোখারী শরীফ # ১০৭৮)।

যে সকল প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস হারাম সে সকল প্রতিষ্ঠানের চাকুরি থেকে অর্জিত অর্থও হারাম। মদ ও জুয়া হারাম। অতএব এ সকলের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করে অর্থ উপার্জন করাও হারাম। জীবিকা নির্বাহের জন্য নিতান্ত নিরুপায় হয়ে পড়লে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা যায় বলে অনেক আলেমের মত। তবে যত শীঘ্র সম্ভব এই চাকুরি পরিত্যাগ করে জীবিকার অন্য হালাল উপায় খোঁজে বের করতে হবে।

বৈধ উপার্জনের মধ্যে অবৈধ উপার্জন ঢুকানো ছাড়াও সম্পূর্ণ অবৈধ পথে কিছু উপার্জন অনেকে করে থাকে। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদি এদের অন্যতম। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, চোর পুরুষ হোক বা স্ত্রী হোক উভয়ের হাত কেটে দাও তাদের কর্মফল হিসেবে যা আল্লাহর নিকট থেকে অর্জিত শাস্তি। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (সূরা মায়েদা # ৫ : ৩৮)। তবে যে কোন চুরির জন্য হাত কাটা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময়ে দশ দিরহামের কম মূল্যের মালামাল চুরির দায়ে হাত কাটা হত না।

www.nagorikpathagar.org

আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী (সা.)-এর সময়কালে একটি ঢালের চেয়ে কম মূল্যের বস্তু চুরির দায়ে চোরের হাত কাটা হত না (সহীহ্ মুসলিম # ৪২৫৭, বোখারী শরীফ # ২৫৫৪)। চুরির দায়ে হাত কাটার বিধান সৌদী আরবে চালু আছে কিন্তু অন্য প্রায় সকল মুসলিম রাষ্ট্রে হাত কাটার পরিবর্তে জেল বা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড দেয়া হয়।

ডাকাতি ও রাহাজানির শাস্তি আরোও কঠিন। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি (ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে লুণ্ঠন, ছিনতাই, ডাকাতি ধ্বংস ও বিপর্যয়) করে বেড়ায় তাদের জন্য হত্যা কিংবা শূলে চড়ানো; অথবা তাদের হাত ও পা বিপরীত দিকে থেকে কেটে ফেলা কিংবা দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া। এ লাঞ্ছনা ও অপমান হবে এ দুনিয়ায়; কিন্তু পরকালে তাদের জন্য এটা অপেক্ষাও কঠিন শাস্তি রয়েছে (সূরা মায়েদা # ৫ : ৩৩)।

আরোও কয়েকটি উপার্জনকে রাসূলুল্লাহ (সা.) হারাম বলেছেন। আবু মাসউদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) কুকুরের বিক্রয় মূল্য, বেশ্যার উপার্জন এবং গণকের ভেট খেতে নিষেধ করেছেন (সহীহ্ মুসলিম # ৩৮৬৩)। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি মক্কা বিজয়ের বছর মক্কাতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল শরাব, মৃত জীব, শূকর এবং মূর্তির ব্যবসা হারাম করেছেন (সহীহ্ মুসলিম # ৩৯০২)।

ভিক্ষাবৃত্তি হারাম না হলেও রাসূলুল্লাহ (সা.) এটাকে পছন্দ করতেন না। হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে ভিক্ষুক সর্বদা মানুষের নিকট ভিক্ষা চেয়ে থাকে সে কেয়ামতের দিন এমনভাবে আসবে যে, তার মুখমণ্ডলে কোন মাংসখণ্ড থাকবে না (বোখারী শরীফ # ৭৭৭, সহীহ্ মুসলিম # ২৬৬৫)।

অবৈধ উপার্জনকারীর ধন-জন অতিদ্রুত বৃদ্ধি পায়। এতে তারা খুব আনন্দিত হয়। প্রকৃতপক্ষে তা নয়। আসলে এটা আল্লাহর পরীক্ষা। এক সময় আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করবেন। আর সে সময় তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। আল্লাহ বলেন ঃ তারা কি মনে করে যে, আমি

www.nagorikpathagar.org

তাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে যাচ্ছি; এতে তাদেরকে দ্রুত মঙ্গলের দিকে নিয়ে যাচ্ছি? বরং তারা বুঝে না (সূরা আল-মুমিনুন # ২৩ : ৫৫-৫৬)।

সম্পদের মোহ মানুষের বিবেককে আচ্ছন্ন করে রাখে। সে জন্য মানুষ উপার্জনের ক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায়, হারাম-হালাল বিবেচনা করে না। আল্লাহ্ বলেন ঃ মানবকুলকে মোহ্গ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এসব হ্চ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগের বস্তু। আল্লাহ্র নিকট রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল (সূরা আলে-ইমরান # ৩ : ১৪)। আল্লাহ্ আরোও বলেন ঃ যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও এর চাকচিক্য কামনা করে, তাদের কাজ-কর্মের পূর্ণফল এখানে তাদেরকে দান করি, আর তাতে তাদের প্রতি কোনরূপ কমতি করা হয় না। পরকালে তাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছু নেই। তারা দুনিয়াতে যা কিছু করেছে সব বরবাদ হয়ে গেছে এবং তাদের কৃতকর্ম সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়েছে (সূরা হূদ # ১১ : ১৫-১৬)।

হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ যে দেহের মাংস হারাম মালে গঠিত, ওটা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। এর জন্য দোযখ সমীচীন (মিশকাত শরীফ # ২৬৫২ আহমাদ)। তাই অবৈধ উপার্জনের পথ ছেড়ে অল্পতে সন্তুষ্ট থেকে পরকালের অফুরন্ত সুখ লাভের চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কাজ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ বলুন (আমার এই কথা বলুন), হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যারা এই দুনিয়াতে সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে পুণ্য। আল্লাহ্র পৃথিবী প্রশস্ত। ধৈর্যশীলদেরকে অপরিমিত পুরস্কার দেয়া হয় (সূরা যুমার # ৩৯ : ১০)।

www.nagorikpathagar.org

হালাল ও হারাম

প্রত্যেক বস্তু বা কার্যাবলী প্রধানত হালাল এবং হারাম এ দুই ভাগে বিভক্ত। মুসলমান মাত্রই এ দু'টি শব্দের সাথে পরিচিত। হালাল অর্থ বৈধ বা গ্রহণযোগ্য। আর হারাম অর্থ অবৈধ বা অগ্রহণযোগ্য। এ দু'য়ের মাঝে যা আছে তা সন্দেহজনক। এটা ছাড়া কিছু আছে যা সরাসরি হালাল বা হারাম নয়, তবে খাওয়া বা গ্রহণ করা যায়। এটা মাকরূহ- যেমন চিংড়ি মাছ। হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট আর এ দুইয়ের মধ্যে রয়েছে প্রচুর সন্দেহযুক্ত বস্তু- আমি তা একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা একটি নিষিদ্ধ স্থান প্রস্তুত করেছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় পশুদেরকে সে নিষিদ্ধ স্থানের আশে পাশে চরায়, সে যে কোন সময় নিষিদ্ধ স্থানে ঢুকে পড়তে পারে এবং হারামে নিপতিত হতে পারে (নাসাঈ শরীফ # ৫৭১৩)।

খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ এক কথায় জীবন ও জীবিকার প্রত্যেক কিছুর মধ্যেই হালাল, হারাম ও সন্দেহযুক্ত বস্তু বা বিষয়াদির কোন না কোনটি রয়েছে। আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা গ্রহণযোগ্য। এতে কোন দোষ নেই। যা হারাম তা অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। আর যা সন্দেহযুক্ত তা থেকে দূরে থাকাই সমীচীন। হযরত আবু হাওরা সা'দী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমাম হাসান ইবনে আলী (রা.) এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে কোন কথা স্মরণ রেখেছেন? তিনি বললেন, আমি তাঁর নিকট থেকে রেখেছি, যা তোমাকে সন্দেহে নিপতিত করে, তা পরিত্যাগ করবে। আর যাতে কোন সন্দেহ নেই তাই গ্রহণ করবে (নাসাঈ শরীফ # ৫৭১৪)।

অনেক বাছ-বিচার করে খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। হালাল, হারাম এবং সন্দেহযুক্ত দ্রব্যাদি খাবার ও পানীয়ের মধ্যেই বেশী। আল্লাহ তা'আলা

www.nagorikpathagar.org

বলেন, তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অপরের নামে যবেহকৃত পশু, আর শ্বাসরোধে মৃত ও প্রহারে বা আঘাতে মৃত (উচ্চস্থান থেকে) পতনে মৃত ও সংঘর্ষে মৃত ও যাকে হিংস্র পশু খেয়েছে, তবে যা তোমরা যবেহ করতে পেরেছ তা ব্যতীত, আর যা মূর্তি পূজার বেদীতে বলি দেয়া হয়েছে তা- তবে কেউ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে তখন আল্লাহ তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু (সূরা মায়েদা # ৫ : ৩)। আল্লাহ আরোও বলেন, হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে সকল পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা থেকে আহার কর এবং আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা শুধু তারই এবাদত কর (সূরা বাকারা # ২ : ১৭২)। বাম হাতে আহার করা নিষেধ। হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (স.) বলেন, তোমাদের কেউ যেন তার বাম হাতে না খায় এবং পানও না করে। কেননা শয়তান তার বাম হাতে আহার করে (তিরমিযী শরীফ # ১৭৪৬)।

পশুদের মধ্যে কিছু তৃণভোজী এবং কিছু মাংসাশী বা মাংসভোজী। তৃণভোজী পশুদের মধ্যে অধিকাংশগুলোই হালাল। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যাতে কোন কোনটিকে বাহন হিসেবে ব্যবহার কর এবং কোন কোনটিকে ভক্ষণ কর (সূরা মুমিন # ৪০ : ৭৯)। উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, হরিণ ইত্যাদির মাংস হালাল। গাধার মাংস হারাম। আবু সালাবা (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) গৃহপালিত গাধার মাংস হারাম বলে ঘোষণা করেছেন (বোখারী শরীফ # ২১৪৮)। জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত অন্য হাদীসে আছে, হযরত নবী (সা.) খায়বারের জিহাদকালে গাধার মাংস খাওয়া সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন এবং ঘোড়া সম্পর্কে অনুমতি দিয়েছিলেন (বোখারী শরীফ # ২১৪৭ ও তিরমিযী শরীফ # ১৭৪০)। তবে ঘোড়ার গোশত সম্পর্কে অন্য হাদীসে নিষেধাজ্ঞা আছে। সে হাদীসটি দুর্বল। তাই ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক প্রমুখ ইমামগণ ঘোড়ার গোশত মাকরূহ বলেছেন (উপরের হাদীসের ব্যাখ্যা)।

www.nagorikpathagar.org

মাংসভোজী পশুরা হিংস্র প্রকৃতির। এরা দাঁত ও নখ দিয়ে শিকার ধরে। সিংহ, বাঘ, চিতা, শিয়াল, বাঁড়াল, বেজি ইত্যাদি এ শ্রেণীর পশু। এদের মাংস খাওয়া হারাম। আবু সালাবা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) সকল প্রকার হিংস্র জীবের গোশত খেতে নিষেধ করেছেন (বোখারী শরীফ # ২১৫০ ও সহীহ মুসলিম # ৪৮৩৮)। নখ বিশিষ্ট খরগোস ক্ষুদ্র প্রাণী ও পোকা-মাকড় খায়। এদের মাংস হারাম। অপর প্রজাতির খরগোস ছাগলের ন্যায় খুর বিশিষ্ট। এরা তৃণভোজী। এদের মাংস হালাল। আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি সঙ্গীগণসহ একটি খরগোসকে তাড়া করে আমি ধরে আবু তালহা (রা.)-এর নিকট নিয়ে আসলাম। তিনি তা জবাই করলেন এবং পেছনের রান দুইটি হযরত নবী (সা.)-এর জন্য পাঠিয়ে দিলেন। হযরত (সা.) তা গ্রহণ করলেন (বোখারী শরীফ # ২১৫৩ ও তিরমিযী শরীফ # ১৭৩৬)। কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর ইত্যাদির মাংস হারাম।

পশুদের ন্যায় পাখীরাও দুই ভাগে বিভক্ত। এক শ্রেণীর পাখী থাবা দিয়ে শিকার ধরে। এদের নখ তীক্ষ্ণ এবং উপরের ঠোঁট নীচের দিকে বাঁকানো ও খুব ধারালো। ফেলকন বা বাজপাখী, ঈগল, চিল, পেঁচা ইত্যাদি এ শ্রেণীর পাখী। এদের মাংস খাওয়া হারাম। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) সব ধরনের মাংসভোজী হিংস্র জন্তু ও সব রকমের থাবাবিশিষ্ট শিকারী পাখী খেতে নিষেধ করেছেন (সহীহ মুসলিম # ৪৮৪২)। যে সকল পাখী থাবা দিয়ে শিকার ধরে না এবং অপর প্রাণী শিকার করে না বরং শস্য কণা খেয়ে জীবন ধারণ করে এরা হালাল। হাঁস, মোরগ, কবুতর, ঘুঘু, বক, ডাহুক, কোঁড়া ইত্যাদির মাংস হালাল। শকুন মৃত জীবের মাংস খায়, নিজে শিকার ধরে না। এদের মাংস খাওয়াও হারাম।

মহান আল্লাহ মানুষের জন্য মাছ হালাল করেছেন। আল্লাহ বলেন, সমুদ্র দু'টি এক রূপ নয়– একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অপরটির পানি

www.nagorikpathagar.org

লোনা। প্রত্যেকটি থেকে তোমরা তাজা গোশত (মাছ) আহার কর এবং পরিধানে ব্যবহার্য অলংকার আহরণ কর (সূরা ফাতির # ৩৫ : ১২)। এ আয়াতের মর্মার্থ এই যে, দুইটি নদী বা সমুদ্রের পানি এক রকম নয়। নদীর পানি সুমিষ্ট ও সুপেয় এবং সাগরের পানি লোনা। নদী ও সাগরে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ আছে যা মানুষের জন্য হালাল। আবার পানিতে থাকা চুচুক, ডলফিন, গণ্ডার, জলহস্তী, কুমির ইত্যাদি হালাল বা হারাম হওয়ার পক্ষে সুস্পষ্ট কোন দলিল আছে কিনা আমি জানি না। কারো মতে এগুলো হালাল, কারণ আল্লাহ্ বলেছেন, তোমাদের জন্য সমুদ্রে শিকার ও তা ভক্ষণ হালাল করা হয়েছে (সূরা মায়েদা # ৫ : ৯৬)। আবার অন্যমতে আল্লাহ্ যা হারাম করেননি তা হালাল। কিন্তু এই যুক্তিতে নদী বা সমুদ্রের সকল জীব হালাল বলে ধরে নিতে হলে কুমির, সাপ, কচ্ছপ ইত্যাদিও হালাল। কিন্তু কোন মুসলমান এ সকল প্রাণী খায় না। আমার মতে যে বিষয়ে সন্দেহ থাকে তা বর্জন করাই বাঞ্ছনীয়।

আল্লাহ্ জলে ও স্থলে অসংখ্য গাছ-পালা, তরুলতা সৃষ্টি করেছেন। এদের কোনটির কাণ্ড, কোনটির মূল, কোনটির ফুল এবং কোনটির ফল মানুষ ভক্ষণ করে। এ সকলের মধ্যে কোনটি সুস্বাদু, কোনটি তিক্ত আবার কোনটি বিষাক্ত। এগুলোর মধ্যে মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয় এবং অরুচিকরও নয় এমন সবকিছুই খাওয়া যায়। এ সকল ফল-মূল হারাম নয়।

আল্লাহ্ বলেন, লোকে আপনাকে (নবী সা. কে) প্রশ্ন করে, তাদের জন্য কি কি হালাল করা হয়েছে? বলুন, সমস্ত ভাল জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে এবং শিকারি পশু-পক্ষী যাদেরকে তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়েছ যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। তারা যা তোমাদের জন্য ধরে আনে তা ভক্ষণ করবে এবং এতে আল্লাহর নাম নিবে আর আল্লাহকে ভয় করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

আর তোমাদের জন্য সমস্ত ভাল জিনিস হালাল করা হলো, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের খাদ্যদ্রব্য (তাদের যবেহকৃত হালাল পশু)

www.nagorikpathagar.org

তোমাদের জন্য হালাল ও তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ এবং মুমিন সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য হালাল ও তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারীও তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো যদি তোমরা তাকে মহর প্রদান কর বিবাহের জন্য, প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা গোপন প্রণয়িনী গ্রহণের জন্য নয়। কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে তার কর্ম বিফলে যাবে এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে (সূরা মায়েদা # ৫ : ৪-৫)।

আহলে কিতাবদের যবেহ করা জন্তু হালাল হওয়ার কারণ এই যে, ইহুদী ও খৃষ্টানদের ধর্মে অনেক পরিবর্তন সত্ত্বেও যবেহ করার মাসআলাই ইসলামী শরীয়তের অনুরূপ রয়েছে। আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা জন্তুকে তারাও হারাম মনে করে এবং যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা জরুরী মনে করে।

আহলে কিতাবদের মহিলাকে বিবাহ করা হালাল হওয়ার কারণ এই যে, ইসলামে যে সকল মহিলাকে বিবাহ করা হারাম, তাদের ধর্মেও তাদেরকে বিবাহ করা হারাম। ইসলামের যেমন বিবাহ প্রচার করা ও সাক্ষীদের উপস্থিতিতে হওয়া জরুরী, তেমনি তাদের ধর্মেও এ সকল বিধি বিধান জরুরী (তফসীর মা'আরেফুল কোরআন- সূরা মায়েদার তফসীর)। কিন্তু যে ইহুদী নারী ওযাইর (আ.)কে এবং যে খৃষ্টান নারী ঈসা (আ.)কে আল্লাহর পুত্র বলে তাকে বিবাহ করা হালাল হবে না যে পর্যন্ত সে তওবা করে মুসলমান না হয়। তদুপরি নারী ও পুরুষে বিবাহ বহির্ভূত মিলন সম্পূর্ণ হারাম।

পোশাক পরিচ্ছদ, সাজ-সজ্জা আল্লাহ্ প্রদত্ত জিনিস। আল্লাহ্ বলেন, হে বনী আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও সাজ-সজ্জার জন্য আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছদ দিয়েছি এবং পরহেযগারীর পোশাক, এটা সর্বোত্তম। এটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে (সূরা আরাফ # ৭ : ২৬)। নামাযের সময় গুপ্তাঙ্গ আবৃত রাখা ফরয।

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী পুরুষের গুপ্তাঙ্গ নাভি থেকে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত এবং নারীর গুপ্তাঙ্গ মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি ও পায়ের টাখনুর নীচ বাদে সমস্ত শরীর। পোশাক গুপ্তাঙ্গ ঢাকা ছাড়াও শরীরের শোভা বর্ধন করে। নারীদের বাহ্যিক পোশাক স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষকে প্রদর্শন করা হারাম।

নারীরা যে কোন অলংকার ও কাপড় পরিধান করতে পারে। কিন্তু স্বর্ণ এবং রেশমি কাপড় ব্যবহার করা পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ। হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে সোনার আংটি ও রেশমি কাপড় পরতে, রুকু-সেজদায় কোরআনের আয়াত পড়তে এবং হলুদ রংয়ের কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন (তিরমিযী শরীফ # ১৬৮২)। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত অন্য হাদীসে হযরত নবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইহজগতে রেশমি কাপড় ব্যবহার করবে সে অবশ্য অবশ্যই আখেরাতে তা থেকে বঞ্চিত হবে (বোখারী শরীফ # ২২৪৫)।

যে সকল নারীর মাথায় চুল কম তারা চুল বেশী দেখানোর জন্য পরচুলা ব্যবহার করে। আবার যে সকল পুরুষের মাথায় টাক পড়েছে তারা তা ঢাকার জন্য পরচুলা ব্যবহার করে। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, মদীনাবাসিনী একটি মেয়ের বিবাহ হওয়ার পর সে রোগাক্রান্ত হয়ে তার মাথার চুল উঠে গেল। তার মুরুব্বীগণ অন্যচুল মিশ্রণে তার মাথার চুল বেশী দেখানোর ব্যবস্থা অবলম্বনের ইচ্ছা করে তা সম্পর্কে হযরত নবী (সা.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলে হযরত (সা.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা লানত করেছেন ঐ নারীদের প্রতি যারা অন্যচুল মিশ্রিত করে মাথার কেশ বেশী দেখানোর ব্যবস্থা গ্রহণে প্রলুব্ধ করে অথবা নিজে ঐরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করে (বোখারী শরীফ # ২২৭২)।

মদ পান করা, জুয়া খেলা ইত্যাদি নেশা। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) কে মধুর তৈরি মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে

www.nagorikpathagar.org

তিনি বলেন, প্রতিটি নেশা উদ্রেককারী পানীয়ই হারাম। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার (সূরা মায়েদা # ৫ : ৯০)।

আল্লাহ তা'আলা দশটি হারাম বিষয়ে মানুষকে অবহিত করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) কে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি সেগুলোকে নিষেধাজ্ঞার ভঙ্গিতে না বলে এমন ভঙ্গিতে বলেছেন যে এর বিপরীত করা হারাম। তিনি বলেন, বলুন, এস, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন তা তোমাদেরকে পাঠ করে শুনাই। তা এই যে, আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না, পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার কর, দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না– আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার দিয়ে থাকি, প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক অশ্লীল কাজের নিকটেও যেও না, আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হলো যেন তোমরা বুঝ। এতীম বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উত্তম ব্যবস্থা ব্যতীত তোমরা তার সম্পত্তির কাছেও যেও না এবং ওজন ও মাপ ন্যায্যভাবে পুরাপুরি দেবে। আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না। যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায্য বলবে স্বজনের সম্পর্কে হলেও এবং আল্লাহর দেয়া অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। আর এ পথই আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথ অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা সাবধান হও (সূরা আনআম # ৬ : ১৫১-১৫৩)।

উল্লিখিত তিনটি আয়াতে– (১) আল্লাহর সাথে শরীক বা অংশীদার সাব্যস্ত করা, (২) পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার না করা, (৩) দারিদ্র্যের

www.nagorikpathagar.org

ভয়ে সন্তান হত্যা করা, (৪) অশ্লীল কাজ করা, (৫) কাউকেও অন্যায়ভাবে হত্যা করা, (৬) এতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা, (৭) ওজন ও মাপে কম দেয়া, (৮) সাক্ষ্য, ফয়সালা ও অন্যান্য কথাবার্তায় অবিচার করা, (৯) আল্লাহকে দেয়া অঙ্গীকার পূর্ণ না করা এবং (১০) আল্লাহর নির্দেশিত সোজা পথ ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বন করাকে হারাম বলা হয়েছে। এগুলো মারাত্মক গুনাহের কাজ।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ খেতে, চলতে, বলতে, দেখতে– প্রত্যেক ক্ষেত্রেই হালাল ও হারামের বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। অনেক হালাল জিনিস সহজেই হারামে পরিণত হতে পারে। যেমন আঙ্গুর, মধু, খেজুর বা তালের রস হালাল বস্তু। অথচ এগুলো দ্বারাই মদ তৈরি করা হয় যা হারাম। অনেক পশু আল্লাহর নামে যবেহ্ করে হত্যা করলে তাদের মাংস হালাল। কিন্তু সেগুলো আল্লাহ ছাড়া কোন দেব-দেবীর নামে হত্যা করলে, শ্বাসরোধ বা অন্য কোনভাবে হত্যা করলে এদের মাংস হারাম হয়ে যায়। তাই প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাবধানতা অবলম্বন করা একান্ত জরুরী।

www.nagorikpathagar.org

পার্থিব জীবন

মানব জীবন প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত– ইহজীবন আর পরজীবন। ইহজীবন সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আশা-নিরাশা, ভোগ-বিলাস, স্নেহ-মমতা, ঐশ্বর্য-দরিদ্র এবং পাপ-পুণ্যের সমষ্টি। আর পরজীবন বেহেশতের সুখ ভোগ অথবা দোযখের আজাব ভোগের কাল। ইহজীবন অতি ক্ষণস্থায়ী আর পরজীবন অফুরন্ত-অসীম। ইহজীবনের অপর নাম পার্থিব জীবন। এ দু'টির যে কোন একটির প্রাধান্য দেয়ার দায়িত্ব মানুষেরই হাতে।

পার্থিব জীবন চাকচিক্যে ভরপুর। এর মোহে পড়ে মানুষ পাপের পথে পা বাড়ায়। মানুষ শুধু চায়, আরও চায়। যার যা আছে তা অপেক্ষা বেশী পাওয়ার মোহে পেয়ে বসে। যার একদিনের সম্বল আছে, সে দুই দিনের চায়, যার দুই দিনের আছে, সে দুই মাসের চায়, ধনী চায় তার ধন আরও থাক, কয়েক গুন বৃদ্ধি হোক। অথচ কেউ কেউ অপরকে সুখী করে নিজে সুখ পান। এসব লোকেরা ইহকালের অতি ক্ষণস্থায়ী সুখ অপেক্ষা পরকালের সুখ বেশী চান। আবার এমন লোক আছেন, যারা সম্পূর্ণভাবে মোহমুক্ত।

দুনিয়া পরকালের শস্যক্ষেত্র। এখানে যে যেমন বীজ বপন করবে, পরকালে সে তেমন ফসলই পাবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, যে পরকালের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য সে ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ইহকালের ফসল কামনা করে, আমি তাকে এর কিছু দিয়ে দেই এবং পরকালে আর কোন অংশ থাকবে না (সূরা শূরা # ৪২ : ২০)।

কিছু সংখ্যক লোক অগাধ সম্পদের অধিকারী, অথচ আল্লাহর পথে এটা থেকে ব্যয় করে না। বরং ভোগ-বিলাসে, নিজ স্বার্থ অন্বেষণে গর্ব-অহংকারে মেতে থাকে। এমন ব্যক্তির উদাহরণ পবিত্র কুরআনে রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্ সূরা কাসাসের প্রথমাংশে বলেছেন : কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত (চাচাত ভাই)। অতঃপর সে তাদের প্রতি দুষ্টামি করতে শুরু করল। আমি তাকে এত ধন-ভাণ্ডার দান করেছিলাম যার চাবি বহন করা কয়েকজন শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলল, দম্ভ করো না, আল্লাহ্ দম্ভকারীদেরকে ভালবাসেন না। আল্লাহ্ তোমাকে যা দান করেছেন, তা দ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে যেও না। তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ অনর্থ সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না। সে বলল, আমি এ ধন আমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি (সূরা কাসাস # ২৮ : ৭৬-৭৮)।

ধনের মোহ অন্যান্য ধনলোভীদের মত তাকে অন্ধ করে দিয়েছিল। সে ভুলে গিয়েছিল, এটা তার জ্ঞান-গরিমার ফসল নয় বরং আল্লাহর দয়ার দান। তার যা ছিল এর পরেও সে আরো চাইত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যদি কোন আদম সন্তান একটি স্বর্ণের উপত্যকার মালিক হয়ে যায় তাহলে সে এরূপ আরো একটি উপত্যকা পেতে আকাঙ্ক্ষা করে; (কবরের) মাটি ছাড়া আর কোন কিছুই তার পেট ভরাতে পারে না। আর যে ব্যক্তি তওবা করে আল্লাহ তা'আলা তার তওবা কবুল করেন (সহীহ্ মুসলিম # ২২৮৬)।

হালাল উপায়ে সম্পদ আহরণ করতে দোষ নেই। দোষ সেখানেই সম্পদ আহরণ করে তা থেকে গরীব-মিসকীনের হক আদায় না করা। আল্লাহ ইচ্ছা করেই সকল মানুষকে সমপরিমাণ সম্পদের অধিকারী করেননি, যা করা তার জন্য মোটেই কঠিন নয়। এটা মানুষের জন্য একটি পরীক্ষা। সম্পদশালীরা সম্পদহীনদের প্রতি কতটুকু দায়িত্বশীল এটা দেখাই হয়তো আল্লাহর ইচ্ছা। এক পরিবারে সকল ভাইয়ের অবস্থা যেমন সমান নয়, একটি সমাজেও সকলের অবস্থা সমান নয়। তাই একের প্রতি অপরের দায়িত্ব রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্ সূরা কাসাসের ৭৮ নম্বর আয়াতের শেষাংশে প্রশ্ন করেন, সে (কারূন) কি জানে না যে, আল্লাহ তার পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন, যারা শক্তিতে ছিল তার চেয়ে প্রবল এবং ধন-সম্পদে অধিক প্রাচুর্যশীল? তিনি একই সূরার ৮১ নম্বর আয়াতে বলেন, অতঃপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিলাম। তার পক্ষে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন দল ছিল না, যারা তাকে সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও আত্মরক্ষা করতে পারল না।

আরো কিছু সম্পদশালী ব্যক্তি আছে যারা লোক দেখানোর জন্য সম্পদ ব্যয় করে, যাতে লোকেরা তাকে দানশীল বলে। অন্যদিকে বিলাসবহুল জীবন যাপন করে, আমোদ-প্রমোদে মেতে থাকে এবং কুকর্মে লিপ্ত হয়ে আল্লাহকে ভুলে থাকে। তারা অবৈধ পথে সম্পদ আহরণ করে, আল্লাহর পথে ব্যয় না করে অবৈধ পথে ব্যয় করে। তারা চিন্তা করে না যে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ সম্পদের হিসাব নেবেন। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, হে বান্দা! তুমি কিভাবে সম্পদ অর্জন করেছ? কিভাবে অর্জিত সম্পদ ব্যয় করেছ? এ সকল লোকেরা শেষ বিচারের দিনে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) শপথ করে বললেন, আমি তোমাদের পক্ষে দারিদ্র্যকে ভয় করি না, অবশ্যই এ ভয় আছে যে, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের ন্যায় তোমাদেরকে ধন-দৌলতের প্রাচুর্য প্রদান করা হবে এবং তোমরা তাদের ন্যায় ধন-দৌলতের মোহে নিমগ্ন হবে, ফলে ঐ মোহ এবং প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে ধ্বংস করবে, যেরূপ পূর্ববর্তী উম্মতগণকে ধ্বংস করেছে (বোখারী শরীফ # ১৪০৮)।

কিছু সংখ্যক লোক আছেন যারা আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সঠিক পথে ব্যয় করেন। তাঁরা ইহকালের সুখ থেকে পরকালের সুখকে অধিক প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, এমন এক ব্যক্তির নাম যুলকারনাইন। একবার

www.nagorikpathagar.org

তিনি পদব্রজে হজ্জের উদ্দেশ্যে আগমন করলে হযরত ইব্রাহীম (আ.) মক্কা থেকে বের হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান, তাঁর জন্য দোয়া করেন এবং কিছু উপদেশও প্রদান করেন (তফসীর মা'আরেফুল কোরআন)। সম্পদের প্রতি তিনি ছিলেন নির্লোভ। ইয়াজুজ মাজুজদের অত্যাচার থেকে লোকদেরকে রক্ষার জন্য নিজ অর্থ ব্যয়ে উভয়ের মধ্যে বাধা হিসেবে দুই পর্বতের মধ্যে লোহার প্রাচীর নির্মাণ করে দিয়েছিলেন, যা কেয়ামত পর্যন্ত অটুট থাকবে। পবিত্র কোরআনে এ ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। তারা বলল, হে যুলকারনাইন, ইয়াজুজ ও মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আপনি বললে আমরা আপনার জন্য কিছু কর ধার্য করব এ শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন। তিনি বললেন, আমার পালনকর্তা আমাকে যে সামর্থ দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট। অতএব, তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর, আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব (সূরা কাহ্ফ # ১৮ : ৯৪-৯৫)।

আল্লাহ বলেন, হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে দেয়, আর যারা এরূপ করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। আর আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে মৃত্যু আসার পূর্বেই ব্যয় (দান) কর (সূরা মুনাফেকুন # ৬৩ : ৯ ও ১০)। যারা আল্লাহর মহব্বতে দান-খয়রাত করেন ইহকাল এবং পরকালে তারা সফলকাম। তারা মুমিন এবং বেহেশতে তাদের অংশ রয়েছে।

অপরদিকে আল্লাহর এমন কিছু প্রিয় বান্দা আছেন যারা সম্পদ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখেন। তারা লালসামুক্ত, পার্থিব ভোগ-বিলাসে অনাগ্রহী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিকামী। এমনি এক ব্যক্তির নাম হযরত আবু বকর (রা.), যিনি ছিলেন পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিশ্বস্ত সহচর, দানশীল এবং ইসলামের প্রথম খলিফা। একবার দান করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবাগণকে পরামর্শ দিলে প্রত্যেকে নিজ নিজ সম্পদ থেকে কিছু কিছু সামগ্রী নিয়ে তাঁর সম্মুখে হাজির হন।

www.nagorikpathagar.org

আবু বকর (রা.) তাঁর দানের সামগ্রী নিয়ে উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'হে আবু বকর! তুমি তোমার নিজের ও পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছ?' আবু বকর (রা.) জবাবে বললেন, 'আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলকে।'

সম্পদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এমন আরেক ব্যক্তির নাম সুলতান ইব্রাহীম বিন আদহাম। তিনি খোরাসানের পূর্বদিকে অবস্থিত বল্‌খ রাজ্যের সুলতান ছিলেন। তাঁর বংশ পরিচয় সম্পর্কে দ্বিমত আছে। তাঁর পরিবার কুফা থেকে বলখে যান, কারো মতে তিনি খলিফা হযরত ওমর (রা.)-এর বংশধর। আবার অন্যদের মতে তিনি নবী (সা.)-এর কন্যা ফাতেমা (রা.)-এর বংশধর। কথিত আছে, খিজির (আ.) তাঁকে জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপন পরিহার করে আল্লাহর পথে সহজ জীবন যাপনের পরামর্শ দেন। এ কাহিনী হয়তো অনেকেরই জানা আছে যে, তাঁর প্রাসাদের ছাদে কোন এক আগন্তুকের হাঁটার শব্দ শুনা যাচ্ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ছাদে কে? আগন্তুক জবাবে বললেন, আমি তোমার বন্ধু– হারানো উট খুঁজতেছি, ইব্রাহীম বিন আদহাম বিস্মিত হয়ে বললেন, হে নির্বোধ! হারানো উট কি ছাদে থাকতে পারে? আগন্তুক বললেন, তুমি আমার মতই এক নির্বোধ যে রাজপ্রাসাদের জাঁকজমকপূর্ণ শয্যায় শুয়ে আল্লাহর সান্নিধ্য কামনা করে। হয়তো এই আগন্তুকই খিজির (আ.)। এ ঘটনায় ইব্রাহীম বিন আদহামের জীবনে বিরাট পরিবর্তন আসে।

আবার এমনও জানা যায়, এক রাতে স্বপ্ন ভেঙ্গে জাগলে ইব্রাহীম বিন আদহাম দেখতে পান, তার কক্ষে বসে একজন ফেরেশতা একটি সোনালি বইতে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম লিপিবদ্ধ করছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তালিকায় আমার নাম আছে কি? ফেরেশতা বললেন, না। তিনি অনুরোধ করলেন, আল্লাহর বান্দাকে যারা ভালবাসে তাদের নামের সাথে আমার নাম লিখুন। ফেরেশতা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পরের রাতে ঘর আলোকিত করে ফেরেশতা আসলেন। বই খুলে দেখালেন

www.nagorikpathagar.org

লিস্টের প্রথমে তাঁর নাম রয়েছে। তিনি নিজ রাজ্য ছেড়ে আল্লাহকে পাওয়ার মানসে সিরিয়া চলে যান। বাকী জীবন আল্লাহর ধ্যানে কাটিয়ে সেখানে মৃত্যুবরণ করেন (উইকিপিডিয়া ডট অরগ/উইকি/ইব্রাহীম-বিন-আদহাম)।

তবে বাংলাদেশের বগুড়ার মহাস্থান গড়ে একটি মাজার আছে। স্থানীয়দের দাবী এটা উল্লিখিত কাহিনীদ্বয়ের ব্যক্তি ইব্রাহীম বিন আদহামের মাজার। তা যাই হোক এটা সর্বজন স্বীকৃত সত্য যে ইব্রাহীম বিন আদহাম ছিলেন একজন সংসার বিরাগী সূফী সাধক। রাজকীয় শান-শওকতের চেয়ে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা ছিল তাঁর নিকট অনেক প্রিয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা। পক্ষান্তরে সৎকর্মসমূহ আপনার প্রভুর কাছে প্রতিদান প্রাপ্তি ও আশা লাভের জন্য উত্তম (সূরা কাহফ # ১৮ : ৪৬)। আর যদি তোমরা পরকাল কামনা কর, তবে তোমাদের সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আল্লাহ্ বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন (সূরা আহযাব # ৩৩ : ২৯)।

---

www.nagorikpathagar.org

বরযখী জীবন

মানব জীবন তিনটি ভাগে বিভক্ত : (১) পার্থিব তথা দুনিয়ার জীবন, (২) বরযখী তথা মৃত্যু থেকে হাশর পর্যন্ত জীবন এবং (৩) অনন্ত তথা শেষ বিচার পরবর্তী জান্নাত বা জাহান্নামের জীবন। পার্থিব জীবন, পরবর্তী দুইটি জীবনের প্রস্তুতির ক্ষেত্র। এ জীবনে যারা আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ নিষেধ মেনে সৎকর্মে জীবন কাটিয়ে পরকালের পাথেয় সঞ্চয় করে মৃত্যুবরণ করে, তারা পরবর্তী দুইটি জীবনে সুখ ভোগ করে। আর যারা আল্লাহ ও রাসূল মানে না পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আজাব।

মৃত্যু পার্থিব জীবনের শেষ পরিণতি। আল্লাহ বলেন প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যু আস্বাদন করতে হবে (সূরা আলে ইমরান # ৩ : ১৮৫)। আল্লাহর এ হুঁশিয়ারি মানুষকে পরকালের প্রস্তুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষ যে জীবনে প্রবেশ করে একে বরযখী জীবন বলে। এর স্থায়িত্ব হাশরের দিনের বিচার শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। তাই একে মধ্যবর্তী জীবনও বলা হয়ে থাকে। এ জীবন পৃথিবীর জীবন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শেষ বিচারের পরে কেউ জান্নাতে আবার কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে। জান্নাত মহাসুখের স্থান এবং জাহান্নাম কঠিন শাস্তির স্থান। কিন্তু মধ্যবর্তী বরযখী জীবনের অবস্থা কেমন তা জানার আগ্রহ থাকা খুবই স্বাভাবিক। তাই কোরআন ও হাদীসের আলোকে মৃত্যু থেকে হাশর পর্যন্ত জীবনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হল–

মৃত্যু কার কখন হবে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলে প্রাণহরণকারী ফেরেশতা আজরাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ কতিপয় ফেরেশতা মৃত্যু পথযাত্রীর নিকটে আসে। মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তি তাদেরকে দেখতে পায়, কিন্তু তা প্রকাশ করতে পারে না। তার নিকটে অপেক্ষমাণ ব্যক্তিরাও তাদেরকে দেখতে পায় না। আল্লাহ বলেন, যখন তোমাদের কারো মৃত্যু আসে তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তার আত্মা হরণ করে নেয় (সূরা আনআম # ৬ : ৬১)।

www.nagorikpathagar.org

অনন্তর যখন কারো প্রাণ কণ্ঠাগত হয় এবং তোমরা তাকিয়ে থাক, তখন আমি তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি, কিন্তু তোমরা দেখ না (সূরা ওয়াকিয়া # ৫৬ : ৮৩-৮৫)।

মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা সে দেখতে পায়। ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞাসা করে তুমি কি দুনিয়ায় ফিরে যেতে চাও? মুমিন বান্দা বলে, দুঃখ কষ্টের জগতে ফিরে যেয়ে কি করব? আমাকে এখন আল্লাহর কাছে নিয়ে যাও। এ কারণে সে বান্দাকে ভীত অথবা বিচলিত দেখা যায় না। কিন্তু গুনাহ্গার ও কাফের বান্দা বলে, আমাকে দুনিয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে যাও। সে ভয়ে চোখ উল্টিয়ে ফেলে। আল্লাহ্ বলেন, যখন তাদের কারো কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলে, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে পুনরায় প্রেরণ করুন, যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি (সূরা মুমিনুন # ২৩ : ৯৯-১০০)।

ফেরেশতাগণ রূহকে বের হয়ে আসার জন্য আহ্বান জানায়। পাপী অথবা নিষ্পাপ প্রত্যেকের রূহই নিজ বাসস্থান ছেড়ে বের হতে চায় না। আল্লাহ্ বলেন, নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের জন্য আনন্দিত হও (সূরা হা-মীম সেজদা # ৪১ : ৩০)। মুমিনের রূহ কণ্ঠনালী দিয়ে সহজে বের হয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, বিশ্বাসী ললাটে ঘাম নিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয় (তিরমিযী শরীফ # ৯২২)। ফেরেশতারা রূহটিকে বেহেশতী রুমালে জড়িয়ে সপ্তম আকাশের পথে রওয়ানা হন। এ রূহ থেকে সুগন্ধি ছড়াতে থাকে। পথে অন্যান্য ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করেন, এ মহান রূহটি কার? বহনকারী ফেরেশতাগণ তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, অমুকের পুত্র বা কন্যা অমুক। এভাবে এক এক করে বিভিন্ন আসমান পার হয়ে সপ্তম আকাশে পৌঁছলে তার নাম ইল্লিয়্যীনে তালিকাভুক্ত করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দেন। এটা সপ্তম আকাশে অবস্থিত। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয় সৎলোকের আমলনামা

www.nagorikpathagar.org

আছে ইল্লিয়্যীনে। আপনি জানেন ইল্লিয়্যীন কি? এটা লিপিবদ্ধ খাতা। আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত ফেরেশতাগণ এটা প্রত্যক্ষ করবে (সূরা মুতাফফিফীন # ৮৩ : ১৮-২১)।

ইল্লিয়্যীনে পৌঁছলে রূহ তার পূর্বে মারা যাওয়া আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতদের দেখা পায়। মৃত্যুর সময় রেখে যাওয়া তাদের স্বজনেরা কে কেমন আছে তা জিজ্ঞাসা করে। কেউ হয়তো মারা গেছে কিন্তু সেখানে পৌঁছেনি এমন ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে যদি সে বলে যে, অমুক আমার পূর্বেই মারা গেছে, তখন তারা বলে উঠে, নিশ্চয় তাকে দোযখে পাঠান হয়েছে।

ইল্লিয়্যীনে তালিকাভুক্তির পরে আল্লাহ নির্দেশ দেন, তার রূহকে পৃথিবীতে নিয়ে যাও। কারণ আমি ওয়াদা করেছিলাম তাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, এতে তাদেরকে ফেরত পাঠাব এবং তা থেকে তাদেরকে দ্বিতীয়বার উঠাব (সূরা তোহা # ২০ : ৫৫)। আদেশ পেয়ে ফেরেশতাগণ তাকে তার মৃত দেহের ভেতর পৌঁছিয়ে দেয়। এটা এত অল্প সময়ের মধ্যে হয় যে, শবযাত্রীরা ফেরার সময়ে তাদের জুতার শব্দ তখনও কবর পর্যন্ত শুনা যায়।

ফেরেশতাদের নির্দেশ পেয়ে মন্দ রূহ বের হয়ে আসার পরিবর্তে এদিকে-ওদিকে পলায়ন করতে শুরু করে। আল্লাহ্ বলেন, আর যদি তুমি দেখ, যখন ফেরেশতারা কাফেরদের জান কবজ করে, প্রহার করে তাদের মুখে এবং তাদের পৃষ্ঠদেশে আর বলে, জ্বলন্ত আজাবের স্বাদ গ্রহণ কর (সূরা আনফাল # ৮ : ৫০)। ফেরেশতারা যখন তাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, তখন তাদের অবস্থা কেমন হবে (সূরা মুহাম্মদ # ৪৭ : ২৭)? ফেরেশতারা জোর করে রূহকে বের করে ঊর্ধ্বাকাশের দিকে রওনা হয়। এ রূহ থেকে দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে। পথিমধ্যে অন্যান্য ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করেন, কে এই বিদ্বেষপরায়ণ রূহ? বহনকারী ফেরেশতারা তার পরিচয় দিয়ে চলতে থাকেন। কিন্তু প্রথম আকাশে পৌঁছলে এ বদ আত্মার জন্য আকাশের গেইট খোলা হয় না। আল্লাহ্ বলেন, নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা

www.nagorikpathagar.org

বলেছে এবং এগুলো থেকে অহঙ্কার করেছে তাদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না যে পর্যন্ত না সুচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। আমি এমনিভাবে পাপীদেরকে শাস্তি প্রদান করি। তাদের জন্য নরকের আগুনের বিছানা রয়েছে এবং উপর থেকে চাদর। আমি এমনিভাবে জালেমদেরকে শাস্তি প্রদান করি (সূরা আল-আরাফ # ৭ : ৪০-৪১)।

অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে তার নাম তালিকাভুক্ত করার জন্য ফেরেশতাগণ রূহকে সিজ্জীনের দিকে ছুড়ে দেবেন। এর অবস্থান সপ্ত জমিনের সর্বনিম্ন স্তরে। সিজ্জীন বরযখী জীবনে পাপীদের আবাসস্থল। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই পাপাচারীদের আমলনামা সিজ্জীনে আছে। আপনি জানেন সিজ্জীন কি? এটা লিপিবদ্ধ খাতা (সূরা মুতাফফিফীন # ৮৩ : ৭-৯)। সেখানে সে অন্যান্য পাপীদের সাথে মিলিত হয়। সেখান থেকে তার রূহকে তার মৃত দেহে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। তখনও শবযাত্রীদের পায়ের শব্দ কবর পর্যন্ত শোনা যায়।

রূহ বের হয়ে যাওয়ার পরে কোন কোন মৃত ব্যক্তির চোখ খোলা থাকে। অনেকে বলে থাকে মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে কোন স্বজনকে দেখার ইচ্ছা পোষণ করছিল। সে অপেক্ষায় চোখ খোলা রয়েছে। আসলে তা নয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবী আবু সালামা (রা.)কে দেখতে গেলেন, তখন চোখ খোলা ছিল। তিনি তার চোখ বন্ধ করে দিলেন এবং বললেন, যখন রূহ কবজ করা হয়, তখন চোখ রূহকে অনুসরণ করে (সহীহ মুসলিম # ২০০৬)।

যখন মৃত দেহ শবাধারে রেখে পুরুষগণ একে কাঁধের উপর বহন করে চলতে থাকে, তখন মৃত ব্যক্তি যদি নেককার হয় তবে বলতে থাকে, আমাকে দ্রুত সম্মুখে অগ্রসর কর। আর যদি সে বদকার হয় তবে স্বীয় আত্মীয়বর্গকে লক্ষ্য করে বিকট চিৎকারের সাথে বলতে থাকে, এরা এ নরাধমকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? তার এই চিৎকার মানুষ ভিন্ন অপরাপর সকল প্রাণীই শুনতে পায়, মানুষ এই চিৎকার শুনলে স্থির থাকতে সক্ষম হত না, অচেতন হয়ে পড়ে যেত (বোখারী শরীফ # ৬৯৩)।

www.nagorikpathagar.org

মৃতের নাম ইল্লিয়্যীন অথবা সিজ্জীনে তালিকাভুক্ত হওয়ার পরে রূহকে কবরে মৃত দেহের মধ্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু সকল মানুষের কি কবর হয়? হয় না অনেকেরই। হিন্দুরা মৃত দেহ পুড়িয়ে ফেলে, নদী বা সমুদ্রে ডুবে মারা গেলে লাশ মাছ বা জলজ প্রাণী খেয়ে ফেলে, বন্য প্রাণী মানুষ হত্যা করে খেয়ে ফেলে, এমনকি ২০০৩ সালের পহেলা ফেব্রুয়ারি তারিখে মহাশূন্য থেকে পৃথিবীতে ফেরার পথে আমেরিকার মহাশূন্যযান কলাম্বিয়া বিস্ফোরিত হয়ে নয় জন মহাকাশ যাত্রীর দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে কয়েকশত মাইল জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। মনে প্রশ্ন জাগা অতি স্বাভাবিক যে, এ ধরনের মৃত ব্যক্তির রূহ তালিকাভুক্তির পরে কোথায় পাঠান হবে? এ প্রশ্নের জবাব একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। মহান আল্লাহ্ যিনি সৃষ্টি করতে সক্ষম তিনি মৃতের দেহের সকল অণু-পরমাণু একত্রিত করে এতে রূহ প্রবেশ করাতেও সক্ষম। বরযখী জীবন যাপনের স্থান শুধুই কবর বা মাটির গর্ত নয়। এটা পৃথিবী থেকে বহু গুন বড় এক জগৎ যাকে আলমে বরযখ বলে। এর অবস্থান কোথায় তা একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। মানুষ বা জিনেরা এর অবস্থান সম্পর্কে কিছুই জানে না।

বরযখী জীবনকে দুনিয়ার হাজতী জীবনের সাথে তুলনা করা যায়। মামলার আসামিকে বন্দী করে হাজতে রাখা হয়। তথায় তাকে মামলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। কোন কোন আসামিকে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি দিয়ে সত্য আদায়ের চেষ্টা চালান হয়। তারপর বিচারকের রায়ে কেউ খালাস পায়, কেউ জেল, জরিমানা বা মৃত্যুদণ্ড অথবা অন্য কোন ধরনের শাস্তির রায় পায়। বরযখী জীবনে বিভিন্ন অপরাধের জন্য বিভিন্ন ধরনের শাস্তি ভোগ করতে পারে যাকে কবর আজাব বলা হয়। যাদের আমল ভাল, তারা শান্তিতে থেকে শেষ বিচারের অপেক্ষা করতে থাকে। যে সকল মৃতের নাম ইল্লিয়্যীনে থাকে তারা নিরাপদ। প্রতি সকাল ও সন্ধ্যায় তাদেরকে বেহেশতে তাদের মনোরম স্থান দেখানো হয়। অপরদিকে সিজ্জীনে যাদের নাম তালিকাভুক্ত হয় তারা কবরের কঠিন আজাব ভোগ করতে থাকে। প্রতি সকাল ও সন্ধ্যায় দোযখে তাদের ভয়াবহ আবাস স্থান

www.nagorikpathagar.org

দেখানো হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন মরে যায়, প্রতি সকাল-সন্ধ্যায় তার স্থান তার নিকট হাজির করা হয়। সে যদি বেহেশতীদের অন্তর্গত হয়, তাহলে বেহেশতীদের স্থান, আর দোযখীদের অন্তর্গত হলে দোযখীদের স্থান এবং বলা হয় যে, এটাই তোমার আসল স্থান। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তোমায় কেয়ামতের দিন সেখানে পাঠাবেন (বোখারী শরীফ # ৭১৬ এবং নাসাঈ শরীফ # ২০৭৫)। আল্লাহ বলেন, ফেরাউন ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা কঠিন আজাবে আবদ্ধ হয়ে গেল। প্রতিদিন সকাল-বিকাল তাদেরকে দোযখের নিকটবর্তী করা হয়ে থাকে (সূরা মুমিন # ৪০ : ৪৫-৪৬)।

মানুষের রূহ ইহজগৎ থেকে বিদায় নিয়ে বারযাখী জীবনে প্রবেশের পরেও ইহজগতের সাথে কিছু সম্পর্ক থেকে যায়। মৃত ব্যক্তি সদকায়ে জারিয়া হিসেবে যা রেখে যায় তা থেকে সওয়াব তার আমলনামায় পৌঁছে। মৃতের জন্য তার আত্মীয়-স্বজন ও হিতাকাঙ্ক্ষীরা যে দোয়া করে তা তার আমলনামায় জমা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমার কাছে জিব্রাইল (আ.) এসে আমাকে বললেন, আপনার প্রভু আপনার প্রতি আদেশ করেছেন জান্নাতুল বাকীর কবরবাসীদের নিকট যেয়ে তাদের জন্য দোয়া ইস্তেগফার করতে (সহীহ মুসলিম # ২১১৮)।

কিন্তু মৃতের সাথে জীবিতদের সরাসরি কোন যোগাযোগ সম্ভব নয়। বিশেষ কোন ক্ষেত্র ছাড়া মৃতেরা জীবিতদের কথা শুনতে পায় না বা তারা জীবিতদেরকে কিছু বলতে পারে না। তাই তারা জীবিতদের কোন উপকার অথবা অপকার করার ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ বলেন, আর সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান। আপনি (নবী সা.) কবরে শায়িতদেরকে শুনাতে সক্ষম নন (সূরা ফাতির # ৩৫ : ২২)। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামে দরূদ পাঠ করলে ফেরেশতারা তা তাঁর রূহ মোবারকে পৌঁছিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন বিশেষ এক শ্রেণীর ফেরেশতা আল্লাহ তা'আলা এ কাজে নিয়োগ করে রেখেছেন, যারা সর্বদা বিশ্বব্যাপী ঘোরাফেরা করতে থাকেন।

www.nagorikpathagar.org

আমার কোন উম্মত আমার প্রতি সালাম পাঠ করলে তারা ঐ সালাম আমার নিকট তৎক্ষণাৎ পৌঁছিয়ে থাকেন। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ পাঠ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ কর (সূরা আহযাব # ৩৩ : ৫৬)।

মানুষের সম্মুখে মৃত্যুর পর যে ভয়ঙ্কর অবস্থা আগত তা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে তবে আল্লাহর কসম- তোমরা হাসতে কম, কাঁদতে বেশী (বোখারী শরীফ # ২৪৫৩)। মৃত্যু পরবর্তী সে জীবনের কঠিন আজাব থেকে তিনি আল্লাহর আশ্রয় চাইতেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি কবরের আজাব থেকে এবং জীবিতাবস্থায় বা মৃত্যুকালে পথভ্রষ্টতা হওয়া থেকে এবং অসৎ দাজ্জালের দ্বারা পথভ্রষ্ট থেকে (বোখারী শরীফ # ৭১৪-৭১৫)।

বরযখী জীবনের কিছু আজাবের নমুনা কবর আজাব অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যেগুলো অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও লোমহর্ষক।

---

www.nagorikpathagar.org

অনন্ত জীবন

পার্থিব জীবনের শেষ মৃত্যুতে, মৃত্যু পরবর্তী বরযখী জীবনের শেষ হাশরের বিচারে; কিন্তু হাশরের বিচারের পরবর্তী জীবনের আর শেষ নেই। এটা অনন্ত জীবন যা মানব জীবনের তৃতীয় ও শেষ ধাপ। এ জীবনে কেউ দোযখে আবার কেউ বেহেশতে স্থান লাভ করবে। যারা বেহেশতে প্রবেশ করবে তারা এটা থেকে আর বাইরে যাবে না। এটাই তাদের স্থায়ী বাসস্থান। কিন্তু যারা দোযখে প্রবেশ করবে তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ঈমানদার বান্দাও থাকবে। তাদের কোন কোন পাপের শাস্তি দোযখে ভোগ করে পর্যায়ক্রমে সেখান থেকে বের হয়ে বেহেশতে প্রবেশ করে অনন্ত জীবন শুরু করবে। অতঃপর যারা অবশিষ্ট থাকবে, তারা কাফের ও মোনাফেক। তাদের অনন্ত জীবনের ঠিকানা দোযখ।

পার্থিব জীবনে যে যেমন কর্ম করেছে, অনন্ত জীবনে সে তেমন ফল ভোগ করবে। সে ফল ভোগ করাবার জন্যই আল্লাহ সাতটি দোযখ ও আটটি বেহেশত প্রস্তুত করে রেখেছেন। বেহেশতের আটটি এবং দোযখের সাতটি দরজা আছে। নিজ নিজ কর্মফল অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে বেহেশতে বা দোযখে মানুষ প্রবেশ করবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : বেহেশত ও দোযখের মধ্যে বিতর্ক হলো। দোযখ বলল, বড় বড় মানুষ যারা ফখর-গর্বকারী তারা আমার ভাগে আসবে। তখন বেহেশত আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করল, হে পরওয়ারদেগার! আমার ভাগে শুধু দুর্বল ও নিম্নস্তরের বিবেচিত লোকগণ কেন হবে? তদুত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তুমি আমার রহমতের স্থান। তোমার দ্বারা আমি আমার বান্দাদের যাকে ইচ্ছা তাকে রহমত দান করব। আর দোযখকে বলেছেন, তুমি আমার আজাব ও শাস্তিদানের স্থান, তোমার দ্বারা আমি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করব। তোমাদের প্রত্যেককে এ পরিমাণ অধিবাসী প্রদান করা হবে যে, তোমরা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে (বোখারী শরীফ # ১৯৪৮)।

আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, দোযখকে ঘিরে রাখা হয়েছে চিত্তাকর্ষক কার্যাবলীর দ্বারা, বেহেশতকে ঘিরে

www.nagorikpathagar.org

রাখা হয়েছে রুচিবিহীন কার্যাবলীর দ্বারা (বোখারী শরীফ # ২৪৫৫)। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ বেহেশত তৈরি করে জিব্রাইল (আ.) কে এটা দেখে আসতে বললেন। তিনি যেয়ে এর অধিবাসীদের জন্য যে সমস্ত জিনিস আল্লাহ্ তৈরি করে রেখেছেন তা দেখে এসে বললেন, হে রব! তোমার ইজ্জতের কসম, যে কেউ বেহেশতের অবস্থা সম্পর্কে শুনবে, সে অবশ্যই এতে প্রবেশ করবে। অতঃপর আল্লাহ্ এর চারদিকে কষ্টসমূহ্ দ্বারা ঘিরে দিয়ে জিব্রাইল (আ.) কে আবার দেখে আসতে বললেন। তিনি দেখে এসে বললেন, হে পরওয়ারদেগার! এখন যা কিছু দেখে আসলাম, এতে আমার আশংকা কোন একজনও এতে প্রবেশ করবে না।

অতঃপর আল্লাহ দোযখ সৃষ্টি করে জিব্রাইল (আ.)কে তা দেখে আসতে বললেন। তিনি দেখে এসে বললেন, হে রব! তোমার ইজ্জতের কসম, যে কেউ দোযখের ভয়ঙ্কর অবস্থার কথা শুনবে, সে কখনো এতে প্রবেশ করবে না। আল্লাহ্ দোযখের চারপার্শ্বে প্রবৃত্তির আকর্ষণীয় বস্তুর দ্বারা ঘিরে দিয়ে বললেন, যাও আবার দেখে আস। তিনি এবার দেখে এসে বললেন, হে রব! তোমার ইজ্জতের কসম করে বলছি, আমার আশংকা হচ্ছে, একজন লোকও এতে প্রবেশ ব্যতীত বাকী থাকবে না (তিরমিযী শরীফ # ২৪৯৯ ও আবু দাউদ শরীফ # ৪৬৬৯)।

উপরে বর্ণিত হাদীস দু'টির মর্মার্থ এই যে, নাচ-গান মদ-জুয়া, যৌনাচার ইত্যাদি অবৈধ কাজগুলো মানুষের নফসকে আকর্ষণ করে। এগুলো মানুষকে দোযখের পথে পরিচালিত করে। নফসকে দমন করে ইবাদত বন্দেগিতে মন নিবিষ্ট করতে পারলে বেহেশত লাভের পথ সুগম হয়। দিনে পাঁচবার নামায পড়া, বছরে এক মাস রোযা রাখা, নিজের উপার্জন থেকে অন্যকে যাকাত দেয়া, অর্থ ব্যয় ও দৈহিক পরিশ্রম করে হজ্জ করা– এ সমস্তই কষ্টসাধ্য কাজ। তদুপরি আল্লাহ্ বলেছেন, আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি এবং ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে (সূরা বাকারা # ২ : ১৫৫)। এ পরীক্ষায়

www.nagorikpathagar.org

ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখাও কষ্টসাধ্য কাজ। পবিত্র কোরআনে আছে, সে (ইবলিস) বলল, হে রব! যে কারণে আপনি আমাকে বিভ্রান্ত করেছেন, আমি এখন পৃথিবীতে চাকচিক্য সৃষ্টি করে তাদের সকলকে বিভ্রান্ত করব (সূরা হিজর # ১৫ : ৩৯)। শয়তানের প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকা আরেকটি কঠিন কাজ। অথচ এগুলোতে টিকে থাকতে পারলে বেহেশতের আশা করা যায় নতুবা দোযখ।

দোযখ অতি ভয়ঙ্কর স্থান। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের তথা জাগতিক অগ্নি দোযখের অগ্নির তুলনায় সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র (বোখারী শরীফ # ১৬০৬)। আবু হোরায়রা (রা.) বলেন, নবী (সা.) বলেছেন : দোযখের আগুনকে প্রথমে এক হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্বলিত করা হয়েছে, এতে তা লাল হয়ে যায়। তারপর এক হাজার বছর প্রজ্বলিত করার ফলে তা সাদা হয়ে যায়। অতঃপর এক হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্বলিত করা হয়, অবশেষে তা কাল হয়ে যায়। সুতরাং তা এখন ঘোর অন্ধকার কাল অবস্থায় রয়েছে (তিরমিযী শরীফ # ২৫৯২)।

দোযখের গঠন সম্পর্কে চিন্তা করলে তা কত বিশাল সে সম্পর্কে কিছুটা অনুমান মাত্র করা যায়। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, দোযখ চারটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রত্যেক প্রাচীর চল্লিশ বছরের দূরত্ব পরিমাণ পুরু বা মোটা (তিরমিযী শরীফ # ২৫২২)।

আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে থাকাবস্থায় কোন কিছু পতনের বিকট শব্দ শুনতে পাই। এতে রাসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান এটা কিসের শব্দ? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভাল জানেন। তিনি বললেন, একটি পাথর জাহান্নামের মুখ থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল যা সত্তর বছর পরে তলায় পৌঁছেছে। এটা তার শব্দ (সহীহ মুসলিম # ৬৯৬১)।

আল্লাহ বলেন, তাদের (পথভ্রান্তদের) নির্ধারিত স্থান জাহান্নাম। এর সাতটি দরজা আছে। প্রত্যেক দরজার জন্য এক একটি পৃথক দল আছে

www.nagorikpathagar.org

(সূরা হিজর # ১৫ : ৪৩-৪৪)। দোযখের সাতটি নাম পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন সূরায় উল্লিখিত আছে:

(১) জাহান্নাম : তারা (কাফেররা) কি জানে না যে, যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে মোকাবিলা করে তার জন্য জাহান্নামের আগুন রয়েছে, যাতে তারা চিরদিন থাকবে? আর এটা বড়ই লাঞ্ছনার ব্যাপার (সূরা তাওবা # ৯ : ৬৩)।

(২) জাহীম : তোমরা অবশ্যই জাহীম দেখবে। আবার (শুন), তোমরা সম্পূর্ণ নিশ্চয়তাসহ তাকে দেখতে পাবে (সূরা তাকাছুর # ১০২ : ৬-৭)।

(৩) সাঈর : নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদেরকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত সাঈর সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখানে কোন বন্ধু পাবে না (সূরা আহ্যাব # ৩৩ : ৬৪-৬৫)।

(৪) সাকার : খুব শীঘ্রই আমি তাকে (কাফের সর্দার অলীদ বিন মুগীরাকে) সাকারে নিক্ষেপ করব। আর আপনি কি জানেন সাকার কি? এটা অবশিষ্ট রাখে না এবং ছেড়েও দেয় না। চামড়া ঝলসিয়ে দেয় (সূরা মুদ্দাসসির # ৭৪ : ২৬-২৯)।

(৫) হুতামাহ্ : যে লোক ধন-মাল সঞ্চয় করেছে এবং তা গণনা করে, সে মনে করে তার ধন-মাল চিরকাল তার নিকট থাকবে। কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামাতে (পিষ্টনকারীতে)। আপনি কি জানেন পিষ্টনকারী কি? আল্লাহর আগুন, প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্ত-উৎক্ষিপ্ত যা অন্তর পর্যন্ত পৌঁছবে (সূরা হুমাযাহ্ # ১০৪ : ২-৭)।

(৬) লাযা : সেদিন গুনাহ্গার ব্যক্তি মুক্তিপণ হিসাবে দিতে চাইবে আপন সন্তানকে, স্ত্রীকে, ভাইকে, তার আশ্রয়দাতাকে এমনকি পৃথিবীর সকল কিছুকে দিয়েও নিজেকে রক্ষা করতে চাইবে। কখনই না, এটা তো লাযা (লেলিহান আগুন), যা চামড়া তুলে দেবে (সূরা মাআরিজ # ৭০ : ১১-১৬)।

(৭) হাবিয়া : আর যার পাল্লা হালকা হবে, হাবিয়া হবে তার আশ্রয়স্থল। আপনি কি জানেন তা কি? জ্বলন্ত আগুন (সূরা করিয়াহ্ # ১০১ : ১১)।

www.nagorikpathagar.org

মহান আল্লাহ বলেন, হে ঈমানদারগণ! নিজেকে ও নিজ পরিবারবর্গকে সে আগুন থেকে রক্ষা কর যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। সেখানে অত্যন্ত কর্কশ-রুঢ় নির্মম স্বভাবের ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবে, যারা কখনই আল্লাহর হুকুম অমান্য করে না (সূরা তাহরীম # ৬৬ : ৬)। আল্লাহ আরও বলেন, আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেককে সঠিক দিক নির্দেশ দিতাম, কিন্তু আমার এই উক্তি অবধারিত সত্য যে, আমি জিন ও মানুষ দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব (সূরা সেজদা # ৩২ : ১৩)।

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে তাঁর চাচা আবু তালিবের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলো। তিনি বললেন, আশা করা যায় কেয়ামতের দিন আমার সুপারিশ তার উপকারে আসবে। তাকে আগুনের উপরিভাগে রাখা হবে। আগুন তার দুই পায়ের গোঁড়ালি পর্যন্ত পৌঁছবে। এতে তার মস্তিষ্ক টগবগ করতে থাকবে (সহীহ মুসলিম : ৪২০)। উল্লেখ্য এটা দোযখের সর্বনিম্ন শাস্তি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে ঈমানদারগণ! মুসলমানদের বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে বন্ধু বানিও না। তোমরা কি এমনটি করে নিজের উপর আল্লাহর প্রকাশ্য দলিল কায়েম করে দিবে? নিঃসন্দেহে মোনাফেকরা রয়েছে দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে (সূরা নিসা # ৪ : ১৪৪-১৪৫)। এতে সন্দেহ নেই যে, আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি যেসব লোক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে, আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পাল্টিয়ে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আজাব আস্বাদন করতে থাকে (সূরা নিসা # ৪ : ৫৬)। যারা কাফের তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরি করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে। ফলে তাদের পেটে যা আছে, তা এবং চর্ম গলে বের হয়ে যাবে (সূরা হজ্জ # ২২ : ১৯-২০)।

দোযখের আজাব যেন অতিমাত্রায় আস্বাদন করতে পারে, সে জন্য দোযখীদের দেহ বিশাল আকারের করে দেয়া হবে। আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী (সা.) বলেছেন, এক একজন কাফেরের কাঁধদ্বয়ের

www.nagorikpathagar.org

মধ্যবর্তী ব্যবধান দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন দিনের পথ হবে (বোখারী শরীফ # ২৪৮৮)।

এ সকল দোযখীদের খাদ্য ও পানীয় সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন : যাক্কুম গাছ? আমরা সে গাছটিকে জালেমদের জন্য ফেতনা বানিয়ে দিয়েছি। তা এমন একটি গাছ যা জাহান্নামের তলদেশ থেকে বের হয়। এর ছড়াগুলো শয়তানের মস্তকের মত। জাহান্নামের অধিবাসীরা তা খাবে এবং তা দিয়ে পেট ভরবে। তারপর পান করার জন্য তাদেরকে ফুটন্ত পানি দেয়া হবে (সূরা আস-সফফাত # ৩৭ : ৬২-৬৭)। আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন, আমরা জালেমদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি, যার লেলিহান শিখা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। সেখানে তারা পানীয় প্রার্থনা করলে তাদেরকে পুঁজ বা তেলের গাদের ন্যায় পানীয় দেয়া হবে যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং মন্দ আশ্রয়স্থল (সূরা কাহফ # ১৮ : ২৯)।

দোযখের সাতটি স্তরের মধ্যে প্রথম এবং উপরের স্তরের নাম জাহান্নাম। ঈমানদার পাপীরা এতে প্রবেশ করবে। ক্রমান্বয়ে নীচের দিকের স্তরগুলোর আজাবের মাত্রা বাড়তে থাকবে। সর্বনিম্ন স্তরের নাম হাবীয়া। এটা মোনাফেকদের আবাসস্থল। সূরা মুদদাসসিরের ৩০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে, "দোযখের পাহারায় নিয়োজিত আছেন উনিশ জন ফেরেশতা।" তাদের প্রধানের নাম মালেক যিনি দোযখের দারোগা নামে আখ্যায়িত। "দোযখীরা বলবে, হে মালেক! তোমার রব আমাদের ব্যাপারটি চূড়ান্ত করে দিক, তবেই ভাল। তিনি জবাব দেবেন : তোমরা এ অবস্থায় থাক" (সূরা যুখরুফ # ৪৩ : ৭৭)। অন্যত্র আছে, দোযখীরা রক্ষীদেরকে বলবে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে বল, তিনি যেন আমাদের এক দিনের শাস্তি কমিয়ে দেন। রক্ষীরা বলবে, তোমাদের নিকট কি সুস্পষ্ট প্রমাণসহ রাসূল আসেনি? তারা বলবে, হ্যাঁ, রক্ষীরা বলবে, তবে তোমরাই দোয়া কর। বস্তুতঃ কাফেরদের দোয়া ব্যর্থ হয় (সূরা মুমিন # ৪০ : ৪৯-৫০)।

দোযখের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে দোযখীরা বের হবার চেষ্টা করবে। আল্লাহ্ বলেন, তাদের জন্য নির্ধারিত লোহার গুরুজ। তারা যখনই যন্ত্রণায়

www.nagorikpathagar.org

অতিষ্ঠ হয়ে দোযখ থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে এতে ফিরে দেয়া হবে। বলা হবে, জ্বলন্ত আজাব আস্বাদন করতে থাক (সূরা হজ্জ # ২২ : ২১-২২)।

আল্লাহ্ তার অবাধ্য বান্দাদের জন্য যেমন ভয়ঙ্কর আজাবের আবাস দোযখ তৈরি করেছেন, তেমনি তাঁর বাধ্যগত বান্দাদের জন্য তৈরি করেছেন পরম সুখের আবাস বেহেশত। বেহেশতের আকার বা আয়তন মানুষের কল্পনার বাইরে। আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়স (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সা.) বলেছেন, বেহেশতের মধ্যে প্রত্যেক বেহেশতীর জন্য এক একটি বিশেষ গৃহ হবে বিরাট এক একটি মোতি খুঁড়ে; তা উঁচুর দিকে হবে ত্রিশ মাইল। তার প্রতি কোণে মুমিন ব্যক্তির জন্য একজন হুর থাকবে। গৃহটি এত বিরাট যে, তার এক কোণ থেকে অন্য কোণ দেখা যাবে না (বোখারী শরীফ # ১৫৯৮)।

আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন যে, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন এমন নেয়ামতসমূহ তৈরি করে রেখেছি যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শুনেনি, কোন মানুষের অন্তরে তার কল্পনাও আসতে পারে না। অতঃপর তিনি সূরা আস-সেজদার ১৬ ও ১৭ আয়াত পাঠ করলেন– তাদের পিঠ বিছানা থেকে আলাদা হয়ে থাকে, নিজেদের রবকে ডাকে ভয় ও আশাসহ। আর যা কিছু রিযিক আমরা তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। তাছাড়া তাদের কর্মের প্রতিফলস্বরূপ তাদের চোখ শীতলকারী সে সকল সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে, কোন প্রাণীই তা জানে না (বোখারী শরীফ # ১৫৯৯)।

পবিত্র কোরআনে বেহেশতসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও বর্ণনা পাওয়া যায়। ঈমানদারগণ নিজ নিজ তাকওয়া অনুযায়ী এক একটি বেহেশতে চিরস্থায়ী বাসস্থান লাভ করবেন।

(১) জান্নাতুল ফেরদাউস : যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তাদের মেহমানদারির জন্য জান্নাতুল ফেরদাউস (ফেরদাউসের

www.nagorikpathagar.org

বাগান) রয়েছে (সূরা কাহফ # ১৮ : ১০৭)। আর যারা আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে এবং যারা আপন নামাযের প্রতি যত্নশীল, তারাই হবে উত্তরাধিকারী। অধিকারী হবে ফেরদাউসের– হবে তাতে স্থায়ী (সূরা মুমিনুন # ২৩ : ৮-১১)। এটা সর্বশ্রেষ্ঠ জান্নাত। নবী-রাসূল ও অতি উচ্চ মর্যাদাশীল ঈমানদারগণ এতে থাকবেন।

(২) জান্নাতুল মাওয়া : নিশ্চয় তিনি (নবী সা.) তাকে (জিব্রাইল আ.-কে) আরেকবার দেখেছিলেন, সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে, যার কাছে অবস্থিত জান্নাতুল মাওয়া (বসবাসের বাগান) (সূরা নাজম # ৫৩ : ১৩-১৫)।

(৩) জান্নাতু আদন : মুমিন পুরুষ ও নারীদের সম্পর্কে আল্লাহর ওয়াদা এই যে, তাদেরকে এমন বাগ-বাগিচা দান করবেন যার নিম্নদেশে ঝর্নাধারা প্রবহমাণ এবং তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। এ জান্নাতু আদনে (চিরসুখের বাগান) তাদের জন্য পবিত্র পরিচ্ছন্ন বসবাসের স্থান থাকবে। আর সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তারা আল্লাহর সন্তোষ লাভ করবে, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাফল্য (সূরা তওবা # ৯ : ৭২)।

(৪) জান্নাতুল খুলদ : তাদেরকে (কাফেরদেরকে) জিজ্ঞাসা কর, এ পরিণতি ভাল নাকি জান্নাতুল খুলদ (চিরস্থায়ী জান্নাত) ভাল, যার ওয়াদা করা হয়েছে, খোদাভীরু পরহেযগার লোকদের জন্য, যা হবে তাদের আমলের প্রতিফল এবং তাদের মহাযাত্রার শেষ মনযিল (সূরা ফোরকান # ২৫ : ১৫)।

(৫) জান্নাতুন নাঈম : নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তাদের রব তাদের ঈমানের কারণে জান্নাতুন নাঈমের (নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতের) পথ দেখাবেন যার নীচে নদ-নদী প্রবহমাণ (সূরা ইউনুস # ১০ : ৯)। আর যদি আহলে কিতাবরা ঈমান আনত এবং খোদাভীতি অবলম্বন করত তবে আমি তাদের মন্দ বিষয়সমূহ ক্ষমা করে দিতাম এবং জান্নাতিন নাঈমে প্রবেশ করাতাম (সূরা মায়েদা # ৫ : ৬৫)।

(৬) দারুস সালাম : আর আল্লাহ তোমাদেরকে দারুস সালামের (শান্তির আবাসের) দিকে আহ্বান জানান এবং যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ

www.nagorikpathagar.org

দেখান (সূরা ইউনুস # ১০ : ২৫)। তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য রয়েছে দারুস সালাম (শান্তির আবাস) এবং তারা যা করত সেজন্য তিনিই তাদের অভিভাবক (সূরা আনআম # ৬ : ১২৭)।

(৭) দারুল মুকামা : যিনি (আল্লাহ্) আমাদেরকে নিজের অনুগ্রহে দারুল মুকামে (স্থায়ী আবাসে) এনে দিয়েছেন যাতে কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করে না (সূরা ফাতির # ৩৫ : ৩৫)।

(৮) দারুল কারার : (ফেরাউনের সম্প্রদায়ের) মুমিন ব্যক্তিটি বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করব। হে আমার সম্প্রদায়! এ পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখেরাতই হচ্ছে দারুল কারার বা চিরস্থায়ী আবাস (সূরা মুমিন # ৪০ : ৩৮-৩৯)।

বেহেশতের এ আটটি স্তর একটি থেকে অন্যটি বহু দূরে অবস্থিত। সাহল (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত নবী (সা.) বলেছেন, বেহেশতের নিম্নস্তরের লোকগণ তাদের ঊর্ধ্বতন মহলসমূহ এরূপ দেখবে যেরূপ তোমরা আকাশের পূর্ব বা পশ্চিম দিগন্তে উদিত নক্ষত্র দেখে থাক (বোখারী শরীফ # ২৪৯০)। বেহেশতীদের মর্যাদার পার্থক্যের কারণে এরূপ হবে। অথচ এক মহলের লোকদের প্রতি অপর মহলের লোকদের কোন হিংসা হবে না।

আল্লাহ্ বলেন, যারা নিজেদের পালনকর্তার সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্যধারণ করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে আর আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং মন্দকে ভাল দিয়ে প্রতিরোধ করে, তাদের জন্য রয়েছে পরকালের গৃহ; স্থায়ী জান্নাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে আর তাদের বাপ-দাদা, তাদের স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকাজ করেছে তারাও তাদের সঙ্গে যাবে। ফেরেশতারা প্রত্যেক দরজা দিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হবে এবং বলবে তোমাদের প্রতি সালাম এ কারণে যে তোমরা সবর করেছ, কতই না উত্তম পরকালের এ ঘর (সূরা রাদ # ১৩ : ২২-২৪)।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ বলবেন, যারা আমাদের আয়াতের উপর ঈমান এনেছিল এবং ছিল অনুগত বান্দা তাদেরকে বলা হবে হে আমার বান্দারা! তোমরা তোমাদের স্ত্রীগণসহ জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং চিন্তায়ও পড়তে হবে না, তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করে দেয়া হবে। তাদের চারদিকে রক্ষিত থাকবে সোনার থালা ও পানপাত্র, সেখানে তাদের অন্তর যা চাইবে ও চোখে যা ভাল লাগবে তা পাবে এবং সেখানে তারা হবে স্থায়ী (সূরা যুখরুফ # ৪৩ : ৭১)।

আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, বেহেশতের মধ্যে প্রবেশকারী প্রথম দলটির লোকদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। পরবর্তী দলটি সর্বাধিক উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় হবে। বেহেশতবাসীগণের মধ্যে এরূপ শ্রেণী বিভক্তি হবে। তাদের মুখে থুথু হবে না, নাকে শ্লেষ্মা থাকবে না, মল-মূত্রের বেগ হবে না, কোন প্রকার রোগের আক্রমণ হবে না। তাদের ব্যবহারিক আসবাবপত্র, বর্তন-পেয়ালা স্বর্ণ নির্মিত হবে (বোখারী শরীফ # ১৬০০)।

আল্লাহ বলেন, মুত্তাকীদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছিল, তার পরিচয় এই যে, তাতে ঝর্নাধারা প্রবহমাণ থাকবে স্বচ্ছ-সুমিষ্ট পানির। ঝর্নাধারা প্রবহমাণ থাকবে এমন দুধের যা কখনো বিস্বাদ হবে না। ঝর্নাধারা প্রবহমাণ থাকবে এমন পানীয়ের যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু-সুপেয় হবে। ঝর্নাধারা প্রবহমাণ হবে স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন মধুর। সেখানে তাদের জন্য সকল প্রকারের ফল থাকবে এবং তাদের রবের নিকট থেকে থাকবে ক্ষমা (সূরা মুহাম্মদ # ৪৭ : ১৫)।

পবিত্র কোরআনে কমপক্ষে চারটি আয়াতে যথা সূরা তুরের ২০, সূরা দোখানের ৫৪, সূরা আর-রহমানের ৭২ এবং সূরা ওয়াকেয়ার ২২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, বেহেশতী পুরুষদেরকে তিনি আয়তলোচনা হুর দেবেন। অনেকের প্রশ্ন নারীদের জন্য কারা থাকবে? পৃথিবীতে যারা স্বামী-স্ত্রী ছিলেন উভয়ে জান্নাতী হলে সেখানেও তারা স্বামী-স্ত্রী থাকবেন। সূরা যুখরুফের ৭০ নম্বর আয়াতে এর সত্যতা পাওয়া যায় যাতে বলা হয়েছে :

www.nagorikpathagar.org

তোমরা ও তোমাদের স্ত্রীগণ সানন্দে বেহেশতে প্রবেশ কর। প্রশ্ন থেকে যায়, যার একাধিক স্বামী ছিল তিনি কার সাথে যাবেন? স্বামী বেহেশতী না হলে কে তার সঙ্গী থাকবেন? যার বিবাহ হয়নি অথবা হলেও তালাক প্রাপ্তা অবস্থায় মারা গিয়েছেন, তার অবস্থা কি হবে? এ সকল প্রশ্নের উত্তর কোরআন অথবা হাদীসে আমি পাইনি। আল্লাহ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন তিনিই তা ভাল জানেন।

শিশু অবস্থায় মৃত্যু হলে তার পরিণাম কি হবে সে সম্পর্কে কোরআনের কোন আয়াত আমার জানা নেই। তবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি হাদীস থেকে জানা যায় পিতা-মাতার জাতি-ধর্ম যাই হোক না কেন, শিশু নিষ্পাপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সা.) বলেছেন, প্রত্যকটি মানুষ সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহর তরফ থেকে এমন একটি শক্তি প্রাপ্ত হয়ে এ জগতে পদার্পণ করে থাকে যে, যদি সে কোন আকর্ষণ বা বাধার বেষ্টনে পতিত না হয়, ঐ শক্তিটি তাকে হক ও সত্যের দিকে ধাবিত করবে। কিন্তু কারো ইহুদী মাতা-পিতার পরিবেশ তাকে ইহুদী বানায়, কারো নাসারা মাতা-পিতার পরিবেশ তাকে নাসারা বানায় এবং কারো অগ্নিপূজক মাতা-পিতার পরিবেশ তাকে অগ্নিপূজকে পরিণত করে থাকে (বোখারী শরীফ # ৭২০)।

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, একদা নবী (সা.) কিছু সংখ্যক নারীকে নসিহত শুনাবার সময় বলেছিলেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ তিনটি শিশু সন্তানকে কেয়ামতের দিনের জন্য পাঠিয়ে দেবে (শিশু অবস্থায় মারা যাবে) তার জন্য ঐ শিশু সন্তানগুলো দোযখের অগ্নি থেকে ঢালস্বরূপ রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়াবে। একজন স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করল, দুইটি সন্তান হলে? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, হ্যাঁ, দুইটি সন্তান হলেও ঐরূপ হবে (বোখারী শরীফ # ৮২)। তিরমিযী শরীফের অন্য এক হাদীসে আয়েশা (রা.) প্রশ্ন করলেন, একটি সন্তান মরলে? হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, একটি সন্তান মরলেও তদ্রূপই হবে (তিরমিযী শরীফ # ১০০০)।

www.nagorikpathagar.org

বারা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিশু পুত্র ইব্রাহীম (রা.)-এর মৃত্যু হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন, তার জন্য বেহেশতে একজন দাই নিযুক্ত করা হবে (বোখারী শরীফ # ৭১৭)।

ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট মুশরিকদের ঔরসজাত নাবালক (মৃত) সন্তানদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করাকালীন সময়ে অবগত ছিলেন তারা (বেঁচে থাকলে) কি প্রকারের আমল করত (বোখারী শরীফ # ৭১৮)।

উপরের হাদীসগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সৃষ্টিকর্তা এবং বিচার দিবসের মালিক দয়ালু আল্লাহ্ শিশুদেরকে বেহেশত দান করবেন।

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : ছোট বয়সে কিংবা বৃদ্ধ বয়সে যে কোন বেহেশতী লোক মারা যাবে, সে বেহেশতী ত্রিশ বছর বয়সী (জোয়ান) হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ বয়স কখনও বৃদ্ধি পাবে না। দোযখবাসীরাও অনুরূপ হবে (মেশকাত শরীফ # ৫৪০৬)। অপর একটি হাদীসে মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : জান্নাতবাসীগণ কেশবিহীন, দাঁড়িবিহীন ও সুরমায়িত চক্ষুবিশিষ্ট ত্রিশ বা তেত্রিশ বছর বয়সীর মত জান্নাতে প্রবেশ করবে (তিরমিযী শরীফ # ২৫৪৭)।

আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : তাদের (বেহেশতীদের) দৈহিক গঠন হবে একই ধরনের। উচ্চতায় তারা তাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর মত ষাট হাত মতান্তরে ষাট গজ লম্বা হবে (বোখারী শরীফ # ১৬২০)।

ইমরান (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সা.) বলেছেন : আমি বেহেশত পরিদর্শন করেছি (এবং জ্ঞাত হয়েছি) যে, তা লাভকারীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হবে দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের। দোযখও দেখেছি (এবং জ্ঞাত হয়েছি) যে, সেখানে প্রবেশকারীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হবে নারীদের (বোখারী শরীফ # ২৫৫২)।

www.nagorikpathagar.org

কেয়ামতের হিসাব নিকাশের পর অগণিত পাপী বান্দাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। তথাপি দোযখ পূর্ণ হবে না। আল্লাহ্ বলেন : সেদিন যখন আমরা জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করব, তুমি পুরোমাত্রায় পূর্ণ হয়েছ কি? সে বলবে, আরও অধিক আছে কি (সূরা কাফ # ৫০ : ৩০)? আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সা.) বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর স্বীয় কুদরতের এমন চাপ প্রয়োগ করবেন যাতে দোযখের গভীরতা এবং প্রশস্ততা সংকোচিত হয়ে যাবে। তখন সে বলবে, যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে (বোখারী শরীফ # ১৯৪৭)। পক্ষান্তরে আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত নবী (সা.) বলেছেন : বেহেশতকে পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নতুন মাখলুক পয়দা করবেন। (তারা বেহেশতবাসী মানুষের অধীনস্থ হবেন) (বোখারী শরীফ # ১৯৪৮)।

বেহেশতীদের জন্য আল্লাহ্ অকল্পনীয় সুখকর জিনিস সৃষ্টি করে রেখেছেন। কিন্তু আল্লাহ্র দর্শন লাভ অপেক্ষা অধিক সুখকর আর কিছুই হবে না। আল্লাহ্ তাঁর মোত্তাকী বান্দাদেরকে দর্শন দান করবেন। আল্লাহ্ বলেন : সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে (সূরা কেয়ামাহ্ # ৭৫ : ২২-২৩)। অপরদিকে দোযখীরা আল্লাহ্র দর্শন লাভে বঞ্চিত হবে। আল্লাহ্ বলেন : আর কিছু সংখ্যক মুখমণ্ডল উদাস-ম্লান হবে (সূরা কেয়ামাহ্ # ৭৫ : ২৪)।

পার্থিব জীবনের অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্ট থেকে জাহান্নামের আজাব কত ভয়ঙ্কর আর পার্থিব জীবনের ধন-সম্পদ, ভোগ-বিলাস, আমোদ-প্রমোদ ও চাকচিক্য থেকে জান্নাতের সুখ কত উত্তম, পাপীরা যদি তা ভেবে দেখত তবে কতই না মঙ্গলকর হত।

www.nagorikpathagar.org

কেয়ামত

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করে তাদেরকে ভাল ও মন্দ বিবেচনা করার জন্য জ্ঞান দান করেছেন। তিনি তাঁর অন্য কোন সৃষ্টিকে মানুষের সমান জ্ঞান দান করেননি। তাই মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষকে আল্লাহ্ স্বাধীনতা দিয়েছেন। তারা ইচ্ছা করলে ভাল কাজ যেমনি করতে পারে তেমনি মন্দ কাজও করতে পারে। মানুষের কৃতকর্মের হিসাব নেয়ার জন্য আল্লাহ্ পরকালে শেষ বিচারের ব্যবস্থা রেখেছেন। বিচারের এ দিন কেয়ামত বা হাশরের দিন। মুসলমান মাত্রই এ নামগুলোর সাথে পরিচিত। কেয়ামতের উপর বিশ্বাস রাখা ঈমানের একটি প্রধান অঙ্গ।

মানুষকে হেদায়াত করার জন্য আল্লাহ্ যুগে যুগে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। যারা তাঁদের আদেশ নিষেধ মান্য করে চলে তারা সৎ পথের সন্ধান পেয়ে মুমিন হতে পারে এবং পরকালে বেহেশত লাভে সক্ষম হবে। যারা বিপরীত পথ অবলম্বন করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন ঃ আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একেকজন রাসূল রয়েছে। যখন তাদের কাছে তাদের রাসূল উপস্থিত হলো তখন আর তাদের উপর জুলুম হয় না (সূরা ইউনুস # ১০ : ৪৭)। নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম (সূরা আলে-ইমরান # ৩ : ১৯)।

কেয়ামত কখন হবে ঃ

আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না কেয়ামত কখন হবে। তবে কেয়ামত যে অতি নিকটে তার ইঙ্গিত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিম্নের হাদীস দু'টিতে পাওয়া যায় ঃ

(১) আমার আবির্ভাব ও কেয়ামত উভয়টির ব্যবধান শুধুমাত্র এ দুইটি আঙ্গুলের ব্যবধানস্বরূপ– মধ্যাঙ্গুল ও শাহাদাত আঙ্গুল (বোখারী শরীফ # ২৪৬৪)।

(২) কেয়ামত কবে হবে কারো এ প্রশ্নের জবাবে নবী রাসূলুল্লাহ্

www.nagorikpathagar.org

(সা.) কোন একটি বালককে লক্ষ্য করে বলতেন, এই বালক বেঁচে থাকলে তার বৃদ্ধ হবার পূর্বে তোমাদের কেয়ামত কায়েম হয়ে যাবে (বোখারী শরীফ # ২৪৬৫)। অর্থাৎ মৃত্যুই কেয়ামতের সূচনা।

তবে কেয়ামতের কতগুলো আলামত তিনি বলে গিয়েছেন। একে একে এগুলো দেখা গেলে বুঝতে হবে, কেয়ামতের আর বেশী দেরি নেই। তিনি বলেছেন, কেয়ামতের নিদর্শন দুইশত বছর পর থেকে প্রকাশ হতে থাকবে (ইবনে মাজাহ # ৪০৫৭)। অনেকের মতে তাঁর ইন্তেকালের পর থেকে দুইশত বছর বুঝানো হয়েছে।

কেয়ামতের আলামত ঃ

(১) আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কেয়ামতের পূর্বে অবশ্যই হেজায অঞ্চলের কোন এক স্থানে ভূগর্ভ থেকে অগ্নি উত্থিত হবে। যার আলোতে সিরিয়াস্থ বোসরা (হুরান) শহরে অবস্থিত উটের গর্দান পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হবে (বোখারী শরীফ # ২৬৪৫)।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত নবী (সা.) বলেছেন, কেয়ামতের আলামতগুলোর প্রথম আলামত হলো, একটি আগুন, যা লোকদেরকে পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিকে হাঁকিয়ে নিবে। বোখারী শরীফের বিশিষ্ট ব্যাখ্যাকার হাফেয ইবনে হাজার (র.) লিখেছেন, এ ভবিষ্যদ্বাণীর ঘটনা সংঘটিত হয়ে গেছে। ৬৫৪ হিজরী সনের জমাদিউস সানী মাসের তিন তারিখ বুধবার রাত্রে এশার নামাযের পর মদীনা শহরের বাইরে প্রস্তরময় এলাকার ভূগর্ভ থেকে আগুন উত্থিত হয়েছিল। ভীষণ এক ভূমিকম্প হয়ে সে আগুন বের হয়েছিল এবং মঙ্গলবার দিবাগত বুধবার রাত্র থেকে শুক্রবার দিন দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত প্রজ্বলিত ছিল (ফাতহুল বারী, ১৩-৬৮)। এটা উপরের হাদীসের সাথে দেয়া ব্যাখ্যা।

(২) রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যখন গনিমতের মালকে ব্যক্তিগত সম্পদরূপে ব্যবহার করা হবে, আমানতকে গনিমতের মাল মনে করা হবে,

www.nagorikpathagar.org

যাকাতকে জরিমানা ধারণা করা হবে, দ্বীন ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে ইলম হাসিল করা হবে, পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য করবে এবং মায়ের নাফরমানি করবে আর বন্ধুকে খুব নিকটে স্থান দেবে এবং আপন পিতাকে দূরে সরিয়ে রাখবে, মসজিদসমূহে শোরগোল করা হবে, ফাসেক ব্যক্তি গোত্রের সরদার হবে, জাতির নিকৃষ্টতম ব্যক্তি তাদের নেতা হবে, ক্ষতির ভয়ে মানুষেরা সম্মান করবে, গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রাদি ব্যাপকভাবে প্রকাশ লাভ করবে, মদ্যপান বেড়ে যাবে এবং এ উম্মতের পরবর্তীকালের লোকেরা পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি অভিসম্পাত করতে থাকবে। সে সময় তোমরা অপেক্ষা কর রক্তিম বর্ণের ঝড়ের, ভূকম্পনের, ভূমি ধসের, রূপ বিকৃতির, পাথর বৃষ্টির এবং সুতা ছিঁড়ে দানার ন্যায় একটির পর একটি নিদর্শনসমূহের (তিরমিযী শরীফ # ২১৫৭-২১৫৮)।

আমরা বর্তমানে এ খারাপ সময় পার করছি। অধিকাংশ লক্ষণগুলো এখন সর্বত্র বিরাজমান।

(৩) কেয়ামতের পূর্বে খুনা-খুনির যুগ আসবে। তখন দ্বীনের ইলম থাকবে না, অজ্ঞতা বেড়ে যাবে। যাদের জীবদ্দশায় কেয়ামত বা মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে তারা হবে মানব সমাজের সর্বাধিক জঘন্যতম মানুষ (বোখারী শরীফ # ২৬২৫)।

(৪) দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে এবং (এককালের) নগ্নপদ বস্ত্রহীন, দুস্থ কাঙ্গাল, বকরির রাখালকে বড় বড় দালান-কোঠার মালিক হয়ে গর্ব অহঙ্কারে মত্ত দেখতে পাবে (সহীহ্ মুসলিম # ১)।

এই লক্ষণের প্রকাশ এখন দৃশ্যমান।

(৫) সময় দ্রুতগামী মনে হবে। কাজ কম হবে। কৃপণতা ও কাঠিন্য লোকদের স্বভাবে পরিণত হবে। উৎকণ্ঠাজনক অবাঞ্ছিত ঘটনাবলীর প্রাদুর্ভাব হবে। হত্যাকাণ্ডের আধিক্য হবে (বোখারী শরীফ # ২৬২৩)।

(৬) যখন আমানতের খেয়ানত হতে থাকবে, তখন কেয়ামতের অপেক্ষা কর। বিশেষতঃ হুকুমত ও রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনা বা শাসন

www.nagorikpathagar.org

ক্ষমতার ভার যখন অযোগ্য পাত্রে অর্পিত হবে, অযোগ্য ও অবিশ্বস্ত লোকদেরকে যখন রাষ্ট্রীয় কার্যে ও ক্ষমতার নির্বাচন বা নিযুক্ত করা হবে, তখন জগৎ ধ্বংসের অপেক্ষা করতে থাক (বোখারী শরীফ # ৫৩)।

(৭) কেয়ামতের পূর্বে নিশ্চয় এ ঘটনা ঘটবে যে, তোমরা মুসলমানরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে। এমনকি কোন পাথরের পেছনে কোন ইহুদী লুকিয়ে থাকলে ঐ পাথর মুসলমানকে ডেকে বলবে, দেখ- আমার পেছনে এক ইহুদী লুকিয়ে আছে, এটাকে হত্যা কর (বোখারী শরীফ # ১৩৪৩)।

(৮) কেয়ামতের কতিপয় আলামত এই– ইলম দুর্লভ হয়ে যাবে, অজ্ঞতা প্রবল হবে, প্রকাশ্যে ব্যভিচার হবে, নারীর সংখ্যা অধিক হবে, পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে, এমনকি এক একটি পুরুষের তত্ত্বাবধানে পঞ্চাশটি নারী আশ্রিতা হবে (বোখারী শরীফ # ৬৯)।

(৯) নজদ এলাকায় ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হবে এবং তথায় ভয়ঙ্কর ভূকম্পনের হিড়িক পড়বে। এটাও (পূর্বাঞ্চলের) একটি এলাকা, যেখানে শয়তানের শিং উঁচু হবে (বোখারী শরীফ # ২৩৩৩)।

(১০) কেয়ামতের পূর্বে অচিরেই এমন একদিন আসবে, যেদিন (ইরাকস্থ) ফোরাত নদীর কূল শুকিয়ে পর্বত আকারে এক স্বর্ণখনি আবির্ভূত হবে। সেখানে উপস্থিত কেউ যেন তা ছুঁতেও না যায় (বোখারী শরীফ # ২৬৪৬)।

ব্যাখ্যা : মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েতে আছে "উক্ত স্বর্ণ খনির জন্য লোকদের মধ্যে রক্তারক্তি চলবে এবং শতকরা নিরানব্বইজন নিহত হবে; প্রত্যেকের ধারণা হবে, আমি হয়তো সফলকাম হব।

(১১) কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না যে পর্যন্ত সম্পদের প্রাচুর্য না আসবে। এমনকি কোন ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত নিয়ে ঘুরবে কিন্তু নেয়ার মত লোক পাবে না (সহীহ মুসলিম # ২২০৯)।

(১২) কেয়ামতের পূর্বে এমন অনেক লোকের আবির্ভাব হবে যারা

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যেকে নিজকে শেষ নবী দাবি করবে। হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) বলেন, আমি নবী রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, কেয়ামতের পূর্বে বহু মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব ঘটবে। সুতরাং তোমরা তাদের থেকে সতর্ক থাক (সহীহ্ মুসলিম # ৪৫৬৩, তিরমিযী # ২১৬৫)। অর্থাৎ ভণ্ড নবীর আবির্ভাব ঘটবে। মুসাইলামা, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নাম অন্যতম।

হযরত সাওবান (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতের মাঝে ত্রিশ জন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব ঘটবে এবং তারা প্রত্যেকে আল্লাহ্র নবী হওয়ার দাবি করবে অথচ প্রকৃত কথা হল, আমি শেষ নবী; আমার পরে আর কোন নবী নেই (তিরমিযী শরীফ # ২১৬৬)।

(১৩) নবী রাসূলুল্লাহ (সা.) এমন এক সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করলেন যারা তাঁর কওমের মধ্যে আবির্ভূত হবে। সমাজে যখন বিভেদ-বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়বে সে সময় আত্মপ্রকাশ করবে। আর তাদেরকে চিনার উপায় হল, তারা নেড়া মাথা বিশিষ্ট হবে। তারা হবে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি (সহীহ্ মুসলিম # ২৩২৬)। অন্য এক হাদীসে আছে ঃ মাথা নেড়া এক সম্প্রদায় (খারেজী) পূর্বদিক থেকে (নজ্দ থেকে) বের হবে (সহীহ্ মুসলিম # ২৩৪০)।

(১৪) আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা কোরআন পাঠ করবে। তোমাদের পাঠ তাদের পাঠের তুলনায় নিম্নমানের মনে হবে। অনুরূপভাবে তাদের নামায ও রোযার তুলনায় তোমাদের নামায-রোযা সামান্য মনে হবে। কোরআন পাঠ করে তারা ধারণা করবে এতে তাদের খুব লাভ হয়েছে অথচ এটা তাদের জন্য ক্ষতির কারণ হবে। তাদের নামায তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমনটি তীর বের হয়ে যায় শিকার থেকে (সহীহ্ মুসলিম # ২৩৩৫)।

(১৫) মুসলিম শরীফ, আবু দাউদ ও বিবিধ বর্ণনামতে এক ঘন কুয়াশা বা ধোঁয়া সম্পূর্ণ আকাশ ঢেকে ফেলবে। এটা চল্লিশ দিন থাকবে

www.nagorikpathagar.org

এবং এটাতে মুমিনগণ সর্দিতে আক্রান্ত হবে এবং কাফেরগণ বেহুঁশ হয়ে যাবে। অতঃপর আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে (মুসলিম একসেস ডট কম)।

(১৬) রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, দুনিয়া নিঃশেষ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার খান্দানের এক ব্যক্তি (মাহ্দী) গোটা আরব ভূখণ্ডের মালিক হবে না। তার নাম হবে আমার নামে (আবু দাউদ # ৪২৩৩)। মাহ্দী আমার খান্দানের তথা ফাতেমার বংশ থেকে জন্ম লাভ করবে (আবু দাউদ)। মাহ্দী হবেন আমার বংশের, উজ্জ্বল চেহারা উঁচু নাক বিশিষ্ট। তিনি ন্যায় ও ইনসাফ দ্বারা জমিনকে এমনভাবে পরিপূর্ণ করে দেবেন যেমনিভাবে পূর্বে তা জুলুম ও অত্যাচারে পরিপূর্ণ ছিল; আর সে সাত বছর ক্ষমতার মালিক থাকবে (আবু দাউদ # ৪২৩৬)।

টীকা ঃ চল্লিশ বছর বয়সকালে ইমাম মাহ্দী আলাইহিস সালামের আত্মপ্রকাশ ঘটবে এবং সাতচল্লিশ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করবেন।

(১৭) রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ আল্লাহর শপথ, মরিয়মের পুত্র (ঈসা আ.) ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে নিশ্চিত (আসমান থেকে) অবতরণ করবেন। (খৃষ্টানদের) ক্রুশ ভেঙ্গে দেবেন, শূকর নিধন করবেন, জিযিয়া কর তুলে দেবেন, মালিক তার উট ছেড়ে দেবে অথচ কেউ তা ধরার জন্য চেষ্টা করবে না। (মানুষের অন্তর থেকে) কার্পণ্য, হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়ে যাবে এবং লোকদেরকে ধন-সম্পদ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করা হবে অথচ কেউ তা কবুল করবে না (সহীহ মুসলিম # ২৯৯)।

মাহ্দী আলাইহিস সালামের সময়ে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম দু'জন ফেরেশতার কাঁধে ভর করে সিরিয়ার দামেস্কের জামে মসজিদের পূর্বদিকের সাদা মিনারে আসরের নামাযের পূর্বে অবতরণ করবেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, সে সময়ের লোকদের আমীর বা নেতা (ইমাম মাহ্দী) তাঁকে বলবেন, আপনি এদিকে আসুন এবং লোকদেরকে নামায পড়িয়ে দিন। তিনি বলবেন, না; বরং তোমরা পরস্পরে পরস্পরের ইমাম। (আর এটা এ জন্য যে) আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে (উম্মতে মুহাম্মদীকে সর্বোপরি) মর্যাদা দান করেছেন (সহীহ মুসলিম # ৩০৩)।

www.nagorikpathagar.org

হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.) জমিনে অবতরণ করবেন, এরপর তিনি বিবাহ করবেন এবং তাঁর সন্তান সন্তানাদিও জন্ম লাভ করবে এবং তিনি পঁয়তাল্লিশ (মতান্তরে চল্লিশ) বছর অবস্থান করবেন। অতঃপর তিনি ইন্তেকাল করবেন। তাকে আমার সঙ্গে আমার কবরের সাথে দাফন করা হবে। কেয়ামতের দিন আমি ও ঈসা একই কবরস্থান হতে আবু বকর ও ওমরের মধ্যখান থেকে উত্থিত হব (মেশকাত শরীফ # ৫২৭৪, ইবনে জাওযী তাঁর আল-ওয়াফা গ্রন্থে)।

(১৮) আমি (রাসূলুল্লাহ সা.) স্বপ্নযোগে দেখতে পেলাম আমি কা'বা শরীফ তাওয়াফ করছি। এমন সময় এক ব্যক্তিকে দেখলাম বাদামি রংয়ের সোজা চুল বিশিষ্ট, দুই ব্যক্তির মাঝখানে। তাঁর মাথা থেকে পানি টপকিয়ে পড়ছে অথবা পানি গড়িয়ে পড়ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ইনি কে? তারা বলল, ইনি ইবনে মরিয়ম (আ.)। অতঃপর আমি সামনে অগ্রসর হয়ে আর এক ব্যক্তিকে দেখলাম রক্তবর্ণের, স্থূলদেহী কুঁকড়ানো চুল, এক চোখ কানা। তার চোখ ফোলা আঙ্গুরের মতো যেন বাইরে খসে পড়ে পড়ে অবস্থায় আছে। আমি জানতে চাইলাম, এ ব্যক্তি কে? তারা বলল, দাজ্জাল। চেহারা ও মুখাকৃতির গঠন সাদৃশ্যে ইবনে কাতানের (এক কাফেরের ছেলের) সাথে তার অধিক মিল রয়েছে (সহীহ মুসলিম # ৩৩৭, বোখারী শরীফ # ২৬৫১)।

দাজ্জাল শব্দের অর্থ অতিশয় জালিয়াতি। তার জালিয়াতি আরম্ভ হবে নবুয়তের দাবি থেকে। অতঃপর খোদায়ী দাবিও সে করবে। সিরিয়া ও ইরাকের পথ বেয়ে দাজ্জালরূপে তার আবির্ভাব অভিযান আরম্ভ হবে। চতুর্দিকে বিভীষিকা বিপর্যয় ছড়িয়ে সে বিদ্যুৎ গতিতে অগ্রসর হতে থাকবে। সে ইহুদী সম্প্রদায়ের হবে এবং সকল ইহুদী তার আনুগত্য গ্রহণ করবে। এতদ্ভিন্ন বেদ্বীন এবং শুধু নামের মুসলমান শ্রেণীর বহুলোক তার দলে ভিড়বে। যাদুর সাহায্যে বিভিন্ন রকম অলৌকিক অস্বাভাবিক ঘটনাবলী সে দেখাবে। সে চল্লিশ দিনে সর্বত্র ভ্রমণ করে মিথ্যা বেহেশত ও দোযখ দেখিয়ে এবং মানুষ দ্বিখণ্ডিত করে আবার জীবিত করে খোদায়ী দাবি

১৭—

www.nagorikpathagar.org

করবে। দাজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। অবশেষে সিরিয়ার অন্তর্গত 'লুদ' নামক স্থানে যুদ্ধক্ষেত্রে দাজ্জাল হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের হস্তে নিহত হবে (বোখারী শরীফের ২৬৫৪ নম্বরের হাদীসের ব্যাখ্যা)।

(১৯) দাজ্জাল নিহত হওয়ার পরে শুরু হবে ইয়াজুজ মাজুজদের উপদ্রব। এ দুইটি গোষ্ঠি মানবজাতির অংশবিশেষ। সংখ্যায় এরা সাধারণ মানুষের অনেক গুন বেশী। স্বভাবে এরা খুব হিংস্র। আল্লাহর কুদরতে এরা দুইটি পর্বতের আড়ালে অবরুদ্ধ আছে। লোহার পাতের উপর গলানো তামা ঢেলে দুই পর্বতের মধ্যে সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে যুলকারনাইন তাদের বাইরে আসার পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে সূরা কাহ্ফে আছে ঃ অতঃপর ইয়াজুজ ও মাজুজ এর উপর আরোহণ করতে পারল না এবং তা ভেদ করতেও সক্ষম হলো না। যুলকারনাইন বললেন ঃ এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ; যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত সময় আসবে তখন তিনি এটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি সত্য। আমি সেদিন তাদেরকে দলে দলে তরঙ্গের আকারে ছড়িয়ে দেব এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে (সূরা কাহফ # ১৮ : ৯৭-৯৯)। (কেয়ামত সংঘটিত হবে না) যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজদেরকে বন্ধনমুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উঁচু স্থান থেকে বের হবে (সূরা আম্বিয়া # ২১ : ৯৬)।

এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করবেন ঃ আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এমন লোক বের করব, যাদেরকে মোকাবেলা করার শক্তি কারো নেই। কাজেই আপনি (ঈসা আ.) মুসলমানদেরকে সমবেত করে তুর পর্বতে চলে যান।

ঈসা (আ.) সঙ্গীদের নিয়ে তুর পর্বতে আশ্রয় নিবেন। অপরদিকে আল্লাহ্ ইয়াজুজ মাজুজদের রাস্তা খুলে দিলে পঙ্গপালের ন্যায় তারা নেমে আসবে। চলার পথে সিরিয়ার তাবারিয়া নদীর পানি পান করে নিঃশেষ করে ফেলবে। পর্বতে ঈসা (আ.) সঙ্গীগণসহ খাদ্য ও পানির অভাবে কষ্টে

www.nagorikpathagar.org

পতিত হয়ে আল্লাহর নিকট কষ্ট লাঘবের দোয়া করবেন। আল্লাহ্ দোয়া কবুল করবেন। ইয়াজুজ মাজুজদের ঘাড়ে ফোঁড়া হয়ে সকলে মরে যাবে। ঈসা (আ.) ও সঙ্গীরা তুর পর্বত থেকে নেমে এসে দেখতে পাবেন এদের লাশ ছাড়া কোথাও খালি জায়গা নেই। লাশে পঁচা ধরে দুর্গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে যাবে। ঈসা (আ.) সঙ্গীদের নিয়ে এ মুসিবত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করবেন। আল্লাহ্ উটের গলার ন্যায় লম্বা গলাবিশিষ্ট এক প্রকার পাখী পাঠাবেন যারা লাশগুলো ঠোঁটে করে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দেবে। এরপর চল্লিশ দিন ধরে বৃষ্টি হবে। ফলে সমস্ত আবর্জনা ও দুর্গন্ধ দূর হয়ে যাবে। অতঃপর সর্বত্র প্রাচুর্য আসবে (তফসীর মা'আরেফুল কোরআন-এর সূরা কাহফের তফসীর অবলম্বনে)।

দাজ্জালের মৃত্যুর পর মাহদী আলাইহিস সালাম ইন্তেকাল করবেন। ঈসা (আ.) তাঁর জানাযা পড়াবেন। অতঃপর তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা ও ইমামতি দুই-ই করবেন।

(২০) ইয়াজুজ-মাজুজ ধ্বংস হওয়ার পর হযরত ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করবেন। অতঃপর ইয়ামেনের কাহতান গোত্রীয় জাহজাহ নামীয় এক ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ শাসক হবেন। তারপর থেকে যে সকল শাসক আসবে তাদের সময়ে ক্রমে কুফরি বিস্তার লাভ করতে থাকবে। এ সময় তিনটি স্থান ধসে যাবে– একটি পূর্বে একটি পশ্চিমে এবং একটি সৌদী আরবের হেজাযে। ফলে ঐ সকল লোকেরা মারা যাবে যারা তকদীরে বিশ্বাস করত না (তিরমিযী শরীফ # ২১২৯)।

(২১) কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে তিন রাতের সমান দীর্ঘ একটি রাত আসবে মানুষ ভীত হয়ে পড়বে। পশুরা ক্ষুধার জ্বালায় চিৎকার শুরু করবে (ক্রিষ্টালিংকস ডট কম)।

(২২) দীর্ঘ রাতের পরদিন পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে পর্যন্ত পশ্চিম আকাশ থেকে সূর্য উদিত না হবে, কেয়ামত হবে না। অতঃপর যখন পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবে তখন সমস্ত মানুষ আল্লাহর উপর ঈমান আনবে কিন্তু ইতোপূর্বে যে

www.nagorikpathagar.org

সকল ব্যক্তি ঈমান আনেনি অথবা ঈমানের সাথে ভাল কাজ করেনি ঐ ঈমান তার কোন উপকারে আসবেন (সহীহ্ মুসলিম # ৩০৪, বোখারী শরীফ # ১৯১৬)।

(২৩) পশ্চিম আকাশ থেকে সূর্যোদয়ের পরে আল্লাহর বিশেষ কুদরতে সাফা পাহাড়ের মাটির নীচ থেকে এক অদ্ভুত জন্তু বের হয়ে আসবে। এটা অল্প সময়ে বিশ্ব পরিভ্রমণ করবে। সে কাফের ও মুমিনকে চিনবে এবং তাদের সাথে কথা বলবে। এ জন্তু মুমিনদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করে দেবে। অপরদিকে এটা কাফেরের মুখমণ্ডলে কুফরের চিহ্ন এঁকে দেবে (তফসীর মা'আরেফুল কোরআন, সূরা নামলের তফসীর)। আল্লাহ্ বলেন ঃ আর যখন তাদের উপর প্রতিশ্রুতি (কেয়ামত) পূর্ণ হবার সময় আসবে, তখন আমি তাদের জন্য জমিন থেকে এক জন্তুর আবির্ভাব করব। এটা তাদের সাথে আলাপ করবে, এ কারণে যে, লোকেরা আমার নিদর্শনসমূহ বিশ্বাস করত না (সূরা নামল # ২৭ : ৮২)।

(২৪) রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, (কেয়ামত ঘনিয়ে আসলে) এক হাবশী-নিগ্রো লোক, যার পায়ের গোছা অপেক্ষাকৃত সরু হবে, সে বায়তুল্লাহ্ শরীফকে বিধ্বস্ত করবে (বোখারী শরীফ # ৮৩১)।

তিনি (সা.) আরও বলেছেন, আমি যেন দেখছি, কৃষ্ণবর্ণ বাঁকা গোছাযুক্ত ব্যক্তিটি বায়তুল্লাহ্ শরীফের এক একটি পাথর বিচ্ছিন্ন করে একে বিধ্বস্ত করছে (বোখারী শরীফ # ৮৩২)। এতে হজ্জ বন্ধ হয়ে যাবে।

(২৫) কেয়ামতের পূর্বে এমন একটা সময় আসবে যখন থেকে কোরআন উঠিয়ে নেয়া হবে (ইবনে মাজাহ্ # ৪০৪৮)।

(২৬) রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ ঈমান (শেষ পর্যন্ত) মদীনায় এমনভাবে গুটিয়ে আসবে যেমন সাপ তার গর্তের ভেতরে গুটিয়ে আসে (সহীহ্ মুসলিম # ২৮২)।

(২৭) রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলার মত একজন অবশিষ্ট থাকলেও কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না (সহীহ্ মুসলিম # ২৮৪)।

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ নেক লোকগণ এক এক করে দুনিয়া থেকে চলে যেতে থাকবে। যবের আটা চালনি দ্বারা ছাঁকলে যেরূপ আটার অংশ নীচে পড়ে যায় এবং শুধুমাত্র ভুসি বা চোকলা চালনির উপর থাকে তদ্রূপ নেক লোকগণ ভূপৃষ্ঠ থেকে নিঃশেষ হয়ে ভূপৃষ্ঠে শুধু চোকলার ন্যায় নিকৃষ্ট লোকগণ অবশিষ্ট থেকে যাবে; আল্লাহ্ তাদের অস্তিত্বের কোন পরওয়া করবেন না। (তাদের উপর কেয়ামত কায়েম হবে) (বোখারী শরীফ # ২৪২৮)।

(২৮) আল্লাহ্ ইয়ামেনের দিক থেকে এমন মৃদু বায়ু প্রবাহিত করবেন যা রেশম থেকেও মোলায়েম। যার অন্তরে শস্য বীজের পরিমাণ বা অণু পরিমাণ ঈমান থাকবে, তাকে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়ে দেবে। (অবশিষ্ট কাফেরের উপর কেয়ামত কায়েম হবে) (সহীহ্ মুসলিম # ২২০)।

কেয়ামত কিভাবে শুরু হবে ঃ

হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে আজ পর্যন্ত অগণিত মানুষ দুনিয়ার বুকে এসেছে, ক্ষণস্থায়ী জীবন যাপন করে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে পরপারে চলে গেছে। এ প্রক্রিয়া কেয়ামতের সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে। একে একে সমস্ত মুমিন ব্যক্তি দুনিয়া থেকে চলে যাবেন। শিঙ্গা বেজে উঠার সময় কোন ঈমানদার থাকবে না। যারা অবশিষ্ট থাকবে তাদের উপর কেয়ামত কায়েম হবে। এরা নিকৃষ্টতম ব্যক্তি।

একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সব ধ্বংস হয়ে যাবে। এই ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনার জন্য আল্লাহ্ তাঁর বিশিষ্ট চারজন ফেরেশতার একজন হযরত ইস্রাফিল আলাইহিস সালামকে নিয়োজিত রেখেছেন। তিনি এ কাজের জন্য আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় শিঙ্গা হাতে নতমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। আল্লাহর আদেশ পাওয়া মাত্র তিনি শিঙ্গায় ফুৎকার দেবেন। শিঙ্গার আওয়াজ বিকট থেকে বিকটতর হতে থাকবে এবং সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। সেদিন চিরঞ্জীব এবং চিরস্থায়ী আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। এ অবস্থা চল্লিশ বছর বিরাজমান থাকবে।

www.nagorikpathagar.org

আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি ঃ (এক সময়) লোকেরা মদীনা ত্যাগ করে যাবে মদীনায় ভাল অবস্থা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও। এমনকি অবশেষে এর বাসিন্দা শুধুমাত্র বন্য পশু-পাখী, যারা ঘুরে ফিরে নিজ নিজ আহার্য যোগায়, এরা থাকবে। মদীনার প্রতি সর্বশেষ আগন্তুক মোযায়না গোত্রের দুই রাখাল তদের ছাগলপাল হাঁকাতে হাঁকাতে মদীনার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতে থাকবে; বাইরে থাকতেই অনুভব করবে যে, মদীনা জনশূন্য– সেখানে বন্য পশু-পাখী ভিন্ন আর কিছু নেই। মদীনায় প্রবেশ পথের দ্বারস্থ 'ছানিয়াতুল-বেদা' নামক স্থানে তাদের পৌছামাত্র শিঙ্গা ফুঁক আরম্ভ হয়ে যাবে, তারা সেখানে অধঃমুখে পতিত হয়ে মরে থাকবে (বোখারী শরীফ # ৯৫৭)।

কেয়ামতের ভয়াবহতা ঃ

কেয়ামতের অবস্থা কত ভয়াবহ হবে পবিত্র কোরআনের কয়েকটি আয়াতের বাংলা অনুবাদ থেকে সহজে অনুমান করা যেতে পারে। ঃ

(১) আর যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, তখন আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা করবেন তারা ব্যতীত আসমানে এবং জমিনে যত কিছু রয়েছে সকলে ভীত-বিহ্বল হয়ে যাবে এবং সকলে তাঁর কাছে আসবে বিনীত অবস্থায় (সূরা নামল # ২৭ : ৮৭)।

(২) হে মানবগণ! আপন প্রভুকে ভয় কর। নিঃসন্দেহে কেয়ামতের কম্পন বড় ভীষণ ব্যাপার হবে (সূরা হজ্জ # ২২ : ১)।

(৩) যেদিন তোমরা এটা দেখবে, সেদিন সমস্ত স্তন্যধাত্রী তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী নারী গর্ভপাত করবে। আর তুমি মানুষকে মাতাল দেখবে, অথচ তারা মাতাল হবে না। বস্তুতঃ আল্লাহর আজাব বড় ভয়ঙ্কর (সূরা হজ্জ # ২২ : ২)।

(৪) অতঃপর যেদিন কর্ণ বিদারক শব্দ আসবে, সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাইয়ের কাছ থেকে, নিজের মাতা-পিতা থেকে; নিজের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা থেকে (সূরা আবাসা # ৮০ : ৩৩-৩৬)।

www.nagorikpathagar.org

(৫) যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের ন্যায় আর পবর্তমালা হবে ধুনিত রঙ্গিন পশমের ন্যায় (সূরা আল-কারেয়া # ১০১ : ৪ ও ৫)।

কবর থেকে হাশরের মাঠে ঃ

চল্লিশ বছর পর ইস্রাফিল (আ.) আল্লাহর আদেশে আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেবেন। এ ফুৎকারে সকলে আবার জেগে উঠবে। এ জাগরণ শেষ বিচারে মহান অল্লাহর সম্মুখীন হওয়ার জন্য। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

(১) আর শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। এটা হবে শাস্তির দিন (সূরা কাফ # ৫০ : ২০)।

(২) শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে আসমান ও জমিনে যারা আছে সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে (সূরা আয-যুমার # ৩৯ : ৬৮)।

(৩) আর শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, আর তৎক্ষণাৎ তারা সকলে কবর থেকে উঠে স্বীয় প্রভুর সমীপে দ্রুত যেতে থাকবে (সূরা ইয়াসীন # ৩৬ : ৫১)।

(৪) আমি কেয়ামতের দিন তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে, অন্ধ অবস্থায়, মূক অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম (সূরা বনী ইসরাইল # ১৭ : ৯৭)।

হাশরের মাঠ ঃ

হযরত ইস্রাফিল আলাইহিস সালামের দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার ফলে ভূপৃষ্ঠ সমতলভাবে জেগে উঠবে। হাশরের ময়দান এ ভূপৃষ্ঠে হবে। আর সে ময়দান হবে বর্তমান সিরিয়ায়।

কেয়ামতের পূর্বে বিশ্বের চতুর্দিক অশান্তির অগ্নি জ্বলে উঠবে। শুধু সিরিয়া অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত কিছু কম অশান্তি হবে, তাই বিশ্বের চতুর্দিকে

www.nagorikpathagar.org

থেকে লোকগণ নিজ নিজ আবাসভূমি ত্যাগকরতঃ সিরিয়ার দিকে ধাবিত হবে। ঐ অবস্থায় যারা সিরিয়ার দিকে না আসবে তাদেরকে ডেকে আনার জন্য আল্লাহ তা'আলার কুদরতী আগুনের আবির্ভাব হবে। সে আগুন আরব সাগরের এডেনস্থিত সমুদ্র গর্ভ থেকে বের হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে। এ সকল তথ্য বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত রয়েছে (বোখারী শরীফ, পঞ্চম সংস্করণ, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৪)।

আল্লাহ তা'আলা পূর্বাপর সমস্ত লোককে (হাশর ময়দান নামীয়) এমন একটি ভূমণ্ডলে একত্র করবেন যা ময়দার রুটির ন্যায় উঁচু-নিচুহীন সুসমতল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে। তাতে কারো কোন নির্দিষ্ট সীমানা চিহ্ন থাকবে না (বোখারী শরীফ # ২৪৭৪)।

আল্লাহর আরশ হাশরের মাঠে স্থাপন করা হবে। বিচারকদের বিচারক, শেষ বিচার দিবসের একমাত্র মালিক মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের বিচার করার জন্য সে আরশে উপবিষ্ট হবেন। সেদিন তাঁর সে আরশের ছায়া ছাড়া হাশরের মাঠে অন্য কোন ছায়া থাকবে না।

কেয়ামতের কঠিন দিনে আল্লাহর আরশের ছায়া যারা পাবেন তারা অতি ভাগ্যবান। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ এমন একদিন (কেয়ামতের দিন) তাঁর (আরশের) ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন যেদিন এর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া অবশিষ্ট থাকবে না ঃ (১) ন্যায়পরায়ণ ইমাম (জনগণের নেতা), (২) ঐ যুবক যে আল্লাহ তা'আলার এবাদতে মশগুল থেকে বড় হয়েছে, (৩) সে ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে রয়েছে, (৪) সে দু'ব্যক্তি যারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালবাসে ও পরস্পর মিলিত হয় এবং এ জন্যে (পরস্পর) বিচ্ছিন্ন হয়, (৫) যে ব্যক্তিকে কোন অভিজাত এবং সুন্দরী, রমণী (ব্যভিচারের জন্য) আহ্বান জানায় আর তার জবাবে সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি, (৬) যে ব্যক্তি এতটা গোপনে দান করে যে তার ডান হাত কি দান করে তা তার বাম হাত টের পায় না এবং (৭) যে ব্যক্তি একাকী বসে আল্লাহকে স্মরণ করে আর তার চোখ দুইটি (আল্লাহর ভয় বা

www.nagorikpathagar.org

ভালবাসায়) অশ্রুপাত করে (সহীহ্ মুসলিম # ২২৫০)। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্র নিকট থেকে অতি উচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ তাঁর আরশের ছায়াতলে থাকবেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কেয়ামতের দিন হাশর ময়দানে মানুষের ঘাম এই পরিমাণ বের হবে যে, জমিনের ভেতর সত্তর হাত পর্যন্ত তা শোষিত হয়েও উপরে যা থাকবে তা কোন কোন ব্যক্তির কান পর্যন্ত পৌঁছবে (বোখারী শরীফ # ২৪৮২)।

হাশরের মাঠে বিচার ঃ

আল্লাহ্ প্রতিশ্রুত শেষ বিচারের জন্য পাপী-নিষ্পাপ নির্বিশেষে সকল বান্দা হাশরের ময়দানে সমবেত হলে মহাপ্রভু তাদের বিচারকার্য শুরু করবেন। বান্দা অধীর আগ্রহে বিচারের ফলাফলের অপেক্ষায় থাকবে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি কেয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারো প্রতি জুলুম হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আমি যথেষ্ট (সূরা আম্বিয়া # ২১ : ৪৭)।

আজ আমি তাদের মুখে মোহর মেরে দেব এবং তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে (সূরা ইয়াসীন # ৩৬ : ৬৫)।

যাদের পাল্লা ভারি হবে তারা হবে সফলকাম এবং যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারা নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে, তারা চিরকাল দোযখে বসবাস করবে (সূরা মুমিনুন # ২৩ : ১০২ ও ১০৩)।

সেদিন বান্দাদেরকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ আর তোমরা তিন ভাগে বিভক্ত হবে। অতঃপর যারা ডান দিকওয়ালা; তারা কত ভাল। আর যারা বাম দিকওয়ালা; তারা কত মন্দ। আর যারা উচ্চস্তরের; তারাতো উচ্চস্তরেরই বটে (সূরা আল-ওয়াকিয়াহ # ৫৬ : ৭-১০)।

www.nagorikpathagar.org

এ আয়াতসমূহের অর্থ এ যে, ডান দিকওয়ালা বলতে সে সমস্ত লোকই উদ্দেশ্য, যাদের আমলনামা ডান হাতে প্রদত্ত হবে। তারা সাধারণ মুমিন। তাদের অবস্থা মোটামুটি ভাল। যারা বাম দিকওয়ালা, তাদের আমলনামা বাম হাতে প্রদান করা হবে। অর্থাৎ কাফেরগণ, এতে মোটামুটিভাবে তাদের অবস্থার নিকৃষ্টতা বর্ণিত হলো। যারা উচ্চস্তরের এর মধ্যে সমস্ত নবী, ওলী, সিদ্দিক, পূর্ণ খোদাভীরুগণ অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। তাদের অবস্থা উচ্চস্তরের হওয়ার কথা মোটামুটিভাবে বর্ণিত হয়েছে [মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) প্রণীত 'বয়ানুল-কোরআন'-এর বঙ্গানুবাদ তফসীরে আশরাফী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ৬ষ্ঠ খণ্ড]।

কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.)-কে ডাকবেন। আদম (আ.) উপস্থিত হবেন এবং স্বীয় আনুগত্য নিবেদন করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, দোযখী দলকে বেছে বের করুন। আদম (আ.) জিজ্ঞাসা করবেন, দোযখী দলের পরিমাণ কি? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই (বোখারী শরীফ # ২৪৮০)।

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, এ যদি অবস্থা হয় তাহলে আমাদের অবস্থা কি হবে। এ নয়শত নিরানব্বইয়ের মধ্যে কাফের গোষ্ঠী ইয়াজুজ মাজুজরাও অন্তর্ভুক্ত যাদের সংখ্যা সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক গুন বেশী। তদুপরি রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আমি আশা করি তোমরা বেহেশতবাসীদের মোট সংখ্যার অর্ধেক হবে।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কেয়ামতের দিন লোকদের মধ্যে নরহত্যার হিসাব সর্বপ্রথম হবে (বোখারী শরীফ # ২৪৮৩)।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তির উপর তার অন্য মুসলমান ভাইয়ের মানহানি বা অন্য কোন বস্তু সম্পর্কীয় হক থাকে, তার কর্তব্য হবে– ইহজীবনে তা থেকে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করা। তার সম্মুখে এমন একদিন আসবে যেদিন কারো নিকট কোন প্রকার ধন-দৌলত থাকবে না। যদি তার নিকট নেক আমল থাকে, তবে ঐ হক অনুপাতে তার নেক আমল ছিনিয়ে নেয়া হবে। আর নেক আমল না থাকলে হকদারের গুনাহের বোঝা তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে (বোখারী শরীফ # ১১৮৩)।

www.nagorikpathagar.org

যারা পরকালে মঙ্গল চায় তাদের অবশ্য কর্তব্য জীবিত থাকাকালীন সময়ে হকদারের হক পরিশোধ করে দেয়া বা তার নিকট থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া। অপরদিকে কারো নিকট কোন পাওনা থাকলে এবং দেনাদার তা পরিশোধে অক্ষম হলে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া। আল্লাহ্ ক্ষমাকারীকে পছন্দ করেন। অতএব এর বিনিময় তিনি আল্লাহর নিকট থেকে পাবেন। কারো এই ধারণা করা ঠিক নয় যে, কোন বিধর্মীর হক আদায় না করলে কোন ক্ষতি হবে না।

অতীতে আল্লাহর হক তথা ফরয কাজের গাফেলতির জন্য মৃত্যু নিকটবর্তী হওয়ার পূর্বে আল্লাহর নিকট থেকে অশ্রুসজল নয়নে ক্ষমা চেয়ে নেয়া প্রয়োজন। সে সাথে নেকের পাল্লা ভারি করার জন্য সৎ লোকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন, দান-খয়রাত ও জনহিতকর কাজের প্রতি মনোযোগী হওয়া দরকার।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুপারিশ ঃ

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কেয়ামতের দিন মুমিনগণও আবদ্ধ থাকবে, যদ্দরুন তারা বিচলিত হয়ে পড়বে। তখন তারা পরস্পর বলবে, আমাদের পরওয়ারদেগারের দরবারে সুপারিশ লাভের ব্যবস্থা করলে ভাল হত; তিনি যেন আমাদের বর্তমান অশান্তির অবস্থা থেকে শান্তি দান করেন। এ বলে তারা আদম (আ.)-এর নিকট আসবে এবং বলবে, আপনি আমাদের জন্য প্রভুর দরবারে সুপারিশ করুন– তিনি যেন আমাদেরকে এ স্থানের অশান্তি থেকে শান্তি দান করেন। আদম (আ.) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই... তোমরা নূহ (আ.)-এর নিকট যাও।

লোকজন নূহ (আ.)-এর নিকট এসে তাদের আবেদন পেশ করলে তিনিও বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই... তোমরা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর নিকট যাও।

লোকগণ ইব্রাহীম (আ.)-এর নিকট এসে তাদের নিবেদন পেশ

www.nagorikpathagar.org

করলে তিনিও বলবেন, আমি তোমাদের কাজে উপযুক্ত নই... তোমরা মূসা (আ.)-এর নিকট যাও।

লোকগণ মূসা (আ.)-এর নিকট আসবে। তিনিও বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই... তোমরা হযরত ঈসা (আ.)-এর নিকট যাও।

লোকগণ ঈসা (আ.)-এর নিকট আসবে। তিনিও বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট যাও। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার এমন প্রিয় বান্দা যে, আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বাহ্নেই তাঁর আগের পরের সব গুনাহ্ মাফ বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, লোকগণ তখন আমার নিকট আসবে। আমি আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিতির অনুমতি প্রার্থনা করব, আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। আমি আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সেজদায় পড়ে যাব। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী আমাকে সেজদায় রাখবেন। অতঃপর বলবেন, হে মুহাম্মদ! আপনি সেজদা থেকে উঠুন, আপনার বক্তব্য পেশ করুন; আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে, আবেদন পেশ করুন, যা চাবেন তা দেয়া হবে। [তখন নবী (সা.)-এর সুপারিশে হিসাব আরম্ভ হবে এবং হাশর ময়দানের উপস্থিতির কষ্ট-যাতনার সমাপ্তির সূচনা হবে, সমস্ত লোক সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর প্রশংসা মুখর হবে। এটা হলো, মাকামে মাহমুদ-সারা বিশ্বের জনগণের প্রশংসাভাজন হওয়ার মর্যাদার একটি বিকাশ। এই সুপারিশকে শাফায়াতে কোবরা বা বড় সুপারিশ বলা হয়]।

তারপর আবার আমি শাফায়াত করব (আমার গুনাহগার উম্মতকে দোযখ থেকে বের করার জন্য)। তখন আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য একটি সীমা নির্ধারণ করে দিয়ে বলবেন, আপনি যান। তখন আমি আল্লাহর দরবার থেকে চলে আসব এবং ঐ শ্রেণীর লোকগণকে দোযখ থেকে বের করে বেহেশতে পৌঁছাব (বোখারী শরীফ # ২৪৯৫, সহীহ মুসলিম # ৩৮২)।

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ (সা.) একে একে চারবার এভাবে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবেন এবং গুনাহগার ঈমানদারগণকে দোযখ থেকে বের করে বেহেশতে পৌঁছাতে থাকবেন। অবশেষে দোযখে একমাত্র তারা থাকবে যারা কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী চিরজাহান্নামী সাব্যস্ত হয়েছে। যে খাঁটি অন্তরে কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ... গ্রহণ করেছে তাদের কেউ দোযখে থাকবে না (হাদীস কুদসী)।

যে যার উপাসনা করেছে সে তার সাথী হবে ঃ

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা দেবে, যে দল যার পূজা (উপাসনা) করত সে দলকে তার সঙ্গে যেতে হবে। সে মতে ক্রুশ পূজকগণ ক্রুশের সঙ্গে, দেব-দেবীর পূজকগণ দেব-দেবীর সঙ্গে এরূপে প্রত্যেক পূজনীয় বস্তুর সঙ্গে তার পূজকগণ যেতে বাধ্য হবে (বোখারী শরীফ)। যারা সূর্যের পূজা করত তারা সূর্যের সাথে থাকবে। যারা চাঁদের পূজা করত তারা চাঁদের সাথে থাকবে। আর যারা খোদাদ্রোহীদের পূজা করত তারা খোদাদ্রোহীদের সাথে একত্রিত হয়ে যাবে (মুসলিম)। অবশিষ্ট থেকে যাবে ঈমানের দাবিদার দল– যাদের মধ্যে মুনাফেক ও গুনাহগারও থাকবে এবং কিছু সংখ্যক কিতাবধারী কাফের (ইহুদী ও নাসারাদের একদল লোক) (বোখারী শরীফ # ২৫০০, সহীহ মুসলিম # ৩৫৯)।

[ইহুদীরা ওযায়ের (আ.)-কে এবং নাসারারা (খৃষ্টানরা) ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র দাবী করে তাদের উপাসনা করত। কিন্তু নবীগণ দোযখে যাবেন না। তাই ঐ সকল উপাসনাকারীগণকে দোযখে নেয়ার অন্য ব্যবস্থা করা হবে]। তারপর জাহান্নামকে (হাশরের ময়দানের নিকটে) আনা হবে। দূর থেকে তা মরীচিকার ন্যায় দেখা যাবে। তখন ইহুদীগণকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কাকে মা'বুদ গণ্য করেছো? তারা বলবে, আল্লাহর পুত্র ওযায়েরকে মা'বুদ গণ্য করতাম। তাদেরকে বলা হবে– তোমরা মিথ্যাবাদী, আল্লাহ তা'আলার স্ত্রী-পুত্র নেই। এখন তোমরা কি চাও? (তারা ভয়ানক পিপাসা বোধ করবে, তাই) তারা বলবে আমাদেরকে পানি পান

www.nagorikpathagar.org

করান। (তাদের সামনে দোযখ মরীচিকার ন্যায় পানিরূপে দেখা যাবে) তাদেরকে বলা হবে, ঐ স্থানে গিয়ে পানি পান কর। তখন তারা ঐ স্থানে যাবে এবং দোযখে পতিত হবে।

তারপর নাসারাগণকেও জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কার বন্দেগি করেছো? তারা বলবে, আমরা আল্লাহর পুত্র মসীহর এবাদত করেছি। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যাবাদী, আল্লাহ তা'আলার স্ত্রী-পুত্র নেই। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কি চাও? (তাদের পিপাসা থাকবে) তারাও বলবে, আমরা পানি চাই। তাদেরকেও (দোযখের দিকে দেখিয়ে) বলা হবে, ঐ পানি পান কর। তারাও সেখানে গিয়ে দোযখে পতিত হবে (বোখারী শরীফ # ২৫০০)।

পুলসিরাত পার হওয়া ঃ

পুলসিরাত এনে দোযখের উপর স্থাপন করা হবে। আমরা (সাহাবাগণ) আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পুলসিরাতের অবস্থা কি? হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তা (গুনাহগারদের জন্য) মারাত্মক পিচ্ছিল স্থান। তার উভয় পার্শ্বে অসংখ্য লোহার আঁকড়া লটকানো থাকবে এবং অতি প্রশস্ত প্রশস্ত কাঁটা থাকবে, যে সবের বক্র মাথায় বড়শির ন্যায় উল্টা কাঁটা থাকবে, যেরূপ নজ্‌দ অঞ্চলের সা'দান কাঁটা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে সৎ ও কামেল মুমিনগণ ঐ পুলসিরাত অতিক্রম করবে, কেউ বা চোখের পলকের ন্যায় দ্রুত গতিতে, কেউ বা বিজলির ন্যায়, কেউ বা বাতাসের ন্যায়, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়া বা উটের ন্যায়। সারকথা, এক শ্রেণীর লোক এই পুলসিরাত সম্পূর্ণ সহীহ-সালামতে ও অক্ষত অবস্থায় অতিক্রম করবে (এরা মুমিন)। আর এক শ্রেণীর লোক (তার উভয় পার্শ্বের আঁকড়া ও কাঁটাসমূহের দ্বারা) ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রেহাই পাবে এবং পার হয়ে যাবে (এরা কিছু কিছু গুনাহ করেছে এমন মুমিনগণ)। আর এক শ্রেণীর লোককে (আঁকড়া ও কাঁটার সাহায্যে) জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে (এরা হলো চির জাহান্নামী মোনাফেক এবং অস্থায়ী সাজা ভোগী বদকার মুমিন)। এমনকি পুলসিরাত অতিক্রমকারীদের সর্বশেষ ব্যক্তি হেঁচড়ানো অবস্থায় পার হবে (বোখারী শরীফ # ২৫০০, সহীহ মুসলিম # ৩৬২)।

www.nagorikpathagar.org

মুমিনদের সুপারিশ ঃ

নেককার মুমিনগণ যারা পরিত্রাণ পেয়েছে, তারা দোযখে থাকা মুমিনদের জন্য আল্লাহর নিকট জোর সুপারিশ পেশ করবেন। যার অন্তরে দীনার পরিমাণ ঈমান আছে, তাকে বের করে আনার জন্য আল্লাহ্ অনুমতি দেবেন।

অতঃপর তারা আবার সুপারিশ করবেন। আল্লাহ্ এবার যার অন্তরে অর্ধদীনার পরিমাণ ঈমান আছে তাকে বের করে আনার অনুমতি দেবেন। অবশেষে আল্লাহ্ বলবেন, যার অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান দেখ তাকে বের কর। তাঁরা অণু পরিমাণ ঈমান আছে এমন সকলকে দোযখ থেকে বের করে আনবেন (বোখারী শরীফ # ২৫০০)।

সর্বশেষে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, সকলে সুপারিশ করেছে, শুধু আমার সুপারিশ (দয়া ও রহমত) বাকী রয়েছে। এ বলে আল্লাহ্ তাঁর দয়া ও রহমত দ্বারা একবার বের করবেন, তাতে একদল লোক (যাদের অন্তরে অণু থেকে কম ঈমান আছে) বের হবে, যারা আগুনে পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। তাদেরকে বেহেশতের দরজায় প্রবাহিত একটি নহর বা খালের মধ্যে ফেলে দেয়া হবে যে খালের পানি জীবনী শক্তিবাহী। ফলে তারা নহর থেকে মতির ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে বের হবে। তাদের ঘাড়ে সীলমোহর দ্বারা চিহ্নিত করা হবে। বেহেশতবাসীগণ তাদেরকে পরম দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলার দল আখ্যা দান করবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে আখেরাতের জন্য সঞ্চিত কোন প্রকার নেক আমল ব্যতিরেকে বেহেশতে পৌঁছাবেন। তাদের প্রত্যেককে বেহেশতের মধ্যে বলা হবে, যে পরিমাণ তোমাদের দৃষ্টি ও ধারণায় আসতে পারে সে পরিমাণ এবং আরও তত পরিমাণ অধিক সুখ ভোগের নেয়ামত সম্ভার তোমাদেরকে দেয়া হলো (বোখারী শরীফ # ২৫০০)।

টীকা ঃ বোখারী শরীফের ২৫০০ নম্বর হাদীসটি অতি দীর্ঘ একটি হাদীস এবং অনেক বিষয়ের বর্ণনা এই একটি হাদীসে আছে। এই জন্য ইতোপূর্বে বর্ণিত অনেকগুলো বিষয়ের বর্ণনা শেষে এ হাদীসের নম্বর রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

মৃত্যুকে যবেহ্ করা ঃ

মানুষের মৃত্যু পরবর্তী জীবন অনন্ত-অসীম। এর কোন শেষ নেই। বেহেশতীরা অনন্তকাল বেহেশতে সুখ ভোগ করতে থাকবে এবং দোযখীরা অনন্তকাল এর আজাব ভোগ করতে থাকবে। তাই মৃত্যু নামক কিছু আর থাকবে না।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, বেহেশতীদের বেহেশতে এবং দোযখীদের দোযখে যাওয়ার সর্বশেষ অবস্থায় মৃত্যুকে (একটি জীবের আকৃতিতে) বেহেশত ও দোযখের মধ্যস্থলে দাঁড় করানো হবে। অতঃপর তাকে যবেহ্ করে দেয়া হবে। তারপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে– হে বেহেশতবাসীগণ! তোমাদের আর মৃত্যু হবে না এবং হে দোযখবাসীগণ! তোমরাও অমর হয়েছ, তোমাদের আর মৃত্যু হবে না। তখন বেহেশতবাসীগণের আনন্দ উল্লাস আর দোযখবাসীগণের দুঃখ ভাবনা অধিক হয়ে যাবে (বোখারী শরীফ # ২৪৮৬)।

আল্লাহর দর্শন লাভ ঃ

বেহেশতবাসীগণের নিকট বেহেশত থেকে অধিক প্রিয় হবে এর স্রষ্টা মহান আল্লাহর দর্শন, যাকে না দেখে তারা তাঁর এবাদত করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যখন বেহেশতবাসীগণ বেহেশতে প্রবেশ করবে, তখন মহাকল্যাণময় আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ তোমরা আরো অতিরিক্ত কিছু কামনা কর কি? তারা বলবে, আমরা এর চেয়ে অধিক আর কি কামনা করতে পারি? আমাদের মুখমণ্ডল কি হাস্যোজ্জ্বল করা হয়নি? আমাদের কি জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়নি এবং আগুন থেকে মুক্তি দেয়া হয়নি? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আবরণ উন্মোচন করবেন। তখন বেহেশতের অধিবাসীদের কাছে আল্লাহর দর্শন লাভের চেয়ে অধিক পছন্দনীয় জিনিস আর কিছু হবে না (সহীহ্ মুসলিম # ৩৫৭)।

---

www.nagorikpathagar.org

যারা আল্লাহর আরশের ছায়া পাবেন

ইস্রাফিল (আ.) শিঙ্গায় ফুঁক দিলে আসমান-জমিন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত এবং পর্বত হবে ধুনিত রঙিন পশমের মত (সূরা কারেয়া # ১০১ : ৪-৫)। সকলে মরে যাবে। তখন একমাত্র মহান প্রভু আল্লাহ তা'আলা অবশিষ্ট থাকবেন। এটা কেয়ামত। এটার দীর্ঘ সময় পরে (কারো মতে চল্লিশ বছর পরে) আল্লাহ তা'আলা ইস্রাফিল (আ.)-কে জীবিত করে দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দিতে আদেশ করবেন। ইস্রাফিল (আ.) শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন। তাতে সকলে জেগে উঠবে এবং মানুষ কবর থেকে উঠে হাশরের ময়দানের দিকে ছুটে যেতে থাকবে। পবিত্র কোরআনে রয়েছে ঃ শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে আর তৎক্ষণাৎ তারা সকলে কবর থেকে স্বীয় প্রভুর সমীপে দ্রুত যেতে থাকবে (সূরা ইয়াসীন # ৩৬ : ৫১)।

ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, একদা নবী (সা.) ভাষণ দানকালে এ তথ্য প্রকাশ করলেন ঃ সমস্ত মানুষ হাশর ময়দানে একত্রিত হবে এ অবস্থায় যে, সকলে খালি পা বস্ত্রবিহীন ও খতনাবিহীন হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যে অবস্থার উপর প্রথম দুনিয়াতে পয়দা করেছিলাম; পুনরুজ্জীবিতও সে অবস্থার উপর করব (বোখারী শরীফ # ২৪৭৬)।

হাশরের মাঠে আল্লাহর আরশ স্থাপন করা হবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ আটজন ফেরেশতা আপনার (নবী সা.-এর) পালনকর্তার আরশকে তাদের ঊর্ধ্বে বহন করবে (সূরা হাককাহ্ # ৬৯ ঃ ১৭)।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের একজনের সম্পর্কে বলার জন্য আমাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে। তার কানের নীচ থেকে কাঁধের দূরত্ব দ্রুতগামী পাখীর সাতশ'ত বছরের পথ– আবু দাউদ। হাশরের ময়দান

www.nagorikpathagar.org

এবং সে ময়দানে আল্লাহর আরশ কত বিশাল হবে, এ হাদীসে তার সামান্য ইঙ্গিত মাত্র রয়েছে।

আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন, সূর্য ও চন্দ্রকে হাশরের দিন আলোহীন করে দেয়া হবে (বোখারী শরীফ # ১৫৮৪)। সে দিন সূর্যকে অতি নিকটে আনা হবে। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে মানুষ বিচারের অপেক্ষা করতে থাকবে। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কেয়ামতের দিন হাশর ময়দানে মানুষের ঘাম এ পরিমাণ বের হবে যে, জমিনের ভেতর সত্তর হাত পর্যন্ত তা শোষিত হয়েও উপরে যা থাকবে, তা কোন কোন ব্যক্তির কান পর্যন্ত পৌঁছবে (বোখারী শরীফ # ২৪৮২)। অন্য হাদীসে হযরত মিকদাদ (রা.)-এর বর্ণনায় মানুষ নিজ নিজ আমল অনুযায়ী ঘাম কারো টাখনু পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত আবার কারো মুখের ভেতর পর্যন্ত লাগামের ন্যায় ঢুকে যাবে (সহীহ মুসলিম # ৭০০০, তিরমিযী শরীফ # ২৩৬৩)।

এমন কঠিন সঙ্কটের দিনে আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া হাশরের ময়দানে থাকবে না। আল্লাহ তাঁর কিছু সংখ্যক প্রিয় বান্দাকে তাঁর আরশের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে যখন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না, তখন সাত প্রকারের মানুষকে তিনি তাঁর (আরশের) ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন ঃ (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক (২) ঐ যুবক যে আল্লাহ তা'আলার এবাদতে মশগুল থেকে বড় হয়েছে (৩) সে ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে রয়েছে (৪) সেই দুই ব্যক্তি যারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালবাসে ও পরস্পর মিলিত হয় এবং এ জন্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয় (৫) যে ব্যক্তিকে কোন অভিজাত এবং সুন্দরী রমণী (ব্যভিচারের জন্য) আহ্বান জানায় আর সে এর জবাবে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি (৬) যে ব্যক্তি এতটা গোপনে আল্লাহর রাস্তায় দান করে যে তার ডান হাত কি দান করেছে বাম হাত তা জানে না এবং (৭) সে ব্যক্তি যে একাকী বসে আল্লাহকে স্মরণ

www.nagorikpathagar.org

করে আর তার দুই চোখ থেকে (আল্লাহর ভয় ও ভালবাসায়) অশ্রুপাত হয় (সহীহ মুসলিম # ২২৫০, বোখারী শরীফ # ৪০০)।

এ হাদীসের বিশ্লেষণ এই যে–

(১) ন্যায়পরায়ণ শাসক ঃ একটি দেশের মোট জনগোষ্ঠী থেকে মাত্র একজনকে আল্লাহ কোন মেয়াদের জন্য সে দেশের শাসক নিযুক্ত করেন। সে শাসক ক্ষমতা লাভ করে নিজের বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে দেশে সুশাসন চালাতে পারে। আবার নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশের মানুষের উপর জুলুম-অত্যাচারও চালাতে পারে। আওফ ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ তোমাদের উত্তম ইমাম (শাসক) হয়েছে যাদেরকে তোমরা ভালবাস আর তারাও তোমাদেরকে ভালবাসে। তারা তোমাদের জন্য দোয়া করে এবং তোমরাও তাদের জন্য দোয়া কর। আর তোমাদের নিকৃষ্ট ইমাম (শাসক) হয়েছে, যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে এবং তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও আর তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দেয় (সহীহ মুসলিম # ৪৬৫৩)।

হযরত ওমর (রা.) ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত কঠোর কিন্তু সুশাসক ছিলেন। প্রজাদের সুখের জন্য তিনি নিজের সুখ বিসর্জন দিয়েছেন। নিজে কাঁধে বহন করে নিঃস্ব প্রজার গৃহে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছিয়ে দিতেন, এমনকি নিজের স্ত্রীকে ধাত্রী হিসেবে প্রসূতির গৃহে নিয়ে গিয়েছেন। অথচ মিসরের প্রতাপশালী শাসক ফেরাউন নিজে খোদায়ী দাবী করে নিজেকে রাজাধিরাজ মনে করত যা আল্লাহর নিকট অপছন্দের নাম। সে তার অবাধ্য প্রজাদেরকে কঠিন শাস্তি দিত। অবশেষে আল্লাহ তাকে নদীতে ডুবিয়ে মারেন।

হযরত মা'কাল (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যদি কোন বান্দাকে আল্লাহ শাসক নিযুক্ত করেন, আর সে তাদের অধিকার হরণ করে এবং খেয়ানতকারী হিসেবে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন (সহীহ মুসলিম # ২৭১ ও বোখারী শরীফ # ২৬৭৩)। অপরদিকে হযরত আবু সায়ীদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ সুবিচারক নেতা আল্লাহর নিকট পুনরুত্থান দিবসে সর্বাপেক্ষা

www.nagorikpathagar.org

প্রিয় এবং সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী হবে (তিরমিযী শরীফ # ১২৬৭)। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ ন্যায়পরায়ণ শাসক (হাশরের মাঠে) মহান আল্লাহর নিকট নূরের উচ্চ মিনারায় (উচ্চ মর্যাদায়) অবস্থান করবে, যা থাকবে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর ডান পাশে। যে সকল শাসক ন্যায় ইনসাফ ও সততার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করবে, নিজেদের পরিজনদের সাথে ইনসাফ করবে এবং তাদের উপর ন্যস্ত প্রত্যেকটি দায়িত্বের ক্ষেত্রে ন্যায়ের পরিচয় দেবে কেবল তারা এই মর্যাদার অধিকারী হবে (সহীহ মুসলিম # ৪৫৭৩)। তারা আল্লাহর অনুগ্রহে তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান পাবেন।

(২) ঐ যুবক যে আল্লাহ্ তা'আলার এবাদতে মশগুল থেকে বড় হয়েছে ঃ জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় যৌবনকাল। জীবনকে ভাল অথবা মন্দ পথে পরিচালিত করার এটাই সময়। এ সময় নাচ দেখা, গান শোনা, নাইট ক্লাবে যাওয়া, ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া, অসৎ বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আড্ডা দেয়া, মদ খাওয়া অথবা জুয়া খেলা ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হয়ে আল্লাহর নির্দেশিত পথ থেকে দূরে সরে যাওয়া খুব সহজ। এ সকল দুনিয়াদারি কাজ যৌবনে অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

আবার অন্যদিকে আল্লাহ যাদেরকে সুমতি দান করেন তারা পাপের পথ থেকে নিজকে দূরে রেখে আল্লাহর এবাদত-বন্দেগির মাধ্যমে জীবনের সময় অতিবাহিত করতে পারে। এ ধরনের কয়েকজন যুবকের কথা আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেন, তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিলাম (সূরা কাহফ # ১৮ : ১৩)। এই যুবকেরা আসহাবে কাহফ নামে খ্যাত।

এ ধরনের যুবকেরা বাল্যকাল থেকে ধর্ম-কর্মে আগ্রহী হয়ে উঠে। বয়স যত বাড়তে থাকে এরা ধর্মের স্বাদ তত বেশী উপভোগ করতে শুরু করে। ফলে যৌবনের শুরু থেকে তারা কোন পাপ কর্মে আকৃষ্ট হয় না। সৎপথে চলার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের উৎসাহ এবং শক্তি বৃদ্ধি করে

www.nagorikpathagar.org

দেন। এবাদতের জন্য ভবিষ্যতে অনেক সময় পাওয়া যাবে, তারা এমন মনে করে না। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ ফেতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ার পূর্বে তোমরা কল্যাণকর কাজে আত্মনিয়োগ কর। এ বিপর্যয় তোমাদেরকে অন্ধকার রাতের মত গ্রাস করবে। কোন ব্যক্তির ভোর হবে মুমিন অবস্থায় আর সন্ধ্যা হবে কাফের অবস্থায়। আর তার সন্ধ্যা হবে মুমিন অবস্থায় এবং সকাল হবে কাফের অবস্থায়। মানুষ দুনিয়ার সামান্যতম স্বার্থের বিনিময়ে নিজের ধর্মকে বিকিয়ে দেবে (সহীহ মুসলিম # ২২১)।

(৩) সে ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে রয়েছে ঃ মসজিদে যাওয়ার লোকেরা কয়েক ভাগে বিভক্ত। কেউ বছরের দুই ঈদে দুইবার ঈদের নামায পড়তে যায়, কেউ মাঝে মধ্যে দুই একবার যায়, কেউ শুক্রবার জুমার নামায পড়তে যায়, আবার কেউবা দিনে পাঁচবার জামাতে নামায পড়তে যায়। এরা পরহেযগার। তাদের জন্য ঘরে বা অন্য কোন স্থানে একাকী নামায পড়া অপেক্ষা মসজিদে জামাতে নামায পড়ার সওয়াব পঁচিশ গুন বেশী। তাছাড়া মসজিদে যাতায়াতের জন্য বহু গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ঘরে বা দোকানে নামায পড়া থেকে (মসজিদে) জামাতে নামায পড়া পঁচিশ গুন বেশী সওয়াবের কাজ। কারণ যখন কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করে একমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যে বের হয়ে মসজিদের দিকে চলতে থাকে, তখন তার প্রত্যেকটি পদক্ষেপে এক একটি গুনাহ মাফ হয়ে যায় এবং এক একটি মর্তবা বাড়ান হয়। তারপর সে যখন নামায পড়ে, ফেরেশতাগণ তার জন্য দোয়া করতে থাকে– হে আল্লাহ! তার গুনাহ মাফ কর, হে আল্লাহ! তার উপর রহমত নাযিল কর এবং সে ব্যক্তি নামাযের জন্য যত সময় অপেক্ষায় থাকে, তার জন্য ঐ সম্পূর্ণ সময় নামাযের মধ্যে গণ্য করা হয় (বোখারী শরীফ # ৩৯৩)।

এ সকল লোকেরা নামায শেষ করে নিজ গৃহে ফিরে অথবা কোন কাজে বের হয়ে গেলেও তাদের হৃদয় মসজিদে পড়ে থাকে। পরবর্তী

www.nagorikpathagar.org

নামাযে মসজিদে হাজির হওয়ার জন্য তাদের মন ছটফট করতে থাকে এবং যথাশীঘ্র তারা মসজিদে ফিরে যায়। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ বলেছেন ঃ যে আল্লাহ এবং আখেরাতকে বিশ্বাস করে, সে আল্লাহর মসজিদে যাতায়াত করে (তিরমিযী, হাদীসে রাসূল)।

এক হাদীস কুদসীতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যদি বান্দা আমার প্রতি এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তার প্রতি এক হাত অগ্রসর হই, যদি সে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তার প্রতি এক বাও অগ্রসর হয়। বান্দা আমার প্রতি হেঁটে অগ্রসর হলে আমি তার প্রতি দ্রুতবেগে ছুটে আসি (বোখারী শরীফ # ২৭০২)।

(৪) সে দুই ব্যক্তি যারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালবাসে ও পরস্পর মিলিত হয় এবং এ জন্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয় ঃ পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা জাগতিক স্বার্থে অথবা পরকালের স্বার্থে সৃষ্টি হতে পারে। পরকালের স্বার্থে যে ভালবাসার সৃষ্টি হয় তা আল্লাহকে ভালবেসে হয়ে থাকে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। এক মুসলমান অন্য মুসলমানের উপর অন্যায়-অত্যাচার করতে পারে না, সে তাকে শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত ও অত্যাচারিত অবস্থায় রক্ষা করার চেষ্টা না করে পারে না (বোখারী শরীফ # ১১৭৮)।

মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টির বিশেষ স্থান মসজিদ। আল্লাহকে ভালবেসে মুসলমান মসজিদে একত্রিত হয়। ধনী কি দরিদ্র, দেখতে কেমন, গায়ের রং কি, বাড়ী কোথায় ইত্যাদির বিবেচনা না করে উভয়ে আল্লাহকে ভালবেসে মসজিদে আসে, এ বিবেচনায় একে অপরকে ভালবাসে। তারা বিপদে-আপদে পরস্পরকে সাহায্য করে, পরস্পরের ভুল ক্ষমা করে, একে অপরের জন্য দূর থেকে দোয়া করে, সাক্ষাতে হাসিমুখে সালাম করে, পরস্পর সত্য পছন্দ করে এবং অসত্য ত্যাগ করে, নিজের জন্য যা পছন্দ করে অপর ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করে।

www.nagorikpathagar.org

আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ বলবেন, সে সকল লোকেরা কোথায় যারা আমার মহত্ত্বের ও অনুসরণের কারণে পরস্পরকে ভালবেসেছে? আজ আমি তাদেরকে আমার ছায়ায় আশ্রয় দেব। আমার ছায়া ছাড়া আজ আর অন্য কোন ছায়া নেই (সহীহ্ মুসলিম # ৬৩৬৫)। সে দিন সূর্য মাথার অনেক নিকটে থেকে তাপ দিতে থাকবে। সে দিন আল্লাহর ছায়া পাওয়ার গুরুত্ব কত বেশী একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যাবে।

আল্লাহর ছায়া যারা পাবেন তারা যে সকল গুণাবলীর অধিকারী, যাদের মধ্যে সে সকল গুণগুলো নেই এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে যারা ব্যর্থ তাদেরকে আল্লাহভীরুরা ভাল না বেসে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ বন্ধুবর্গ সেদিন (কেয়ামতের দিন) একে অপরের শত্রু হবে, তবে আল্লাহ্ভীরুরা নয় (সূরা যুখরুফ # ৪৩ : ৬৭)। আল্লাহ্ আরোও বলেন, যারা আমাকে স্মরণ রাখবে আমিও তাদেরকে স্মরণ রাখি (সূরা বাকারা # ২ : ১৫২)।

(৫) যে ব্যক্তিকে কোন অভিজাত এবং সুন্দরী রমণী ব্যভিচারের জন্য আহ্বান জানায় আর সে এর জবাবে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি ঃ পৃথিবী অনেক আকর্ষণীয় জিনিসে ভরপুর। এদের মধ্যে যুবক-যুবতীর অনৈতিক কার্যকলাপ একটি। যৌবনে পুরুষ ও নারী একে অপরের সাথে মিলিত হবার জন্য উন্মাদ হয়ে পড়ে। এ সময় কোন অভিজাত ও সুন্দরী রমণীর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করার মত ঈমানের জোর খুব কম যুবকের মধ্যে থাকে। কিন্তু যার অন্তরে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও ভয় থাকে সে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে না। পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মিসরে তৎকালীন সময়ে দেশ শাসনের কর্মকর্তা তথা মন্ত্রীকে আজিজ বলা হত। সে সময়ের আজিজের স্ত্রীর নাম ছিল জুলেখা। তাঁরা ইউসুফ (আ.)-কে খরিদ করে নিজেদের সংসারে রেখেছেন। ইউসুফ (আ.) যৌবনে পৌঁছলে জুলেখা তাঁর প্রেমে পড়ে যান। ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে সূরা ইউসুফে আছে ঃ যখন সে পূর্ণ

www.nagorikpathagar.org

যৌবনে পৌঁছে গেল তখন তাকে প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করলাম (১২ ঃ ২২)। নিশ্চয় মহিলা তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল এবং সেও মহিলার প্রতি আসক্ত হত (১২ ঃ ২৪)। আর সে যে মহিলার ঘরে ছিল, সে মহিলা তাকে ফুসলাতে লাগল এবং দরজাসমূহ বন্ধ করে দিল এবং বলল, আমার দিকে চলে আস। সে বলল, আল্লাহর পানাহ চাই, নিশ্চয় তিনি আমার রব। তিনি আমাকে উত্তম বাসস্থান দিয়েছেন। নিশ্চয় জালেমরা সফল হয় না (১২ ঃ ২৩)। ঘটনা জুলেখার স্বামী, কিছু মহিলা ও অন্যান্যদের মধ্যে জানাজানি হয়ে যায়। ঐ সকল মহিলারা ইউসুফের প্রতি তাকিয়ে বিমোহিত হয়ে পড়ে। জুলেখা বলল, আমি তাকে যে আদেশ দেই, সে যদি তা না করে তবে তাকে কারারুদ্ধ করা হবে এবং লাঞ্ছিত হবে (১২ ঃ ৩২)। ইউসুফ বলল, হে আমার রব, তারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করে তা অপেক্ষা আমি কারাগার পছন্দ করি। যদি আপনি তাদের চক্রান্ত আমার উপর থেকে প্রতিহত না করেন তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব (১২ ঃ ৩৩)। তার রব তার দোয়া কবুল করলেন এবং ঐ সমস্ত মেয়েলোকদের কৌশল তার থেকে প্রতিহত করলেন। নিশ্চয় তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন (১২ ঃ ৩৪)।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, জুলেখার স্বামী আজিজ মারা যান। ইউসুফ (আ.) রাজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরে রাজা ইউসুফ (আ.)-এর সাথে জুলেখার বিবাহ দেন।

(৬) যে ব্যক্তি এতটা গোপনে আল্লাহর রাস্তায় দান করে যে তার ডান হাত কি দান করেছে বাম হাত তা জানে না ঃ দানের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দুইটি হতে পারে। কেউ দান করে আল্লাহর মহব্বতে যাতে পরকালে এর সুফল পেতে পারে। অন্যদিকে কেউ দান করে দাতা সেজে সমাজে নাম করে দুনিয়ার কোন স্বার্থ হাসিলের জন্য যাকে রিয়া বলা হয়ে থাকে। রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা কবীরা গুনাহ। আল্লাহ বলেন ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাত বরবাদ করো না সে ব্যক্তির মত যে নিজের ধন-

www.nagorikpathagar.org

সম্পদ লোক দেখানোর **উদ্দেশ্যে** ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না (সূরা বাকারা # ২ : ২৬৪)। অন্য আয়াতে আছে ঃ আর সে সকল লোককেও আল্লাহ্ পছন্দ করেন না যারা নিজেদের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে। প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না (সূরা নিসা # ৪ : ৩৮)।

কিন্তু যারা পরকালের কল্যাণের আশায় দান করে তারা তা গোপনে করতে ভালবাসে। তবে দানের মধ্যে প্রদর্শনেচ্ছা না থাকলে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হলে প্রকাশ্যে বা গোপনে করার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ থাকে না। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, যারা নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে তারা এর সওয়াব তাদের রবের নিকট থেকে পাবে, তাদের কোন আশঙ্কা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না (সূরা বাকারা # ২ : ২৭৪)।

অন্যের নিকট সাহায্যের জন্য হাত পাতা সম্মানের কাজ নয়। তাই গোপনে দান করার তাৎপর্য এই যে, দান গ্রহীতা জানে সে এবং দাতা ছাড়া অন্য কেউ তা জানতে পারল না, তাতে সে কারো নিকট হেয় প্রতিপন্ন হলো না। আল্লাহ্ বলেন ঃ যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর তবে তা অত্যন্ত ভাল কাজ, আর যদি গোপনভাবে গরীব-দুস্থকে দান কর, তবে তা অধিক উত্তম এবং দান-খয়রাত তোমাদের গুনাহের বিলুপ্তি সাধন করবে। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সমুদয় কৃতকর্মের খবর রাখেন (সূরা বাকারা # ২ : ২৭১)।

(৭) সে ব্যক্তি যে একাকী বসে আল্লাহকে স্মরণ করে আর তার দুই চোখ থেকে অশ্রুপাত হয় ঃ কান্না এবং হাসি নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকে। অন্তরের সাথে এদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। দুঃখ-যাতনায় মানুষ কান্না করে, চোখ থেকে অশ্রু ঝরে। এটা ছাড়া চোখে অশ্রু আসে ভয়ে, ভালবাসায়, অতি খুশীতে, অন্যের অত্যাচারে অন্যের দয়া লাভে বা আত্ম-তৃপ্তিতে। আবার মোনাফেকের চোখে অশ্রু দেখা যায় অন্যকে ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু মুমিনের চোখ থেকে অশ্রু ঝরে আল্লাহর ভয়ে ও আশায়। পাপের কথা

www.nagorikpathagar.org

স্মরণ করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়ার সময় যে অশ্রু বিসর্জন দেয়া হয় তা অতি মূল্যবান– আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ যে বিশ্বাসী বান্দার নয়নযুগল থেকে মক্ষিকার মস্তিষ্ক পরিমাণও অশ্রু আল্লাহর ভয়ে বহির্গত হয় এবং তাতে তার মুখমণ্ডলের উজ্জ্বলতা হ্রাস পায়, আল্লাহ্ তার জন্য দোযখ হারাম করবেন (ইবনে মাজাহ্ ও হাদীসে রাসূল)। এ সকল বিশ্বাসী বান্দা কোলাহল হতে দূরে থাকতে ভালবাসে। তারা একাকী বসে আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে মনের আকুতি স্বীয় প্রভুকে জানাতে পছন্দ করে।

উল্লিখিত সাত শ্রেণীর বান্দাগণ ছাড়া আরো কিছু প্রিয় বান্দা আল্লাহর আরশের ছায়া পাওয়ার কথা অন্যান্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা হলেন, আল্লাহর পথে জিহাদকারী, যারা অসুবিধায় থাকা দেনাদারকে সময় দেয় অথবা ঋণ মাফ করে দেয়, যারা সে সকল লোককে সাহায্য করে যারা দেনার ভারে জর্জরিত, সৎ ব্যবসায়ী, যারা এতীমের সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং আরোও অনেকে (ফাতহুল বারী)।

www.nagorikpathagar.org

সদকায়ে জারিয়া

বিনিময় ছাড়া একজন অপরজনকে কিছু দিয়ে এর মালিক বানিয়ে দেয়ার নাম সদকা বা দান। কাকেও দান করে তা ফেরত নেয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি দানকৃত বস্তু ফেরত নেয় তার অবস্থা ঐ কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে আবার তা ভক্ষণ করে (বোখারী শরীফ # ১২৩৯)। ইসলামে দান দুই প্রকার- বাধ্যতামূলক এবং ঐচ্ছিক। সম্পদের যাকাত ও রমাযানের রোযার ফিতরা বাধ্যতামূলক দান। এটা ছাড়া সন্তুষ্ট চিত্তে যা অপরকে দেয়া হয় তা ঐচ্ছিক দান।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা ধনের থলি গরীব দুঃখী থেকে বেঁধে রেখ না, নতুবা আল্লাহ তা'আলাও স্বীয় ধনভাণ্ডার তোমাদের জন্য বন্ধ করে দেবেন (বোখারী শরীফ # ৭৫৪)। তিনি আরও বলেছেন, মানবের জাগতিক জীবনের প্রতিটি দিনে দু'জন ফেরেশতা ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হয়ে একজন দোয়া করেন, হে আল্লাহ! তোমার রাস্তায় দানকারীকে উত্তম বিনিময় দান কর। অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণ ব্যক্তির জন্য ধ্বংস নির্ধারিত কর (বোখারী শরীফ # ৭৫৯)। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের মালিক যারা হয়ে যায়, তাদের অন্তরে কৃপণতা স্থান করে নেয়, যা পরকালে তাদের ক্ষতির কারণ হতে পারে।

দানে ধন কমে না। দান বান্দার প্রতি আল্লাহর রাগকে প্রশমিত করে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যারা দান করে আল্লাহ ঐ দানের সওয়াব সত্তর গুন এবং কখনো সাতশত গুন পর্যন্ত বৃদ্ধি করে থাকেন। সূরা বাকারায় (২) আল্লাহ বলেন, (১৯৫) আর ব্যয় কর আল্লাহর পথে এবং নিজদেরকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন। (২৪৫) এমন কে আছে যে আল্লাহকে ঋণ দিবে- উত্তম ঋণ; অতঃপর আল্লাহ তার জন্য এটাকে বহুগুনে বৃদ্ধি করে দেবেন। আর আল্লাহ কমান এবং বাড়ান। আর তোমরা তার নিকট ফিরে যাবে। (২৬১) যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয়

www.nagorikpathagar.org

করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশত দানা থাকে। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ।

যতদিন শক্তি-সামর্থ থাকে ততদিন অনেকে ধর্মীয় কাজে থাকে উদাসীন। অথচ সে সময়ের এবাদত-বন্দেগি, দান-খয়রাত বৃদ্ধ বয়সের ধর্ম-কর্ম অপেক্ষা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। শরীর নিস্তেজ হতে শুরু করলে মনে মরণ ভীতি আসে এবং ধর্ম-কর্মের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। তাই দান-খয়রাতেও আগ্রহী হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, দান-খয়রাতের সওয়াব বেশী এমন অবস্থায়, যখন তুমি সুস্থ-সবল আছ, ধনের প্রতি তোমার আকর্ষণ বিদ্যমান আছে, দরিদ্র-অভাবগ্রস্ত হওয়ার ভয়-ভীতিও আছে এবং তুমি ধনাঢ্য থাকার প্রতি লালায়িত আছ (বোখারী শরীফ # ৭৪৬)।

আল্লাহ পবিত্র। দানের বস্তু অবশ্য পবিত্র ও হালাল এবং দানের উদ্দেশ্য সৎ হতে হবে। হালাল মাল ছাড়া কোন দান আল্লাহ গ্রহণ করেন না। অসৎ উপায়ে অর্জিত ধন থেকে দান করলে তা দান হিসেবে গণ্য হবে না। আর যারা মানুষকে দেখাবার জন্য বা যশ ও সুনাম অর্জনের জন্য সদকা দেয় তারা এটা থেকে সওয়াব পাবে না। আবার যারা ঈমান আনে না, অথচ দান-খয়রাত করে, তারা এর বিনিময় এ পৃথিবীতে পাবে– পরকালে এরা কোন ফল লাভ করবে না। কারণ যারা এক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে না তারা জান্নাতে যাবে না।

শুধু ধন ব্যয় দান নয়; বরং সদুপদেশ, ধর্মীয় শিক্ষা, নৈতিক চরিত্র গঠনকারী কোন বাক্য, আধ্যাত্মিক উন্নয়নে সহায়তা, যে কোন সৎকাজ ইত্যাদি দান হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। আল্লাহ বলেন, (২৬২) যারা স্বীয় ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, আর ব্যয় করার পর কৃপাও প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না, তারা তাদের বিনিময় পাবে তাদের প্রতিপালকের নিকটে, আর তাদের কোন আশংকাও হবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (২৬৩) সন্তুষ্টিজনক কথা বলে দেয়া এবং ক্ষমা করা ঐ দান অপেক্ষা উত্তম যার পরে কষ্ট দেয়া হয়। আল্লাহ অভাবহীন, ধৈর্যশীল। (২৬৪) হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে অথবা কষ্ট দিয়ে নিজেদের দানসমূহকে বরবাদ করো না ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে নিজের

www.nagorikpathagar.org

ধন দান করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না (সূরা বাকারা # ২ : ২৬২-২৬৪)।

ঐচ্ছিক দানকে দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে– যেমন এককালীন সওয়াব পাওয়ার দান এবং দীর্ঘকাল ধরে সওয়াব পেতে থাকার দান বা সদকা। অভাবীকে অর্থ সাহায্য দেয়া, বস্ত্রহীনকে একটি বস্ত্র দেয়া ইত্যাদি এককালীন সওয়াব পাওয়ার দান। মসজিদ নির্মাণ করা, সেতু নির্মাণ করা, রাস্তা বানিয়ে দেয়া, কোন ধর্ম পুস্তক লিখে যাওয়া ইত্যাদি থেকে মানুষ দীর্ঘকাল যাবত উপকার পেতে থাকবে। এ ধরনের সদকা বা দান যতদিন জারি অর্থাৎ প্রচলিত থাকবে ততদিন সদকাকারী এদের সওয়াব পেতে থাকবে। এরূপ সদকাকে সদকায়ে জারিয়া বলে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন মানুষ মরে যায় তখন তিনটি জিনিস ব্যতীত তার নিকট থেকে সমস্ত কাজ ছিন্ন হয়ে যায়। সে তিনটি ব্যতীত কোন আমল তার কাছে পৌঁছায় না। (১) এমন কোন সদকার কাজ যা সর্বদা প্রচলিত থাকে (২) এমন কোন ইলম বা জ্ঞান যা থেকে উপকৃত হওয়া যায় অথবা (৩) নেক সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে (সহীহ মুসলিম # ৪০৭৬)। আরেকটি হাদীসে আছে ঃ মুমিনের মৃত্যুর পরে তার যে সকল সৎকার্য তার কাছে পৌঁছবে, তা সে বিদ্যা যা অর্জন করে সে প্রচার করেছে, ঐ ধার্মিক সন্তান যাকে সে রেখে গেছে, এমন ধর্মীয় পুস্তক যা সে ত্যাজ্য সম্পত্তি হিসেবে রেখে গেছে, এমন মসজিদ যা সে নির্মাণ করেছে, পথিকের জন্য এমন গৃহ যা সে প্রস্তুত করেছে, এমন খাল যাতে সে পানি প্রবাহিত করে দিয়েছে, এমন সদকা যা নিজ সম্পত্তি থেকে জীবিতাবস্থায় সুস্থ সময়ে দান করেছে। এ সকল কার্যের সওয়াব তার মৃত্যুর পরেও তার নিকট পৌঁছবে (ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)।

সদকায়ে জারিয়ার উদ্দেশ্যে কোন সম্পদ ওয়াকফ করতে হলে তা এমনভাবে করতে হবে যাতে কেউ এতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করতে না পারে। এক সময় হযরত ওমর (রা.) খায়বর এলাকায় কিছু জমির মালিক হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট গিয়ে আরজ করলেন, আমি

www.nagorikpathagar.org

খায়বর এলাকায় এমন একটি উত্তম জমি পেয়েছি, যা অপেক্ষা উত্তম জমি আমার নেই। আমি এটা সদকা করতে চাই। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, যদি ইচ্ছা কর তাহলে মূল জমিটি আটকিয়ে রেখে এর উৎপন্ন ফসল সদকা করে দাও। পরে তিনি আরও বললেন, হে ওমর! এমনভাবে তা সদকা কর যেন, তা বিক্রয় না করা যায়, দান না করা যায় এবং কেউ উত্তরাধিকার সূত্রেও যেন তা না পায়। বরং এর ফল-ফসল ব্যয় করা যেতে পারে (বোখারী শরীফ # ১২৭৫; সহীহ মুসলিম # ৪০৭৭)।

ওয়াকফকারী নিজে এর রক্ষণাবেক্ষণকারী থাকতে পারবে অথবা অন্য কাকেও দায়িত্ব দিতে পারবে। তার নির্দেশানুসারে পরবর্তীকালের রক্ষণাবেক্ষণকারী নিয়োজিত হবে।

নগদ টাকা কোন সুদমুক্ত ও হালাল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করে অথবা ইসলামী বিধি-বিধান মোতাবেক পরিচালিত সুদবিহীন ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসাব খুলে অর্জিত মুনাফার টাকা সদকা হিসেবে ব্যয় করা যায়। যতদিন পর্যন্ত মুনাফা আসতে থাকবে এবং সে আয় সদকা বাবদ ব্যয় হতে থাকবে ততদিন টাকার মালিক তার মৃত্যুর পরেও এর সওয়াব পেতে থাকবে। মৃত পিতা-মাতার জন্য সন্তান অথবা মৃত সন্তানের জন্য পিতা-মাতা সদকায়ে জারিয়া চালু রাখলে মৃত ব্যক্তি সে সওয়াব পেতে থাকবে। এর ব্যবস্থাপনাও ওয়াকফের ন্যায় পরিচালিত হতে পারে।

মৃত্যুর পরও যে সকল কার্যের সওয়াব তার আমলনামায় পৌঁছে তাদের মধ্যে তার জানাযা পড়া, তার গুণের প্রশংসা করা, তার জন্য দোয়া করা, তার ঋণ শোধ করে দেয়া, তার বদলা হজ্জ করা, তাঁর সৎ কাজের ইচ্ছা পূর্ণ করা ইত্যাদি। একবার এক রমণী নবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করে, আমার মাতা হজ্জ করার মানত করেছিলেন; কিন্তু তিনি হজ্জ আদায় করতে পারেননি, তার মৃত্যু ঘটেছে, এখন আমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি কি? নবী (সা.) বলেছেন, হ্যাঁ, তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় কর। তোমার মাতার উপর কারো ঋণ থাকলে তা তুমি কি আদায় করতে না (বোখারী শরীফ # ৯৪৫)?

www.nagorikpathagar.org

হযরত আবু উসায়দ বদরী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে বসেছিলাম, ইতোমধ্যে এক আনসার এসে প্রশ্ন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পিতা-মাতার ইন্তেকালের পরও তাদের কোন হক আমার যিম্মায় আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাদের জন্য দোয়া ও ইস্তেগফার করা, তাঁরা কারো সাথে কোন অঙ্গীকার করে থাকলে তা পূরণ করা, তাদের বন্ধুবর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁদের এমন আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখা, যাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক শুধু তাদের মাধ্যমে। পিতা-মাতার এ সকল হক তাঁদের মৃত্যুর পরও তোমার যিম্মায় অবশিষ্ট রয়েছে (তফসীর মা'আরেফুল কোরআন)। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেও পিতা-মাতার জন্য দোয়া করতে শিখিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ বল, হে পালনকর্তা, তাঁদের উভয়ের প্রতি রহমত কর, যেমন তাঁরা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন (সূরা বনী ইসরাইল # ১৭ : ২৪)।

এখানে মনে রাখা দরকার যে, মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া ভাল প্রতিষ্ঠানের সওয়াব যেমন তার আমলনামায় যোগ হবে তেমনি কোন খারাপ প্রতিষ্ঠান তথা মদের ব্যবসা, সুদের কারবার ইত্যাদির গুনাহ্ও তার আমলনামায় যোগ হবে।

---

www.nagorikpathagar.org

প্রতিবেশীর হক

যে যে স্থানে বসবাস করে তার আশেপাশে যারা বাস করে তারা তার প্রতিবেশী। অর্থাৎ এক এলাকায় বসবাসকারীগণ একে অপরের প্রতিবেশী। প্রতিবেশী তিন প্রকারের। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ কোন কোন প্রতিবেশী রয়েছে যাদের হক মাত্র একটি, কোন কোন প্রতিবেশী রয়েছে যাদের হক দু'টি এবং কোন কোন প্রতিবেশী রয়েছে যাদের হক তিনটি। এক হক বিশিষ্ট প্রতিবেশী হলো, এমন অমুসলমান যাদের সাথে কোন আত্মীয়তা নেই। দু'হক বিশিষ্ট প্রতিবেশী হলো– তারা, যারা প্রতিবেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানও বটে। আর তিন হক বিশিষ্ট প্রতিবেশী হলো– তারা, যারা প্রতিবেশী ও মুসলমান এবং সেই সঙ্গে আত্মীয়ও বটে (ইবনে কাসীর, তফসীর মা'আরেফুল কোরআন, সূরা নিসার তফসীর)।

উপরের হাদীসের ব্যাখ্যা এই যে, এক হক বিশিষ্ট অমুসলিম প্রতিবেশী শুধু প্রতিবেশী হিসেবে কিছু হক পাবে। দু'হক বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রতিবেশী হওয়ার হক পাওয়ার সাথে মুসলমান হিসেবেও হক পাবে। আর তিন হক বিশিষ্ট প্রতিবেশী একাধারে প্রতিবেশী, মুসলমান ও আত্মীয়তার হক পাবে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলেন ঃ তোমরা আল্লাহ্র এবাদত করবে ও কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করবে না; এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করেন না (সূরা নিসা # ৪ : ৩৬)।

একজন মুসলমানের নিজ পরিবারবর্গের প্রতি যেমন দায়িত্ব আছে, তার প্রতিবেশীর প্রতিও তেমন দায়িত্ব আছে। প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে আছে ঃ তার সাথে সদ্ব্যবহার করা, তাকে সম্মান করা, তার

www.nagorikpathagar.org

স্বার্থ রক্ষা করা, দুঃসময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া, তার সুখ-দুঃখের ভাগী হওয়া, তার দোষ তালাশ না করা, কোন অন্যায় করে ফেললে ক্ষমা করে দেয়া, গরীব প্রতিবেশীকে আর্থিক সাহায্য দেয়া, পীড়িতকে দেখতে যাওয়া ও সেবা করা, মারা গেলে দাফন করা ও পরিবারকে সান্ত্বনা দেয়া, কোন ভুল করতে থাকলে সংশোধনের পরামর্শ দেয়া ইত্যাদি। এগুলো প্রতিবেশীর হক। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারের জন্য সর্বদা জিব্রাইল ফেরেশতা (আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে) আমার উপর চাপ দিয়ে এসেছেন, এমনকি আমার ধারণা হল, প্রতিবেশীকে ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়া হবে (বোখারী শরীফ # ২৩০৬, সহীহ্ মুসলিম # ৬৪৯৭ এবং ইবনে মাজাহ # ৩৬৭৩)।

সকল প্রতিবেশী ভাল হওয়ার কোন নিশ্চয়তা নেই। ভাল ও মন্দ, এই উভয় প্রকারের প্রতিবেশী থাকতে পারে। আবু শোরায়হ (রা.) বর্ণনা করেছেন, একদা হযরত নবী (সা.) বলে উঠলেন, আল্লাহর কসম সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম সে মুমিন নয়। হযরত (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন ব্যক্তি ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বললেন, যে ব্যক্তির প্রতিবেশী তার দ্বারা অশান্তির ভয় থেকে নিরাপদ নয় (বোখারী শরীফ # ২৩০৮)। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, বাসস্থানের নিকটস্থ মন্দ প্রতিবেশী থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কেননা, জঙ্গলের প্রতিবেশী (পশু-পাখী) তো তোমার নিকট থেকে প্রস্থান করবে (নাসাঈ শরীফ # ৫৫০৩)।

মন্দ প্রতিবেশীকে ভাল করার জন্য ভদ্রভাবে চেষ্টা করতে হবে। সে চেষ্টা ব্যর্থ হলে বক্র পথ অবলম্বন করতে হবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-এর কাছে এসে তার প্রতিবেশী সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করল। তিনি বললেন, তুমি যাও ধৈর্য ধর। এরপর সে ব্যক্তি আরো দু'তিনবার এসে অভিযোগ করলে নবী (সা.) তাকে বললেন ঃ তুমি যাও এবং তোমার মালপত্র বের করে পথে রাখ। সে ব্যক্তি তার

১৯—

www.nagorikpathagar.org

মালপত্র বের করে পথে রাখলে, লোকেরা তার কাছে এর কারণ জানতে চায়। তখন সে তাদেরকে তার প্রতিবেশীর অবস্থা বলে দেয়। তখন লোকেরা সে ব্যক্তির কাছে গিয়ে তাকে গালমন্দ করতে থাকে। এতে সে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর কাছে গিয়ে বলল, তুমি তোমার ঘরে ফিরে চলো। এখন থেকে আমি তোমার সাথে আর কোন মন্দ ব্যবহার করবো না (আবু দাউদ শরীফ # ৫০৬৩)।

প্রতিবেশীদের মধ্যে কেউ নিকটের প্রতিবেশী আবার কেউ দূরের প্রতিবেশী। নিজের গৃহ থেকে কত দূরের গৃহ পর্যন্ত প্রতিবেশী গণ্য করা হয় সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) শিক্ষা দিয়েছেন যে, প্রতিবেশী শুধু পরবর্তী দরজা নয়, তবে দূরে পরবর্তী সাত দরজা পর্যন্ত অর্থাৎ একটি পাড়া। (islamawareness.net) বাস্তবে একটি পাড়ার সকলের সাথে সমান সম্পর্ক থাকে না। যারা অতি নিকটের প্রতিবেশী ঘনিষ্ঠতা তাদের সাথে বেশী থাকে। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দুইজন প্রতিবেশী আছে, আমি কার সাথে প্রথমে ভাল ব্যবহার করব? তিনি বললেন ঃ যার দরজা তোমার নিকটবর্তী হবে, তার প্রতি ভাল ব্যবহার করবে (আবু দাউদ শরীফ # ৫০৬৫)।

প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্কের পরিচয় এই যে, কোন অনুষ্ঠানে দাওয়াত করে খাওয়ানো, কোন খুশীর বিষয় হলে তাদের ঘরে মিষ্টি পাঠানো, বাজার থেকে নতুন কোন ফল আনলে তা থেকে কিছু খাওয়ানো, এমনকি কোন খাবার রান্না করলে তা থেকে কিছু দেয়া। আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার প্রাণ প্রিয় বন্ধু নবী (সা.) আমাকে উপদেশ দিয়েছেন যে, যখন তুমি ঝোল পাকাবে তখন তাতে কিছু অতিরিক্ত পানি দেবে। তারপর তোমার প্রতিবেশী পরিবারগুলোর দিকে দেখবে এবং এখান থেকে প্রয়োজন মাফিক ও সামর্থ অনুযায়ী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাদের কাছে পাঠাবে (সহীহ্ মুসলিম # ৬৫০১)।

প্রতিবেশীরা সকলে মুসলমান হতে হবে এমন নয়। এদের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইহুদী বা অন্য যে কোন ধর্মাবলম্বী থাকতে পারে। কিন্তু

www.nagorikpathagar.org

সকল প্রতিবেশীর হক একই রকমের। পবিত্র কোরআনে উল্লিখিত আছে, ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করে না তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন (সূরা মুমতাহিনা # ৬০ : ৮)।

অনেকের ধারণা কোন বিধর্মীকে দান-খয়রাত করলে সওয়াব পাওয়া যাবে না। এটা ভুল ধারণা। তাদেরকে মানুষ হিসেবে গণ্য করতে হবে। অভাবী হলে যাকাত দিতেও বাধা নেই। এতে মুসলমানদের প্রতি তাদের ভাল ধারণা জন্মাবে এবং কালক্রমে তারা মুসলমান হয়ে যেতে পারে। নবী (সা.) নিজে তাদেরকে দান করতেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, সদকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের (বিধর্মীদের) চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য, এটা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (সূরা তওবা # ৯ : ৬০)। তবে রোযার ফিতরা তাদেরকে দেয়া যায় না। কারণ মুসলমানের ঈদে তারা আনন্দ করে না। অথচ গরীব মুসলমানকে দিলে সে ঈদের আনন্দে অন্যদের সাথে শরীক হবে। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সা.) মুসলমান নারীদেরকে বলেছেন, প্রতিবেশীদের সৌহার্দ সূত্রে আদান-প্রদানে কুণ্ঠিত হয়ো না। অতি সামান্য বস্তু যেমন, বকরির পায়াও দেয়ার সুযোগ হলে তাকে সামান্য ভেবে উপেক্ষা করবে না (বোখারী শরীফ # ১২২০)।

প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য ইসলাম তাগিদ দিয়ে আসলেও অনেকে এর প্রতি গুরুত্ব দেয় না। তারা মনে করে জান্নাত লাভের জন্য এবাদত বন্দেগি অর্থাৎ নামায, রোযা যথেষ্ট। পাড়া-প্রতিবেশীর সুখ-দুঃখ দেখা না দেখায় এমন কিছু আসে যায় না। তাদের এমন ধারণা ঠিক নয়। একদা নবী (সা.)-কে এক মহিলা সম্পর্কে বলা হলো, সে তার নিয়মিত ফরয এবাদত ছাড়াও রাত জেগে এবাদত করে, দিনে রোযা রাখে এবং দান-খয়রাত করে। কিন্তু প্রতিবেশীদের অভিযোগ সে তাদের সাথে খারাপ-ব্যবহার করে। নবী (সা.) বললেন, সে

www.nagorikpathagar.org

জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আবার অপর এক মহিলা সম্পর্কে বলা হল, যে কেবলমাত্র তার জন্য বাধ্যতামূলক এবাদত করে এবং দান-খয়রাত বেশী কিছু করে না। কিন্তু প্রতিবেশীরা তার থেকে নিরাপদ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তির অত্যাচার থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না (সহীহ মুসলিম # ৮০)।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে ঃ আর যে অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (সূরা আশশূরা # ৪২ : ৪১-৪২)।

এক পাড়ায় বসবাসকারীদের একের সাথে অপরের প্রায় দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে থাকে। নিকট প্রতিবেশীর সাথে প্রতিদিন একাধিকবার দেখা হতে পারে। এই অবস্থায় তার হক মুসলমান হলে আসসালামু আলাইকুম বলে সালাম দেয়া অথবা অন্যজন সালাম দিলে ওয়া আলাইকুমুস সালাম বলে জবাব দেয়া। এছাড়া প্রতিবেশী যে ধর্মাবলম্বী হোক না কেন পরস্পর কুশল বিনিময় করা, একে অপরকে জিজ্ঞাসা করা আপনি কেমন আছেন, পরিবারের অন্যদের সম্পর্কে জানা থাকলে তাদের সম্পর্কেও খোঁজ খবর নেয়া ইত্যাদি আলাপ করা। সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে গভীর ভালবাসার সৃষ্টি হয় যার ফলে সর্বসময়ে পরস্পরের সাহায্য পাওয়া যায়।

প্রতিবেশীদের মধ্যে ধন-সম্পদের বৈষম্য থাকা স্বাভাবিক। কেউ ধনী, ভোগ বিলাসে জীবন যাপন করে, পরিবার পরিজনকে দামি পোশাক পরায়, বিলাস বহুল বাড়িতে থাকে, দামি খাবার খায়। কিন্তু হয়তো পাশের বাড়ির লোকটি অভাবী, উপার্জন সামান্য, অল্প দামের পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করে, অতি সাধারণ খাবার খায়। দুই পরিবারের সন্তানদের মধ্যে আলাপ আলোচনা হলে কে কি খেয়েছে সে প্রসঙ্গ উঠে আসে। ধনীর

www.nagorikpathagar.org

সন্তানদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে এবং খাদ্যের তারতম্য বুঝে গরীব পরিবারের সন্তানেরা পিতার অসহায়ত্বের কথা ভেবে মনে কষ্ট পায়। এছাড়াও এমন প্রতিবেশী থাকতে পারে যার পরিবারে দু'বেলা পেট ভরে খাওয়া জুটে না কিন্তু মুখ খুলে এ অবস্থা অন্যকে জানায় না। এ বৈষম্য কমিয়ে আনার জন্যে ইসলামে যাকাত বাধ্যতামূলক করেছে। তারপরেও গরীব প্রতিবেশীকে সাহায্য করা একান্ত কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, প্রতিবেশীকে ক্ষুধার্ত রেখে যে পেট ভরে খায় সে (পূর্ণ) মুমিন নয়।

যারা সুপ্রতিবেশী নয় তারা একে অপরের খোঁজ খবর রাখে না। পাশের বাড়ির কেউ খুব অসুস্থ। তার জন্য ডাক্তার ডেকে আনার বা তাকে হাসপাতালে নেয়ার মত কেউ সে পরিবারে নেই। সে বাড়ি থেকে কান্নার আওয়াজ শুনা গেছে অথচ পাশের প্রতিবেশীর বাড়িতে আমোদ উল্লাস চলছে। এরা সত্যিকারের খারাপ প্রতিবেশী। পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকলে পাশের বাড়ির অসুস্থ লোকটির চিকিৎসার ব্যবস্থা না করে থাকতে পারত না। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন মহান আল্লাহ (কোন এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে) বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি রোগাক্রান্ত হয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমার সেবা করোনি। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তো বিশ্বজগতের প্রভু, আমি কেমন করে তোমার সেবা করতে পারি? আল্লাহ বলবেন, তোমার কি মনে নেই যে, আমার অমুক বান্দা রোগাক্রান্ত হয়েছিল। তখন তুমি তার খোঁজ-খবর নেওনি। যদি তুমি তার সেবা করতে, তাহলে আমাকে সেখানে পেতে (সহীহ মুসলিম # ৬৩৭১)। এ ধরনের পরিস্থিতি সাধারণত শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে হয়ে থাকে।

গ্রামাঞ্চলের প্রতিবেশীদের অবস্থা অনেকটা ভিন্ন ধরনের। তারা একে অপরের খোঁজ-খবর নেয়। কেউ আর্থিক সঙ্কটে পড়লে অর্থ সাহায্য করে। দান করতে না পারলে অন্তত টাকা-কড়ি হাওলাত দেয়। বাইরের কোন শত্রু সমাজের একজনকে আক্রমণ করলে অন্যেরা সকলে তা প্রতিহত করে। এমনকি কোন বাড়িতে ডাকাত পড়লে সে বাড়ির লোকদের চিৎকারে চারদিক থেকে প্রতিবেশীরা ছুটে আসে। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে ঝগড়া লাগলে সকলে তা থামানোর চেষ্টা করে। অপরদিকে কিছু খারাপ প্রতিবেশী

www.nagorikpathagar.org

থাকে যারা অন্যের ভাল পছন্দ করে না। কোন দিন মজুরের ছেলে স্কুল-কলেজে পড়লে অহংকারী হিংসুক প্রতিবেশী বলে বেড়ায়, লেখা-পড়া শিখে কি জজ-ব্যারিষ্টার হবে? বাবার সাথে মজুরি করলে দু'বেলা পেট ভরে খেতে পারবে। মেয়েটা লেখা-পড়ায় থাকলে বলে, আরেক দিন মজুরের ছেলে ছাড়া কোন রাজকুমার তো বিবাহ করতে আসবে না। তাহলে কি দরকার লেখাপড়া শিখার? এ সকল মন্তব্য শুনলে সে সন্তানগুলোর পিতা-মাতা মনে খুব কষ্ট পায়। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ তোমরা হিংসা ত্যাগ কর। কেননা, হিংসা নেক কাজকে সেরূপ ধ্বংস করে, যেরূপ আগুন কাঠকে ধ্বংস করে (আবু দাউদ শরীফ # ৪৮২৩)।

গ্রামাঞ্চলে এক বাড়িতে অনেকগুলো পরিবার বাস করতে দেখা যায়। এদের একজনের গরু-ছাগল ও হাঁস-মুরগি অপরজনের জায়গায় বিচরণ করাকে কেন্দ্র করে ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয়। ফলে গ্রাম্য দরবার থেকে শুরু করে মামলা-মোকদ্দমার সূত্রপাত হয়। একপক্ষ অপর পক্ষকে নাজেহাল করার চেষ্টায় লেগে থাকে। তিক্ততা চরমে পৌছলে গালা-গালি, মারা-মারি এমনকি খুনের ঘটনা ঘটে। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার কর্তব্য হবে প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়া (বোখারী শরীফ # ২৩১০)। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ আল্লাহর দৃষ্টিতে প্রতিবেশীদের মধ্যে উত্তম সে প্রতিবেশী যে তার নিজের প্রতিবেশীর কাছে উত্তম (তিরমিযী শরীফ # ১৮৯৪)।

---

www.nagorikpathagar.org

হত্যা ও আত্মহত্যা

পৃথিবীতে মানব বসতির শুরু তথা হযরত আদম (আ.)-এর সময় থেকে হত্যার সূচনা। সুন্দরী বোনকে বিবাহ করার প্রতিযোগিতায় আদম (আ.)-এর দু'ছেলে একে অপরকে হারাবার মানসে বড় ভাই কাবিল ছোট ভাই হাবিলকে হত্যা করে। এটা মানব ইতিহাসের প্রথম হত্যা। সে সময় থেকে শুরু হয়ে এটা অহরহ ঘটে চলছে। আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তিকে না হক হত্যা করা হয়, তখন সে খুনের একটি অংশ আদমের প্রথম ছেলের (কাবিলের) উপর বর্তায়, কেননা সে হত্যার রীতি প্রথম চালু করেছে (সহীহ মুসলিম # ৪২৩২)। নরহত্যা অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। পরকালে হত্যার প্রতিশোধ নেয়া হবে এবং এর বিচার প্রথম হবে। আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম যে মোকদ্দমার ফয়সালা হবে তা হবে রক্তপাত বা হত্যা সম্পর্কিত (সহীহ মুসলিম # ৪২৩৪)।

হত্যাকে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক হত্যা আবার দু'রকম। একটি বিচারের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দেয়া এবং অপরটি ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সাধারণ জনগণকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা সেনাবাহিনী দ্বারা নির্বিচারে হত্যা করা। অন্যদিকে ক্ষমতা দখলের জন্য অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাসীনদেরকে হত্যা করা। পৃথিবীর অনেক দেশে সরকার কর্তৃক প্রতিবাদী জনগণকে হত্যার নজির যেমন আছে তেমনি ক্ষমতাসীনকে হত্যার নজিরও আছে। হযরত ওসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.)-এর হত্যা এমনি ঘটনা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম; তাতে সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন (সূরা নিসা # ৪ : ৯৩)।

www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তিগত হত্যা বহু কারণে হতে পারে। পারিবারিক হত্যার মধ্যে যৌতুকের জন্য হত্যা বর্তমানে বহুল আলোচিত। কন্যাপক্ষ যৌতুকের ওয়াদা করে পরে পরিশোধ করতে না পারলে সে বধূর উপর অত্যাচার-নিপীড়ন শুরু হয়ে শেষ পর্যন্ত সে হত্যার শিকার হয়। গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে, শ্বাসরোধ করে অথবা লাঠি বা ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্বামী বা পরিবারের অন্য কেউ তাকে হত্যা করে। এরূপ ঘটনা অহরহ ঘটছে।

প্রেমের কারণে হত্যা সংঘটিত হতে পারে। যুবক যুবতীর নিকট প্রেম নিবেদন করে। যুবতী তাতে সাড়া না দিলে যুবক ক্ষিপ্ত হয়ে যুবতীকে হত্যা করে মনের জ্বালা মেটায়। এই ধরনের ঘটনা প্রায় ঘটে থাকে।

সংসারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ চলতে থাকলে মনের মধ্যে একের প্রতি অপরের ঘৃণার সৃষ্টি হয়। শুরু হয় কলহ। সংসারের শান্তি বিনষ্ট হয়ে যায়। একে অপরকে সহ্য করতে পারে না। তর্ক-বিতর্কের মধ্যে উভয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। মাথায় আসে হত্যার চিন্তা এবং বাড়াবাড়ির এক পর্যায়ে হাতের কাছে দা, বটি বা লাঠি যা পাওয়া যায় তা দ্বারা স্বামী স্ত্রীকে হত্যা করতে পারে অথবা স্ত্রী স্বামীকে ঘুমের মধ্যে কোনভাবে হত্যা করে বা ভাড়াটিয়া খুনী দিয়ে হত্যা করায়।

পিতা বা মাতার নিকট অর্থ চেয়ে না পেলে সন্তান তাদেরকে হত্যা করতে পারে। ভাই ভাইকে সম্পত্তির লোভে হত্যা করে অথবা অন্যকে দিয়ে হত্যা করায়। আবার কখনো পারিবারিক কোন গোপন বিষয় পরিবারের কারো দ্বারা অন্যের নিকট প্রকাশ পেয়ে বিপদের আশঙ্কা করলে কৌশলে তাকে হত্যা করে বা হত্যা করায়। সন্তানের ভরণ পোষণ দিতে না পারলে পিতা বা মাতা দ্বারা সন্তান হত্যার ঘটনা ঘটে থাকে। অথচ আল্লাহ বলেন ঃ দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমি জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ (সূরা বনী ইসরাইল # ১৭ : ৩১)।

ডাকাতি বা চুরি করতে গিয়ে বাধাগ্রস্ত হলে হত্যার ঘটনা ঘটে। এদের চিনে ফেললে পরবর্তী সময়ের বিপদের কথা চিন্তা করে এরা

www.nagorikpathagar.org

মালিককে হত্যা করে। অর্থ উপার্জনের জন্য কেউ কেউ মানুষ হত্যা করে। এদের অন্তরে দয়া-মায়া নেই এবং এরা পরকালের ভয় করে না। এরা পেশাদার খুনী হিসেবে পরিচিত। টাকার বিনিময়ে এরা যে কোন লোককে হত্যা করতে পারে।

কেউ কারো দ্বারা কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে সে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তৎপর হয়ে পড়ে। মনের ক্ষোভ ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকলে এক পর্যায়ে হত্যার চিন্তা মাথায় আসে। সুযোগ পেলে এক সময় প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করে না।

দু'জনের মধ্যে কোন বিষয়ে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হলে কখনো কখনো মতানৈক্য দেখা দেয়। এতে শুরু হয় গালাগালি, হাতাহাতি, মারামারি এবং শেষে চরম উত্তেজনার এক পর্যায়ে ঘটতে পারে হত্যার ঘটনা। এ ধরনের ঘটনা চায়ের টেবিলে বা হাট-বাজারে বন্ধু বা পরিচিতজনদের মধ্যে বেশী ঘটে। রাজনৈতিক আলোচনা-সমালোচনার দরুন এমনটি বেশী ঘটে থাকে।

বিনা অপরাধে কাউকে হত্যা করা জঘন্য অপরাধ। কিন্তু যারা হত্যা করে বা করায় তারা আল্লাহর বিধান মনে রাখে না। এক শ্রেণীর বিবেকহীন লোক জিহাদের নামে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে বোমা মেরে নিরপরাধ মানুষ হত্যা করছে। অনেক সময় সে বোমায় নিজেরা মারা যায়। এদের দাবী তারা শহীদ হতেছে। প্রকৃতপক্ষে এসব লোকেরা আত্মহত্যা করছে। তা একদিকে মানুষ হত্যা এবং অপরদিকে আত্মহত্যার দায়ে তারা অপরাধী হতেছে। সত্যিকার জিহাদ হলো, নিজের কুপ্রবৃত্তিকে দমন করার জন্য নিজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা অথবা ইসলামকে সমুন্নত রাখার জন্য যুদ্ধ করা। আবু মূসা আশয়ারী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবী (সা.)-এর খেদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কি প্রকারে হয়? আমাদের কেউ যুদ্ধ করে রাগের বশীভূত হয়ে, কেউ জেদের বশীভূত হয়ে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ ও উন্নত করার জন্য যুদ্ধ করা। একমাত্র এটা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ গণ্য হবে (বোখারী শরীফ # ৯৮)।

আল্লাহ বলেন ঃ আমি বনী ইসরাইলদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ প্রাণের বদলে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে

www.nagorikpathagar.org

হত্যা করে, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করে (সূরা মায়েদা # ৫ : ৩২)। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে কোন মুসলমান সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই এবং আমি (মুহাম্মদ সা.) নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল, এমন ব্যক্তির রক্ত (জান) তিন কাজের যে কোন একটি করা ব্যতীত হালাল (বৈধ) নয় ঃ বিবাহিত অবস্থায় যেনা করা, (অন্যায়ভাবে) কাউকে হত্যা করা এবং ইসলাম ত্যাগী, যে মুসলিম জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে (সহীহ মুসলিম # ৪২২৮)।

কোন অবস্থায় হত্যা জায়েয আল্লাহর নির্ধারিত সে সীমা যারা লঙ্ঘন করবে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তিদানের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। অতঃপর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এ'টি তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরেও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আজাব (সূরা বাকারা # ২ : ১৭৮)।

মানুষের নিকট নিজের জীবন সবচেয়ে প্রিয়। কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে আত্মহত্যার মাধ্যমে এ জীবনের অবসান ঘটিয়ে থাকে। আত্মহত্যার প্রধান কারণ হতাশা। কোন সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হলে মানুষ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আর হতাশা যখন চরমে পৌঁছায় তখন আত্মহত্যা করে। কেউ কোন কঠিন রোগে ভুগতে থাকলে যদি চিকিৎসায় ফল পাওয়া না যায় এবং রোগ-যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে পড়ে তখন আত্মহত্যা করে। জুন্দুব (রা.) নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ এক ব্যক্তির শরীরে ঘা ছিল, যাতনা সহ্য করতে না পেরে সে আত্মহত্যা করল। তার এ কার্যে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, বান্দা স্বীয় প্রাণ বের করায় যেন আমা থেকে অগ্রগামী হয়েছে ঃ অতএব আমি তার জন্য বেহেশত হারাম করে দিলাম (বোখারী শরীফ # ৭০৪)।

www.nagorikpathagar.org

আত্মহত্যার ঘটনা বিশ থেকে ত্রিশ এবং ষাট থেকে পরবর্তী বয়সের মধ্যে বেশী ঘটে থাকে। বিশ থেকে ত্রিশের মধ্যবর্তী বছরগুলো জীবন গড়ার উপযুক্ত সময়। এ সময়ের মধ্যে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছার আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে জীবনের প্রতি ঘৃণা জন্মায় এবং আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। অপরদিকে ষাট বছর বয়সের পর অনেকে সন্তান বা অন্য নিকট আত্মীয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ সময় তাদের প্রতি অযত্ন বা অবহেলা মনে আক্ষেপের সৃষ্টি করে যার ফলে আত্মহত্যা করে।

যৌবনের শুরুতে যুবক-যুবতীরা দাম্পত্য জীবনের রঙিন স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। পরিণত বয়সে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হলে অনেকের দাম্পত্য জীবন সুখের হয় না। এতে স্বপ্ন ভঙ্গের কারণে যে কোন একজন আত্মহত্যা করতে পারে। অনেক সময় বিবাহ-পূর্ব প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যা করে। আবার প্রেমে মত্ত যুবক-যুবতীর বিবাহে অভিভাবক অসম্মতি জানালে দু'জনে একত্রে আত্মহত্যা করার ঘটনা ঘটে।

কোন নারী অসৎ ব্যক্তির দ্বারা ধর্ষিতা হলে রাগে, ক্ষোভে ও লজ্জায় আত্মহত্যা করে। অবিবাহিত মেয়েদের ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা প্রায় ঘটছে। আবার সংসারের অভাব-অনটন অথবা অন্য কোন কারণে মনে ক্ষোভের সঞ্চার হলে ধারালো অস্ত্র বা আগ্নেয় অস্ত্র দ্বারা সংসারের লোকজন এমনকি অন্যান্য নিরপরাধ লোকজনকে হত্যা করে নিজে সে অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করে।

মেয়ে অপেক্ষা পুরুষের আত্মহত্যার হার বেশী। পুরুষ সংসার জীবনে মেয়েদের অপেক্ষা অনেক বেশী দায়িত্বশীল। দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে অনেকে আত্মহত্যা করে। পরিসংখ্যানে দেখা যায় প্রতি চারটি আত্মহত্যার মধ্যে তিনটি পুরুষের এবং একটি মেয়ের। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, তোমরা নিজেদের হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু। আর যে কেউ সীমালঙ্ঘন কিংবা যুলুমের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে, তাকে খুব শীঘ্র আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষে খুব সহজসাধ্য (সূরা মায়েদা # ৪ : ২৯-৩০)।

হতাশা ক্ষোভ, দুঃখ-যাতনা, অপমান, ভয় ও মানসিক পীড়া আত্মহত্যার কারণ হতে পারে। আত্মহত্যা যারা করে তারা এর পাপ সম্পর্কে ধারণা করতে পারে না। তারা বুঝে না যে আত্মহত্যা করে দুনিয়ার

www.nagorikpathagar.org

কষ্ট থেকে মুক্তি পেলেও পরকালে তাদের জন্য ভীষণ আজাব অপেক্ষা করছে। ছাবেত ইবনে জাহহাক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করবে, সে তার এ কর্মের দরুন জাহান্নামের আগুনে আজাব ভোগ করবে (বোখারী শরীফ # ৭০৩)।

মাত্রাতিরিক্ত ঘুমের ঔষধ খেয়ে, কীটনাশক অথবা অন্য কোন বিষ খেয়ে, বন্দুক দ্বারা নিজকে গুলি করে, পানিতে ডুবে, গলায় ফাঁসি দিয়ে, গায়ে আগুন লাগিয়ে, উঁচু স্থান থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়ে, রেল লাইনে ট্রেনের বা চলন্ত বাস-ট্রাকের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করার ঘটনা ঘটে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি গলায় ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে দোযখের মধ্যে গলায় ফাঁসি দেয়ার আজাব যাতনা ভোগ করবে এবং যে ব্যক্তি বর্শা দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে দোযখের মধ্যেও বর্শাঘাতের আজাব যাতনা ভোগ করবে (বোখারী শরীফ # ৭০৫)।

অনেকে আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়তে চান না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের জানাযা পড়তে নিষেধ করেননি। জাবের ইবনে সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.)-এর নিকট এক ব্যক্তির লাশ হাজির করা হলো। সে চেপ্টা তীরের আঘাতে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) তার জানাযা পড়েননি (সহীহ মুসলিম # ২১৩৪)। তবে হাসান বসরী, ইবরাহীম নখঈ, কাতাদা, মালিক, আবু হানিফা, শাফেঈ (র.) ও অধিকাংশ আলেমদের মতে আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়া জায়েয। সে ঈমানদার হলে অন্যান্য ঈমানদার মুসলমানের ন্যায় তার জানাযা পড়তে হবে। কেননা অন্য এক হাদীসে আছে, সাহাবীগণ এই ধরনের ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানাযা পড়ার জন্য আদেশ করেছেন। এ ধরনের ঘৃণ্য কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি জানাযা পড়েননি (উপরোল্লিখিত ২১৩৪ নম্বর হাদীসের টীকা)।

www.nagorikpathagar.org

ক্রোধ বা রাগ

মানসিক চাপ, হতাশা, ব্যর্থতা, নানাবিধ সমস্যা ইত্যাদির কারণে অন্তরে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এটাই ক্রোধ। ক্রোধের প্রতিশব্দ রাগ। প্রকৃতিগতভাবেই মানুষের মধ্যে ক্রোধ বিদ্যমান। আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বেহেশতে আদম (আ.)-এর দেহ তৈরির পর রেখে দিলেন। শয়তান এ সময় তাঁর চারদিকে ঘুরাফেরা করতে লাগল এবং তাঁর পরিচিতি জানার জন্য তাঁকে দেখছিল। অতঃপর সে (শয়তান) যখন আদম (আ.)-কে খালি পেট বিশিষ্ট দেখতে পেল তখন বুঝল যে, তাঁকে এমন এক প্রকৃতি সম্পন্ন করে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হবে না (সহীহ মুসলিম # ৬৪৬১)।

ক্রোধ আত্মরক্ষার একটি অস্ত্র। যথাস্থানে এবং যথাসময়ে এর ব্যবহার হলে অনেক সুফল পাওয়া যায়। আক্রান্ত হলে ক্রোধের কারণেই পাল্টা আক্রমণ করে আত্মরক্ষা করা হয়। অপরদিকে অত্যধিক ক্রোধ মানুষকে উদ্ধত ও অহংকারী করতে পারে। ক্রোধের কারণে যুদ্ধ বিগ্রহ হয়, আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব নষ্ট হয়, স্বামী-স্ত্রীর সংসার ভাঙ্গে অথবা খুনের ঘটনা ঘটে। ক্রোধ শুধু মানুষের মধ্যেই নয়, অন্যান্য সকল প্রাণীর মধ্যে এটা লক্ষ্য করা যায়। একটি জন্তু অপর জন্তুর সাথে, একটি পাখী আরেকটি পাখীর সাথে এমনকি একটি মোরগ আরেকটি মোরগের সাথে লড়াই করতে দেখা যায়। কখনো কখনো আকাশে অথবা গাছের ডালে দু'টি পাখীর মধ্যে ঝগড়া শুরু হলে উভয়ে পাঞ্জারত অবস্থায় মাটিতে লুটে পড়ে। এটা তাদের ক্রোধের কারণে হয়। ক্রোধের সময় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া এবং রক্তচাপ বেড়ে যায়। অতিরিক্ত ক্রোধান্বিত হলে স্ট্রোক করতে পারে অথবা হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুও হতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

ক্রোধের সময় হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করে। এটা দেখে শয়তান আনন্দ পায় এবং উভয়পক্ষকে আরোও উত্তেজিত করার চেষ্টা করে। ফলে উভয়ের উত্তেজনা চরমে পৌঁছে। এ সময় ক্রোধকে আয়ত্তে রাখা খুবই কষ্টসাধ্য। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : মল্লযুদ্ধে বিজয়ী প্রকৃত বীর পুরুষ নয়, প্রকৃত বীর পুরুষ ঐ ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজকে আয়ত্তে রাখতে সক্ষম হয় (বোখারী শরীফ # ২৩৩৪ এবং সহীহ মুসলিম # ৬৪৫৬)।

ক্রোধ দমন করা অপেক্ষা যার প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েছে তাকে ক্ষমা করতে পারা আরোও কঠিন কাজ। ক্রোধ দমন করা বীরত্বের কাজ, আর ক্রোধ সংবরণ করে ক্ষমা করে দেয়া মহত্ত্বের কাজ। আল্লাহর অসন্তুষ্টি সৃষ্টি হতে পারে এমন ক্রোধ অবশ্যই পরিত্যাগ করা উচিত।

একবার হযরত আলী (রা.) কোন এক কাফেরের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে হত্যা করার জন্য ধরাশায়ী করে তার বুকের উপর চেপে বসলেন। লোকটি বুঝতে পারল যে, তাকে অবশ্যই হত্যা করা হবে। তাই দীর্ঘ সময় নির্যাতন ভোগ করা অপেক্ষা শীঘ্র মৃত্যুবরণ করাই সে শ্রেয় মনে করল। এ জন্য আলী (রা.)-কে অধিকতর ক্রোধান্বিত করার জন্য সে তাঁর মুখে থুথু ছুড়ে দিল। আলী (রা.) অধিকতর ক্রোধান্বিত না হয়ে তাকে ছেড়ে দিলেন। লোকটি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি আমার উপর আরোও ক্রুদ্ধ না হয়ে আমাকে ছেড়ে দিলেন কেন? তিনি বললেন, তোমার এ কাজের দরুন আমার নফস আল্লাহর প্রতি ভীত না থেকে শয়তানের প্ররোচনায় অন্যদিকে ঘুরে গেল। তাই আমি নফসের গোলামি না করে আল্লাহর গোলামির লক্ষ্যে তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি। এ কথা শুনে লোকটি তখনই কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। (muslimcanada.org)

হযরত সাহল ইবনে মুয়ায ইবনে আনাস আল-জুহানী (রা.) থেকে

www.nagorikpathagar.org

তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধকে কার্যে পরিণত করার ক্ষমতা রেখেও তা সংবরণ করে, আল্লাহ তাকে কেয়ামতের দিন সমগ্র সৃষ্টির সামনে ডেকে এনে বেহেশতের যে কোন হুর নিজের ইচ্ছামত বেছে নেয়ার অধিকার দেবেন (তিরমিযী শরীফ # ১৯৭০)।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, বস্তুতঃ তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের ভোগ, কিন্তু আল্লাহর নিকট যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে, যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য থেকে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধান্বিত হলে ক্ষমা করে দেয় (সূরা আশ-শূরা # ৪২ : ৩৬-৩৭)। আল্লাহ আরো বলেন, যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন (সূরা আলে-ইমরান # ৩ : ১৩৪)।

ক্রোধান্বিত অবস্থায় অর্থাৎ রাগের সময় ভাল-মন্দ বিবেচনা করার ক্ষমতা হ্রাস পায়। এ জন্য রাগান্বিত অবস্থায় কোন ভাল কাজ করার সময় মন্দও করে ফেলতে পারে। তাই রাগ প্রশমিত হওয়ার পূর্বে কোন ভাল কাজে হাত না দেয়াই উচিত। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার দ্বারা (আমার ভাই) সিজিস্তানের গভর্নর উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু বকরকে লিখে পাঠান : তুমি রাগান্বিত অবস্থায় দু;ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা করবে না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ যেন রাগান্বিত অবস্থায় দু'ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা না করে (নাসাঈ শরীফ # ৫৪০৭)।

রাগ না করা একটি মহৎ গুণ, যদিও এটা অত্যন্ত কঠিন কাজ। হযরত যুলকিফল (আ.) রাগ না করার একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, যার বর্ণনা নবী ও রাসূল অধ্যায়ে তাঁর জীবনীতে দেয়া আছে। রাগ না

www.nagorikpathagar.org

করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) উপদেশ দিতেন। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সা.)-এর নিকট এসে বলল, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, রাগ করো না, উত্তেজিত হয়ো না। ঐ লোকটি বার বার অনুরোধ করছিল। হযরত (সা.) বার বারই তাকে বলছিলেন, রাগ করো না, উত্তেজিত হয়ো না (বোখারী শরীফ # ২৩৩৫ ও তিরমিযী শরীফ # ১৯৬৯)।

রাগ একটি মন্দ স্বভাব। কখনো রাগান্বিত হলে এটা অন্তরে ধরে রাখা মোটেই উচিত নয়। আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কারো প্রতি কেউ বিদ্বেষ ভাব পোষণ করবে না, কারো প্রতি কেউ হিংসা করবে না, (রাগ করে) পরস্পর বিচ্ছেদ-ভাবাপন্ন আচরণ করবে না। তোমরা সকলে এক আল্লাহর বান্দা, ভাই ভাই হয়ে থাকবে। কোন মুসলমানের পক্ষে জায়েয হবে না যে, স্বীয় মুসলমান ভাই থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিন দিনের বেশী সালাম-কালাম বন্ধ করে রাখে (বোখারী শরীফ # ২৩২৩)। আর আবু আইউব আনসারী (রা.)-এর বর্ণনায় নবী (সা.) বলেছেন, কোন ব্যক্তির পক্ষে এটা জায়েয নয় যে, স্বীয় মুসলমান ভাই থেকে সম্পর্ক ছেদন অবস্থায় তিন দিনের অধিককাল অতিক্রম করে– উভয়ের সাক্ষাৎ হলেও একে অপর থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে চলে। তাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট উত্তম পরিগণিত হবে যে (রাগ ভেঙ্গে) প্রথমে অপরজনকে সালাম করে (বোখারী শরীফ # ২৩২৭)।

ক্রোধ মানুষের অনেক ভাল গুণ নষ্ট করে দিয়ে অনেক খারাপের জন্ম দিতে পারে। এমনকি এটা ঈমান নষ্ট করতে পারে। ইবনে হাকীম (র.) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : ক্রোধ ঈমানকে এমনভাবে বিনষ্ট করে, যেমনভাবে ছাবির (এক প্রকার তিক্ত ফল আঞ্চলিক ভাষায় যার নাম মুছাব্বর) মধুকে বিনষ্ট করে দেয় (বায়হাকী, মেশকাত শরীফ # ৪৮৯১)।

www.nagorikpathagar.org

মহান আল্লাহ বলেন, যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহকে স্মরণ করবে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ (সূরা আল-আরাফ # ৭ : ২০০)।

ক্রোধের কারণে শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। তাই কোন কারণে ক্রোধান্বিত হলে যথাশীঘ্র তার উপশমের চেষ্টা করা উচিত। সোলায়মান ইবনে সোরাদ (রা.) বর্ণনা করেছেন, একদা আমি নবী (সা.)-এর নিকট বসেছিলাম, সে সময় দু'ব্যক্তি বিবাদ করছিল। তাদের এক ব্যক্তির অত্যধিক ক্রোধের দরুন চেহারা রক্তবর্ণ এবং গলার রগগুলো মোটা হয়ে গিয়েছিল। এটা দেখে হযরত (সা.) বললেন, আমি এমন একটি বাক্য জানি যা ঐ ক্রোধান্বিত ব্যক্তি বললে তার ক্রোধ উপশম হয়ে যাবে। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তনির রাজীম (অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি) বললে এখনই তার ক্রোধের অবসান হবে (বোখারী শরীফ # ১৬১০)।

অবস্থানের পরিবর্তনের দ্বারা ক্রোধ প্রশমিত হয়। হযরত আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন তোমাদের কারো ক্রোধ হয়, তখন দাঁড়ানো থাকলে সে যেন বসে যায়। যদি ক্রোধের উপশম হয় তবে উত্তম। তা না হলে সে যেন শুয়ে পড়ে (আহমদ, মেশকাত শরীফ # ৪৮৮৭)।

হযরত আতিয়্যাহ ইবনে উরওয়াহ সা'দী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : ক্রোধ শয়তানের পক্ষ থেকে, আর শয়তান আগুনের তৈরি। বস্তুত আগুন পানি দ্বারা নিভানো হয়। সুতরাং যখন তোমাদের কেউ ক্রোধান্বিত হয় তখন সে যেন অজু করে নেয় (আবু দাউদ, মেশকাত শরীফ # ৪৮৮৬)। কোন কোন বর্ণনায় অজু করে দুই রাকআত নামায পড়ার কথা বলা হয়।

যে কারণে ক্রোধের উৎপত্তি তা থেকে মন অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলে ক্রোধ ক্রমে প্রশমিত হয়ে যাবে। শারীরিক কোন পরিশ্রমের কাজ শুরু

২০—

www.nagorikpathagar.org

করলে ক্রোধের উৎসস্থল থেকে মন অন্যদিকে নিবিষ্ট হয়ে ক্রোধের কথা ভুলে যাবে। ক্রোধের সময় চুপ করে থাকাও উপকারী।

ক্রোধের সময় শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হয়ে যায়। এ সময় গভীর দীর্ঘশ্বাস নিলে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি স্বাভাবিক হয়ে ক্রোধ কমে আসবে, ফলে হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে। চোখ বন্ধ করে দীর্ঘশ্বাস নেয়া বেশী ফলপ্রসূ।

কিছু কিছু মানুষ দেখা যায় যারা কারণে অকারণে সব সময় উত্তেজিত অবস্থায় থাকে। সাধারণ কথায় যাদেরকে রগচটা বলা হয়। তাদের সাথে কথা বলতে গেলে তারা উত্তেজিত হয়ে কথা বলে। মানুষ তাদেরকে ভাল চোখে দেখে না এবং যথাসম্ভব তাদেরকে এড়িয়ে চলে। এটা খারাপ অভ্যাস এবং এ অভ্যাস পরিত্যাগ করা উচিত। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সেই উপদেশ সব সময় মনে রাখা দরকার, রাগ করো না, উত্তেজিত হয়ো না।

www.nagorikpathagar.org

অহংকার

অহংকার শব্দের অর্থ গর্ব বা দম্ভ। অহংকার করা জঘন্য অপরাধ। এর কারণে যে কারো পতন ঘটতে পারে। আল্লাহর অনেক প্রিয় ফেরেশতাকুলের সরদার ইবলিস অহংকার করার কারণে শয়তান হয়ে বেহেশত থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। বহু বহু বছর আল্লাহর এবাদত বন্দেগি করে সে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়েছিল। হযরত আদম (আ.) কে সৃষ্টি করে তাকে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে আল্লাহ হুকুম দিলেন। ইবলিস নিজকে আদম (আ.) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দাবী করে অহংকারবশে তাঁকে সেজদা করতে অস্বীকার করল। আল্লাহ বললেন, আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি, তখন তোকে কিসে সেজদা করতে বারণ করল? সে বলল, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা (সূরা আরাফ # ৭ : ১২)। ইবলিস একজন জিন। আল্লাহ তাকে শয়তান বানিয়ে বেহেশত থেকে বের করে দিলেন এবং শেষ বিচারের পরে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে।

মানুষের মধ্যেও ইবলিসের মত অনেক অভিশপ্ত লোক দেখা যায়। ইব্রাহীম (আ.) তাঁর মূর্তি প্রস্তুতকারী ও মূর্তি পূজক পিতা আযরকে এক আল্লাহর উপাসনা করতে অনুরোধ করলে সে তা করতে অস্বীকার করল। আল্লাহ বলেন, স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম পিতা আযরকে বললেন : তুমি কি প্রতিমাসমূহকে উপাস্য মনে কর? আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি ও তোমার সম্প্রদায় প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট (সূরা আনআম # ৬ : ৭৪)। এতে সে পুত্রকে মূর্তি পূজক শাসক নমরূদের হাতে তুলে দিল। ইব্রাহীম (আ.) নমরূদকেও আল্লাহর এবাদত করতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু অহংকারী নমরূদ আল্লাহর উপাসনা করতে অস্বীকার করে বরং তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করল। কিন্তু আল্লাহর আদেশে আগুন তাঁর একটি পশমও স্পর্শ করেনি। অপরদিকে একটি উড়ন্ত পোকা নমরূদের নাকের ছিদ্র দিয়ে মস্তকে চলে

www.nagorikpathagar.org

যায়। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সে তার মাথায় পিটানোর জন্য লোকদের নির্দেশ দেয়। তাতে তার যন্ত্রণার অবসান হয়নি এবং এ যন্ত্রণায় সে মারা যায়।

আরেক অহংকারী শাসক ছিল মিসরের ফেরাউন। সে খোদায়ী দাবী করত। মূসা (আ.) তাকে এক আল্লাহর উপাসনা করতে বললে, সে তা করতে অস্বীকার করল। ফেরাউন (তার লোকজনকে) বলল, হে পরিষদবর্গ, আমি জানি না যে, আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য আছে। হে হামান (ফেরাউনের উজীর), তুমি ইট পোড়াও, অতঃপর আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর; সম্ভবত আমি তাতে উঠে মূসার ইলাহ্ কে দেখতে পাব; আমি তো তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি (সূরা কাসাস # ২৮ : ৩৮)। জানা যায় তার জন্য সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় এটা ভেঙ্গে পড়লে এর নীচে চাপা পড়ে বহু লোক মারা যায়।

ফেরাউন মূসা (আ.)কে হত্যা করার পরিকল্পনা করলে, আল্লাহর নির্দেশে মূসা (আ.) তাঁর অনুসারীদেরকে নিয়ে নদী পার হয়ে অপর পাড়ে চলে যান। ফেরাউন ও তার লোকজন তাদেরকে ধরার জন্য অনুসরণ করলে আল্লাহ তাদেরকে ডুবিয়ে মারেন। আল্লাহ্ বলেন, আজকের দিনে তোমার দেহকে বাঁচিয়ে দিচ্ছি যাতে তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পার (সূরা ইউনুস # ১০ : ৯২)। তার সে দেহ মিসরের মিউজিয়ামে এখনো সংরক্ষিত আছে, যাতে মানুষ দেখতে পারে।

মিসরে কারূন নামের অন্য এক অহংকারী ব্যক্তি ছিল। আল্লাহ তাকে অগাধ ধন-সম্পদ দান করেছিলেন। কিন্তু সে তা থেকে কিছুই দান-খয়রাত করত না। আল্লাহ্ বলেন : কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত। পরে সে তাদের নিজের জাতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে গেল। আমি তাকে এত বেশী ধন-সম্পদ দান করেছিলাম যার চাবি বহন করা কয়েকজন শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টকর ছিল। যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলল, আনন্দে আত্মহারা হয়ো না নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আনন্দে আত্মহারাকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ্ তোমাকে যা দান করেছেন, তা দ্বারা পরকালের ঘর অনুসন্ধান কর এবং ইহকাল থেকে নিজের অংশ গ্রহণ করতে ভুল না। তুমি

www.nagorikpathagar.org

অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অনর্থ সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না। সে বলল, আমি এ সম্পদ আমার জ্ঞান-গরিমা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি (সূরা কাসাস # ২৮ : ৭৬-৭৮)। কিন্তু আল্লাহ্ তার এ অহংকার সহ্য করেননি। আল্লাহ্ বলেন : অতঃপর আমি তাকে তার প্রাসাদসহ জমিনে পুঁতে ফেললাম (সূরা কাসাস # ২৮ : ৮১)।

এমন অহংকারী লোকদেরকে আল্লাহ্ ইহকাল ও পরকালে শাস্তি দিয়ে থাকেন। অহংকার করার মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। তাঁর সাথে তুলনীয় কেউ নেই। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : অহংকার আমার চাদর এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার ইজার (পায়জামা)। সুতরাং যে ব্যক্তি এর কোন একটি নিয়ে আমার সাথে টানাটানি করবে আমি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করব (সহীহ্ মুসলিম # ১৭৫, ইবনে মাজাহ # ৪১৭৪)। আল্লাহ্ আরোও বলেন, তাদের জন্য বেহেশতের দরজা খোলা হবে না এবং তারা বেহেশতে যাবে না যে পর্যন্ত সুঁচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে (সূরা আরাফ # ৭ : ৪০)।

অনেকে দেহের গড়ন অথবা রূপের গর্ব করে থাকে। আসলে এদের কোনটিতে মানুষের গর্ব করার কিছু নেই। কারণ সবল-দুর্বল, লম্বা-বেটে, সুন্দর-অসুন্দর মানুষের সৃষ্টি নয়। এ সকল আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহ্ বলেন : মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি (নোংরা) বীর্য থেকে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী (সূরা ইয়াসীন # ৩৬ : ৭৭)।

কিছু লোক দেখা যায় যারা নিজের শিক্ষা-দীক্ষা তথা পাণ্ডিত্যের অহংকার করে থাকে। তারা মনে করে সকলের চেয়ে এরা বেশী জ্ঞানী। কলেজ বা ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেট থাকলেই বেশী জ্ঞানী হওয়ার অহংকার করা যায় না। অল্প শিক্ষিত লোকও উচ্চ শিক্ষিত লোক অপেক্ষা বেশী জ্ঞানী হতে পারে। এটা আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদ। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কোন ডিগ্রী ছিল না। কিন্তু তিনি সর্বকালের মানবকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। আবার কিছু লোক আছে যারা অতি ধার্মিক হিসেবে গর্ব করে। তারা

www.nagorikpathagar.org

নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তসবী হাতে রাখে। তারা কি জানে তাদের এবাদত আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হয়েছে বা হয়নি? পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে : তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের সম্পর্কে ভাল জানেন, যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণ ছিলে। অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তিনি ভাল জানেন কে পরহেযগার বা মুত্তাকী (সূরা নাজম # ৫৩ : ৩২)।

ধন, জন, জ্ঞান ও অর্থ-বিত্ত আল্লাহ্ সকলকে সমান দেননি। যাদেরকে দিয়েছেন তাদের অনেকেই এর গর্বে বুক ফুলিয়ে পদচারণা করেন। কিন্তু যারা সত্যিকার আল্লাহ-প্রেমিক তাদের যত কিছুই থাকুক না কেন, তারা নম্র ও বিনয়ী। তারা নিজকে অন্যদের তুলনায় উৎকৃষ্ট মনে না করে নিকৃষ্ট মনে করে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে : অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না (সূরা লোকমান # ৩১ : ১৮)।

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন, যার অন্তরে অণু পরিমাণ গর্ব-অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এক ব্যক্তি বলল : কোন ব্যক্তি এটাই পছন্দ করে যে, তার পোশাক সুন্দর হোক এবং জুতা জোড়াও খুব সুন্দর হোক, তাও কি অহংকার? তিনি বললেন : আল্লাহ্ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। প্রকৃত অহংকার হচ্ছে, সত্য ও ন্যায়কে উপেক্ষা করা এবং মানুষকে তুচ্ছ মনে করা (সহীহ্ মুসলিম # ১৭৩)।

যারা ক্ষমতাধর তাদের অধিকাংশই অহংকারী। এরা নিরীহ সাধারণ মানুষকে তুচ্ছ মনে করে। গ্রাম প্রধান, সমাজপতি বা রাষ্ট্রনায়ক যে-ই হোক না কেন এরা ক্ষমতার দর্পে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করতে দ্বিধাবোধ করে না। পৃথিবীর অনেক দেশেই অহংকারী ও অত্যাচারী শাসক দেশ শাসন করে। পেছনে ফিরে তাকালে অতীতের এ সকল শাসকদের

www.nagorikpathagar.org

করুণ পরিণতির চিত্র মনে ভেসে উঠে। এদের জন্য এ পৃথিবীর শাস্তিই শেষ নয়, পরকালে আরোও কঠিন আজাব তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সমগ্র ভূমণ্ডলকে মুঠোর মধ্যে নিবেন এবং আসমানসমূহকে দক্ষিণ হস্তে লেপ্টিয়ে নিবেন। অতঃপর বলবেন : আমিই একমাত্র অধিপতি, সকল ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আমি। দুনিয়ায় যারা অধিপতি হওয়ার দাবী করত, ক্ষমতার গর্ব করত, তারা কোথায় (বোখারী শরীফ # ২৪৭২ ও ১৯৩৯)?

আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত নবী (সা.) বলেছেন, বেহেশত ও দোযখের মধ্যে বিতর্ক হলো : দোযখ বলল, বড় বড় মানুষ যারা অত্যাচারী ও গর্বকারী, তারা আমার ভাগে আসবে। বেহেশত আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করল, হে প্রভু! আমার ভাগে শুধু দুর্বল, নির্দোষ ও নিম্নস্তরের বিবেচিত লোকজন কেন হবে? আল্লাহ উত্তরে বলেছেন, তুমি আমার রহমতের স্থান। তোমার দ্বারা আমি আমার বান্দাদের যাকে ইচ্ছা তাকে রহমত দান করব। আর দোযখকে বলেছেন, তুমি আমার আজাব ও শাস্তিদানের স্থান। তোমার দ্বারা আমি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করব (বোখারী শরীফ # ১৯৪৮)।

www.nagorikpathagar.org

গীবত ও চোগলখুরী

গীবত শব্দের অর্থ পরনিন্দা। কারো অগোচরে এমন সকল কথা-বার্তা বলা যা সে শুনলে দুঃখ পায় তাই গীবত। ধারণার বশবর্তী হয়ে সাধারণত পরনিন্দা করা হয়। আল্লাহ বলেন, মুমিনগণ! তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই কতক ধারণা গুনাহ। আর গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারো পশ্চাতে নিন্দা (গীবত) না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু (সূরা হুজুরাত # ৪৯ : ১২)।

হাটে, মাঠে, ঘাটে যেখানেই কয়েকজনের সমাবেশ ঘটে সেখানেই যে কোন প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু হলে এক পর্যায়ে অনুপস্থিত কারো প্রসঙ্গ চলে আসে। তার যত প্রকারের মন্দ দিক আছে তাই আলোচনায় এসে যায়। আলোচনাকে আরোও রসালো করার জন্য অনেক বানোয়াট বা মিথ্যা কল্প-কাহিনী জুড়ে দেয়া হয়। অথচ আল্লাহ সাবধান করে বলেছেন : যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার পেছনে লেগ না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তঃকরণ, এদের প্রত্যেকটিই (কেয়ামতে) জিজ্ঞাসিত হবে (সূরা বনী ইসরাইল # ১৭ : ৩৬)।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) (সাহাবাদেরকে) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান গীবত কি? তাঁরা বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জানেন। তিনি বললেন : তোমার কোন ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা যা সে অপছন্দ করে (তাই গীবত)। জিজ্ঞাসা করা হল, আমি যা বলি যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে তা বিদ্যমান থাকে, তখন আপনার কি অভিমত? তখন তিনি বললেন : তুমি যা বল তার মধ্যে তা থাকলে তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তার মধ্যে তা না তাকে যা তুমি বল, তখন তুমি তার মিথ্যা অপবাদ রটালে (আবু দাউদ

www.nagorikpathagar.org

শরীফ # ৪৭৯৮)। গীবত করা একটি কঠিন গুনাহ। মিথ্যা বলা আরেকটি কবীরা গুনাহ (বোখারী শরীফ # ১২৫১)।

যারা সত্যনিষ্ঠ তারা এ সকল আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে না। তাদের উপস্থিতিতে পরনিন্দা শুরু হলে তারা এতে অংশ গ্রহণ না করে স্থান ত্যাগ করে। আল্লাহ বলেন, তারা যখন কোন অর্থহীন কথা শুনতে পায়, তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, আমাদের আমল আমাদের জন্য এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্য। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের মত পথ চলতে চাই না (সূরা কাসাস # ২৮ : ৫৫)।

আর তারা এটাও জানে, বাজে কথায় অংশ গ্রহণ অপেক্ষা নীরব থাকা অনেক উত্তম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : যে ব্যক্তি নীরব রয়েছে, সে মুক্তি পেয়েছে (তিরমিযী শরীফ # ২৪৪১)। অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : যার আল্লাহ্ ও পরকালের উপর বিশ্বাস আছে সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে (বোখারী শরীফ # ৬০১৮, সহীহ মুসলিম # ৪৭)।

ব্যভিচার বা যেনা একটি জঘন্য অপরাধ। তবে যেনাকারী তওবা করলে আল্লাহ মাফ করে দেন। কিন্তু গীবতকারী যার গীবত করেছে তার নিকট থেকে মাফ না নিলে তা মাফ হবে না। হযরত আবু সাঈদ ও জাবের (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : গীবত যেনা থেকেও জঘন্য। সাহাবাগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গীবত কিভাবে যেনা থেকে জঘন্য? তিনি বললেন : কোন ব্যক্তি যেনা করে, অতঃপর তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। কিন্তু গীবতকারীকে আল্লাহ্ ক্ষমা করেন না, যে পর্যন্ত না যার গীবত করা হয়েছে সে ক্ষমা করে দেয় (বায়হাকী, মেশকাত শরীফ # ৪৬৫৯)।

গীবত মানুষের অন্তরকে কলুষিত করে। একে নিরুৎসাহিত করার জন্য হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : আমার সাহাবাদের কেউ যেন আমার কাছে অন্য কারো দোষ বর্ণনা না করে। কেননা আমি চাই, যখন তোমাদের কাছে আমি আসব

www.nagorikpathagar.org

তখন যেন পরিষ্কার হৃদয়-মন নিয়ে আসতে পারি (আবু দাউদ, তিরমিযী, রিয়াদুস সালেহীন # ১৫৩৯)।

কিন্তু এমন কিছু গীবত আছে, যাতে কোন দোষ নেই। কোরআন ও হাদীসে এর সমর্থন পাওয়া যায়। কেউ রাষ্ট্রপ্রধান, সমাজপতি বা অন্য কোন প্রভাবশালী কর্তৃক জুলুমের শিকার হলে প্রতিকারের জন্য অন্যের নিকট তা প্রকাশ করতে পারে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ কোন মন্দ বিষয় প্রকাশ করা পছন্দ করেন না। তবে কারো প্রতি জুলুম হয়ে থাকলে সে কথা আলাদা। আল্লাহ্ শ্রবণকারী, বিজ্ঞ (সূরা নিসা # ৪ : ১৪৮)।

কোন বিবাহের প্রস্তাব হলে পাত্র পক্ষ পাত্রীর এবং পাত্রী পক্ষ পাত্রের খোঁজ খবর নেয়। এ ধর্মীয় বন্ধন যাতে সুখের হয় সে জন্য পাত্র বা পাত্রীর বিশেষ কোন দোষ-ত্রুটি জানা থাকলে তা প্রকাশ করা উচিত। হযরত ফাতেমা বিনতে কায়িস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন আমি নবী (সা.)-এর কাছে যেয়ে বললাম, আবু জাহম ও মুয়াবিয়া আমার কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন : মুয়াবিয়া তো গরীব লোক, তার কোন সম্পদ নেই। আর আবু জাহম, সে তো কাঁধ থেকে লাঠি নামায় না (মেয়েলোক পিটাতে ওস্তাদ) (বোখারী ও মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন # ১৫০৩)।

কোন মুসলমান ধর্ম-কর্ম না করলে তাকে শোধরানোর জন্য তার এ দোষের কথা সমাজের অন্যদের নিকট প্রকাশ করা যায়। এটা প্রকাশ পেয়ে তার কর্ণগোচর হলে সে ধর্মের প্রতি আগ্রহী হবে; কোন বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে তা জানার চেষ্টা করবে। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : অমুক অমুক ব্যক্তি আমাদের ধর্মের কিছু জানে বলে আমি মনে করি না (বোখারী, রিয়াদুস সালেহীন # ১৫৩২)।

পরিবারের লোকজনদের ভরণ-পোষণের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উদাসীন থাকলে তার মুরুব্বীদের নিকট তার প্রতিকার চাইতে দোষ নেই।

www.nagorikpathagar.org

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা (রা.) নবী (সা.)-এর নিকট এসে বলল, আবু সুফিয়ান (রা.) খুবই কৃপণ লোক। সে আমার ও ছেলে-মেয়েদের সংসার খরচ ঠিক মত দেয় না। তবে আমি তার অজান্তে তা নিয়ে প্রয়োজন মিটাই। তিনি (সা.) বললেন, স্বাভাবিকভাবে তোমার ও তোমার সন্তানদের যতটুকু প্রয়োজন শুধু ততটুকু নিতে থাকো (বোখারী ও মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন # ১৫৩৫)।

গীবতের মত চোগলখুরী বা কুটনামী আরেকটি জঘন্য অপরাধ। ঝগড়া-বিবাদ ও অশান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের কথা অন্যজনের নিকট লাগানোকে চোগলখুরী বলে। কোন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য চোগলখুরীর মাধ্যমে দুই বা ততোধিক লোকের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করা হয়। এ বিবাদের জের ধরে মারামারি বা হত্যার ঘটনা পর্যন্ত ঘটতে পারে। আল্লাহ্ বলেন, যে পশ্চাতে নিন্দা করে, একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে ফিরে; যে ভাল কাজে বাধা দেয়, সে সীমালঙ্ঘন করে, সে পাপিষ্ঠ (সূরা কলম # ৬৮ : ১১-১২)।

চোগলখোর বন্ধুবেশে অথবা হিতাকাঙ্ক্ষী সেজে একজনের নিকটে এসে অন্যের নামে বদনামি করে এবং ফিরে গিয়ে অপর পক্ষের নিকট প্রথম পক্ষের বদনামি করে। একজনের স্ত্রীর নিকট এসে তার স্বামীর সম্পর্কে খারাপ ধারণার সৃষ্টি করে। আবার স্বামীর নিকট গিয়ে স্ত্রীর সম্পর্কে তার মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের সংসারের সমস্ত সুখ-শান্তি বিনষ্ট করে দেয়। এভাবে অন্যের ক্ষতি সাধন করে এরা আনন্দ পায়। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বনিকৃষ্ট মানুষ ঐ ব্যক্তিকে দেখবে যে ব্যক্তি একদলের সম্মুখে এক ধরনের কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গি নিয়ে আসে এবং অপর দলের সম্মুখে অন্য ধরনের কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গি নিয়ে যায় (বোখারী শরীফ # ২৩২০)। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদেরকে ডেকে বলেন, হে মুমিনগণ, আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল (সূরা আহ্যাব # ৩৩ : ৭০)।

www.nagorikpathagar.org

চোগলখোরের স্বভাব এই যে, তারা কারো নিকট চোগলখুরী করতে যেয়ে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে পড়ে। তাদের বলার ধরন এরূপ, আপনার মত এমন ভালো মানুষকে অমুক লোকটি কেমন করে এভাবে অপদস্থ করার চেষ্টা করছে? অথবা আপনার মত এমন একজন সুন্দরী স্ত্রী ঘরে রেখে আপনার স্বামী কেমন করে অমুকের স্ত্রীর আশেপাশে ঘুরঘুর করতে পারে? আবার স্বামীকে বলে, আপনার মত এমন সহজ-সরল, সৎ ও সদালাপী স্বামী থেকে মুখ ফিরিয়ে আপনার স্ত্রী আপনার অনুপস্থিতিতে কেমন করে অমুক অমুকের সাথে হাসি-ঠাট্টা ও ভাব বিনিময় করে সময় কাটাতে চায় ইত্যাদি? হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করবে (সহীহ মুসলিম # ৭২৮৭)।

চোগলখোরদের কার্যকলাপ আস্তে আস্তে প্রকাশ পেতে থাকলে তারা সমাজে ঘৃণিত ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে পড়ে। সচেতন লোকেরা তাদের নিকট থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলে। হযরত হোযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি জানতে পারলেন, এক ব্যক্তি চোগলখুরী করে বেড়ায়। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি : চোগলখোর বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না (সহীহ মুসলিম : ১৯৮ ও বোখারী শরীফ : ২৩১৯)।

www.nagorikpathagar.org

কোরআন

কোরআন আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ কিতাব। এটি মুসলমানদের ধর্ম গ্রন্থ। কোরআনে আল্লাহ্ একে সূরা ফোরকানের প্রথম আয়াতে ফোরকান, সূরা বাকারার দ্বিতীয় আয়াতে কিতাব এবং সূরা হিজরের নবম আয়াতে যিকর বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ, আমি একে এক বরকতপূর্ণ রজনীতে নাযিল করেছি (সূরা দোখান # ৪৪ : ২-৩)। আমরা তা নাযিল করেছি কদরের রাত্রে (সূরা কদর # ৯৭ : ১)। তফসীর মা'আরেফুল কোরআনে সূরা দোখানের তফসীর বর্ণিত আছে, কোরআন শবে কদরে নাযিল হয়েছে। এর অর্থ এই যে, লওহে মাহফুয থেকে সমগ্র কোরআন দুনিয়ার আকাশে এ রাত্রিতেই নাযিল করা হয়েছে। অতঃপর তেইশ বছরে অল্প অল্প করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি নাযিল হয়েছে। কেউ কউ বলেন, প্রতি বছর যতটুকু কোরআনের অবতরণ অবধারিত ছিল, ততটুকুই শবে কদরে দুনিয়ার আকাশে নাযিল করা হত। (কুরতুবী) অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, লওহে মাহফুয থেকে কোরআন দুনিয়ার আকাশে এনে বায়তুল ইজ্জতে রাখা হয়েছিল (আওলিয়া-ই-হিন্দ)।

সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নিয়ে জিব্রাইল (আ.) হেরা গুহায় এসে মুহাম্মদ (সা.)কে মুখে মুখে শিখিয়ে যান। এ থেকেই দুনিয়ায় কোরআন নাযিলের শুরু। সে সময় মুহাম্মদ (সা.)-এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। তখন থেকে শুরু করে তেষট্টি বছর বয়সে তাঁর ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত কোরআন নাযিল হয়েছে। এ তেইশ বছর ধরে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে হযরত জিব্রাইল (আ.) কোরআনের কয়েকটি আয়াত নিয়ে তাঁর নিকট আসতেন। পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে কোরআনের ১১০ নম্বর সূরা নাসর এবং আয়াত হিসেবে সূরা মায়েদার তৃতীয় আয়াত সর্বশেষ নাযিল হয়।

একাধিক হাদীস ও সাহাবার উক্তিতে আছে যে, সূরা নাসরে রাসূলে করীম (সা.)-এর ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত আছে। বলা হয়েছে যে, আপনার দুনিয়াতে অবস্থান করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে। অতএব,

www.nagorikpathagar.org

আপনি তসবীহ্ ও ইস্তেগফার করুন। মুকাতিল (র.)-এর রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবায়ে কেরামের এক সমাবেশে সূরাটি তেলাওয়াত করলে সকলে আনন্দিত হলেন যে, এতে মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ আছে। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূরাটি শুনে ক্রন্দন করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এতে আপনার ওফাতের সংবাদ লুকায়িত আছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.)ও এর সত্যতা স্বীকার করলেন। (সূরা নাসরের তফসীর, তফসীর মা'আরেফুল কোরআনে বর্ণিত)।

কোরআনে মোট সূরা ১১৪টি; আয়াত ৬৩৪৯টি যা অন্য মতে ৬৬৬৬টি; শব্দ ৯৯,৪৬৪টি; অক্ষর ৩,৩০,১১৩টি যার মধ্যে আছে আলিফ ৪৮,৮৭২টি; নূন ২৬,৫৫০টি; ওয়াও ১৫,৫৩৬টি এবং ইয়া ২৫,৯১৯টি। সূরা তওবা ছাড়া অন্য সকল সূরার প্রথমে বিসমিল্লাহ্ আছে। সূরা নামলে বিসমিল্লাহ্ আছে দুইবার– একবার শুরুতে এবং একবার মধ্যে। সূরাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ সূরা বাকারা যার আয়াত সংখ্যা ২৮৬টি আর সবচেয়ে ছোট সূরা কাওসার যার আয়াত সংখ্যা মাত্র ৩টি। কোরআনে রুকু ৫৪০টি। কোরআন ৩০ অংশে বা পারায় বিভক্ত। কোরআনের ৮৬টি সূরা মক্কায় নাযিল হয়েছে যাদেরকে মক্কী সূরা এবং বাকী ২৮টি সূরা মদীনায় নাযিল হয়েছে যাদেরকে মাদানী সূরা বলা হয়ে থাকে।

কোরআনের একটি অক্ষর পাঠ করলে দশটি নেকী পাওয়া যায়। কোরআনের অর্থ বুঝে পড়া এবং সেই অনুসারে আমল করা অতীব জরুরি। সূরা ফাতিহা কোরআনের প্রথম সূরা। পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবেও এটা সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে। এর প্রথমাংশে আল্লাহর প্রশংসা এবং শেষাংশে রয়েছে তাঁর নিকট বান্দার প্রার্থনা। এ সূরা সর্বাধিকবার পাঠ করা হয়ে থাকে। নামাযের প্রত্যেক রাকাতে এ সূরা পড়তে হয়। এ সূরাকে উম্মুল কোরআন বা কোরআনের মা বলা হয়। বোখারী শরীফের ১৯২০ নম্বর হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) এই সূরাকে কোরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা বলেছেন। সূরা ইখলাস বা কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ সূরাকে কোরআনের এক তৃতীয়াংশ বলা হয়। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমরা কেউ কি এক রাত্রে কোরআনের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করতে সক্ষম? সকলে জিজ্ঞাসা করলেন, এক রাতে

www.nagorikpathagar.org

কোরআনের এক তৃতীয়াংশ কিভাবে পড়ব? তিনি বললেন, কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ সূরাটি কোরআন মজীদের এক তৃতীয়াংশের সমান (সহীহ মুসলিম # ১৭৬৩, বোখারী শরীফ # ১৯৮০)। হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, সূরা ইয়াসীন কোরআনের হৃৎপিণ্ড। যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন আল্লাহ ও পরকালের কল্যাণ লাভের নিয়তে পাঠ করে, তার মাগফিরাত হয়ে যায়। তোমরা তোমাদের মৃতদের উপর এ সূরা পাঠ কর। (রূহুল মা'আনী, মাযহারী, তফসীর মা'আরেফুল কোরআন-এ সূরা ইয়াসীনের তফসীর থেকে নেয়া)।

কোরআনের ১৪টি সূরার ১৫টি স্থনে সেজদার আয়াত রয়েছে। আয়াতগুলো হচ্ছে– সূরা আরাফের ২০৬, রাদের ১৫, নাহলের ৫০, আল-ইসরার ১০৯, মরিয়মের ৫৮, হজ্জের ১৮ ও ৭৭, ফোরকানের ৬০, নমলের ২৬, *সেজদার ১৫, ছোয়াদের ২৪, *হা-মীমের ৩৮, *নজমের ৬২, ইনশিকাকের ২১ এবং *আলাকের ১৯ নম্বর আয়াত। কোন কোন মতে (*) তারকা চিহ্নিত আয়াতগুলো পাঠ করে সেজদা করা ওয়াজিব এবং অন্যান্যগুলোর সেজদা মোস্তাহাব। ইমাম শাফেয়ীর মতে ছোয়াদের ২৪ আয়াতের সেজদা মোস্তাহাব এবং বাকীগুলো ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার মতে হজ্জের ৭৭ আয়াতের সেজদা মোস্তাহাব এবং বাকীগুলো ওয়াজিব। এ সকল আয়াত তেলাওয়াতের সময় কিবলামুখী হয়ে সেজদায় যেয়ে সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা তিনবার পড়তে হয়। সেজদা শুধু একবার করতে হয়। সেজদা না করলে গুনাহ হবে।

আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলেন : আমি আপনার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি, তাদের কারো ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করেছি এবং কারো ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করিনি (সূরা মুমিন # ৪০ : ৭৮)। কোরআনে উল্লিখিত পঁচিশ জন নবী ও রাসূল হলেন : (১) হযরত আদম আ. (২) ইদ্রিস আ. (৩) নূহ আ. (৪) হূদ আ. (৫) সালেহ আ. (৬) ইব্রাহীম আ. (৭) ইসমাঈল আ. (৮) ইসহাক আ. (৯) লূত আ. (১০) ইয়াকুব আ. (১১) ইউসুফ আ. (১২) শোয়ায়েব আ. (১৩) আইউব আ. (১৪) মূসা আ. (১৫) হারুন আ. (১৬) জুলকিফল আ. (১৭) দাউদ আ. (১৮) সোলায়মান আ. (১৯) ইলিয়াস আ. (২০) আল-ইয়াসা আ.

www.nagorikpathagar.org

(২১) ইউনুস আ. (২২) যাকারিয়া আ. (২৩) ইয়াহইয়া আ. (২৪) ঈসা আ. এবং (২৫) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কোরআনে মুহাম্মদ নাম আছে চারটি স্থানে এবং আহমদ নাম আছে একটি স্থানে। কোরআনে মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম আছে ২৩৬ বার যা নবীদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লিখিত নাম। এ সকল নবী ও রাসূলগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নবী ও রাসূল অধ্যায়ে রয়েছে।

কোরআন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। পৃথিবীর অনেক মুসলিম রাষ্ট্রে কোরআন ও হাদীসের আলোকে রাষ্ট্রীয় আইন রচিত হয়েছে। আল্লাহ নিজেই বলেন, কোরআনে তিনি সব কিছুই লিখেছেন। সূরা আনআম-এর ৩৮ আয়াতে তিনি বলেন : "আর যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল রয়েছে এবং যত প্রকার পাখী দু'ডানাযোগে উড়ে বেড়ায় তারা সকলেই তোমাদের মত এক একটি শ্রেণী। আমি কোন কিছু লিখতে ছাড়িনি।" কোরআনের বিশ্লেষণ করলে মনের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর এর মধ্যে খোঁজে পাওয়া যায়। মানুষের আচার-আচরণ চাল-চলন, জীবন-যাপন পদ্ধতি, হালাল-হারাম, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান, মাতা-পিতা, ইহকাল-পরকাল, বেহেশত-দোযখ সকল কিছুর বিশ্লেষণ কোরআনে রয়েছে। আল্লাহ বলেন : সেদিন (শেষ বিচারের দিন) প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে একজনকে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করাব যে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। তদুপরি এ লোকদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দানের জন্য আমরা আপনাকে উপস্থিত করব। আর (এ সাক্ষ্যের জন্য) আমরা আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যা প্রত্যেকটি বিষয়েরই সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী এবং হেদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ– সে সকল লোকের জন্য যারা আত্মসমর্পণকারী (সূরা নাহল # ১৬ : ৮৯)।

কোরআনে কতগুলো শব্দ এবং এদের বিপরীতার্থক শব্দে সংখ্যার ব্যবহারের মিল অতি অদ্ভুত। কোরআনে দুনিয়া ১১৫ বার এবং আখেরাত ১১৫ বার, হায়াত ১৪৫ বার এবং মৃত্যু ১৪৫ বার, বেহেশত ৭৭ বার এবং দোযখ ৭৭ বার, ফেরেশতা ৮৮ বার এবং শয়তান ৮৮ বার, মুসিবত ৭৫ বার, শোকর ৭৫ বার, অভাব ১১৪ বার এবং ধৈর্য ১১৪ বার, পুরুষ ২৪ বার এবং নারী ২৪ বার রয়েছে। এছাড়া কতগুলো শব্দ কোরআনে বহুবার উল্লিখিত হয়েছে। কোরআনে আল্লাহ ২৬৯৮ বার, বলা ১৭১৯ বার, বিশ্বাস

www.nagorikpathagar.org

৭৮৩ বার, জানা ৫১৮ বার, আসা ২৩৬ বার, পাঠান ১৯০ বার, দেয়া ২৭৪ বার, ক্ষমা ২৩৪ বার, জমিন ৪৬১ বার, ফেতনা ৬০ বার, বরকত ৩২ বার রয়েছে। নামায আছে ৬৬ বার। বহুবার উল্লিখিত এমন আরও অনেক শব্দ আছে। উল্লিখিত ৩০টি শব্দ কোরআনে ১০,৭৭২ বার উল্লিখিত হয়েছে যা মোট ৯৯,৪৬৪টি শব্দের এক দশমাংশেরও বেশী অর্থাৎ তিন প্যারার অধিক। এগুলো আরবী শব্দের পরিবর্তে বাংলায় লিখা হলো।

সূরা নাযিলের সময় জিব্রাইল (আ.) অহী পড়াকালীন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহ্বা নেড়ে মুখস্থ করার চেষ্টা করতেন। এতে তাঁর কষ্ট হত। সেজন্য আল্লাহ বললেন : অহী তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার জন্য জিহ্বা নাড়বেন না। তা মুখস্থ করে দেয়া ও পড়ে দেয়া আমাদের দায়িত্ব। অতঃপর আমরা যখন তা পড়তে থাকি, তখন এর পাঠকে মনোযোগসহ শুনতে থাকেন। পরে তার তাৎপর্য বুঝিয়ে দেয়াও আমাদের দায়িত্বে রয়েছে (সূরা কেয়ামাহ # ৭৫ : ১৬-১৯)। অহী শুনার সাথে সাথে তা তাঁর মুখস্থ হয়ে যেত। তিনি সাহাবাদেরকে পড়ে শুনাতেন। তাঁরা তা মুখস্থ করে নিতেন। মুহাম্মদ (সা.) পড়তে বা লিখতে জানতেন না। সাহাবাগণের অনেকে বিশেষ করে মুহাম্মদ (সা.)-এর নির্দেশে যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.)ও কিছু সংখ্যক সাহাবা গাছের শুকনা ডাল, পাথর, হাঁড়, কাপড়ের টুকরা ইত্যাদিতে কোরআন লিখে রাখতেন।

কোরআনের অধিকাংশ সূরা খণ্ডে খণ্ডে বিভিন্ন সময়ে নাযিল হয়েছে। অহী নাযিলের পরে মুহাম্মদ (সা.) সাহাবাগণকে বলে দিতেন তা কোন সূরার অংশ। সে অনুসারে সূরাগুলোর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লিখা হয়েছে। আল্লাহ বলেন : কোরআন নাযিল করেছি খণ্ডে খণ্ডে যাতে আপনি (নবী সা.) লোকদের নিকট অল্প অল্প শুনাতে পারেন আর তা আমরা ক্রমশ নাযিল করেছি (সূরা বনী ইসরাইল # ১৭ : ১০৬)।

এ মহান কোরআনকে রক্ষা করার দায়িত্বে আল্লাহ নিজেই রয়েছেন। আল্লাহ বলেন : আমি যিকর (কোরআন) নাযিল করেছি, আমি তার রক্ষাকারী (সূরা হিজর # ১৫ : ৯)। রাসূলুল্লাহ (সা.) জীবিত থাকাকালে কোরআন একটি বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। যারা কোরআন মুখস্থ করেছিলেন, তাঁর ওফাতের পরে সে সকল হাফেযগণ একে একে মৃত্যুবরণ

www.nagorikpathagar.org

করছিলেন। বিশেষ করে ইয়ামামার যুদ্ধে চার শতাধিক এবং অন্যান্য যুদ্ধে অনেক হাফেয মারা যাওয়ায় কোরআন একটি বইতে লিপিবদ্ধ করে রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) কে হযরত ওমর (রা.) কোরআন সংকলন করানোর জন্য অনুরোধ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) যা করে যান নি তা করতে আবু বকর (রা.) প্রথমে ইতস্তত করলেও পরে এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে রাজি হলেন।

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) কে এ কাজের জন্য ডাকা হলে তিনি বলেছিলেন : ওহোদ পাহাড় সরিয়ে নেয়ার জন্য আমাকে আদেশ করলে আমি তা অতটুকু কষ্টকর মনে করতাম না। শেষ পর্যন্ত তিনি রাজি হলেন। তাঁর দায়িত্বাধীনে কোরআন সংকলনের কাজ শুরু হয়। কোরআন তাঁর মুখস্থ ছিল। অন্যান্য সাহাবাগণের নিকট থেকে তিনি সংরক্ষিত আয়াত বা সূরাসমূহ আনিয়ে মিলিয়ে নিতেন। আয়াতসমূহ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময় লিখিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য নিতেন। এরূপ সতর্কতার মধ্য দিয়ে কোরআনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কপি লিখা হয়। এ কপি হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর এটা দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.)-এর হাতে যায়। তাঁর পরে এটা তাঁর কন্যা এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর বিবিগণের একজন হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট রাখা হয়।

হযরত ওসমান (রা.)-এর খেলাফতকালে তিনি হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট থেকে সংকলিত উক্ত কপিটি চেয়ে নিয়ে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) কে প্রধান করে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আল যুবায়ের (রা.), হযরত সাঈদ ইবনে আল আস (রা.) ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আল হারিস ইবনে হিসাম (রা.)কে কোরআনের কপি করার দায়িত্ব দেন। তাঁরা সাতটি কপি করেন। ওসমান (রা.) এক কপি মদীনায় রেখে বাকী কপিগুলো মক্কা, সিরিয়া, বাহরাইন, বসরা ও কুফায় পাঠিয়ে দেন। মূল কপিটি হযরত হাফসা (রা.)কে ফেরত দেন। পরবর্তীতে যার নিকট যে সকল খণ্ড খণ্ড কপি ছিল সেগুলো পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন যাতে রহিত হওয়া এ সকল খণ্ডের অমর্যাদা না হয়। পড়ার সুবিধার জন্য পরবর্তীতে কোরআনে হরকত যোগ করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

আবু বকর (রা.) কর্তৃক সংকলিত কোরআন তখনও মদীনায় হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট রক্ষিত ছিল। পরে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসনকালে মদীনার শাসনকর্তা মারওয়ান এটা চাইলে হাফসা (রা.) তা তাঁকে দেননি। হাফসা (রা.)-এর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা.)-এর নিকট তা ছিল। শাসনকর্তা মারওয়ান পুনরায় তাঁর নিকট তা চাইলেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) তা মারওয়ানের হাতে অর্পণ করলেন। মারওয়ান তাকে খণ্ড খণ্ড করে আগুনে পুড়িয়ে ফেললেন এবং বললেন, পরবর্তীকালে যেন এর দ্বারা কোন বিবাদের সৃষ্টি না হতে পারে সে উদ্দেশ্যে এ ব্যবস্থা করা হলো (ফাতহুল বারী, বোখারী শরীফ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১১৪)।

কোরআনকে বিতর্কিত করার জন্য ইহুদী ও নাসারারা এর পেছনে লেগে আছে। এদিকে শিয়ারা একে বিতর্কিত করে ফেলেছে। তাদের মতে হযরত আলী (রা.) সর্বপ্রথম কোরআন সংকলন করেছেন। পরে যারা (সুন্নীরা) সংকলন করেছেন তারা অনেক আয়াত বাদ দিয়ে গেছেন। শিয়ারা কোরআনের কোন কোন আয়াতকে ভুল মনে করে। তাদের সংকলিত কোরআনে তাদের অনুকূলে অনেক আয়াত রয়েছে। এ সম্পর্কে আলোচনা না করাই ভাল। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তাঁর পরে মুসলমানদের মধ্যে ৭৩টি দল হবে। অতএব এরূপ হওয়া স্বাভাবিক।

পৃথিবীতে কোরআনের যে সকল কপি এখন পাওয়া যায়, এ সমস্তই (শিয়াদের বাদে) তৎকালীন সময়ে সংকলিত কোরআনের অনুরূপ। চৌদ্দশত বছর পরেও কোরআনের একটি অক্ষরও পরিবর্তিত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। কারণ আল্লাহ্ এর রক্ষক।

---

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর গুণবাচক ৯৯টি নাম

ﷲ (আল্লাহ্) : মহাবিশ্ব এবং এর মধ্যকার অগণিত সৃষ্টির যিনি স্রষ্টা তিনিই আল্লাহ। তিনি এক, তার কোন শরীক নেই– স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নেই। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। তন্দ্রা তাঁকে আচ্ছন্ন করে না। এক সময় গোটা বিশ্ব এবং এর মধ্যকার সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু তখনও তিনি থাকবেন এবং শেষ বিচারের বিচারক হবেন। তাঁর তুলনা শুধু তিনিই। আল্লাহ্ তাঁর জাত নাম। কেউ তাঁকে গড, কেউ ঈশ্বর, কেউ ভগবান এবং আরোও কত নামেই না তাঁকে ডাকা হয়। কিন্তু কোরআন বলে : যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন করবে; তাদের কৃত কর্মের ফল তাদেরকে দেয়া হবে (সূরা আরাফ # ৭ : ১৮০ এবং শেষাংশ)।

আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক (সূরা আরাফ # ৭ : ১৮০ এর প্রথমাংশ)। আপনি (নবী সা.) বলে দিন, "আল্লাহ" বলে ডাক কিংবা "রহমান" বলে ডাক– যে নামেই ডাক না কেন সকল সুন্দর নাম তাঁরই (সূরা বনী ইসরাইল # ১৭ : ১১০)। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ নাম ২৬৯৮ বার রয়েছে। তাঁর গুণবাচক নামসমূহ কোরআনের বহু আয়াতে রয়েছে। আবু হোরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর নিরানব্বই তথা এক কম একশত (গুণবাচক) নাম রয়েছে (বোখারী শরীফ # ২৪১৭)। আল্লাহর ৯৯টি গুণবাচক নাম পবিত্র কোরআনের আয়াত ও অর্থসহ বর্ণনা করা হলো :

(১) রহমান ঃ অর্থ : পরম করুণাময়।

(২) রাহীম ঃ অর্থ : অসীম দয়ালু ও দাতা।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম অর্থ ঃ পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। সূরা তওবা ছাড়া কোরআনের প্রত্যেক সূরার শুরুতে এটা পাঠ করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

(৩) **মালেক** ঃ অর্থ : মালেক, অধিশ্বর।

(৪) **কুদ্দুস** ঃ অর্থ : অতীব পবিত্র।

(৫) **সালাম** ঃ অর্থ : শান্তিদাতা।

(৬) **মু'মিন** ঃ অর্থ : নিরাপত্তাদাতা।

(৭) **মুহাইমিন** ঃ অর্থ : রক্ষাকারী।

(৮) **আজীজ** ঃ অর্থ : পরাক্রমশালী।

(৯) **জাব্বার** ঃ অর্থ : প্রবল।

(১০) **মুতাকাববির** ঃ অর্থ : মাহাত্ম্যশীল।

হুওয়াল্লাহুল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়া, আলমালিকুল কুদ্দুসুস সালামুল মু'মিনুল মুহাইমিনুল আজিজুল জাব্বারুল মুতাকব্বির সুবহানাল্লাহি আম্মা ইউশরিকুন (সূরা হাশর # ৫৯ : ২৩)। অর্থ ঃ তিনিই আল্লাহ যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি মালেক, অতীব পবিত্র, শান্তি-নিরাপত্তাদাতা, রক্ষাকারী, পরাক্রমশালী, প্রবল, মাহাত্ম্যশীল। তারা যাকে অংশীদার করে তা থেকে তিনি পবিত্র।

(১১) **খালিক** ঃ অর্থ : সৃষ্টিকর্তা।

ইকরা বিসমি রব্বিকাল্লাযী খালাক (সূরা আলাক # ৯৬ : ১)। অর্থ ঃ পড়ুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।

(১২) **বারী** ঃ অর্থ : উদ্ভাবক।

(১৩) **মুসাব্বির** ঃ অর্থ : রূপদাতা।

হুওয়াল্লাহুল খালিকুল বারীউল মুসাব্বিরু লাহুল আসমাউল হুসনা (সূরা হাশর # ৫৯ : ২৪)। অর্থ ঃ তিনি আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, তাঁর বহু সংখ্যক উত্তম নাম আছে।

www.nagorikpathagar.org

(১৪) গাফফার ঃ অর্থ : ক্ষমাশীল।

ইন্না রাব্বী গাফুরুর রাহীম (সূরা ইউসুফ # ১২ : ৫৩)। অর্থ : আমার পালনকর্তা, ক্ষমাশীল, দয়ালু।

(১৫) কাহ্হার ঃ অর্থ : পরাক্রান্ত।

ইয়াওমা তুবাদ্দালুল আরদু গাইরাল আরদি ওয়াসসামাওয়াতু ওয়া বারাজু লিল্লাহিল ওয়াহিদিল কাহ্হার। ওয়া তারাল মুজরিমিনা ইয়াওমায়িযিম মুকাররানিনা ফিল আসফাদ (সূরা ইব্রাহীম # ১৪ : ৪৮-৪৯)। অর্থ ঃ যেদিন এ পৃথিবী বলদিয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমণ্ডলীও, আর মানুষ হাজির হবে এক পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে। সেদিন দেখবে অপরাধীগণের হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ।

(১৬) ওহ্হাব ঃ অর্থ : মহানদাতা।

রাব্বানা লাতুজিগ কুলুবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রহমাতান, ইন্নাকা আনতাল ওহ্হাব (সূরা আলে ইমরান # ৩ : ৮)। অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরকে সত্য লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত করো না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর, নিশ্চয়ই তুমি মহান দাতা।

(১৭) রাজ্জাক ঃ অর্থ : রিযিকদাতা।

ইন্নাল্লাহা হুয়ার রাজ্জাকু যুল কুওয়্যাতিল মাতীন (সূরা আযযারিয়াত # ৫১ : ৫৮)। অর্থ ঃ আল্লাহই রিযিকদাতা, শক্তিধর, পরাক্রান্ত।

(১৮) ফাত্তাহ্ ঃ অর্থ : ফয়সালাকারী।

ওয়া হুয়াল ফাত্তাহুল আলীম (সূরা সাবা # ৩৪ : ২৬)। অর্থ ঃ আর তিনি ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞ।

(১৯) আলীম ঃ অর্থ : মহাজ্ঞানী।

ওয়া কানাল্লাহু শাকিরান আলীমা (সূরা নিসা # ৪ : ১৪৭)। অর্থ ঃ বস্তুত আল্লাহ অতিশয় গুণজ্ঞ মহাজ্ঞানী।

www.nagorikpathagar.org

(২০) কাবিদ ঃ অর্থ : সংকোচনকারী।

(২১) বাসিত ঃ অর্থ : প্রসারকারী।

ওয়াল্লাহু ইয়াকবিদু ওয়া ইয়াবসুতু, ওয়া ইলাইহি তুরজাউন (সূরা বাকারা # ২ : ২৪৫)। অর্থ ঃ আল্লাহ্ সংকোচন ও প্রসারকারী এবং তাঁরই নিকট সকলে ফিরে যাবে।

(২২) খাফিদ ঃ অর্থ : নিচুকারী।

ইযা ওয়াকিয়াতিল ওয়াকিয়াত; লাইসা লিওয়াকআতিহা কাযিবাতু। খাফিদাতুর রাফিআত (সূরা ওয়াকিয়াহ্ # ৫৬ : ১-৩)। অর্থ ঃ যখন কেয়ামত সংঘটিত হবে, যার বাস্তবতায় কোন সংশয় নেই। কাউকেও করবে নিচু কাউকেও করবে উন্নত।

(২৩) রাফি ঃ অর্থ : মর্যাদাদানকারী।

তিলকাররুসুলু ফাদ্দালনা বা'আদাহুম আলা বা'আদি। মিনহুম মান কাল্লামাল্লাহু ওয়া রাফাআ বাআদাহুম দারাজাতি (সূরা বাকারা # ২ : ২৫৩)। অর্থ ঃ এ রাসূলগণের কাউকেও অন্য জনের উপর মর্যাদা দান করেছি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্র সাথে কথা বলেছেন।

(২৪) মালিকাল মুলক ঃ অর্থ : সাম্রাজ্যের মালিক।

(২৫) মুয়িযযু ঃ অর্থ : সম্মানদাতা।

(২৬) মুযিল্লু ঃ অর্থ : লাঞ্ছিতকারী।

কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মুলকি তুতিল মুলকা মান তাশা-উ ওয়া তানযিউল মুলকা মিম্মান তাশা-উ, ওয়া তুয়িযযু মান তাশা-উ ওয়া তুযিল্লু মান তাশা-উ, বিইয়াদিকাল খাইর (সূরা আল ইমরান # ৩ : ২৬)। অর্থ ঃ বলুন, হে আল্লাহ! তুমি সাম্রাজ্যের মালিক। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা রাজ্য কেড়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত কর। তোমারই হাতে সকল কল্যাণ, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশক্তিমান।

www.nagorikpathagar.org

(২৭) সামীউ ঃ অর্থ : শ্রবণকারী।

রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না, ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলীম (সূরা বাকারা # ২ : ১২৭)। অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ কাজ তুমি কবুল কর; নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী সর্বজ্ঞ।

(২৮) বাসির ঃ অর্থ : সর্বদ্রষ্টা।

ইন্নাহু বিইবাদিহি খাবিরুম বাসীর (সূরা আশ-শূরা # ৪২ : ২৭)। অর্থ : নিশ্চয়ই তিনি স্বীয় বান্দাদের সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, সর্বদর্শী।

(২৯) হাকাম ঃ অর্থ : আদেশ দানকারী, বিচারক।

আফাগাইরাল্লাহি আফতাগী হাকামা-উ ওয়া হুয়াল্লাযী আনযালা ইলাইকুমুল কিতাবা মুফাসসালা (সূরা আনআম # ৬ : ১১৪)। অর্থ ঃ তবে কি আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন বিচারক খোঁজ করব; অথচ তিনি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট কিতাব নাযিল করেছেন।

(৩০) আদল ঃ অর্থ : ন্যায় বিচারক।

ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ই-তা-ইযিল কোরবা ওয়া ইয়ানহা আনিল ফাহশা-ই ওয়ালমুনকারি ওয়াল বাগই ইয়াইযুকুম লাআল্লাকুম তাযাককারুন (সূরা নাহল # ১৬ : ৯০)। অর্থ ঃ আল্লাহ নির্দেশ দেন ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও স্বজনদের দান করার জন্য এবং তিনি নিষেধ করেন পাপাচার, অন্যায় ও ধৃষ্টতা থেকে, তিনি উপদেশ দেন তোমাদের শিক্ষার জন্য।

(৩১) লতিফ ঃ অর্থ : সূক্ষ্মদর্শী।

লা তুদরিকুহুল আবসারু; ওয়া হুওয়া ইউদুরিকুল আবসার; ওয়া হুয়াল লাতিফুল খাবীর (সূরা আনআম # ৬ : ১০৩)। অর্থ ঃ দৃষ্টিসমূহ তাঁকে পেতে পারে না, অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহকে পেতে পারেন, তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী, সুবিজ্ঞ।

www.nagorikpathagar.org

(৩২) খাবীর ঃ অর্থ : সুবিজ্ঞ, সর্বজ্ঞানময়।

ওয়াল্লাহু খাবীরুম বিমা তা'মালুন (সূরা আলে ইমরান # ৩ : ১৫৩)। অর্থ ঃ বস্তুত আল্লাহ সর্বজ্ঞানময়।

(৩৩) হালীম ঃ অর্থ : ধৈর্যশীল।

ওয়াল্লাহু গাফুরুন হালীম (সূরা বাকারা # ২ : ২২৫)। অর্থ ঃ আর আল্লাহ ক্ষমাকারী, ধৈর্যশীল।

(৩৪) আযীম ঃ অর্থ : মহান উন্নত।

ফাসাব্বিহ বিসমি রাব্বিকাল আযীম (সূরা ওয়াকিয়াহ # ৫৬ : ৭৪)। অর্থ ঃ অতএব আপনি আপনার মহান উন্নত পালনকর্তার নামে পবিত্রতা ঘোষণা করুন।

(৩৫) সাবুর ঃ অর্থ : সবরকারী, ধৈর্যশীল।

ওয়াবাশশিরিস ছোয়াবিরীন (সূরা বাকারা # ২ : ১৫৫)। অর্থ ঃ আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদেরকে।

(৩৬) আলীই ঃ অর্থ : সুউচ্চ।

(৩৭) কাবীর ঃ অর্থ : সুমহান।

যালিকা বিআন্নাল্লাহা হুয়াল হাক্কু ওয়া আন্নামা ইয়াদয়ুনা মিন দুনিহি হুয়াল বাতিলু ওয়া আন্নাল্লাহা হুয়াল আলিইয়্যুল কাবীর (সূরা হজ্জ # ২২ : ৬২)। অর্থ ঃ এটা এজন্য যে, আল্লাহই প্রকৃত সত্য, আর সেসব কিছুই বাতিল (মিথ্যা) যাদেরকে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে ডাকে, আর তিনি সুউচ্চ সুমহান।

(৩৮) শাকুর ঃ অর্থ : গুণগ্রাহী।

ইন তুকরিদুল্লাহা কারদান হাসানাই য়ুদাইফহু লাকুম ওয়া ইউগফির লাকুম; ওয়াল্লাহু শাকুরুন হালীম (সূরা তাগাবুন # ৬৪ : ১৭)। অর্থ ঃ যদি আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও তিনি তা তোমাদের জন্য বহুগুন বৃদ্ধি করে দেবেন এবং ক্ষমা করে দেবেন, আর আল্লাহ অতিশয় গুণগ্রাহী ধৈর্যশীল।

www.nagorikpathagar.org

(৩৯) হাফিয ঃ অর্থ : রক্ষাকারী।

ওয়া রাব্বুকা আলা কুল্লি শাইয়িন হাফিয (সূরা সাবা # ৩৪ : ২১)। অর্থ ঃ তোমার প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুর রক্ষাকারী।

(৪০) মুকিত ঃ অর্থ : ক্ষমতাবান।

ওয়াকানাল্লাহু আলা কুল্লি শাইয়িন মুকিতা (সূরা নিসা # ৪ : ৮৫)। অর্থ ঃ বস্তুত আল্লাহ্ সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

(৪১) জলিল ঃ অর্থ : মহিমান্বিত।

তাবারাকাসমু রাব্বিকা যিল জালালি ওয়াল ইকরাম (সূরা আররহমান # ৫৫ : ৭৮)। অর্থ ঃ কত উচ্চ তোমার প্রতিপালকের নাম– তিনি মহিমান্বিত ও সম্মানিত।

(৪২) কারীম ঃ অর্থ : সম্মানিত।

ইন্নাহু লাকাউলু রাসূলিন কারীম (সূরা হাক্কাহ # ৬৯ : ৪০)। অর্থ ঃ এটা নিশ্চয়ই এক মহাসম্মানিত রাসূলের বাণী।

(৪৩) রাকীব ঃ অর্থ : প্রহরী।

ওয়া কানাল্লাহু আলা কুল্লি শাইয়িন রাকীবা (সূরা আহযাব # ৩৩ : ৫২)। অর্থ ঃ আর আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর সজাগ প্রহরী।

(৪৪) মুজিব ঃ অর্থ : ডাকে সাড়া দানকারী।

ইন্না রাব্বি কারীবুম মুজিব (সূরা হূদ # ১১ : ৬১)। অর্থ ঃ আমার পালনকর্তা নিকটেই, সাড়া দেন ডাকে।

(৪৫) হাকীম ঃ অর্থ : মহাজ্ঞানী।

কালু সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা আল্লামতানা; ইন্নাকা আনতাল আলীমুল হাকীম (সূরা বাকারা # ২ : ৩২)। অর্থ ঃ (ফেরেশতারা) বলল, আপনি পবিত্র, যা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন তাছাড়া আমরা কিছুই জানি না, আপনি মহাজ্ঞানী হেকমতওয়ালা।

www.nagorikpathagar.org

(৪৬) ওয়াসিউ ঃ অর্থ : প্রাচুর্যশালী।

কুল ইন্নাল ফাদলা বিয়াদিল্লাহি, ইউতিহি মাইয়াশাউ, ওয়াল্লাহু ওয়াসিউন আলীম (সূরা আলে ইমরান # ৩ : ৭৩)। অর্থ ঃ বলে দিন কল্যাণ কেবল আল্লাহরই হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন; আর আল্লাহ প্রাচুর্যশীল ও জ্ঞানী।

(৪৭) ওয়াদুদ ঃ অর্থ : প্রেমময়।

ওয়া হুয়াল গাফুরুল ওয়াদুদ (সূরা বুরূজ # ৮৫ : ১৪)। অর্থ ঃ আর তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়।

(৪৮) মাজীদ ঃ অর্থ : মহিমান্বিত।

ওয়া হুয়াল গাফুরুল ওয়াদুদ, যুল আরশিল মাজীদ (সূরা আল-বুরূজ # ৮৫ : ১৪-১৫)। অর্থ ঃ আর তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়। মহিমান্বিত আকাশের অধিপতি।

(৪৯) বায়িছ ঃ অর্থ : পুনরুত্থানকারী।

ওয়া আন্নাস সাআতা আতিয়াতুল লারাইবা ফিহা ওয়া আন্নাল্লাহা ইয়াবয়াছু মান ফিল কুবুর (সূরা হজ্জ # ২২ : ৭)। অর্থ ঃ কেয়ামত আসবেই তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং আল্লাহ কবরবাসীগণকে পুনরুত্থিত করবেন।

(৫০) শাহীদ ঃ অর্থ : সাক্ষী।

কুল ইয়া আহলাল কিতাবি লিমা তাকফুরুনা বিআয়াতিল্লাহ, ওয়াল্লাহু শাহীদুন আলা মা তা'মালুন (সূরা আলে ইমরান # ৩ : ৯৮)। অর্থ ঃ বলুন, হে কিতাবধারীগণ, কেন তোমরা আল্লাহর বিধান অমান্য করছ, অথচ তোমরা যা করছ আল্লাহ সে বিষয়ে সাক্ষী রয়েছেন।

(৫১) হাককু ঃ অর্থ : সত্যিকার।

ফাতাআলাল্লাহুল মালিকুল হাককু (সূরা তাহা # ২০ : ১১৪)। অর্থ ঃ আল্লাহ উচ্চ মর্যাদাশীল সত্যিকার অধিশ্বর।

www.nagorikpathagar.org

(৫২) ওয়াকীল ঃ অর্থ : কার্যনির্বাহক।

ওয়া তাওয়াক্কাল আলাল্লাহি ওয়া কাফা বিল্লাহি ওয়াকীলা (সূরা আহযাব # ৩৩ : ৩)। অর্থ ঃ আর আপনি আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। আল্লাহ যথেষ্ট কার্যনির্বাহক।

(৫৩) কাভিউ ঃ অর্থ : শক্তিধর।

মা কাদারুল্লাহা হাককা কাদরিহি; ইন্নাল্লাহ লাকাবিয়্যুন আযীয (সূরা হজ্জ # ২২ : ৭৪)। অর্থ ঃ তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মর্যাদা বুঝেনি, নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।

(৫৪) মাতিন ঃ অর্থ : অটল শক্ত।

ওয়াউমলী লাহুম; ইন্না কাইদি মাতিন (সূরা আরাফ # ৭ : ১৮৩)। অর্থ ঃ আমি তাদেরকে অবকাশ দেই, আমার কৌশল শক্ত।

(৫৫) ওয়ালিয়্যু ঃ অর্থ : বন্ধু।

ওয়ামা লাকুম মিনদুনিল্লাহি ওয়ালিয়্যু ওয়ালা নাসির (সূরা বাকারা # ২ : ১০৭)। অর্থ : আর আল্লাহ ছাড়া কোন বন্ধু এবং সাহায্যকারী নেই।

(৫৬) হামিদ ঃ অর্থ : প্রশংসাভাজন।

লাহু মা ফিসসামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদ, ওয়া ইন্নাল্লাহা লাহুয়াল হামিদ (সূরা হজ্জ # ২২ : ৬৪)। অর্থ ঃ আসমান ও জমিনের সব কিছু তাঁরই, আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসাভাজন।

(৫৭) মুহসী ঃ অর্থ : সর্বজ্ঞানী।

ওয়া কুল্লা শাইয়িন আহসাইনাহু কিতাবা (সূরা নাবা # ৭৮ : ২৯)। অর্থ ঃ আমি তাদের প্রতিটি কাজ আমলনামায় লিখে রেখেছি।

(৫৮) মুবদিউ ঃ অর্থ : প্রথম সৃজনকারী।

(৫৯) মুয়িদ ঃ অর্থ : পুনরায় জীবিতকারী।

www.nagorikpathagar.org

ইন্নাহু হুয়া ইউবদিউ ওয়া ইউইদু (সূরা বুরূজ # ৮৫ : ১৩)। অর্থ ঃ তিনি প্রথম সৃজনকারী এবং পুনরায় জীবিতকারী।

(৬০) মুহয়ী ঃ অর্থ : জীবনদাতা।

(৬১) মুমিতু ঃ অর্থ : মৃত্যুদাতা।

ইয কালা ইব্রাহীমু রব্বিইয়াল্লাযী ইউহয়ী ওয়া ইউমিতু, কালা আনা উহয়ী ওয়া উমিত (সূরা বাকারা # ২ : ২৫৮)। অর্থ ঃ ইব্রাহীম যখন বললেন, আমার প্রভু এমনি যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান, সে (নমরূদ) বলল, আমিও জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই।

(৬২) হাইউ ঃ অর্থ : চিরজীবন্ত।

(৬৩) কইয়্যুম ঃ অর্থ : সংরক্ষণকারী।

আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইউল কইয়্যুম (সূরা বাকারা # ২ : ২৫৫)। অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সব কিছুর সংরক্ষণকারী।

(৬৪) ওয়াজিদ ঃ অর্থ : ইচ্ছা করা মাত্র হওয়ার অধিকারী।

আলাম ইয়াজিদকা ইয়াতীমান ফা-আওয়া (সূরা দুহা # ৯৩ : ৬)। অর্থ ঃ তিনি কি আপনাকে এতীমরূপে পাননি এবং আশ্রয় দেননি?

(৬৫) মাজিদ ঃ অর্থ : মহান।

ওয়া হুয়াল গাফরুল ওয়াদুদ। যুল আরশিল মাজীদ (সূরা বুরূজ # ৮৫ : ১৪-১৫)। অর্থ ঃ তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়, মহান আরশের অধিপতি।

(৬৬) ওয়াহিদ ঃ অর্থ : অদ্বিতীয়।

কুলিল্লাহু খালিকু কুল্লি শাইয়াও ওয়া হুয়াল ওয়াহিদুল কাহহার (সূরা রাদ # ১৩ : ১৬)। অর্থ ঃ বল, আল্লাহই সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, অদ্বিতীয়, সকলের উপর বিজয়ী।

(৬৭) আহাদ ঃ অর্থ : একমাত্র আল্লাহ।

www.nagorikpathagar.org

(৬৮) সামাদ ঃ অর্থ : অভাবহীন।

কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ (সূরা ইখলাস # ১১২ : ১-২)। অর্থ ঃ বলুন, তিনি আল্লাহ এক, আল্লাহ অভাবহীন।

(৬৯) কাদির ঃ অর্থ : ক্ষমতাবান, সর্বশক্তিমান।

ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির (সূরা ফাতির # ৩৫ : ২)। অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

(৭০) মুকাতাদির ঃ অর্থ : মহাশক্তিধর।

ইন্নাল মুত্তাকীনা ফি জান্নাতিও ওয়া নাহার। ফি মাকআদি সিদকিন ইনদা মালিকিন মুকতাদির (সূরা কমার # ৫৪ : ৫৪-৫৫)। অর্থ ঃ মুত্তাকীরা থাকবে নদী বিধৌত জান্নাতে। মহাশক্তিধর মালিকের সত্যধামে আসন গ্রহণ করবে।

(৭১) মুকাদ্দিমু ঃ অর্থ : ত্বরান্বিতকারী।

ওয়া লাউ ইউ-আখিযুল্লাহুন্নাসা বিযুলমিহিম মা তারাকা আলাইহা মিন দাব্বাতিও ওয়ালাকিউ ইউআখখিরুহুম ইলা আজালিম মুসাম্মা, ফাইযা জা-আ আজালুহুম লাইয়াস্তা'খিরুনা সা-আতাউ ওয়ালা ইয়াস্তাকদিমুন (সূরা নাহল # ১৬ : ৬১)। অর্থ ঃ আল্লাহ মানুষকে তাদের অপরাধের জন্য শাস্তি দিলে জমিনে কোন জীব জানোয়ারই রেহাই পেত না। কিন্তু তিনি প্রতিশ্রুত সময় পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে যখন মৃত্যু এসে যাবে তখন এক মুহূর্তও বিলম্বিত অথবা ত্বরান্বিত করতে পারবে না।

(৭২) মুয়াখখিরু ঃ অর্থ : অবকাশদাতা।

ইয়াগফিরলাকুম মিন যুনুবিকুম ওয়াইউ আখখিরুকুম ইলা আজালিম মুসাম্মা; ইন্না আজালাল্লাহি ইযা জা-আ লা ইউখখার; লাও কুনতুম তা'লামুন (সূরা নূহ # ৭১ : ৪)। অর্থ ঃ আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং নির্দিষ্ট সময় (মৃত্যু) পর্যন্ত অবকাশ দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহর নির্দিষ্টকাল যখন হবে তখন অবকাশ দেয়া হবে না, যদি তোমরা তা জানতে।

www.nagorikpathagar.org

(৭৩) আউয়াল ঃ অর্থ : আদি, প্রথম।

(৭৪) আখির ঃ অর্থ : অনন্ত, সর্বশেষ।

(৭৫) জাহির ঃ অর্থ : প্রকাশ্য।

(৭৬) বাতেন ঃ অর্থ : অপ্রকাশ্য, গোপন।

হুয়াল আউয়্যালু ওয়াল আখিরু ওয়াজ্জাহিরু ওয়াল বাতিন, ওয়া হুয়া বিকুল্লি শাইয়িন আ'লীম (সূরা হাদীদ # ৫৭ : ২)। অর্থ ঃ তিনিই (আল্লাহ) প্রথম ও সর্বশেষ এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, তিনি প্রত্যেক বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।

(৭৭) ওয়ালি ঃ অর্থ : অভিভাবক।

ইন্না ওয়ালিয়্যি ইয়াল্লা-হুল্লাযী নাযযালাল কিতাবা, ওয়া হুয়া ইয়াতাওয়াল্লাস সালিহীন (সূরা আরাফ # ৭ : ১৯৬)। অর্থ ঃ আমার অভিভাবক আল্লাহ, যিনি অবতীর্ণ করেছেন কিতাব, তিনি সৎকর্মশীলদের অভিভাবক।

(৭৮) মুতায়ালী ঃ অর্থ : মহাউন্নত।

আলিমুল গাইবি ওয়াশশাহাদাতিল কাবীরুল মুতাআল (সূরা রাদ # ১৩ : ৯)। অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ) গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে পরিজ্ঞাত। তিনি মহান, মহা উন্নত।

(৭৯) বাররু ঃ অর্থ ঃ অনুগ্রহকারী।

ইন্না কুন্না মিন কাবলু নাদউহু; ইন্নাহু হুয়াল বাররুর রাহীম (সূরা তুর # ৫২ : ২৮)। অর্থ ঃ আগেও আমরা তাকে ডাকতাম; তিনি বড়ই অনুগ্রহকারী ও মেহেরবান।

(৮০) তাওয়াবু ঃ অর্থ ঃ ক্ষমা মঞ্জুরকারী।

আলাম ইয়ালামু আন্নাল্লাহা হুয়া ইয়াকবালুত তাওবাতা আন ইবাদিহী ওয়া ইয়াখুজুস সাদাকাতি ওয়া আন্নাল্লাহা হুয়াত তাওওয়াবুর রাহীম

www.nagorikpathagar.org

(সূরা তওবা # ৯ : ১০৪)। অর্থ ঃ তারা কি জানে না আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং সদকা গ্রহণ করেন, আল্লাহ ক্ষমা মঞ্জুরকারী, দয়াময়।

(৮১) মুনতাকীম ঃ অর্থ ঃ প্রতিফলদাতা।

ফাইম্মা নাজহাবান্না বিকা ফাইন্না মিনহুম মুনতাকিমুন (সূরা যুখরুফ # ৪৩ : ৪১)। অর্থ ঃ তোমাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিলেও আমরা তাদেরকে অবশ্যই শাস্তি দেব।

(৮২) আফুয়্যু ঃ অর্থ ঃ ক্ষমাকারী।

ইন্নাল্লাহা কা-না আফুওয়্যান গফুরা (সূরা নিসা # ৪ : ৪৩)। অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ বড় ক্ষমাকারী- ক্ষমাশীল।

(৮৩) রাউফ ঃ অর্থ ঃ মেহেরবান।

ইন্নাল্লাহা বিন্নাসি লারাউফুর রাহীম (সূরা বাকারা # ২ : ১৪৩)। অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অতিশয় মেহেরবান দয়ালু।

(৮৪) মালিকি ইয়াওমিদদীন ঃ অর্থ : বিচার দিনের মালিক।

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ-লামীন। আররাহমানির রাহীম। মালিকি ইয়াওমিদদীন (সূরা ফাতিহা # ১ : ১-৩)। অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি নিখিল জাহানের রব। যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক।

(৮৫) যালজালালি ওয়াল ইকরাম ঃ অর্থ : সর্বমহত্ত্ব ও গৌরবের অধিকারী।

কুল্লুমান আলাইহা ফানিও, ওয়া ইয়াবকা ওয়াজহু রাব্বিকা যুলজালালি ওয়াল ইকরাম (সূরা আর-রহমান # ৫৫ : ২৬-২৭)। অর্থ ঃ ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত সমস্তই ধ্বংসশীল। আর একমাত্র সর্বমহত্ত্ব ও গৌরবের অধিকারী রবের সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে।

www.nagorikpathagar.org

(৮৬) রব ঃ অর্থ : পালনকর্তা, প্রভু।

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন (সূরা ফাতিহা # ১ : ১)। অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা, প্রভু।

(৮৭) মুকসিত ঃ অর্থ : সুবিচারক, ন্যায়পরায়ণ।

ওয়া ইন হাকামতা ফাহকুম বাইনাহুম বিলকিসতি, ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুকসিতিন (সূরা মায়েদা # ৫ : ৪২)। অর্থ ঃ আর যদি মীমাংসা কর তবে তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে মীমাংসা কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকদেরকে ভালবাসেন।

(৮৮) জামিউ ঃ অর্থ : একত্রকারী।

ওয়া তারকনা বাদাহুম ইয়াওমাইযি ইয়ামুযু ফি বাদিও ওয়া নুফিখা ফিসসুরি ফাজামাআনাহুম জামআ (সূরা কাহফ # ১৮ : ৯৯)। অর্থ ঃ আর আমরা যেদিন তাদেরকে ছেড়ে দেব সেদিন তারা তরঙ্গাকারে দলে দলে ছুটবে এবং শিঙ্গায় ফুৎকার হলে তাদেরকে একত্র করব।

(৮৯) গনি ঃ অর্থ : অভাবমুক্ত, সম্পদশালী।

ইয়া আইয়্যুহান্নাসু আনতুমুল ফুকারাউ ইলাল্লাহি, ওয়াল্লাহু হুয়াল গনিউল হামীদ (সূরা ফাতির # ৩৫ : ১৫)। অর্থ ঃ হে মানুষ, তোমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী, আর আল্লাহ তিনি অভাবমুক্ত প্রশংসিত।

(৯০) মুগনি ঃ অর্থ : পরিবর্তনকারী।

ওয়া আন্নাহু হুয়া আগনা ওয়া আকনা (সূরা নাজম # ৫৩ : ৪৮)। অর্থ ঃ আর তিনি ধনী করেন এবং সম্পদ দান করেন।

(৯১) হাসিব ঃ অর্থ : হিসাব গ্রহণকারী।

ওয়া ইযা হাইয়্যিতুম বিতাহিয়্যাতিন ফাহাইয়্যু বিআহসানা মিনহান আও রুদ্দুহা; ইন্নাল্লাহা কানা আলা কুল্লি শাইয়িন হাসিবা (সূরা নিসা # ৪ : ৮৬)। অর্থ ঃ আর যখন তোমাদেরকে সালাম দেয়া হয়, তখন তোমরা এর উত্তরে তদপেক্ষা উত্তম সালাম কর অথবা অনুরূপভাবে বল, নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।

www.nagorikpathagar.org

(৯২) মাওলা ঃ অর্থ : অভিভাবক।

ওয়া ইন তাওয়াল্লাউ ফালামু আন্নাল্লাহা মাওলাকুম; নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান্নাসির (সূরা আনফাল # ৮ : ৪০)। অর্থ ঃ আর তারা যদি নাই মানে তবে জেনে রাখ, আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক, তিনিই সর্বোত্তম সাহায্যকারী।

(৯৩) দাররু ঃ অর্থ : বিপদদাতা।

আম হাসিবতুম আন তাদখুলুল জান্নাতা ওয়া লাম্মা ইয়াতিকুম মাছালুল্লাযিনা খলাও মিন কাবলিকুম মাসসাতিহুমুল বা'সাউ ওয়াদ্দাররাউ ওয়া জুলজিলু হাত্তা ইয়াকুলার রাসূলু ওয়াল্লাযীনা আমানু মাআহু মাতা নাসরুল্লাহি, আলা ইন্না নাসরাল্লাহি করীব (সূরা বাকারা # ২ : ২১৪)। অর্থ ঃ তোমরা যদি মনে কর যে, তোমরা বেহেশতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমাদের উপর এখনও তোমাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় বিপদাপদ আসেনি; তাদের উপর বহু অভাব অনটন ও বিপদাপদ এমনভাবে এসেছিল যাতে রাসূল ও ঈমানদারগণ বলতে বাধ্য হয়েছে যে, কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে, তোমরা শুনে রাখ আল্লাহর সাহায্য নিকটে।

(৯৪) নূরু ঃ অর্থ : জ্যোতি।

আল্লাহু নূরুসসামাওয়াতি ওয়াল আরদ (সূরা নূর # ২৪ : ৩৫)। অর্থ ঃ আল্লাহ্ আসমান ও জমিনের জ্যোতি।

(৯৫) হাদী ঃ অর্থ : পথ প্রদর্শক।

ওয়া মা জায়ালনাল কিবলাতাল লাতী কুনতা আলাইহা ইল্লা লিনা লামা মাইয়াত্তাবিউর রাসূলা মিম্মাই ইয়ানকলিবু আলা আকিবাইহি; ওয়া ইন কানাত লাকাবীরাতান ইল্লা আলাল্লাযীনা হাদাল্লাহু (সূরা বাকারা # ২ : ১৪৩)। অর্থ ঃ আর তুমি যার উপর ছিলে তাকে এজন্য কিবলা করেছিলাম যাতে আমরা জানতে পারি কোন ব্যক্তি রাসূলের অনুকরণ করে, তাদের মধ্যে কারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে চায়, এ ব্যাপারটি বড় কঠিন ছিল, কিন্তু যাদেরকে সুপথ দেখিয়েছেন আল্লাহ্, তাদের জন্য নয়।

www.nagorikpathagar.org

(৯৬) বা'দি ঃ অর্থ : সর্বপ্রথম সৃষ্টিকর্তা ।

বাদিউস সামাওয়াতী ওয়াল আরদ (সূরা আনআম # ৬ : ১০১)। অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ্) আকাশ ও পৃথিবীর প্রথম সৃষ্টিকর্তা ।

(৯৭) বাকি ঃ অর্থ : অনন্ত ।

ওয়ামা উতিতুম মিন শাইয়িন ফামাতাউল হায়াতিদ্দুনিয়া ওয়া ফিনাতুহা, ওয়ামা ইনদাল্লাহি খাইরুউ ওয়া আবকা, আফালা তাকিলুন (সূরা কাসাস # ২৮ : ৬০)। অর্থ ঃ যা কিছু তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে তা পার্থিব সামগ্রী ও এর চাকচিক্য মাত্র, আর যা আল্লাহ্র কাছে রয়েছে তা উত্তম ও অনন্ত, তোমরা তা বুঝ না ।

(৯৮) ওয়ারিস ঃ অর্থ : স্বত্ত্বাধিকারী ।

ওয়া জাকারিয়া ইজনা-দা রাব্বাহু রাব্বি লা-তাজারনী ফারদাও ওয়া আনতা খাইরুল ওয়ারিছীন (সূরা আম্বিয়া # ২১ : ৮৯)। অর্থ ঃ জাকারিয়ার কথা স্মরণ কর, সে স্বীয় রবকে ডাকল, "হে আমার রব, আমাকে সন্তানহীন রেখ না, তুমি তো উত্তম স্বত্ত্বাধিকারী ।

(৯৯) রশিদ ঃ অর্থ : সুষ্ঠু ও সঠিকরূপে পূর্ণকারী ।

ইয আওয়াল ফিতইয়াতু ইলাল কাহফি ফাকালু রাব্বানা আতিনা মিল্লাদুনকা রহমাতাও ওয়া হায়্যিলানা মিন আমরিন রাশাদা (সূরা কাহফ # ১৮ : ১০)। অর্থ ঃ যুবকেরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে বলল, হে আমাদের প্রতিপালক নিজ থেকে তুমি আমাদেরকে বিশেষ রহমত দান কর এবং আমাদের সমস্ত ব্যাপারটি সুষ্ঠু ও সঠিকরূপে পূর্ণ কর ।

কোন কোন বর্ণনাকারীর বর্ণনায় উল্লিখিত নামগুলোর মধ্যে দু'চারটি নাম নেই এবং তদস্থলে অন্য নাম আছে। আবার দোয়া দরূদে কিছু নামের ব্যবহার আছে। কিন্তু পবিত্র কোরআনে হুবহু পাওয়া যায়নি। যেমন : সাদিক (অর্থ- সত্যবাদী), সাত্তার (অর্থ- দোষ গোপনকারী), মানিউ (অর্থ- নিষেধকারী), নাফিউ (অর্থ- সুফলদাতা), মুনইম (অর্থ- সম্পদদাতা) এবং আরো অনেক ।

www.nagorikpathagar.org

আবু হোরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর নিরানব্বই তথা এক কম একশত (গুণবাচক) নাম রয়েছে। তার কোন দোসর নেই- জোড়া নেই- তিনি বেজোড়, বেজোড়কে তিনি বেশী পছন্দ করেন। যে কোন ব্যক্তি ঐসব নামকে আয়ত্ত করবে, সে বেহেশত লাভ করবে (বোখারী শরীফ # ২৪১৭)।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ আয়ত্ত করার অর্থ ঐসব নাম তার মর্মসহ হৃদয়পটে অঙ্কিত রাখা এবং আল্লাহর প্রত্যেকটি গুণের যে প্রতিক্রিয়া বান্দার জীবনে হওয়া প্রয়োজন সে প্রতিক্রিয়া স্বীয় জীবনে বাস্তবায়িত করা।

www.nagorikpathagar.org

নবী ও রাসূলগণ

(১) হযরত আদম (আ.) ৩৪৩
(২) হযরত নূহ (আ.) ৩৪৩
(৩) হযরত ইদ্রিস (আ.) ৩৪৪
(৪) হযরত ইব্রাহীম (আ.) ৩৪৫
(৫) হযরত লূত (আ.) ৩৪৯
(৬) হযরত ইসমাঈল (আ.) ৩৫০
(৭) হযরত ইসহাক (আ.) ৩৫১
(৮) হযরত ইয়াকুব (আ.) ৩৫২
(৯) হযরত ইউসুফ (আ.) ৩৫৩
(১০) হযরত হূদ (আ.) ৩৫৭
(১১) হযরত সালেহ (আ.) ৩৫৯
(১২) হযরত শোয়ায়েব (আ.) ৩৬০
(১৩) হযরত আইউব (আ.) ৩৬২
(১৪) হযরত মূসা (আ.) ৩৬৩
(১৫) হযরত দাউদ (আ.) ৩৭১
(১৬) হযরত সোলায়মান (আ.) ৩৭৩
(১৭) হযরত ইউনুস (আ.) ৩৭৭
(১৮) হযরত জাকারিয়া (আ.) ৩৭৮
(১৯) হযরত ইয়াহইয়া (আ.) ৩৮০
(২০) হযরত ইলিয়াস (আ.) ৩৮২
(২১) হযরত আল ইয়াসা (আ.) ৩৮৩
(২২) হযরত যুলকিফল (আ.) ৩৮৪
(২৩) হযরত হারুন (আ.) ৩৮৬
(২৪) হযরত ঈসা (আ.) ৩৮৮
(২৫) হযরত মুহাম্মদ (সা.) ৩৯১

www.nagorikpathagar.org

নবী ও রাসূলগণ

আল্লাহর অগণিত সৃষ্টিতে ভূমণ্ডল ভরপুর। এদের মাঝে আল্লাহ্ তাঁর বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছেন মানুষকে। মানুষ সৃষ্টির সেরা। তাদেরকে তিনি দিয়েছেন আধ্যাত্মিক এবং বাহ্যিক দৃষ্টি শক্তি, ভাল-মন্দ বিচারের বিশেষ জ্ঞান এবং সর্বোপরি ইচ্ছামত নিজের জীবনের পথ খোঁজে নেয়ার স্বাধীনতা। স্বাধীনভাবে পথ চলতে যেয়ে অনেকে ভুল পথে চলে যায়। পথহারা লোককে সঠিক পথের সন্ধান দিতে আল্লাহ্ মানুষের মাঝে যুগে যুগে নবী বা রাসূল পাঠিয়েছেন।

মানুষের আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালাম প্রথম নবী। আল্লাহ্ বলেন, আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একজন রাসূল রয়েছে। যখন তাদের রাসূল ন্যায়দণ্ডসহ উপস্থিত হলো, তখন আর তাদের উপর জুলুম হয় না (সূরা ইউনুস # ১০ : ৪৭)। তিনি নবী ও রাসূলগণকে এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের জন্য পাঠিয়েছেন। যেমন– হযরত সালেহ্ (আ.) কে সামুদ সম্প্রদায়ের জন্য, হযরত মূসা (আ.) কে বনী ইসরাইল তথা ইহুদী সম্প্রদায়ের জন্য, হযরত ঈসা (আ.) কে নাসারা তথা খৃষ্টান সম্প্রদায়ের জন্য। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে তিনি পাঠিয়েছেন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য। তাঁর পরে পৃথিবীতে আর কোন নবী বা রাসূল প্রেরিত হবে না। তবে তিনি বলেছেন, তাঁর পরে ত্রিশ জন নবুয়তের মিথ্যা দাবি করবে। এদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সময়ের ভণ্ড নবী মুসাইলামা এবং অষ্টাদশ শতকে ভারতের মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮৪০ সালে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানের জন্ম, ১৮৮৬ সালের দিকে তার ভণ্ডামির শুরু এবং ১৯০৮ সালে পায়খানার কূপে পড়ে তার মৃত্যু হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) আরবের নজদ প্রদেশের জন্য দোয়া করেননি এবং বলেছেন, সেখান থেকে শয়তানের শিং উঁচু হবে। আরব ভূখণ্ডে সে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে।

www.nagorikpathagar.org

নবী ও রাসূলের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। যাঁরা উম্মতের কাছে নতুন শরীয়ত প্রচার করেন তাঁরা রাসূল। তাঁরা আসমানী কিতাব পেয়ে থাকেন। হযরত দাউদ (আ.) যাবুর, হযরত মূসা (আ.) তাওরাত, হযরত ঈসা (আ.) ইঞ্জিল এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) কোরআন পেয়েছেন এবং তাঁরা রাসূল। আর যাঁরা পূর্ববর্তী নবীর ধর্মকে প্রচারে সহায়তা করেন তাঁরা নবী। হযরত মুহাম্মদ (সা.) একাধারে নবী ও রাসূল ছিলেন।

আল্লাহ্ মুহাম্মদ (সা.) কে বলেন : আমি আপনার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি, তাদের কারো ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করেছি এবং কারো ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করিনি (সূরা মু'মিন # ৪০ : ৭৮)। আল্লাহ্ পৃথিবীতে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্তরে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁদের সকলের নাম কেউ জানে না। পবিত্র কোরআনে মাত্র পঁচিশ জনের নামের উল্লেখ আছে। তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেশ করা হল :

(১) হযরত আদম আলাইহিস সালাম ঃ তিনি মানবজাতির আদি পিতা এবং নবীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম নবী। হযরত হাওয়া (আ.) ছিলেন তাঁর সঙ্গিনী। ইবলিস শয়তান উভয়কে ফুসলিয়ে আল্লাহ্র নিষিদ্ধ গাছের ফল (গন্ধম) খাইয়ে ছিল। আদেশ অমান্যের অপরাধে আল্লাহ্ বেহেশত থেকে দু'জনকে পৃথিবীর দু'জায়গায় নামিয়ে দিয়েছিলেন। দীর্ঘদিনের কান্নাকাটির পর আরাফার ময়দানে আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করেন। এ ময়দানেই হাজীদের গুনাহ্ মাফ করা হয়।

কারো কারো মতে তাঁদের আঠার জোড়া (এক ছেলের বিপরীতে এক মেয়ে) সন্তান ছিল। তাঁদের দুই ছেলে কাবিল ও হাবিলের নাম প্রায় সকলের জানা। কেয়ামতের দিন গন্ধম খাওয়ার লজ্জায় তিনি মানব গোষ্ঠির জন্য আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ করবেন না।

(২) হযরত নূহ আলাইহিস সালাম ঃ তিনি বর্তমান ইরাকের নিকটবর্তী কোন এক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন। সে সময় সেখানের লোকেরা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করত। তিনি লোকদেরকে শেরেক থেকে বের করে আনার জন্য দীর্ঘ

www.nagorikpathagar.org

নয়শত পঞ্চাশ বছর চেষ্টা করেন। এতে মাত্র আশি জন পুরুষ ও আশি জন নারী মোট একশত ষাট জন ঈমান এনেছিলেন। তিনি আল্লাহর অহী মারফতে জানতে পারেন যে, আর কেউ ঈমান আনবে না। এজন্য তিনি কাফেরদের ধ্বংসের জন্য আল্লাহর নিকট বদদোয়া করেন।

আল্লাহ তাঁকে একটি নৌকা তৈরি করে ঈমানদার ও এক এক জোড়া পশু-পাখী নিয়ে নৌকায় উঠার নির্দেশ দেন। তাঁর ছোট ছেলে কেনান ও তার মাতা কাফের ছিল। তিনি কেনানকে নৌকায় উঠানোর জন্য আল্লাহর অনুমতি চাইলে আল্লাহ তাঁকে ধমক দিয়ে আবেদন প্রত্যাহারের আদেশ দেন। তাঁর অপর তিন ছেলে হাম, সাম ও ইয়াফেস ঈমানদার ছিল এবং নৌকায় উঠল।

মাটি ফেটে নীচ থেকে পানি উঠতে শুরু করল। বিভীষিকাময় আকারে তুফান ও জলোচ্ছ্বাস আরম্ভ হয়ে একটানা চল্লিশ দিন পর্যন্ত চলতে থাকল। অতঃপর আল্লাহ আকাশকে পানি বর্ষণে বিরত থাকার এবং জমিনকে এর নিঃসৃত পানি শোষণ করার আদেশ করলেন। পানি হ্রাস পেল এবং নূহ (আ.) সঙ্গী-সাথী নিয়ে নৌকা থেকে নেমে আসলেন। এ মহাপ্লাবনের পর তিনি ষাট বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর জীবনকাল মোট এক হাজার পঞ্চাশ বছর।

আল্লাহ বলেন, অতঃপর তারা তাঁকে (নূহ আ.) মিথ্যাবাদীই সাব্যস্ত করল। সুতরাং আমি নূহকে এবং যারা তাঁর নৌকায় ছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম। আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম, নিঃসন্দেহে তারা ছিল অন্ধ (সূরা আরাফ # ৭ : ৬৪)।

(৩) হযরত ইদ্রিস আলাইহিস সালাম ঃ তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। হযরত আদম (আ.) ও তার পুত্র শীশ (আ.)-এর পরে তিনি নবী হয়েছিলেন। অনেকের মতে তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পূর্ব পুরুষ। একটি সূত্রে জানা যায়, তিনি এক ফেরেশতাকে পেলে তাঁর সৎকর্ম বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিজের আয়ু বাড়াবার জন্য আজরাঈল (আ.)-এর নিকট

www.nagorikpathagar.org

সুপারিশ করতে তাকে অনুরোধ করেন। ফেরেশতা নিজের ডানায় উঠিয়ে তাঁকে চতুর্থ আসমানে নিয়ে গেলে সেখানে আজরাঈল (আ.)-এর সাক্ষাৎ পান। ফেরেশতা আজরাঈল (আ.)কে বললে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তিনি (ইদ্রিস আ.) এখন কোথায়? ফেরেশতা বলল, আমার পিঠে। আজরাঈল (আ.) বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, কি আশ্চর্য! চতুর্থ আসমানে তাঁর রূহ কবজ করতে আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যখন তিনি পৃথিবীতে ছিলেন। এ বলে আজরাঈল (আ.) ইদ্রিস (আ.)-এর রূহ কবজ করলেন।

আল্লাহ্ বলেন, এ কিতাবে ইদ্রিসের কথা আলোচনা করুন, তিনি ছিলেন সত্যবাদী নবী। আমি তাঁকে উচ্চে উন্নীত করেছিলাম (সূরা মরিয়ম # ১৯ : ৫৬ ও ৫৭)।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মিরাজের ঘটনায় জানা যায়, তিনি চতুর্থ আসমানে ইদ্রিস আলাইহিস সালামকে দেখে সালাম দিয়েছিলেন এবং তিনি সালামের উত্তরে বলেছিলেন, উপযুক্ত ও সম্মানিত ভ্রাতা এবং নবীকে মোবারকবাদ।

(৪) হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ঃ তাঁর আবির্ভাব খৃষ্টপূর্ব ২১০০ বা ২২০০ শতকে। তিনি হযরত নূহ (আ.)-এর পুত্র 'সাম'-এর অষ্টম বংশধর। ইরাকের বাবেল (বেবিলন) অঞ্চলের "ফাদ্দানে আরাম" এলাকায় তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা আযর ছিল কাফের। তখন ছিল খোদায়ী দাবিদার নমরূদের শাসনামল। ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহর অনেক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

তাঁর দেশবাসী বিভিন্ন দেব-দেবী, চন্দ্র-সূর্য এবং নক্ষত্রের পূজা করত। তাঁর পিতা আযরও সে সকল দেব-দেবীর পূজা করত। তৎকালীন বাবেলের অতি প্রভাবশালী অধিপতি নমরূদকে দেশবাসী উপাস্য মানত। তিনি তাঁর পিতাকে মূর্তি পূজা বর্জন করে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানান। অতঃপর দেশবাসীর প্রতি একই আহ্বান জানান। অবশেষে খোদায়ী দাবীদার নমরূদের সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হন। কিন্তু নমরূদ ঈমান না এনে ইব্রাহীম (আ.)-এর ধ্বংসের চেষ্টায় লেগে যায়।

www.nagorikpathagar.org

নমরূদ দেশবাসীর সাথে পরামর্শ করে ইব্রাহীম (আ.)কে পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত নিল। তারা একটি অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করে তাঁকে উলঙ্গ করে সে অগ্নিতে নিক্ষেপ করল। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি বেঁচে যান। আল্লাহ বলেন, আমি আদেশ করলাম, হে আগুন ইব্রাহীমের জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাও (সূরা আম্বিয়া # ২১ : ৬৯)।

নমরূদ ইব্রাহীম (আ.)কে উলঙ্গ করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে পোড়াবার চেষ্টা করেছিল। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম তাঁকে বেহেশতী পোশাক পরাবেন।

দেশবাসীর আচরণে নিরাশ হয়ে ইব্রাহীম (আ.) দেশত্যাগ করে ফিলিস্তীনে চলে যান। কিছুকাল সেখানে অবস্থান করে ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য মিসরে যান।

হযরত ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহর আদেশে শিশুপুত্র ইসমাঈল (আ.) ও স্ত্রী হাজেরা (রা.)কে মক্কায় নির্বাসন দিয়ে আসেন। নির্জনে শিশুকে পানি পান করাবার জন্য মাতা পানির সন্ধানে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়াদৌড়ি করছিলেন। ইতোমধ্যে শিশুপুত্রের পায়ের নীচে আল্লাহর কুদরতে ঝরনা দেখা দেয়। মাতা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে শিশুকে পানি পান করান। এটাই জমজম কূপ যা আজও বিদ্যমান। লক্ষ লক্ষ হাজী এবং এলাকাবাসী এর পানি পান করেন এবং এর পানি দিয়ে গোসল করেন। এমনকি বর্তমানে এর পানি গাড়ীতে গাড়ীতে করে মদীনায় সরবরাহ করা হয়। পাইপ লাইনের মাধ্যমে সরাসরি সরবরাহের উদ্যোগ নেয়া হবে বলে জানা গেছে।

হাজেরা (রা.)-এর দৌড়াদৌড়ির স্মরণে হাজীগণ সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সাঈ (সাতবার দৌড়ানো) করে থাকেন। এটা হজ্জের একটি অংশ। মাতা-পুত্রের নির্বাসনকে কেন্দ্র করে মক্কা নগরীর গোড়াপত্তন হয়।

ইব্রাহীম (আ.)-এর জন্য আল্লাহর আরেক পরীক্ষা স্বীয় প্রাণ-প্রিয়

www.nagorikpathagar.org

পুত্রকে যবেহ্ করার জন্য স্বপ্নযোগে পাওয়া নির্দেশ। পিতা পুত্রের অনুমতি নিয়ে স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুত হলেন। আল্লাহ্ বলেন : যখন পিতা-পুত্র উভয়েই আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইব্রাহীম তাকে যবেহ করার জন্য শায়িত করলেন; তখন আমি তাকে ডেকে বললাম : হে ইব্রাহীম; তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখালে। আমি এভাবেই সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তার পরিবর্তে দিলাম যবেহ্ করার জন্য একটি শ্রেষ্ঠ জন্তু (সূরা আস-সফফাত # ৩৭ : ১০৩-১০৭)।

এ ঘটনার স্মরণে সারা বিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায় যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে পশু কোরবানী করে থাকে।

ইব্রাহীম (আ.)-এর বয়স যখন আশি বছর তখন আল্লাহ্ তাঁকে খতনা করার আদেশ দেন। এ কঠিন কাজটি তিনি কুঠারের সাহায্যে নিজ হাতে সম্পন্ন করেন। সে থেকে খতনা প্রথার শুরু হয়।

ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহর আদেশে পবিত্র কাবাঘর পুনঃনির্মাণ করেন। ইসমাইল (আ.) তাঁকে এ কাজে সাহায্য করেন। নির্মাণ শেষে হজ্জের জন্য মানুষকে আহ্বান করতে আল্লাহ আদেশ দেন। এতে তিনি আজান দিয়েছিলেন। তিনি একটি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে কাবাঘর পুনঃনির্মাণ করেছিলেন। সে পাথরটির উপর তাঁর পায়ের ছাপ রয়েছে। উক্ত পাথরটি কাবাগৃহের পাশে রক্ষিত আছে এবং একে মাকামে ইব্রাহীম বলা হয়। হাজীদের এর পাশে দুই রাকাত নামায আদায় করতে হয়। আল্লাহ্ বলেন : আর তোমরা ইব্রাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে নামাযের জায়গা বানাও (সূরা বাকারা # ২ : ১২৫)।

আযর কাফের অবস্থায়ই মারা গিয়েছিল। কেয়ামতের দিন ইব্রাহীম (আ.) পিতার মুক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করবেন। কিন্তু আল্লাহর আদেশে পিতার দিকে তাকিয়ে দেখবেন, সে চতুষ্পদবিশিষ্ট একটি জন্তু। অতঃপর আল্লাহর আদেশে ফেরেশতারা এর চার পা বেঁধে দোযখে নিক্ষেপ করবে।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর কঠিন কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় ইব্রাহীম (আ.) খলিলুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর দোস্ত উপাধি পেয়েছিলেন। অন্য কোন নবী তাঁর মত এমন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হননি।

ইব্রাহীম (আ.) ৭০ বছর বয়সে পুত্র ইসমাইল (আ.)কে লাভ করেন। তাঁর বয়স যখন ১২০ বছর সে সময় প্রথম স্ত্রী সারা (আ.)-এর গর্ভে ইসহাক (আ.)-এর জন্মের সুসংবাদ ফেরেশতার মারফতে আল্লাহ দিয়েছিলেন। ইহুদীরা ইসহাক (আ.)-এর বংশধর। ইহুদী, নাসারা ও মুসলমানেরা ইব্রাহীম (আ.)কে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকে। মুসলমানদের নামাযের শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পরে ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের নামে দরূদ পড়তে হয়।

হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা এই যে, আল্লাহ্ কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন তা জানার এমনকি স্বচক্ষে দেখার আগ্রহ তাঁর মনে প্রবল হয়ে উঠে। আল্লাহ তার সে ইচ্ছা পূরণ করেছেন। আল্লাহর নির্দেশে তিনি চারটি পাখীকে খণ্ড খণ্ড করে বিভিন্ন পাহাড়ে রেখে আসেন। অতঃপর সে পাখীগুলোকে নিজের নিকটে আসার জন্য ডাকলে সেগুলোর টুকরাগুলো নিজ নিজ দেহের সাথে একত্রিত হয়ে জীবিত পাখী হিসেবে ফিরে আসল। কুরআনের বর্ণনায় ঘটনাটি এরূপ : আর স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে দেখাও কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে। (আল্লাহ্) বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না? (ইব্রাহীম আ.) বলল, অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখতে এজন্য চাচ্ছি, যাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। (আল্লাহ্) বললেন, তাহলে, চারটি পাখী ধরে নাও। পরে সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও, অতঃপর সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও। তারপর সেগুলোকে ডাক; তোমার নিকট উড়ে আসবে। আর জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, অতি জ্ঞানসম্পন্ন (সূরা বাকারা # ২ : ২৬০)।

হযরত ইব্রাহীম (আ.) ১৭৫ বছর বয়সে খৃষ্টপূর্ব ১৯৮৫ সনে ফিলিস্তীনে ইন্তেকাল করেন।

www.nagorikpathagar.org

(৫) হযরত লূত আলাইহিস সালাম ঃ তিনি ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ভাতিজা। তিনি ইব্রাহীম (আ.)-এর ধর্মগ্রহণ করে সে ধর্ম প্রচারের জন্য ইব্রাহীম (আ.)-এর সাথে ইরাক ত্যাগ করে মিসরে চলে যান। পরে তিনি মিসর থেকে জর্ডানের সাদ্দুম বস্তিতে চলে আসেন। ইব্রাহীম (আ.)-এর সময়েই তিনি নবুয়ত লাভ করেন।

সাদ্দুম বস্তিবাসীরা কুফর ও শেরেকের চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। এর সঙ্গে সঙ্গে জুলুম অত্যাচার, লুণ্ঠন ইত্যাদিতে লিপ্ত ছিল। সবচেয়ে ঘৃণিত ও কুৎসিত যে কাজে লিপ্ত ছিল তা হল, ছেলেদের সাথে কুকর্মে লিপ্ত হওয়া। নারীদের বাদ দিয়ে তারা ছেলেদের সাথে যৌন সম্ভোগ করত।

লূত (আ.) তাদেরকে এ কুকর্ম থেকে বিরত করার আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তিনি তাদেরকে আল্লাহর গজবের ভয় দেখালে তারা তাঁকে পাল্টা হুমকি দিয়ে বলল, তুমি যদি তোমার এ ধরনের প্রচার কার্য থেকে বিরত না থাক তবে নিশ্চয়ই তুমি দেশ থেকে বহিষ্কৃত হবে।

লূত (আ.) নিরাশ হয়ে আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করলেন, হে পরওয়ারদেগার, আমাকে এবং আমার পরিজনকে তাদের কার্যাবলীর অভিশাপ থেকে রক্ষা কর। আল্লাহ্ তাঁর ফরিয়াদ কবুল করে লোকদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য দু'জন ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন।

ফেরেশতারা সুশ্রী যুবকের বেশে লূত (আ.)-এর বাড়ীতে পৌছলে তিনি তাদের রক্ষায় ভীত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। লূত (আ.)-এর স্ত্রী ছিল কাফের এবং দুষ্কৃতিকারীদের সমর্থক। সে লোকদের নিকট সুশ্রী দু'যুবকের সংবাদ দিলে তারা কুকর্মের জন্য দল বেঁধে চলে আসল। লূত (আ.) মেহমানদ্বয়ের রক্ষা করার জন্য তাদের নিকট নিজের মেয়েদেরকে বিবাহ দেয়ার প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু তারা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে কুকর্মের জন্য যুবকদ্বয়কে তাদের হাতে দেয়ার দাবী জানাল।

ফেরেশতাদ্বয় লূত (আ.)কে গোপনে জানিয়ে দিলেন যে, ভয়ের কোন কারণ নেই। তাঁরা এ লোকদেরকে শায়েস্তা করতেই আল্লাহর আদেশে

www.nagorikpathagar.org

সেখানে এসেছেন। তাঁরা আরও পরামর্শ দিলেন, ভোর হবার পূর্বেই স্বীয় পরিজন ও সঙ্গীগণকে নিয়ে এ এলাকা ত্যাগ করবেন। কাফের বলে আপনার স্ত্রী যাবে না। ভোর হতে না হতেই এ এলাকার উপর আল্লাহর আজাব নেমে আসবে। আপনি পেছনে ফিরে তাকাবেন না।

যারা লূত (আ.)-এর বাড়ী ঘেরাও করেছিল তারা বস্তুত অন্ধ হয়ে গেল। লূত (আ.) সঙ্গীদের নিয়ে রাতেই বস্তি এলাকা ছেড়ে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে চলে গেলেন। প্রভাতে ভয়ঙ্কর ভূকম্পন এবং উপর থেকে প্রবল প্রস্তর বর্ষণ শুরু হলো। অতঃপর সমগ্র এলাকাকে উপরে তুলে উল্টিয়ে সজোরে নিক্ষেপ করা হলো।

আল্লাহ্ বলেন, অতঃপর যখন আমার আদেশ এসে পৌঁছল, তখন আমি উল্টিয়ে দিলাম জনপদকে এবং এদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম প্রস্তর-কঙ্কর (সূরা হূদ # ১১ : ৮২)।

জর্ডানের উক্ত ধ্বংস প্রাপ্ত স্থানটি আরবীতে "বাহারে মাইয়েত" বাংলায় "মরুসাগর" এবং ইংরেজীতে "Dead Sea" নামে আজও বিদ্যমান রয়েছে। এতে কোন জলজ প্রাণী নেই। এর পানি এত অধিক লবণাক্ত যে, এতে নামলে মানুষ উপরে ভেসে থাকে। কথিত আছে এর পানিতে গোসল করলে চর্মরোগ সেরে যায়। কিন্তু এর পানি মুখে নিলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত মুখে কোন জিনিসের স্বাদ অনুভূত হয় না। স্থানটি দৈর্ঘ্যে প্রায় পঞ্চাশ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় নয় মাইল।

(৬) হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ঃ তিনি ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ঔরসজাত এবং হযরত হাজেরা (রা.)-এর গর্ভজাত প্রথম সন্তান। কা'বা শরীফ পুনঃনির্মাণকালে হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.) একত্রে আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন : পরওয়ারদেগার! আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহ কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি কর, আমাদের হজ্জের রীতিনীতি বলে দাও এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী, দয়ালু। হে পরওয়ারদেগার! তাদের মধ্য থেকে তাদের নিকট একজন

www.nagorikpathagar.org

পয়গম্বর প্রেরণ করুন– যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন। নিশ্চয় তুমিই পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা (সূরা বাকারা # ২ : ১২৮-১২৯)।

আল্লাহ তাঁদের দোয়া কবুল করেছিলেন। ফলে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশেই বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম হলো।

ছোটকাল থেকেই আল্লাহর প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। পিতা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁকে কুরবানী করার প্রস্তাব করলে তিনি বিনা বাক্য ব্যয়ে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। সূরা আস-সফফাতে আছে : অতঃপর সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হলো, তখন ইব্রাহীম তাকে বলল ঃ বৎস! আমি স্বপ্নে দেখছি, তোমাকে যবেহ করছি, এখন তোমার অভিমত কি? সে বলল, পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন (সূরা সফফাত # ৩৭ : ১০)।

কথিত আছে, মা হাজেরা (রা.) যখন তাঁকে পান করাবার জন্য ছুটাছুটি করছিলেন, সে সময় জিব্রাইল (আ.)-এর পায়ের আঘাতে ভূমি থেকে পানি উঠতে শুরু করে। এভাবেই জমজম কূপের সৃষ্টি হয়। কা'বার উত্তর পাশে অর্ধ-বৃত্তাকার হাতীমে তিনি ও তাঁর মায়ের কবর রয়েছে।

(৭) হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম ঃ তিনি হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর দ্বিতীয় এবং তাঁর প্রথমা স্ত্রী সারার (রা.)-এর গর্ভজাত একমাত্র পুত্র। তাঁর জন্মের সময়ে মাতা-পিতা উভয়ে ছিলেন বৃদ্ধ। দুইজন ফেরেশতা হযরত লূত (আ.)-এর বস্তিবাসীদের ধ্বংস করতে যাওয়ার পথে ইব্রাহীম (আ.) কে ইসহাক (আ.)-এর জন্ম ও নবী হওয়ার সুসংবাদ আল্লাহর তরফ থেকে দিয়ে গিয়েছিলেন। ফেরেশতাদ্বয় এ সুসংবাদও দিয়েছিলেন যে, ইসহাক (আ.)-এর ঔরসে ইয়াকুব নামের এক সন্তানের জন্ম হবে। সূরা হূদের ৭১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : অতঃপর আমি

www.nagorikpathagar.org

(আল্লাহ) তাকে (ইব্রাহীম আ.) ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ দিলাম এবং ইসহাকের পরের ইয়াকুবেরও।

ইসহাক (আ.) বনী ইসরাইলদের আদি পিতা। তাঁর পুত্র ইয়াকুব (আ.) হয়ে বংশ পরম্পরায় মূসা (আ.)-এর উম্মত বনী ইসরাইল তথা ইহুদীদের বিস্তার লাভ ঘটে।

(৮) হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ঃ তিনি হযরত ইসহাক (আ.)-এর পুত্র। তাঁর আরেক নাম ছিল ইসরাইল। এ জন্যই তাঁর পরবর্তী বংশধরগণ বনী ইসরাইল নামে পরিচিত। তাঁর জন্ম সিরিয়ায়। তাঁর ১২ জন পুত্র ছিল। হযরত ইউসুফ (আ.) তাদের অন্যতম। তাঁর নবী হওয়ার আলামত পেয়ে তিনি এ পুত্রকে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং চোখে চোখে রাখতেন। অন্য ভাইয়েরা তা পছন্দ করত না। তারা চালাকি করে বালক ইউসুফকে খেলার নাম করে বাইরে নিয়ে কূপে ফেলে দিয়ে তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে বলে পিতাকে সংবাদ দেয়। তারা ভুয়া রক্তমাখা ইউসুফের জামা পিতাকে দেখায়। শোকে-দুঃখে কান্নাকাটি করতে করতে ইয়াকুব (আ.) অন্ধ হয়ে যান। পরবর্তীকালে ইউসুফ (আ.) মিসরের সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে পিতার নিকট জামা পাঠিয়ে দিলে তা চোখের উপর স্থাপন করলে আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান।

ইউসুফ (আ.) তাঁকে মিসরে নিয়ে যান। মৃত্যু নিকটবর্তী হয়ে আসলে তিনি পুত্রদেরকে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। সূরা বাকারার আয়াতে এর বর্ণনা এরূপ : (১৩২) এরই অসিয়ত করেছেন ইব্রাহীম তাঁর সন্তানদের এবং ইয়াকুবও যে, হে আমার সন্তানগণ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এ ধর্মকে মনোনীত করেছেন। কাজেই তোমরা মুসলমান না হয়ে কখনও মৃত্যুবরণ কর না। (১৩৩) তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুবের মৃত্যু নিকটবর্তী হয়? যখন সে সন্তানদেরকে বলল, আমার পর তোমরা কার এবাদত করবে? তারা বলল, আমরা তোমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্যের এবাদত করব। তিনি একক উপাস্য।

তিনি সপরিবারে মিসরে বসবাসকালে বৃদ্ধ বয়সে সেখানে ইন্তেকাল করেন।

www.nagorikpathagar.org

(৯) হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ঃ তিনি হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর অতি সুযোগ্য ও আদরের পুত্র ছিলেন। ভাইয়েরা চক্রান্ত করে তাঁকে কূপে ফেলে দিলে একদল বণিক কূপের পাশ দিয়ে যাবার সময় কূপে বালতি ফেলে পানি নেয়ার সময় তাঁকে দেখতে পায়। তারা তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে মিসরের নিঃসন্তান উজিরে আজম তথা আজীজের (রাজকর্মচারীর উপাধি) নিকট বিক্রয় করে দিল। ইউসুফ প্রাপ্ত বয়স্ক হলে আল্লাহ্ তাঁকে ইলম ও হেকমত দান করলেন।

আজীজের স্ত্রী জুলেখা টগবগে যুবক ইউসুফের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। একদিন ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিয়ে সে তাঁকে নিজের দিকে ডাকলে ইউসুফ আল্লাহর ভয়ে দৌড়িয়ে পালাবার জন্য দরজার দিকে যেতে থাকলে জুলেখা পেছন দিক থেকে তাঁর জামা টেনে ধরে ছিঁড়ে ফেলে। বাইরে পা দিতেই তিনি গৃহস্বামীর সামনে পড়ে যান।

জুলেখা চিৎকার করে স্বামীকে বলল, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে যে কুকর্ম করতে চায় তার জেল ভোগ করা দরকার। ইউসুফ (আ.) মনিবকে বুঝাতে চাইলেন যে, স্ত্রীলোকটি নিজেই তাঁকে নিজের দিকে ফুসলিয়েছিল। জুলেখার আপনজনের মধ্য থেকে একজন মহিলা বলল, যদি ইউসুফের জামা সামনে ছিঁড়া থাকে তবে সে মিথ্যাবাদী, আর যদি পেছনের দিকে ছিঁড়া থাকে তবে জুলেখা মিথ্যাবাদিনী। ইউসুফ (আ.)-এর জামা পেছনে ছিঁড়া দেখে আজীজ স্ত্রীকে তিরস্কার করলেন।

অন্যদিকে ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে কতিপয় নারী জুলেখার দুর্নাম করতে লাগল। জুলেখা তাদেরকে দাওয়াত করে ঘরে এনে প্রত্যেকের সামনে কিছু ফল এবং হাতে একটি করে ছুরি দিয়ে ফল কেটে খেতে বলল। ইত্যবসরে ইউসুফ (আ.) কে তাদের সামনে ডেকে আনল। ইউসুফ (আ.) কে আল্লাহ্ পুরুষকুলের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁকে দেখা মাত্রই সকলে এমন আনমনা হয়ে পড়ল যে, প্রত্যেকের হাত ছুরিতে কেটে রক্ত বের হয়ে গেল। জুলেখা হেসে নারীদেরকে বলল, এ সে ব্যক্তি যাকে নিয়ে তোমরা আমাকে দোষারোপ কর। আসলে ইউসুফ সম্পূর্ণ পবিত্র।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু বাইরে উজিরে আযমের পরিবার সম্পর্কে মানুষের মাঝে খারাপ মন্তব্য চলতে লাগল। সকলে সাব্যস্ত করল ইউসুফ (আ.) কে কিছু দিনের জন্য কারাগারে দেয়া হোক। এর পেছনে যে আল্লাহ্র বিরাট পরিকল্পনা রয়েছে তা কেউ বুঝতে পারেনি।

তাঁকে কারাগারে দেয়া হলো। তিনি কারাবন্দীদের হেদায়াত করতে শুরু করলেন। সকলের মধ্যে তিনি পরিচিত হয়ে উঠলেন। রাজার পানীয়ের মধ্যে বিষ মিশানোর অভিযোগে দু'জন কারাগারে গেল। একদা একজন স্বপ্নে দেখল, সে আঙ্গুরের রস বের করছে। অপরজন দেখল, সে মাথায় রুটির বোঝা রেখেছে এবং পাখী তা ঠুকরিয়ে খাচ্ছে। তারা উভয়ে ইউসুফ (আ.)-এর নিকট স্বপ্নের অর্থ জানতে চাইল। ইউসুফ (আ.) বললেন, প্রথম জন রাজাকে সুরা পান করাবার কাজ পাবে। আর দ্বিতীয় জনের শূলদণ্ড হবে এবং পাখীরা তার মগজ খাবে। যে খালাস পাবে বলে তিনি ধারণা করেছিলেন তাকে বললেন, রাজার নিকট আমার কথা বলবে। কিন্তু মুক্তি পেয়ে সে রাজাকে ইউসুফ (আ.)-এর কথা বলতে ভুলে গিয়েছিল।

ইউসুফ (আ.) দশ বছর কারাগারে রয়ে গেলেন। এ সময় রাজা স্বপ্নে দেখলেন, সাতটি মোটা-তাজা গরুকে সাতটি জীর্ণ-শীর্ণ গরু খেয়ে ফেলছে। রাজা আরও দেখলেন, সাতটি তাজা সবুজ রংগের শস্য ছড়াকে সাতটি শুষ্ক ছড়া জড়িয়ে ধরে শুষ্ক করে ফেলছে। দরবারের লোকদের নিকট রাজা স্বপ্নের অর্থ জানতে চাইলেন।

ইউসুফ (আ.)-এর কথা খালাস পাওয়া লোকটির স্মরণে আসল। সে বলল, আমাকে কারাগারে যেতে দিন, আমি স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানাতে পারব। অনুমতি পেয়ে কারাগারে যেয়ে সে ইউসুফ (আ.) কে রাজার স্বপ্নের অর্থ জিজ্ঞাসা করল। ইউসুফ (আ.) বললেন, সাত বছর তোমরা ফসল ফলাবে (এ সময় ভাল ফসল উৎপন্ন হবে) এবং শস্য কেটে এনে অল্প কিছু মাড়িয়ে খাবে এবং বাকী ছড়া ও গুচ্ছ জমিয়ে রাখবে। এর পরবর্তী সাত বছর ভীষণ দুর্ভিক্ষ আসবে, প্রথম সাত বছরের রক্ষিত সমুদয় ফসল পরবর্তী সাত বছরে খেয়ে শেষ করবে। অতঃপর দেশে আবার সুদিন আসবে।

www.nagorikpathagar.org

স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে পেরে ইউসুফ (আ.) কে তৎক্ষণাৎ তাঁর সামনে ডেকে আনার জন্য রাজা আদেশ দিলেন। রাজার বার্তাবাহক ইউসুফ (আ.) কে রাজার ইচ্ছার কথা জানালে তিনি বললেন, যে সকল নারীরা হাত কেটেছিল তাদেরকে ডেকে আমার ঘটনার পূর্ণ তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি রাজার সামনে যাব না। রাজা তাদেরকে ডাকলে সকলে বলে উঠল, ইউসুফের কোন দোষ দেখতে পাই নি। জুলেখাও বলে ফেলল, আমি নিজেই মতলব হাসিলের জন্য তাকে ফুসলিয়ে ছিলাম। ইউসুফ সম্পূর্ণ খাঁটি এবং সত্যবাদী, আমিই দোষী।

রাজা তাঁকে ডেকে এনে বললেন, আপনি আজ থেকে বিশ্বাসভাজন এবং অতি মর্যাদাশীলরূপে রাজকীয় স্বীকৃতি লাভ করলেন। ইউসুফ (আ.)-এর অভিপ্রায় অনুসারে রাজা তাঁকে রাজ্যের সম্পদ ভাণ্ডারের দায়িত্ব দিলেন। এভাবে আল্লাহ্ মিসরে ইউসুফ (আ.) কে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি দক্ষতার সাথে খাদ্য ভাণ্ডারের ব্যবস্থাপনা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

সাত বছর পর দেশে চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তাঁর ব্যবস্থাপনায় মিসরের অবস্থা ভালই যেতে লাগল। মিসর দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে খাদ্য বিক্রয় করতে শুরু করল। ইউসুফ (আ.)-এর যে সকল ভাইয়েরা তাঁকে কূপে ফেলেছিল তারাও খাদ্য কিনতে আসল। কিন্তু তারা তাঁকে চিনতে পারেনি যদিও তিনি তাদেরকে চিনে ছিলেন। বাড়িতে আর কে কে আছে তার লিষ্ট নেয়া হলো। তিনি তাদেরকে খাদ্য-সামগ্রী দিয়ে পরবর্তীবারে তাদের বৈমাত্রেয় ভাই (ইউসুফের আপন ভাই) বিনইয়ামীনকে আনতে বললেন। অপরদিকে তাদের প্রদান করা মূল্য তাদের মালের মধ্যে গোপনে ঢুকিয়ে দিতে কর্মীদেরকে বললেন, যাতে তারা মিসরীয়দের সহৃদয়তা অনুভব করে আবার আসতে আগ্রহী হয়।

বাড়িতে ফিরে মালামালের মধ্যে তাদের পরিশোধ করা মূল্য ফেরত পেয়ে তারা পিতাকে বলল, এবার আমরা বিনইয়ামীনকে সঙ্গে নিয়ে যাব এবং এতে আমরা এক উটের বোঝা বেশী আনতে পারব। পিতা পূর্ব

www.nagorikpathagar.org

অভিজ্ঞতা থেকে বললেন, তাকে আমি কিছুতেই দিতে পারি না যাবত তোমরা আল্লাহর নামে অঙ্গীকার দাও যে, বিপদাপদে অপারগ না হলে নিশ্চয় তাকে আমার নিকট ফেরত আনবে। তারা অঙ্গীকার করল পিতা বিনইয়ামীনকে আল্লাহর হাওলা করে ছেড়ে দিলেন।

তারা পৌঁছলে ইউসুফ (আ.) ছোট ভাইকে কাছে বসিয়ে গোপনে বললেন, আমি তোমার ভাই ইউসুফ। আল্লাহ দয়া করে আমাদেরকে আবার একত্র করেছেন।

সকলের মাল-সামগ্রী প্রস্তুত করে কৌশলে বিনইয়ামীনের মালের মধ্যে একটি বাটি ঢুকিয়ে দেয়া হলো। তারা রওনা হলে একজন কর্মচারী ডেকে বলল, তোমাদের কেউ রাজার একটি বাটি চুরি করেছে। যার নিকট তা পাওয়া যাবে তার কি শাস্তি হবে? তারা বলল, আমরা চোর নই। যদি কারো মধ্যে তা পাওয়া যায় তবে আমাদের নিয়ম অনুসারে সে গোলাম হয়ে থাকবে। অতঃপর তাদের মাল তল্লাশি করে বিনইয়ামীনের মালের মধ্য থেকে বাটিটি বের করা হলো। বিনইয়ামীনকে রেখে দেয়া হলো।

অন্যরা ফিরে যেয়ে পিতাকে এ ঘটনা জানাল। পিতা বললেন, তোমরা যাও এবং ইউসুফ ও বিনইয়ামীনকে খোঁজে আন। তারা আবার আসল। ইউসুফ (আ.) নিজের পরিচয় দিলেন। তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে বললেন, বাড়িতে যেয়ে সকলকে নিয়ে আস। তিনি তাঁর একটি জামা দিয়ে বললেন, এটা পিতার চোখের উপর রাখবে। আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবেন।

ইউসুফ (আ.) কূপে পতিত হওয়ার পূর্বে একটি স্বপ্ন দেখে পিতাকে বলেছিলেন, পিতা, আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি নক্ষত্রকে, সূর্যকে এবং চন্দ্রকে। আমি তাদেরকে আমার উদ্দেশ্যে সেজদা করতে দেখেছি। তিনি (পিতা) বললেন : বৎস, তোমার ভাইদের সামনে এ স্বপ্ন বর্ণনা করো না। তা হলে তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। এমনিভাবে তোমার পালনকর্তা তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে বাণীসমূহের নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা দেবেন এবং পূর্ণ করবেন স্বীয়

www.nagorikpathagar.org

অনুগ্রহ তোমার প্রতি ও ইয়াকুব পরিবার-পরিজনের প্রতি (সূরা ইউসুফ # ১২ : ৪, ৫ ও ৬ এর অংশ)।

স্বপ্নের কিছু অংশ বাস্তবায়িত হয়েছে এবং বাকী অংশ হওয়ার পথে চলেছে। তারা ফিরে এসে ইউসুফ (আ.)-এর জামাটি পিতার চোখের উপর রাখলে তিনি তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেলেন। পরের ঘটনা সূরা ইউসুফের আয়াতদ্বয়ে এরূপ : (৯) অতঃপর যখন তারা ইউসুফের নিকট পৌঁছল, তখন ইউসুফ পিতা-মাতাকে নিজের কাছে জায়গা দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ চাহে তো শান্ত চিত্তে মিসরে প্রবেশ করুন। (১০০) এবং তিনি পিতা-মাতাকে সিংহাসনের উপর বসালেন এবং তারা সবাই তাঁর সামনে সেজদাবনত হলো। তিনি বললেন, পিতা : এ হচ্ছে আমার ইতোপূর্বেকার স্বপ্নের বর্ণনা। আমার পালনকর্তা একে সত্যে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আমাকে জেল থেকে বের করেছেন এবং আপনাদেরকে গ্রাম থেকে এনেছেন। শয়তান আমার ও ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে দেয়ার পর। আমার পালনকর্তা যা চান, কৌশলে সম্পন্ন করেন। নিশ্চয় তিনি বিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। সকলকে ক্ষমা করার জন্য ইউসুফ (আ.) পিতাকে অনুরোধ করলে ইয়াকুব (আ.) সকলের জন্য দোয়া করলেন।

যাবতীয় ঘটনার পূর্ণ বিবরণ সূরা ইউসুফে রয়েছে।

(১০) হযরত হূদ আলাইহিস সালাম ঃ হযরত নূহ (আ.)-এর এক পৌত্রের পুত্রের নাম ছিল 'আদ'। তার নামে যে বংশধারার উৎপত্তি হয়েছিল তারা আদ জাতি নামে পরিচিত ছিল। হযরত হূদ (আ.) সে বংশের একজন। আল্লাহ্ আদ জাতির জন্য তাঁকে নবী নিযুক্ত করেছেন।

আদ জাতি আরবের আহ্কাফ নামক স্থানে বাস করত। এর উত্তরে নজদ, দক্ষিণে হাজরামাওত, পূর্বে ওমান এবং পশ্চিমে ইয়ামন। আল্লাহর গজবে এটা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে সম্পূর্ণ জনশূন্য হয়ে পড়ে। ফলে এর অপর নাম হয়েছে রবউল-খালি অর্থাৎ জনশূন্য মরু প্রান্তর। বর্তমানেও এটা জনশূন্য অবস্থায় আছে।

www.nagorikpathagar.org

আদ জাতি ও তাদের নবী হূদ (আ.) সম্পর্কে কোরআনে বর্ণনা আছে। আদেরা আল্লাহ্‌কে ভুলে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করতে শুরু করে। হূদ (আ.) তাদেরকে সতর্ক করতে লাগলেন। মূর্তির উপাসনা না করে আল্লাহ্‌র উপাসনা করতে তাদেরকে তিনি উপদেশ দিতে লাগলেন কিন্তু কাফেররা তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে বরং তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল এবং বলতে লাগল যে, তাদের কোন দেবতা তাঁকে অভিশাপ দিয়েছে।

হূদ (আ.) তাদেরকে আল্লাহ্‌র গজবের ভয় দেখালে তারা বলল, তুমি কি এসেছ আমাদেরকে আমাদের পূজনীয় মা'বুদ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে? তুমি যে আজাবের ভয় দেখাও তা আমাদের উপর নিয়ে আস, যদি তুমি সত্যবাদী হও (সূরা আহ্‌কাফ # ৪৬ : ২২)।

আল্লাহ্‌র গজব তাদের উপর শুরু হলো। দীর্ঘদিন পর্যন্ত অনাবৃষ্টি চলতে থাকল এই সময় হূদ (আ.) তাদেরকে বললেন, হে আমার জাতি! তোমাদের পালনকর্তার কাছে তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তার প্রতি মনোনিবেশ কর, তিনি আসমান থেকে তোমাদের উপর বৃষ্টিধারা প্রেরণ করবেন এবং তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন এবং উন্নতি দেবেন কিন্তু অপরাধীদের মত বিমুখ হবে না (সূরা হূদ # ১১ : ৫২)।

তারা বলল, হে হূদ, তুমি আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নিয়ে আসনি, আমরা তোমার কথায় আমাদের দেব-দেবীদের বর্জন করতে পারি না এবং আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনয়নকারীও নই (সূরা হূদ # ১১ : ৫৩)।

দীর্ঘ অনাবৃষ্টির কারণে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ চলাকালে একদিন তারা তাদের বস্তির দিকে ঘনকালো মেঘ আসতে দেখে আনন্দে মেতে উঠল। তারা ভাবল তাদের বস্তির উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণের জন্য মেঘমালা আসছে। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল তাদের জন্য সর্বনাশা ভয়বহ্ ঘূর্ণিঝড়। সূরা হাককাহ এর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, (৬) আদ জাতিকে বিধ্বস্ত করা হলো প্রবল ঝড়ে (৭) যা প্রবাহিত করেছিলেন তাদের উপর সাত রাত আট দিন পর্যন্ত অবিরাম। সূরা কামার-৫৪ : ১৯ ও ২০ নম্বর আয়াতে আছে ঃ তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু এক চিরাচরিত অশুভ দিনে। তা মানুষকে উৎপাটিত খেজুর গাছের কাণ্ডের মত ছুড়ে ফেলেছিল।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্ বলেন আর আমার আদেশ যখন উপস্থিত হল, তখন আমি নিজ রহমতে হূদ এবং তার সঙ্গী ঈমানদারগণকে রক্ষা করি এবং তাদেরকে এক কঠিন শাস্তি থেকে নিস্তার দেই (সূরা হূদ # ১১ : ৫৮)।

(১১) হযরত সালেহ্ আলাইহিস সালাম ঃ হযরত নূহ (আ.)-এর পৌত্র এরাম, তার পুত্র আবের এবং তার পুত্র ছিল সামুদ। তার বংশধরেরা সামুদ জাতি নামে পরিচিত। হেজায ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী এবং মদীনা শরীফ থেকে ১৮০ মাইল উত্তরে অবস্থিত ওয়াদিল কুরা নামক স্থানে তারা বসবাস করত। এই সামুদ বংশে হযরত সালেহ্ (আ.)-এর জন্ম। আল্লাহ্ সামুদ জাতির জন্য তাঁকে নবী নিয়োজিত করলেন।

সামুদ জাতি আল্লাহকে ভুলে দেব-দেবীর মূর্তি পূজায় লিপ্ত হলো। সালেহ্ (আ.) তাদেরকে মূর্তি ছেড়ে আল্লাহর পথে ফিরে আসার জন্য ডাক দিলেন কিন্তু সে ডাকে তারা সাড়া দিল না; বরং তাঁর প্রতি অবজ্ঞা ও বিরোধিতায় লিপ্ত হলো। তাঁকে বেকায়দায় ফেলার জন্য একদিন বলল, আপনি যদি এ পাহাড়ের পাথর থেকে একটি উট বের করে দেখাতে পারেন তবে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব। সালেহ্ (আ.) তাদের এ প্রস্তাবকে একটি বিশেষ সুযোগ ধারণা করে পাথর থেকে একটি উট বের করার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন। আল্লাহ্ দোয়া কবুল করলেন। তৎক্ষণাৎ জন সমক্ষে পাহাড়ের একটি পাথরে কম্পন দেখা গেল এবং তা ফেটে একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী বের হয়ে আসল এবং অনতিবিলম্বে একটি বাচ্চা প্রসব করল। পবিত্র কোরআনে আছে ঃ তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ এসে গেছে। এটি আল্লাহর উষ্ট্রী তোমাদের জন্য প্রমাণ। অতএব এটাকে ছেড়ে দাও, আল্লাহর ভূমিতে চরে বেড়াবে। এটাকে অসৎভাবে স্পর্শ করবে না। অন্যথা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে (সূরা আরাফ # ৭ : ৭৩)।

কিন্তু প্রমাণ দেখে তারা মুখ ফিরিয়ে নিল। উটটি ছিল অসাধারণ দেহবিশিষ্ট এবং এর পানাহারও ছিল অসাধারণ। মাঠের সমস্ত ঘাস এবং কূপের পানি এটা একাই গ্রাস করে ফেলত। দেশের পশুপাল এটাকে দেখে ছুটে পালাত। এতে এলাকাবাসী বিব্রত হয়ে অসদুপায় অবলম্বনের পরামর্শ

www.nagorikpathagar.org

করল। সালেহ (আ.) তাদেরকে সতর্ক করে বললেন, তোমরা এর কোন ক্ষতি করলে তোমাদের উপর গজব নেমে আসবে। তিনি আল্লাহর আদেশে তাদেরকে একটি সুপন্থা জানিয়ে দিলেন যে, পালাক্রমে আল্লাহর উটটি একদিন আবদ্ধ থাকবে এবং সেদিন তোমাদের পশুগুলো অবাধে পানাহার করবে। আর অন্যদিন নিজ নিজ পশুপালের ব্যবস্থা নিজেদের গৃহে করে নেবে। সেদিন এ উটটি পানাহার করে বেড়াবে।

কিন্তু সে ব্যবস্থায় তারা সন্তুষ্ট হলো না। পরবর্তী ঘটনা সূরা আরাফ-৭ : ৭৭-৭৯ তে বর্ণিত আছে : অতঃপর তারা উষ্ট্রীকে হত্যা করল এবং স্বীয় প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। তারা বলল, হে সালেহ! নিয়ে আস যা দ্বারা আমাদেরকে ভয় দেখাতে, যদি তুমি রাসূল হয়ে থাক। অতঃপর পাকড়াও করল তাদেরকে ভূমিকম্প। ফলে সকাল বেলায় নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

কোন কিছুতে পড়েছিলাম, কেয়ামতের দিন দুইটি প্রাণী বেহেশতে যাবে। একটি আল্লাহর কুদরতী এই উষ্ট্রী এবং অপরটি আসহাবে কাহফের সঙ্গী কুকুরটি।

(১২) হযরত শোয়ায়েব আলাইহিস সালাম ঃ তিনি হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বংশধর। ইব্রাহীম (আ.)-এর তৃতীয় স্ত্রী কতুরা-এর ছয় ছেলের মধ্যে এক ছেলের নাম ছিল মাদইয়ান। তাঁর বংশধরেরা যে অঞ্চলে বসবাস করেছিল তাঁর নামানুসারে এর নাম ছিল মাদইয়ান। মাদইয়ানের আরেক নাম ছিল আইকাহ যার অর্থ জঙ্গল বা বন। সে মাদইয়ানের বংশেই হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর জন্ম। আল্লাহ তাঁকে মাদইয়ানের নবী মনোনীত করলেন।

মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে শিরক ও মূর্তিপূজা বিস্তার লাভ করেছিল। এটা ছাড়াও তারা লেন-দেনের মধ্যে মেপে নিতে হেরফের করে বেশী নিত এবং দেয়ার সময় কম দিত। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, আমি মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েবকে প্রেরণ করেছি। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, শেষ

www.nagorikpathagar.org

দিবসের আশা রাখ এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না (সূরা আনকাবুত # ২৯ : ৩৬)।

আল্লাহ্ আরও বলেন, বনের (মাদইয়ানের) অধিবাসীরা পয়গম্বরকে মিথ্যাবাদী বলেছে; যখন শোয়ায়েব তাদেরকে বললেন, তোমরা কি ভয় কর না? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের কাছে এ জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্বপালনকর্তা দেবেন। মাপ পূর্ণ কর এবং যারা পরিমাপে কম দেয়, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী লোক-সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছেন (সূরা শোআরা # ২৬ : ১৭৬-১৮৪)।

কিন্তু তারা এতে কর্ণপাত করল না বরং তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল। সর্দার শ্রেণীর লোকেরা হুমকি দিল, তুমি তোমার দলবলসহ যদি আমাদের পথের পথিক না হয়ে যাও তবে নিশ্চয় আমরা তোমাদের সকলকে দেশ থেকে বের করে দেব।

তাদের আরও বক্তব্য কুরআনে রয়েছে। তারা বলল, তুমি আমাদের মত মানুষ বৈ তো নও; আমাদের ধারণা তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। অতএব যদি সত্যবাদী হও, তবে আকাশের কোন এক টুকরা আমাদের উপর ফেলে দাও। শোয়ায়েব বলল, তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আমার পালনকর্তা ভালরূপে অবহিত। অতঃপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে দিল; ফলে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আজাব পাকড়াও করল; নিশ্চয় এটা ছিল এক মহাদিবসের আযাব (সূরা শোআরা # ২৬ : ১৮৬-১৮৯)।

পবিত্র কোরআনের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল, অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হলো এবং নিজের গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল (সূরা আনকাবুত # ২৯ : ৩৭)।

অতএব প্রথমে ভয়ানক ভূমিকম্প ও ভীষণ তর্জন-গর্জন দ্বারা তাদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করা হয়েছিল যাতে তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ভীষণ

www.nagorikpathagar.org

উত্তাপের দরুন বাড়ী-ঘর থেকে বের হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় মেঘখণ্ড এসে তাদের উপর অগ্নি বর্ষণ করে। ফলে তারা ভূপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

হযরত শোয়ায়েব (আ.) অক্ষত রয়ে গেলেন। শেষ জীবন তিনি কোথায় কাটিয়েছেন তার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। বোখারী শরীফে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়। এক বর্ণনা মতে তিনি আরব সাগরের উত্তর উপকূলে হাযরামাওত অঞ্চলে চলে এসেছিলেন এবং সেখানে তাঁর কবর বিদ্যমান আছে। অপর বর্ণনায় তিনি মক্কায় চলে এসেছিলেন এবং তাঁর কবরও সেখানে অবস্থিত। আমি হজ্জ থেকে জর্ডান হয়ে ফেরার পথে আসহাবে কাহাফদের স্মৃতিজড়িত স্থান দেখতে গিয়ে এর কাছাকাছি একটি স্থানের মসজিদে নামায পড়ে বের হয়ে শোয়ায়েব (আ.)-এর কবর নামে খ্যাত একটি কবর যিয়ারত করেছি। তাঁর কবর প্রকৃতপক্ষে কোথায় তা বলা মুশকিল।

(১৩) হযরত আইউব আলাইহিস সালাম ঃ তিনি ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বংশধর। তাঁর সময়কাল ইউসুফ (আ.)-এর পরে এবং মূসা (আ.)-এর পূর্বে। তিনি বর্তমান জর্ডানের একটি অংশের বাসিন্দাদের নবী ছিলেন। তাঁর নবুয়তকাল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

আল্লাহ আইউব (আ.)-কে প্রথম জীবনে যথেষ্ট ধন-সম্পদ, দালান-কোঠা ও সন্তান-সন্ততি দান করেছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁকে এক কঠিন পরীক্ষায় ফেলেন। তাঁর সমস্ত শরীরে গলিত কুষ্ঠের ন্যায় এক রোগ দেখা দেয়। তাঁর জিহ্বা ছাড়া অন্য কোন অঙ্গ অক্ষত ছিল না। দুর্গন্ধে কেউ তাঁর নিকটে যেতে চাইত না। ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি একে একে সব চলে যায়। প্রিয়জন ও প্রতিবেশীরা তাঁকে লোকালয়ের বাইরে এক আবর্জনাময় স্থানে রেখে আসে। কেবলমাত্র তাঁর স্ত্রী (ইউসুফ আ.-এর কন্যা বা নাতনী) তাঁর দেখাশুনা করত। তখন তাদের চরম অভাব। তাঁর স্ত্রী মজুরি করে খাওয়া-পরার জোগাড় করতেন।

তিনি ধৈর্যধারণ করলেন। কষ্ট-যাতনা সহ্য করেও আল্লাহর স্মরণে সময় কাটাতেন। অবশেষে রোগমুক্তির দোয়া করলেন। আল্লাহ বলেন,

স্মরণ করুন আমার বান্দা আইউবের কথা, যখন সে তার পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলল, শয়তান আমাকে দুঃখ-কষ্ট প্রদান করেছে। (আমি বললাম) তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত কর। ঝরনা নির্গত হলো গোসল করার জন্য শীতল পানি পান করার জন্য। আর আমি তাকে দিলাম তার পরিবারবর্গ ও তাদের মত আরও অনেক আমার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ এবং বুদ্ধিমানদের জন্য উদাহরণস্বরূপ এবং তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণশলা নাও, তা দ্বারা আঘাত কর এবং শপথ ভঙ্গ করো না; আমি তাকে পেলাম সবরকারী, উত্তম বান্দা সে, নিশ্চয় সে ছিল প্রত্যাবর্তনশীল (সূরা ছোয়াদ # ৩৮ : ৪১-৪৪)।

আইউব (আ.) আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ঝরনার পানি পান করলেন এবং গোসল করলেন। শরীরের সমস্ত রোগ দূর হয়ে গেল; ক্ষত-জর্জরিত শরীর সুন্দর রূপ ধারণ করল। আল্লাহ্ তাঁকে হারানো পরিবার-পরিজন এবং আরও অনেক সন্তান ও ধন-সম্পদ দান করলেন। তিনি সাত বছরের অধিককাল রোগ ভোগ করেছিলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল সাতাশি বছর।

(১৪) হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ঃ তিনি খৃষ্টপূর্ব ১২০০ শতকের শেষের দিকে কোন এক বছর বনী ইসরাইল বংশে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। সে সময় মিসরের রাজাদের উপাধি ছিল ফেরাউন। তৎকালীন ফেরাউনকে জ্যোতিষিরা বলেছিল যে, বনী ইসরাইল বংশের কোন এক পুরুষের হাতে তার ধ্বংস আসবে।

তাই ফেরাউন নির্দেশ দিল যে, সে বংশে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে মেরে ফেলবে।

(ক) বাল্যকাল ঃ আল্লাহ্ বলেন, আমি মূসা জননীকে আদেশ পাঠালাম যে, তাকে স্তন্যদান করতে থাক। অতঃপর যখন তুমি তার সম্পর্কে বিপদের আশংকা কর, তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ কর এবং ভয় কর না, আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে পয়গম্বরগণের একজন করব (সূরা কাসাস # ২৮ : ৭)।

www.nagorikpathagar.org

মূসা (আ.)-এর জন্মের পর তাঁর মা তাকে একটি সিন্দুকে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দিলেন। সে সিন্দুক ফেরাউন পরিবার কুড়িয়ে পেল। ফেরাউনের স্ত্রী বিবি আছিয়া নিজের সন্তানের মত শিশু মূসাকে লালন-পালনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। শিশু মূসাকে দুধ খাওয়ানোর জন্য মূসা (আ.)-এর মাকেই নিয়োগ করল।

(খ) **মিসরীয় হত্যা** ঃ তিনি যৌবনে পদার্পণ করলে বনী ইসরাইলদের প্রতি ফেরাউনের অত্যাচার তাঁকে বিচলিত করত। একদিন তিনি শহরে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন, তাঁর সমাজের একজন এবং শত্রু পক্ষীয় এক মিসরীয় কিবতী বিবাদে লিপ্ত। তাঁর পক্ষীয় লোকটি তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করল। মিসরীয়দের অত্যাচার সম্পর্কে তাঁর ধারণা থাকায় তিনি মিসরীয় লোকটিকে একটি ঘুষি দিলে সে তৎক্ষণাৎ মারা যায়। তিনি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

(গ) **বিবাহ** ঃ পরদিন সকালে এক ব্যক্তি তাঁকে সংবাদ দিল যে, রাজ পরিষদ তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করেছে। অতএব তাঁর অন্যত্র চলে যাওয়া দরকার। এই সংবাদের প্রেক্ষিতে তিনি ভীত অবস্থায় বের হয়ে আল্লাহর সাহায্য কামনা করে মাদইয়ানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। মাদইয়ানের একটি কূপের নিকট পৌঁছে দেখলেন কিছু রাখাল তাদের পশুপালকে পানি পান করাচ্ছে এবং দুইটি বালিকা তাদের পশুগুলোকে পানি পান করাবার সুযোগের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। মূসা (আ.) এগিয়ে যেয়ে তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে অদূরে ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন।

একটি বালিকা তাঁর নিকট গিয়ে জানাল যে, তাঁর বৃদ্ধ পিতা তাঁর উপকারের জন্য তাঁকে পুরস্কৃত করতে চান। তিনি বালিকার সাথে গিয়ে বৃদ্ধের সাথে দেখা করলেন এবং তাঁর সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। বৃদ্ধ বললেন, আমি তোমার সাথে আমার এক কন্যাকে বিবাহ দিতে চাই এ শর্তে যে, তুমি আট বছর অথবা তুমি ইচ্ছা করলে দশ বছর আমার চাকুরি করবে। শোয়ায়েবের (কারো মতে নবী শোয়ায়েব আ.) এক মেয়ের সাথে তাঁর বিবাহ হলো।

www.nagorikpathagar.org

(ঘ) নবুয়ত লাভ ঃ অতঃপর মূসা (আ.)-এর জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শুরু হলো। চাকুরির মেয়াদ দশ বছর পূর্ণ করে শ্বশুর শোয়ায়েব (আ.)-এর অনুমতি নিয়ে সপরিবারে মিসরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তুর পর্বতের নিকট উপস্থিত হলো কিছু দূরে আগুন জ্বলতে দেখলেন। শীত নিবারণের জন্য আগুন আনার উদ্দেশ্যে পরিবারবর্গকে এক স্থানে রেখে সেদিকে অগ্রসর হলেন। আগুনের কাছাকাছি পৌছলে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল। সূরা কাসাসে এর বর্ণনা এরূপ ঃ

(৩০) যখন সে এর (আগুনের) কাছে পৌছল, তখন পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত উপত্যকার ডান প্রান্তের বৃক্ষ থেকে তাকে আওয়াজ দেয়া হল ঃ হে মূসা! আমি আল্লাহ, বিশ্বপালনকর্তা। (৩১) আরও বলা হল, তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন সে লাঠিকে সাপের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করতে দেখল, তখন সে মুখ ফিরিয়ে বিপরীত দিকে পালাতে লাগল এবং পেছন ফিরে দেখল না। (বলা হল) হে মূসা, সামনে আস এবং ভয় করো না, তোমার কোন আশংকা নেই। তোমার হাত বগলে রাখ। তা বের হয়ে আসবে নিরাময় উজ্জ্বল হয়ে এবং ভয় হেতু তোমার হাত তোমার উপর চেপে ধর। এ দু'টি ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের প্রতি তোমার পালনকর্তার তরফ থেকে প্রমাণ। নিশ্চয় তারা পাপাচারী সম্প্রদায়। এভাবে মূসা (আ.) নবুয়ত লাভ করলেন। ফেরাউনকে হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাকে নির্দেশ দেন।

(ঙ) হারুন (আ.)-এর জন্য নবুয়তের প্রার্থনা ঃ মূসা (আ.) তোতলামির কারণে কথা বলতে অসুবিধাবোধ করতেন। তাই নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে নিজের সাহায্যার্থে স্বীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা হারুনকেও নবুয়ত দেয়ার প্রার্থনা জানালেন। আল্লাহ তাঁর আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং হারুনকে সঙ্গে নিয়ে ফেরাউনের নিকট যাবার আদেশ দিলেন।

(চ) ফেরাউনের মোকাবেলা ঃ মূসা (আ.) হারুন (আ.)-কে সঙ্গে নিয়ে ফেরাউনের নিকট গেলেন। তাকে ভ্রান্ত পথ ছেড়ে এক আল্লাহর আনুগত্য করতে উপদেশ দিলেন। ফেরাউন তাঁকে মিথ্যাবাদী ও কৃতঘ্ন

www.nagorikpathagar.org

সাব্যস্ত করল। সে মূসা (আ.)-কে হুঁশিয়ার করে বলল, যে তার পরিবর্তে অন্য কাকেও উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করবে, তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে। মূসা (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন যে, কোন স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আগমন করলে সে বিশ্বাস করবে কিনা। ফেরাউনের অনুমতি পেয়ে তিনি হাতের লাঠি মাটিতে নিক্ষেপ করলে তা অজগর হয়ে গেল এবং হাত বের করলে তা দর্শকদের নিকট সুশুভ্র প্রতিভাত হলো। ফেরাউন সকলকে বলল, মূসা একজন সুদক্ষ যাদুকর। তাকে দেশ থেকে বের করে দিতে হবে।

(ছ) যাদুকরদের ঈমান আনয়ন ঃ মূসা (আ.)-এর সাথে প্রতিযোগিতা করার জন্য ফেরাউন এক নির্দিষ্ট দিনে দেশের সমস্ত যাদুকরদেরকে একত্রিত করল। তাদেরকে পুরস্কৃত করার ঘোষণা দেয়া হলো। বহু দর্শক তার আমন্ত্রণে যাদু দেখতে উপস্থিত হলো।

হযরত মূসা (আ.) যাদুকরদেরকে তাদের যা আছে তা নিক্ষেপ করতে বললেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ অতঃপর তারা তাদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং বলল, ফেরাউনের ইজ্জতের কসম, আমরা বিজয়ী হব। অতঃপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল; হঠাৎ তা তাদের অলীক কীর্তিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল। তখন যাদুকররা সেজদায় নত হয়ে গেল। তারা বলল, আমরা রাব্বুল আলামীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম; যিনি মূসা ও হারুনের রব। ফেরাউন বলল, আমার অনুমতি দানের পূর্বে তোমরা কি তাকে মেনে নিলে? নিশ্চয় সে তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। শীঘ্রই তোমরা পরিণাম জানতে পারবে। আমি নিশ্চয় তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করব এবং তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াবো। তারা বলল, কোন ক্ষতি নেই। আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করব (সূরা আশ-শোআরা # ২৬ : ৪৪-৫০)।

(জ) ফেরাউনের ধ্বংস ঃ ফেরাউনকে সঠিক পথে আনার জন্য মূসা (আ.)-এর বিশ বছরের অধিককালের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেলে আল্লাহ তাকে ঈমানদারগণকে নিয়ে দেশ ত্যাগের নির্দেশ দিলেন। তিনি সঙ্গীদেরকে নিয়ে

www.nagorikpathagar.org

রাতের অন্ধকারে রওনা হয়ে সমুদ্র (সম্ভবত সুয়েজ উপসাগর যা ত্রিশ মাইল প্রশস্ত) তীরে উপস্থিত হলেন। ইত্যবসরে ফেরাউন তা টের পেয়ে বিরাট সৈন্যদল সঙ্গে নিয়ে তাদেরকে ধাওয়া করল। আল্লাহ্ বলেন ঃ অতঃপর আমি মূসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত কর। ফলে তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে গেল। আমি সেখানে অপর (ফেরাউনের) দলকে পৌছিয়ে দিলাম এবং মূসা ও তার সঙ্গীদের বাঁচিয়ে দিলাম। অতঃপর অপর দলটিকে নিমজ্জিত করলাম (সূরা আশ-শোআরা # ২৬ : ৬৩-৬৬)।

(ঝ) ফেরাউনের লাশ ঃ মূসা (আ.) তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে নিয়ে অনায়াসে সমুদ্র পার হয়ে অপর পাড়ে উঠলেন। ফেরাউন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তাদেরকে অনুসরণ করে সমুদ্রে সৃষ্ট পথে নেমে পড়লে দুই দিকের পানি তাদেরকে ডুবিয়ে মারল। আল্লাহর অসীম কুদরতে ফেরাউনের মৃতদেহ পানির কিনারায় ভেসে উঠল। সূরা ইউনুসের ৯২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ "অতএব আজকের দিনে বাঁচিয়ে দিচ্ছি আমি তোমার (ফেরাউনের) দেহকে যাতে তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পারে।" তার দেহ বর্তমানে মিসরের মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। এ দেহ কিছু দিনের জন্য বৃটিশ মিউজিয়ামে প্রদর্শিত হওয়াকালীন সময়ে আল্লাহর মেহেরবানিতে সে দেহ দেখার সুযোগ আমি পেয়েছি।

(ঞ) আল্লাহ্র কিতাবের জন্য অনুরোধ ঃ ফেরাউনের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি লাভের পর বনী ইসরাইলরা আল্লাহর তরফ থেকে হেদায়াতের কিতাব পাওয়ার জন্য মূসা (আ.)-কে অনুরোধ করল। মূসা (আ.) আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন। আল্লাহ্ বলেন, আর আমি মূসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ত্রিশ রাত্রির এবং সেগুলোকে পূর্ণ করেছি আরও দশ দ্বারা। বস্তুত এভাবে চল্লিশ রাতের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেছে (সূরা আরাফ # ৭ : ১৪২)।

(ট) বনী ইসরাইলদের বাছুর পূজা ঃ আল্লাহ্ মূসা (আ.)-কে কিতাব দেয়ার পূর্বে ত্রিশ ও দশ মোট চল্লিশ রাত্রি এতেকাফ করবার নির্দেশ দেন।

www.nagorikpathagar.org

নির্দেশ পালনের জন্য তুর পর্বতে যাওয়ার পূর্বে উম্মতের দেখাশুনার দায়িত্ব হারুন (আ.)-এর উপর দিয়ে যান। বনী ইসরাইলদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা মোনাফেক সামেরী লোকদের নিকট থেকে স্বর্ণ সংগ্রহ করে একটি গো-বাছুরের মূর্তি তৈরি করল। তার নিকট জিব্রাইল (আ.)-এর ঘোড়ার পায়ের স্পর্শ পাওয়া কিছু মাটি ছিল। তাদের মিসর ত্যাগের সঙ্কটময় সময়ে জিব্রাইল (আ.) সাথে ছিলেন। সে (সামেরী) বলল, আমি দেখলাম যা অন্যরা দেখেনি আর আমি তার (জিব্রাইল আ.) পদ চিহ্নের এক মুঠি মাটি নিয়েছিলাম (সূরা তোহা # ২০ : ৯৬)। তা বাছুরের উপর রেখে দিলে আল্লাহর কুদরতে এটা হাম্বা ডাক দিতে শুরু করল। মানুষের ঈমান নষ্ট করার সুযোগ পেয়ে বেঈমান মুনাফেক সামেরী সকলকে বুঝিয়ে বলল, বাছুরটি মূসা ও তাদের উপাস্য মা'বুদ। মূসা ভুল করে মা'বুদের খোঁজে তুর পর্বতে গেছে। তার ধোঁকায় পড়ে লোকেরা বাছুর পূজা শুরু করল। হারুন (আ.) বাধা দিলে তাঁকে হত্যার হুমকি দেয়া হয়। বাছুরের বর্ণনা সূরা আরাফের ১৪৮ নম্বর আয়াতে রয়েছে।

(ঠ) **সামেরীর শাস্তি ঃ** মূসা (আ.) ফিরে এসে এ অবস্থা দেখে প্রথমে ভাই হারুন (আ.) কে দায়ী করলেন। হারুন (আ.) ঘটনার বর্ণনা দিয়ে জানালেন যে, তিনি মূসা (আ.)-এর ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিলেন। মূসা (আ.) সামেরীকে ডেকে পাঠালেন। সে ভয়ে সব স্বীকার করল। মূসা (আ.) সকলকে এই হীন কার্যের জন্য ভর্ৎসনা করলেন এবং তওবা করতে বললেন। বাছুর মূর্তিটি পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিলেন। মূসা (আ.) সামেরীকে বললেন ঃ "তুই দূর হ, তোর জন্য এ শাস্তি রইল যে, তুই বলবি আমাকে স্পর্শ করো না (সূরা তোয়া-হা # ২০ : ৯৭)। বাকী জীবন সে লোক দেখলে আমাকে স্পর্শ করো না বলে চিৎকার দিয়ে পালাত। মোনাফেক হিসেবে পরকালের বিচার তো হবেই।

(ড) তাওরাত লাভ ও আল্লাহর দর্শন লাভের আবেদন ঃ চল্লিশ রাত প্রার্থনার জন্য তুর পর্বতে গেলে আল্লাহ্ তাঁর সাথে কথা বললেন। মূসা (আ.) আল্লাহকে দেখতে চাইলেন। এর পরবর্তী বর্ণনা এই যে, তিনি

www.nagorikpathagar.org

(আল্লাহ্) বললেন, তুমি কিছুতে আমাকে দেখতে পাবে না, তবে তুমি পাহাড়ের দিকে দেখতে থাক। সেটি যদি স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে তবে আমাকে দেখতে পাবে। তারপর যখন তাঁর পরওয়ারদেগার পাহাড়ের উপর নিজ জ্যোতির বিকিরণ ঘটালেন, সেটিকে বিধ্বস্ত করে দিলেন এবং মূসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। অতঃপর তাঁর জ্ঞান ফিরে আসলে বললেন, হে প্রভু! তুমি পবিত্র, তোমার দরবারে আমি তওবা করছি এবং আমি সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপন করছি। (আল্লাহ্) বললেন, হে মূসা, আমি তোমাকে আমার বার্তা পাঠাবার এবং কথা বলবার মাধ্যমে লোকদের উপর বিশিষ্টতা দান করেছি। সুতরাং যা কিছু আমি তোমাকে দান করলাম, গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ থাক। আজ আমি তোমাকে পত্রে লিখে দিয়েছি সর্বপ্রকার উপদেশ এবং বিস্তারিত সব বিষয়। অতএব এগুলোকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং স্বজাতিকে এটার কল্যাণকর বিষয়সমূহ দৃঢ়তার সাথে পালনের নির্দেশ দাও। শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে দেখাব কাফেরদের বাসস্থান (সূরা আরাফ # ৭ : ১৪৩-১৪৫)।

(ঢ) অবিশ্বাসীদের শাস্তি ঃ আল্লাহর কিতাবের জন্য তুর পর্বতে মূসা (আ.)-এর সঙ্গে কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট বনী ইসরাইল যাওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে কেউ যায়নি। তিনি আল্লাহর কিতাব তাওরাত নিয়ে ফিরে আসলে কুচক্রীরা তা বিশ্বাস করল না। তারা সরাসরি আল্লাহর আদেশ শুনতে চাইল। মূসা (আ.) তাদের নির্বাচিত সত্তরজনকে নিয়ে তুর পর্বতে গেলে আল্লাহ তাদেরকে বললেন, আমি তোমাদের একমাত্র মা'বুদ; আমাকে ছাড়া অন্য কারো গোলামি করো না। তারা বলে উঠল, এটা যে আল্লাহর বাণী তাঁকে না দেখে কিভাবে বিশ্বাস করব? তখন ভীষণ গর্জন আর বিদ্যুতের গজবে তারা ধ্বংস হয়ে গেল। এতে মূসা (আ.) এই ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে, দুষ্টদেরকে এই ঘটনা বুঝানো যাবে না। তারা তাঁকে দোষারোপ করবে। তিনি আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন। আল্লাহ পুনরায় তাদেরকে জীবিত করে দিলেন।

(ণ) তীহ প্রান্তরে দিশাহারা চল্লিশ বছর ঃ বনী ইসরাইলগণ তখন তীহ প্রান্তরে অবস্থান করতেছিল। আল্লাহ তাদেরকে তাদের পৈত্রিক

২৪—

www.nagorikpathagar.org

আবাসভূমি শাম্ দেশে (সিরিয়ায়) যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। সে সময় শাম দেশে আমলেকা নামক এক দুর্ধর্ষ জাতি বাস করছিল। বনী ইসরাইলগণ সে দুর্ধর্ষ জাতির মোকাবেলা করতে রাজি হলো না এবং বলল সে জাতি শাম দেশ থেকে বের হয়ে না গেলে তারা সেখানে যাবে না।

বনী ইসরাইলদের মধ্যে সেখানে বারটি গোত্র ছিল। মূসা (আ.) প্রত্যেক গোত্রের সর্দারকে শাম দেশের অবস্থা দেখে আসার জন্য পাঠালেন। তারা তাদের জন্য অবস্থা অনুকূলে পেল। সে খবর দিতে ফিরে এসে তাদের দশজন দুষ্টামি করে বিপরীত সংবাদ দিয়ে লোকদেরকে হতাশ করে ফেলল।

মূসা (আ.) অনুতপ্ত ও মনঃক্ষুণ্ন হয়ে আল্লাহর দরবারে বনী ইসরাইলদের বিরুদ্ধে বিচারপ্রার্থী হলেন। আল্লাহ তাদেরকে তাদের পুণ্যভূমি ও পৈত্রিক দেশ থেকে চল্লিশ বছরের জন্য বঞ্চিত করলেন এবং তীহ প্রান্তরে এই দীর্ঘকাল দিশাহারা হয়ে ঘুরতে থাকার ফয়সালা দিলেন।

(ত) পানি, খাদ্য ও ছায়ার ব্যবস্থা ঃ নাফরমান ও অবাধ্য বনী ইসরাইলগণ তীহ প্রান্তরে পানি খাদ্য ও ছায়ার অভাবে কষ্টে পড়ল। মূসা (আ.) আল্লাহর দরবারে এগুলোর অভাব দূর করার জন্য দোয়া করলেন। আল্লাহ মূসা (আ.)-কে একটি পাথরে তাঁর লাঠি দ্বারা আঘাত করতে বললেন। লাঠির আঘাতে বারটি গোত্রের জন্য বারটি ঝর্নার সৃষ্টি হলো। খাদ্যের জন্য মান্না ও সালওয়ার ব্যবস্থা করলেন এবং ছায়ার জন্য আকাশে মেঘমালা সৃষ্টি করলেন। উল্লেখ্য যে মান্না একটি বিশেষ গাছ থেকে নির্গত এক প্রকার মিষ্টি দ্রব্য এবং সালওয়া এক জাতীয় ক্ষুদ্রাকৃতির পাখী যারা তাদের নাগালের মধ্যে এসে থাকত।

(থ) মূসা (আ.) ও হারুন (আ.)-এর ইন্তেকাল ঃ তীহ প্রান্তরে অবস্থানকালে মূসা (আ.) ও হারুন (আ.) ইন্তেকাল করেন। মিরাজের সময় হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে ষষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা (আ.) এবং পঞ্চম আসমানে হযরত হারুন (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে সালাম বিনিময় এবং কিছু কথাবার্তা হয়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

(দ) **শাম দেশ দখল ঃ** মূসা (আ.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত ইয়াসা (আ.) বনী ইসরাইলদের নবী হলেন। তীহ প্রান্তরে চল্লিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর শাম দেশে যাওয়ার জন্য আল্লাহ বনী ইসরাইলদেরকে নির্দেশ দেন। হযরত ইয়াসা (আ.)-এর নেতৃত্বে তারা জিহাদ করে আমলেকা জাতিকে পরাজিত করে শাম দেশ দখল করল।

(ধ) **বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ ঃ** শাম দেশের রাজধানী বায়তুল মুকাদ্দাসে ঢুকার জন্য আল্লাহ কিছু নিয়ম বলে দিয়েছেন। আর যখন আমি বললাম, তোমরা প্রবেশ কর এই নগরীতে এবং এতে যেখানে খুশী খাও বিচরণ করতে থাক এবং দরজার ভেতর দিয়ে প্রবেশ করার সময় সেজদা করে ঢুক আর বলতে থাক আমাদেরকে ক্ষমা কর, তাহলে আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেব এবং পুণ্যবানদেরকে অতিরিক্ত দান করব। অতঃপর জালেমরা কথা পাল্টিয়ে দিয়েছে যা কিছু তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছিল তা থেকে। তারপর আমি অবতীর্ণ করেছি জালেমদের উপর আজাব আসমান থেকে আদেশ অমান্যের কারণে (সূরা বাকারা # ২ : ৫৮-৫৯)। [তারা ক্ষমা চাই এর পরিবর্তে খাদ্য চাই বলতেছিল]

(ন) **বনী ইসরাইল তথা ইহুদীদের গোঁড়ামি ঃ** মূসা (আ.)-এর উম্মতেরা ইহুদী (Jewish) নামে পরিচিত। তারা অবাধ্য, নাফরমান ও গোঁড়া জাতি। আল্লাহ বলেন ঃ আর সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তোমার পালনকর্তা সংবাদ দিয়েছেন যে, অবশ্যই কেয়ামত দিবস পর্যন্ত ইহুদীদের উপর এমন লোক পাঠাতে থাকবেন যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তিদান করতে থাকবে। নিঃসন্দেহে তোমার পালনকর্তা শীঘ্র শাস্তিদানকারী এবং তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু (সূরা আরাফ # ৭ : ১৬৭)।

(১৫) হযরত দাউদ আলাইহিস সাল্লাম ঃ হযরত মূসা (আ.)-এর অনেক পরে সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে তাঁর আবির্ভাব। তিনি বনী ইসরাইলদের রাজা তালুতের একজন সৈনিক ছিলেন। সে সময় দুর্ধর্ষ আমলেকা জাতির অত্যাচারী রাজা জালুত বনী ইসরাইলদের পবিত্র 'তাবুতে সাকীনা' বা শান্তির সিন্দুক লুট করে নিয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে

www.nagorikpathagar.org

তাওরাতের মূল পাণ্ডুলিপি, মূসা (আ.)-এর অলৌকিক লাঠি এবং মূসা (আ.) ও হারুন (আ.)-এর জামা রক্ষিত ছিল। সিন্দুকটি তারা যেখানে রাখত সেখানে মহামারী দেখা দিত। এই কারণে কেউ এটা রাখতে রাজি হত না। অতঃপর তারা সিন্দুকটি একটি গরুর গাড়ীতে উঠিয়ে চালক ছাড়া মরু অঞ্চলে ছেড়ে দিলে ফেরেশতাগণ গরু দু'টিকে হাঁকিয়ে বনী ইসরাইলদের নিকট নিয়ে আসে (বোখারী শরীফ, ৪র্থ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২১৩ পৃষ্ঠা)। দাউদ (আ.) যুদ্ধক্ষেত্রে পাথর নিক্ষেপ করে রাজা জালুতকে হত্যা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

আল্লাহ্ তাঁকে নবুয়ত দান করলেন। তিনি তালুতের স্থলে বনী ইসরাইলদের বাদশা মনোনীত হলেন। তিনি আসমানী কিতাব যবুর পেয়েছিলেন। তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, অতি অল্প সময়ে তিনি যবুর পাঠ শেষ করতে পারতেন। তাঁর যবুর পাঠ অত্যন্ত মধুর ছিল। তিনি যবুর অথবা তাসবীহ্ পাঠ করার সময় বনের পাখী এসে হাজির হত এবং তাঁর পাঠ শুনে তারা মধুর সুরে তাসবীহ্ পড়ত। তাঁর পড়ার আওয়াজ পাহাড়ে গেলে এটাও তাঁর সাথে তাসবীহ্ পড়ার ধ্বনি করত। আল্লাহ্ বলেন, আমি পর্বত ও পক্ষীসমূহকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলেন। তারা আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত। এই সমস্ত আমিই করেছিলাম (সূরা আম্বিয়া # ২১ : ৭৯)।

দাউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ এই বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন যে, তাঁর হাতের স্পর্শে লোহা নরম হয়ে যেত এবং এটা দ্বারা তিনি যুদ্ধে ব্যবহারের বর্ম ও অন্যান্য লৌহ দ্রব্য তৈরি করতেন। আল্লাহ্ বলেন, আমি তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে (সূরা আম্বিয়া # ২১ : ৮০)।

দাউদ (আ.)-এর সময়ের একটি স্মরণীয় ঘটনা এই যে, কিছু সংখ্যক অবাধ্য ইহুদীকে আল্লাহ বানরে পরিণত করেছিলেন। ইহুদীদের জন্য শনিবার পবিত্র ও সাপ্তাহিক উপাসনার দিন হওয়ায় সেদিন মাছ ধরা তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু শনিবারে সাগরকূলে প্রচুর মাছ ভেসে

www.nagorikpathagar.org

উঠত। সমুদ্র উপকূলের জেলে সম্প্রদায় ফন্দি করে উপকূলে পুকুর খনন করে খাল দ্বারা সমুদ্রের সাথে সংযোগ করে দিত। ফলে ঐ সকল মাছ পুকুরে ঢুকে পড়লে তারা খাল বন্ধ করে দিত এবং পরের দিন অর্থাৎ রবিবারে ধরত। এতে আল্লাহ তাদের উপর গজব নাযিল করেন। আল্লাহ বলেন, তোমরা তাদেরকে ভালরূপে জেনেছ যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেছিল। আমি বলেছিলাম, তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও। অতঃপর আমি এ ঘটনাকে তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহভীরুদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপাদান করে দিয়েছি (সূরা বাকারা # ২ : ৬৫ ও ৬৬)।

তিন দিন পর এদের সকলে মৃত্যু মুখে পতিত হয় (তফসীর মা'আরেফুল কোরআন, পৃ. ৪৪)।

(১৬) হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম ঃ হযরত দাউদ (আ.)-এর পরে তাঁর সুযোগ্য পুত্র হযরত সুলায়মান (আ.) নবুয়ত ও বাদশাহী লাভ করেন। আল্লাহ তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী করেছিলেন।

(ক) বিচারের দক্ষতা ঃ এক ব্যক্তির মেষপাল অপর ব্যক্তির শস্য ক্ষেতে ঢুকে ফসল নষ্ট করে ফেললে ফসলের মালিক দাউদ (আ.)-এর নিকট নালিশ করে। তিনি অনুসন্ধানে জানতে পারেন যে, ফসলের ক্ষতির পরিমাণ পশুপালের মূল্যের সমান। তাই পশুপাল ফসলের মালিককে দেয়ার জন্য তিনি রায় দেন।

সুলায়মান (আ.) এ ঘটনা শুনছিলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল এগার বছর। তিনি পিতাকে বুঝালেন, উভয় পক্ষের সমঝোতার মাধ্যমে এভাবে সমাধান করা যায় যে, জমির মালিককে পশুগুলো দেয়া হবে; সে এদের দুধ ও পশম দ্বারা উপকার পেতে থাকবে। অন্যদিকে পশুর মালিক জমিতে চাষ করে এটা পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে এনে মালিককে বুঝিয়ে দিয়ে পশুপাল ফেরত নেবে। এতে বাদীর ক্ষতি পূরণ হয়ে যাবে এবং বিবাদীও তাঁর পশুপাল থেকে বঞ্চিত হবে না। দাউদ (আ.) এ ফয়সালা পছন্দ করলেন। আল্লাহও এটা পছন্দ করলেন (সূরা আম্বিয়া # ২১ : ৭৮-৭৯)।

www.nagorikpathagar.org

(খ) আল্লাহর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ঃ তাঁর সময়ে সূর্যাস্তের পূর্বে কোন ফরয এবাদত ছিল। একদিন তিনি তাঁর ঘোড়ার পাল পরিদর্শন করতে থাকায় সূর্যাস্ত হয়ে গেল। তাঁর খেয়াল হলে তিনি অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলেন এবং ঘোড়াগুলো যবেহ করে মাংস গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন (সূরা ছোয়াদ # ৩৮ : ৩১-৩৩)।

(গ) ইনশাআল্লাহ না বলার পরিণাম ঃ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের পক্ষে তাঁর সৈন্যদলের উপর বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন, আমি আমার ৭০ জন মতান্তরে ৯০ জন স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করব। প্রত্যেকের গর্ভে এক একজন সৈনিক জন্মাবে। তাদের নিয়ে আমি জিহাদ করব। আল্লাহর উপর ভরসা না করা তথা ইনশাআল্লাহ না বলায় আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। ফলে তাঁর এক স্ত্রী ছাড়া কেউ গর্ভবতী হয়নি। যিনি গর্ভবতী হলেন তিনি একটি বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম দিলেন। এটা দেখে তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলেন ও বিশাল সাম্রাজ্য পাওয়ার জন্য তাঁর নিকট আবেদন জানালেন (সূরা ছোয়াদ # ৩৮ : ৩৪-৩৫)।

(ঘ) বাতাস, পাখী ও জিনের উপর ক্ষমতা লাভ ঃ আল্লাহ সুলায়মান (আ.)-কে বাতাস, পাখী ও জিনদের উপর ক্ষমতা দান করলেন। আল্লাহ বলেন, আমি বাতাসকে তাঁর অনুগত করে দিলাম, যা তার হুকুমে অবাধে প্রবাহিত হত যেখানে সে পৌঁছাতে চাইত। আর সকল শয়তানকে (খারাপ জিনকে) তাঁর অধীন করে দিলাম, যারা ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরি। আর অন্য আরও অনেককে অধীন করে দিলাম, যারা আবদ্ধ থাকত শৃঙ্খলে (সূরা ছোয়াদ # ৩৮ : ৩৬-৩৮)।

তিনি বাতাসকে হুকুম করলে তা তাঁকে অতিদ্রুত গন্তব্যে পৌঁছে দিত। জিনেরা তাঁর আদেশ পালন করত। পাখী, পিপীলিকা ইত্যাদির ভাষা তিনি বুঝতেন। এরা তাঁর অধীন এবং আজ্ঞাবাহী ছিল।

(ঙ) পিপীলিকার কথা বলা ঃ সুলায়মান (আ.) জিন, মানুষ ও পক্ষীকুল নিয়ে গঠিত সৈন্যদল নিয়ে পিপীলিকা অধ্যুষিত একটি এলাকা অতিক্রম করছিলেন। পিপীলিকা বলল, হে পিপীলিকার দল তোমরা

www.nagorikpathagar.org

তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর। অন্যথা সুলায়মান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে। (১৯) এর কথা শুনে সুলায়মান মুচকি হাসলেন এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমাকে সামর্থ দাও যাতে আমি তোমার সেই নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি (সূরা নামল # ২৭ : ১৮-১৯)।

(চ) রাণী বিলকিসের ঘটনা ঃ সুলায়মান (আ.) সৈন্যদের খবর নিতে গিয়ে হুদহুদ পাখীকে অনুপস্থিত পেয়ে রাগান্বিত হলেন। অনুপস্থিতির উপযুক্ত কারণ দেখাতে না পারলে একে হত্যার ঘোষণা দিলেন। সূরা নামলে বলা হয়েছে, কিছুক্ষণ পরে হুদহুদ এসে বলল, আপনি যা অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার কাছে 'সাবা' থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি। আমি এক নারীকে সাবাবাসীদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সব কিছু দেয়া হয়েছে এবং তার একটি বিরাট সিংহাসন আছে। আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করছে (সূরা নামল # ২৭ : ২২-২৪)।

সুলায়মান (আ.) এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য বিলকিসকে একটি পত্র লিখে হুদহুদের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিলেন। অসীম দাতা, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু; আরও লিখলেন, তাঁর বিরুদ্ধে শক্তি প্রদর্শন না করে বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর সম্মুখে হাজির হতে। রাণী তার পরিষদের পরামর্শ শুনল এবং সুলায়মান (আ.)-এর নিকট কিছু উপঢৌকন পাঠিয়ে প্রতিক্রিয়া জানার অপেক্ষায় রইল। সুলায়মান (আ.) সেগুলো এ বলে ফেরত পাঠালেন যে, আল্লাহ তাঁকে প্রচুর সম্পদ দান করেছেন। রাণী আত্মসমর্পণ না করলে বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে সেখানে যাবেন, যার মোকাবেলা করার শক্তি তাদের নেই। বিলকিসের আত্মসমর্পণের পূর্বে তার সিংহাসনটি তাঁর সামনে হাজির করার জন্য এক জিনকে আদেশ দিলে সে চোখের পলকে তা হাজির করল।

ঘটনার বাকী অংশ কোরআনে এরূপ ঃ অতঃপর বিলকিস এসে গেল, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, তোমার সিংহাসন কি এরূপ? সে

www.nagorikpathagar.org

বলল, মনে হয় এটা সেটা। আমরা পূর্বেই সমস্ত অবগত হয়েছি এবং আমরা আজ্ঞাবহ হয়ে গিয়েছি। আল্লাহর পরিবর্তে সে যার এবাদত করত, সে তাকে ঈমান থেকে নিবৃত্ত করেছিল। নিশ্চয় সে কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাকে বলা হল, এই প্রাসাদে প্রবেশ কর।

যখন সে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করল, সে ধারণা করল যে, একটা স্বচ্ছ গভীর জলাশয়। সে তার পায়ের গোছা খুলে ফেলল। সুলায়মান বলল, এটা তো স্বচ্ছ কাঁচ নির্মিত প্রাসাদ। বিলকিস বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি। আমি সুলায়মানের সাথে বিশ্বজাহানের পালনকর্তা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম (সূরা নামল # ২৭ : ৪২-৪৪)।

জানা যায় কুমারী রাণী বিলকিসের অনুরোধে সুলায়মান (আ.) তাঁকে বিবাহ করেছিলেন। রাণীর রাজত্ব সুলায়মান (আ.)-এর সাম্রাজ্যের সাথে একীভূত হয়ে গিয়েছিল।

(ছ) সুলায়মান (আ.)-এর মৃত্যু ঃ সুলায়মান (আ.) জিনদের সাহায্যে বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদ পুনঃনির্মাণ করা কালে নিজের মৃত্যু নিকটবর্তী বলে জানতে পারলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর মৃত্যু হলে জিনেরা স্বাধীন হয়ে যাবে এবং মসজিদের কাজ অসমাপ্ত থেকে যাবে। একটি নির্জন কক্ষে তিনি আল্লাহর এবাদতে মশগুল হয়ে পড়লেন। তিনি একটি লাঠির উপর এমনভাবে ভর করে রইলেন যেন মৃত্যু হলে দেহ পড়ে না যায়। মসজিদের নির্মাণ শেষ হওয়ার জন্য তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন।

তাঁর মৃত্যু হলে দেহ লাঠির উপর ঠেস দেয়া অবস্থায় রয়ে গেল। মসজিদের কাজ শেষ হলে ঘুন পোকায় তাঁর লাঠি খেয়ে ফেললে এটা ভেঙ্গে দেহ মাটিতে পড়ে গেল। জিন ও অন্যান্যরা তাঁর মৃত্যুর খবর পেল। আল্লাহ বলেন, যখন আমি সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন ঘুন পোকা জিনদেরকে তাঁর মৃত্যু সংবাদ অবহিত করল। সুলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে,

www.nagorikpathagar.org

অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকলে তারা এ লাঞ্ছনাপূর্ণ শাস্তিতে আবদ্ধ থাকত না (সূরা সাবা # ৩৪ : ১৪)।

(১৭) হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম ঃ তাঁর বংশ পরিচয় জানা যায় না। রাসূলুল্লাহ (সা.) এক হাদীসে তাঁকে মাত্তার পুত্র বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বনী ইসরাইল অধ্যুষিত ইরাকের নিনওয়া অঞ্চলের নবী ছিলেন। তিনি সেখানকার অধিবাসীদেরকে শিরক ও মূর্তি পূজা ছেড়ে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানান। কিন্তু দীর্ঘ সাত বছর চেষ্টা চালিয়ে তাদেরকে দেব-দেবীর পূজা থেকে বিরত করে আল্লাহর পথে আনতে তিনি পারেননি।

ইউনুস (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে তিন দিনের মধ্যে আল্লাহর আজাব আসার ভয় প্রদর্শন করলেন। বাহ্যত এইটা তাঁর নিজের মত ছিল না, বরং আল্লাহর অহীর কারণে ছিল (তফসীর মা'আরেফুল কোরআন, সূরা আম্বিয়ার তফসীর)। আজাব এসে পড়ার অবকাশস্বরূপ আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে যে তিন দিন নির্ধারিত করা হয়েছিল, সে তিন দিনের দু'দিন গত হয়ে তৃতীয় দিনের মধ্যরাত এসে গিয়েছিল, তবুও দেশবাসীর অবস্থার কোন পরিবর্তন আসেনি। এমতাবস্থায় সে অঞ্চলে অবস্থান করার কোন সুফল বা কার্যকারিতা দেখা যাচ্ছিল না (বোখারী শরীফ, হযরত ইউনুস আ.-এর বর্ণনার অংশ)। তিনি হয়তো মনে করেছিলেন আজাব আসার আর কোন সম্ভাবনা নেই এবং আজাব না আসলে লোকেরা তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবে তাই রাতের অন্ধকারে নিনওয়া ত্যাগ করে অন্যত্র রওয়ানা হলেন।

সকালে আজাবের কিছু আলামত টের পেয়ে লোকেরা ঘর-বাড়ী ছেড়ে ময়দানে একত্রিত হয়ে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি শুরু করল। শিশুদেরকে মায়ের দুধ দিল না এবং গৃহপালিত পশুগুলোকে খাবার দিল না। শিশু ও পশুর চিৎকার আর মানুষের কান্নাকাটিতে আল্লাহ আসন্ন আজাব তুলে নেন। আল্লাহ বলেন, তারা (ইউনুসের সম্প্রদায়) যখন ঈমান আনল, তখন আমি তুলে নিই তাদের উপর থেকে অপমানজনক আজাব

www.nagorikpathagar.org

পার্থিব জীবনে এবং তাদেরকে কল্যাণ পৌঁছায় এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত (সূরা ইউনুস # ১০ : ৯৮)।

অন্যদিকে ইউনুস (আ.) একটি বোঝাই নৌকায় উঠলেন। নৌকা নদীতে কিছুদূর যেতেই ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলো। মাঝি বলে উঠল যে, নৌকায় এমন কোন গোলাম আছে যে মনিবের বিনানুমতিতে পালিয়ে এসেছে। গোলামকে ফেলে না দিলে নৌকা ডুবে যাবে। লোকেরা তিনবার লটারি করে প্রত্যেকবার ইউনুস (আ.)-এর নাম পেল। তারা তাঁকে নদীতে ফেলে দিল। তৎক্ষণাৎ একটি বিরাটাকার মাছ তাঁকে গিলে ফেলল। মাছের পেটে অনুতপ্ত হয়ে তিনি পড়লেন, লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা; ইন্নি কুনতু মিনাযয-লেমীন। (তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তুমি পবিত্র; আমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত) (সূরা আম্বিয়া # ২১ : ৮৭)। আল্লাহর অপরিসীম দয়ায় মাছ তাঁকে এক চরে পেট থেকে বের করে দিল।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলেন, যদি তিনি আল্লাহর তাসবীহ পাঠ না করতেন, তবে তাঁকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত মাছের পেটে থাকতে হত। তারপর আমি তাঁকে এক বিস্তীর্ণ জনহীন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম, তখন তিনি ছিলেন রুগ্ন। আমি তাঁর উপর লতাবিশিষ্ট এক বৃক্ষ উদগত করলাম আর তাঁকে লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করলাম। তাঁরা বিশ্বাস স্থাপন করল ফলে তাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবন ভোগ করতে দিলাম (সূরা আস-সফফাত # ৩৭ : ১৪৩-১৪৮)।

টীকা ঃ ইউনুস (আ.) যে দোয়া পড়ে মাছের পেট থেকে উদ্ধার পেলেন, সে দোয়া পড়তে থাকলে বিপদে উদ্ধার পাওয়া যায়। আল্লাহর গজব ও বড় রকমের বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য সমষ্টিগতভাবে এ দোয়া সোয়া লক্ষ বার পড়া হয়। আল্লাহর রহমতে বিপদ দূর হয়ে যায়। এটা খতমে ইউনুস তথা বড় খতম নামে পরিচিত।

(১৮) হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম ঃ তিনি ছিলেন হযরত দাউদ (আ.)-এর বংশধর। বায়তুল মুকাদ্দাসের ধর্মীয় প্রধান ছিলেন তিনি। তাঁর পিতার সঠিক নাম জানা যায় না। তবে তিনি হযরত ঈসা

www.nagorikpathagar.org

(আ.)-এর মাতা মারইয়াম (আ.)-এর খালু হতেন। মারইয়াম (আ.) তাঁর তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হয়েছিলেন। তাঁর মাতা তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। কোরআনে উল্লেখ আছে, যখন যাকারিয়া তাঁর কক্ষে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যেত তখন তাঁর নিকট খাদ্য সামগ্রী দেখতে পেত। সে বলত, হে মারইয়াম! এই সব তুমি কোথায় পেলে? সে বলত, এটা আল্লাহর নিকট থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন (সূরা আলে ইমরান # ৩ : ৩৭)।

যাকারিয়া (আ.) ছুতার মিস্ত্রীর কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। মারইয়াম (আ.)-এর এইরূপ অলৌকিক ঘটনা দেখে তাঁর মনে আশার সঞ্চার হল যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাঁকে সন্তান দান করতে পারেন। তিনি বিনীতভাবে আল্লাহর নিকট দোয়া করতে লাগলেন। কোরআনের বাণী এই যে, যাকারিয়া তার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি তোমার নিকট থেকে সৎ বংশধর দান কর। নিশ্চয় তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।

যখন যাকারিয়া কক্ষে সালাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন তখন ফেরেশতাগণ তাঁকে সম্বোধন করে বলল, আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন, সে হবে আল্লাহর বাণীর সমর্থক, নেতা, স্ত্রী বিরাগী এবং পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নবী। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র হবে কিরূপে? আমার তো বার্ধক্য এসেছে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। তিনি বললেন, "এভাবে" আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন (সূরা আলে ইমরান # ৩ : ৩৮-৪০)।

যাকারিয়া বলল, হে আমার প্রভু, আমাকে একটি নিদর্শন দাও। তিনি বললেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ থাকা সত্ত্বেও কারো সাথে তিন দিন বাক্যালাপ করবে না। অতঃপর সে কক্ষ থেকে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট আসল এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে বলল (সূরা মারইয়াম # ১৯ : ১০-১১)।

আল্লাহ বলেন ঃ অতঃপর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে যোগ্যতাসম্পন্ন করেছিলাম। তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করত, তারা আমাকে ডাকত

www.nagorikpathagar.org

আশা ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনীত (সূরা আম্বিয়া # ২১ : ৯০)।

একদা ইবলিস মানুষ বেশে প্যালেস্টাইনের লোকদের নিকট এসে যাকারিয়া ও তার লালন পালনে থাকা মারইয়ামের কুৎসা শুনাতে লাগল। লোকেরা এমনিতে যাকারিয়াকে পছন্দ করত না। তদুপরি তার কুৎসা শুনে উত্তেজিত হয়ে গেল এবং তাঁকে হত্যা করার জন্য ধাওয়া করল। তখন তিনি আত্মরক্ষার জন্য একটি গাছের দিকে ছুটে গেলেন। তাঁকে রক্ষা করার জন্য গাছের কাণ্ড ভাগ হয়ে গেল। তিনি এর ভেতরে ঢুকে পড়লেন। গাছ পূর্বের ন্যায় হয়ে গেল। কিন্তু শয়তান তাঁর কাপড়ের অংশ গাছের বাইরে রেখে দিল। শয়তান লোকদেরকে কাপড়ের সে অংশ দেখিয়ে বলল, যাকারিয়া এ গাছের ভেতরে লুকিয়েছে। অতএব করাত দিয়ে গাছটি দ্বিখণ্ডিত করে ফেল। লোকেরা করাত দিয়ে গাছ দ্বিখণ্ডিত করতে শুরু করলে শয়তান অদৃশ্য হয়ে গেল। যাকারিয়া (আ.) আল্লাহর ইচ্ছায় কোন ব্যথা অনুভব না করে দ্বিখণ্ডিত হলেন। আল্লাহ ফেরেশতা পাঠিয়ে তার মৃতদেহ গোসল করান।

(১৯) হযরত ইয়াহইয়া (আ.) ঃ হযরত যাকারিয়া (আ.) ও তাঁর স্ত্রী তখন খুব বৃদ্ধ। সে সময় যাকারিয়া (আ.) আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা (নিঃসন্তান) রেখো না; তুমি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী (সূরা আম্বিয়া # ২১ : ৮৯)। আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করে তাঁদেরকে সক্ষম দম্পতি করে দিলেন। তাঁর বয়স যখন ১২০ বছর এবং তাঁর স্ত্রীর বয়স ৯৮ বছর তখন তাদের পুত্র ইয়াহইয়ার জন্ম হয়।

ইয়াহইয়া (আ.) কে বাল্যকালে আল্লাহ যথেষ্ট জ্ঞান দান করেছিলেন। আল্লাহ বলেন, হে ইয়াহইয়া! এ কিতাব (তাওরাত) দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর। আমি তাকে শৈশবে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং আমার নিকট থেকে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা, সে ছিল মুত্তাকী, পিতা-মাতার অনুগত এবং সে উদ্ধত ও অবাধ্য ছিল না (সূরা মারইয়াম # ১৯ : ১২-১৪)। এটা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

www.nagorikpathagar.org

হযরত ঈসা (আ.) এবং হযরত ইয়াহইয়া (আ.) যে কোনভাবে খালাত ভাই ছিলেন। যে কোনভাবে বলার কারণ এই যে, ঈসা (আ.)-এর নানীর মারইয়াম (আ.) ছাড়া অন্য কোন মেয়ে ছিল না। ঈসা (আ.) এবং ইয়াহইয়া (আ.) একই সময়ের নবী। ইয়াহইয়া (আ.) ঈসা (আ.)-এর সত্যবাদিতা ও তাওরাতের প্রচার করেছিলেন। ইহুদীরা তার এই কার্য পছন্দ করত না। তদুপরি বৃদ্ধ পিতার ঔরসে তাঁর জন্ম নিয়ে তার মাতা সম্পর্কে কুৎসিত অপবাদ রটাচ্ছিল। অবশেষে ইহুদীদের হাতে তাঁকে শাহাদাত বরণ করতে হয়েছিল। মিরাজের রাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) তৃতীয় আসমানে তাঁর দেখা পেয়েছিলেন। তিনি নবী (সা.)-কে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন, মারহাবা ধন্যবাদ উচ্চ মর্যাদাবান ভ্রাতা ও উচ্চ মর্যাদাবান নবীর প্রতি।

বোখারী শরীফের চতুর্থ খণ্ডের ২৪৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, হযরত ইয়াহইয়ার উপর আল্লাহ তা'আলার ভয় ভক্তির এত অধিক প্রভাব ছিল যে, আল্লাহর দরবারে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর চেহারার উপর অশ্রু বর্ষণের রেখা পড়ে গিয়েছিল। তিনি সাধারণত বেহাল-বেকারার অবস্থায় বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন এবং রোদন-ক্রন্দনের মধ্যে সময় কাটাতেন। একদা তাঁর পিতা যাকারিয়া (আ.) তাঁকে নিবিড় জঙ্গলে খোঁজে বের করলেন এবং ঐরূপ রোদন-ক্রন্দন অবস্থায় দেখতে পেয়ে বললেন, আমরা তোমার তালাশে ব্যতিব্যস্ত, আর তুমি এই নীরব জঙ্গলে বসে কাঁদছ। হযরত ইয়াহইয়া বললেন, আব্বাজান! আপনি তো বলেছেন, জাহান্নামকে এড়িয়ে বেহেশতে পৌঁছতে একটি বিশাল ময়দান অতিক্রম করতে হয়, সে ময়দান একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ভয়-ভক্তির অশ্রু বর্ষণে পার হওয়া সম্ভব হবে, অন্যথা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিস্থল বেহেশতে পৌঁছা যাবে না। এতদশ্রবণে পিতা হযরত যাকারিয়াও কেঁদে উঠলেন (কাসাসুল কোরআন # ১-২৯৬)। আল্লাহ বলেন, তার প্রতি শান্তি যে দিন সে জন্মলাভ করে, যে দিন তার মৃত্যু হবে এবং যেদিন সে জীবিত অবস্থায় উত্থিত হবে (সূরা মারইয়াম # ১৯ : ১৫)।

www.nagorikpathagar.org

(২০) হযরত ইলিয়াস (আ.) : তিনি জর্ডানের অল আদ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মূসা (আ.)-এর ভ্রাতা হারুন (আ.)-এর বংশধর। তিনি বনী ইসরাইলদের নবী ছিলেন। তাঁর আবির্ভাবস্থল ছিল তৎকালীন সিরিয়ার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ শহর "বালা-বাক্কা"। এটা বর্তমান লেবাননের একটি মহকুমা। এ শহর এলাকার আদি অধিবাসীদের দেবতা "বা'ল" এবং এ শহরের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ "বাক্কা"– এ উভয় নাম মিলিয়ে "বালা-বাক্কা" হয়েছে।

ইসরাইলের তৎকালীন শাসনকর্তার নাম ছিল আখিয়াব বা আখিব। তার স্ত্রী ঈযবীল "বা'ল" দেবতার পূজা করত এবং ইসরাইলীদেরকে এ দেবতার পূজা করার জন্য আকৃষ্ট করেছিল। ইলিয়াস (আ.) তাদেরকে সতর্ক করতঃ এক আল্লাহর এবাদত করার জন্য উপদেশ দিতেন। তিনি বলতেন, তোমরা তোমাদের ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তাকে ছেড়ে বা'লের পূজা করছ। এটা কত বড় অন্যায়! কিন্তু তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল। মাত্র কয়েকজন নিষ্ঠাবান লোক ছাড়া কেউই তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করল না।

পবিত্র কোরআনে হযরত ইলিয়াস (আ.)-এর নাম সূরা আনআম ও আস সফফাতে পাওয়া যায়। সূরা আনআমে শুধু নবীদের সাথে তাঁর নাম আছে, বিস্তারিত কোন বর্ণনা নেই। তবে সূরা আস সফফাতে আল্লাহ বলেন; নিশ্চয়ই ইলিয়াস ছিল রাসূল। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল : তোমরা কি ভয় কর না? তোমরা কি বা'ল দেবতার এবাদত করবে এবং সর্বোত্তম স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করবে, যিনি আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা, তোমাদের পূর্বপুরুষদের পালনকর্তা? অতঃপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। অতএব তারা অবশ্যই গ্রেফতার হয়ে আসবে; কিন্তু আল্লাহর খাঁটি বান্দাগণ নয়। আমি তার জন্য পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, ইলিয়াসের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। এভাবেই আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। সে ছিল আমার বিশ্বাসী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত (সূরা আস সফফাত # ৩৫ : ১২৩-১৩২)।

www.nagorikpathagar.org

বাদশা আখিয়াব ও রাণী ঈযবীল হেদায়েত প্রাপ্ত না হয়ে ইলিয়াস (আ.)কে হত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করল। এতে তিনি সুদূরে এক গুহায় আশ্রয় নিয়ে দীর্ঘকাল সেখানে অবস্থান করলেন। অতঃপর তিনি দোয়া করলেন যেন ইসরাইলের অধিবাসীরা দুর্ভিক্ষের শিকার হয়। এতে দুর্ভিক্ষ দূর করার জন্য যদি তিনি মুজেযা প্রদর্শন করেন, তা হলে হয়তো তারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। এ দোয়ার ফলে ইসরাইলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।

অতঃপর আল্লাহর আদেশে ইলিয়াস (আ.) বাদশা আখিয়াবের সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, এ দুর্ভিক্ষের কারণ আল্লাহর নাফরমানি। তোমরা মূর্তি পূজা ছেড়ে আল্লাহর পথে আস। আল্লাহ তোমাদের বিপদ দূর করে দেবেন। এতে অনেকেই বিশ্বাস স্থাপন করল। তিনি দোয়া করলেন এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে দুর্ভিক্ষ দূর হলো।

কিন্তু রাণী দেবতার পূজা ছাড়তে রাজি না হয়ে ইলিয়াস (আ.)কে হত্যার প্রস্তুতি শুরু করল। ইলিয়াস (আ.) সংবাদ পেয়ে আবার আত্মগোপনে চলে গেলেন। এরপর তিনি আর ফিরে আসেন নি। তাঁর পরিণাম কি হয়েছে সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। তার সম্পর্কে অনেক ঘটনা শুনা যায়। তবে কোরআন ও হাদীস দ্বারা সে সকল ঘটনা সমর্থিত নয়।

(২১) হযরত আল ইয়াসা (আ.) ঃ তিনি ছিলেন ইলিয়াস (আ.)-এর কাজিন (চাচাত/মামাত/ফুফাত... ভাই) এবং বনী ইসরাইলের অন্যতম নবী। বাইবেলে তাঁর নাম ইলিশা ইবনে সাকেত উল্লিখিত হয়েছে। তাঁর নাম কোরআনের ৬ নং সূরা আনআমের ৮৬ নম্বর এবং ৩৮ নং সূরা ছোয়াদের ৪৮ নম্বর আয়াতে অন্য নবীদের নামের সাথে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু বিস্তারিত কোন বিবরণ দেয়া নেই (তফসীর মা'আরেফুল কোরআনের সূরা ছোয়াদের তফসীর অবলম্বনে)।

কথিত আছে যে, (নবী হওয়ার পূর্বে) একদিন আল ইয়াসা তাঁর জমি চাষ করছিলেন। সে সময় ইলিয়াস (আ.) তাঁর কিছু অনুসারী নিয়ে সে

www.nagorikpathagar.org

জমির উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। আল ইয়াসা জমি চাষ বন্ধ করে তাঁকে অনুসরণ করলেন এবং তাঁর অনুসারী ও সঙ্গী হওয়ার আবেদন জানালেন। ইলিয়াস (আ.) তাঁকে অনুমতি দিলেন। অতঃপর কোন এক সময় আল ইয়াসা তাঁর দোয়া চাইলেন যেন তিনি তাঁর মত একজন হতে পারেন। হযরত ইলিয়াস (আ.) তাঁর জন্য দোয়া করলেন। আল্লাহ্ তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং আল ইয়াসা (আ.) কে নবুয়ত দান করলেন।

আল ইয়াসা (আ.)কে আল্লাহর ধর্ম প্রচারের জন্য ইয়ারীহা অঞ্চলে গেলে লোকেরা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। সে সময় ঐ অঞ্চলে খরা ও দুর্ভিক্ষ চলছিল। পানির অভাবে ফসল হচ্ছিল না। আল ইয়াসা (আ.) আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন এবং আল্লাহ্ তাঁর দোয়া কবুল করলেন বৃষ্টির পানিতে মাঠ ভরে দিলেন (islam.101.com অবলম্বনে)।

(২২) হযরত জুলকিফল (আ.) ঃ আল্লাহ্ বলেন : ইসমাঈল, ইদ্রিস ও জুলকিফলের কথা স্মরণ করুন, তাঁরা প্রত্যেকই ছিলেন সবরকারী। আমি তাদেরকে আমার রহমতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। তাঁরা ছিলেন সৎকর্মপরায়ণ (সূরা আম্বিয়া # ২১ : ৮৫-৮৬)। হযরত জুলকিফল আল ইয়াসা (আ.) এরপরে বনী ইসরাইলীদের একজন নবী ছিলেন। তবে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না।

নবী হযরত ইয়াসা (আ.) বার্ধক্যে উপনীত হলে একজন খলিফা নিযুক্ত করার ইচ্ছা তাঁর সাহাবাদের মধ্যে প্রকাশ করলেন। যিনি খলিফা হবেন তাঁর মধ্যে তিনটি গুণ থাকতে হবে। সদা-সর্বদা রোযা রাখবেন, এবাদতে রাত্রি জাগরণ করবেন এবং কখনো রাগান্বিত হবেন না। সমাবেশের মধ্য থেকে একজন অখ্যাত ব্যক্তি উঠে দাঁড়ায়, যাকে সকলে অতি সাধারণ লোক বলে মনে করল। তিনি বললেন, আমি এ কাজের জন্য উপস্থিত আছি। হযরত ইয়াসা (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি সদা-সর্বদা রোযা রাখ, এবাদতে রাত্রি জাগরণ কর এবং কোন সময় রাগ কর না? লোকটি বলল, নিঃসন্দেহে এ তিনটি আমল আমার মধ্যে আছে। সম্ভবত আল ইয়াসা (আ.) তার কথা বিশ্বাস করতে পারেন নি। তাই সে

www.nagorikpathagar.org

দিনের মত তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় দিন আবার একইভাবে খলিফা নিযুক্ত করার ঘোষণা দিলে সে ব্যক্তিই দাঁড়ালেন। আল ইয়াসা (আ.) তাঁকে খলিফা নিযুক্ত করার ঘোষণা দিলেন। এ ব্যক্তির নাম হযরত জুলকিফল।

খলিফা হয়ে তিনি তাঁর তিনটি ওয়াদা পূরণ করে চলেছেন। তাঁকে তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করানোর জন্য শয়তান তাঁর পেছনে লেগে গেল। জুলকিফল (আ.) সারা রাত জাগ্রত থাকতেন এবং শুধু দ্বিপ্রহরে কিছু সময় নিদ্রা যেতেন। শয়তান দুপুরে তাঁর দরজায় কড়া নাড়া দিল। তিনি জাগ্রত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কে? মানুষ বেশে আগত শয়তান বলল, আমি একজন বৃদ্ধ মজলুম। তিনি দরজা খুলে দিলে সে ভেতরে প্রবেশ করে বলতে শুরু করল, আমার সাথে আমার সম্প্রদায়ের বিবাদ আছে। তারা আমার উপর এ জুলুম করেছে– সে জুলুম করেছে। এভাবে সে তাঁর দুপুরের ঘুমের সময় নষ্ট করে দিল। তিনি বললেন, আমি যখন বাইরে যাব তখন এস। আমি তোমার বিচার করে দেব।

জুলকিফল (আ.) বাইরে এসে তাঁর দরবার কক্ষে বসে লোকটির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু তার দেখা পাওয়া গেল না। পরের দিন তিনি দরবার কক্ষে বসলেন। কিন্তু সে আসল না। দুপুরে তাঁর নিদ্রার সময়ে তিনি ঘরে গেলে সে দরজা পেটাতে লাগল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কে? সে পূর্বের ন্যায় জবাব দিল, আমি একজন বৃদ্ধ মজলুম। তিনি দরজা খুলে বললেন, আমি কি তোমাকে বলিনি যে, মজলিসে বসার সময় আস। তুমি আসনি। আজও সকাল থেকে আমি তোমার অপেক্ষায় ছিলাম, তুমি আসনি, সে বলল, হুজুর! আমার শত্রুপক্ষ খুবই ধূর্ত প্রকৃতির। আপনাকে মজলিসে বসা দেখলে আমার পাওনা পরিশোধ করার কথা স্বীকার করে নেয়। আপনি মজলিস ত্যাগ করলে আবার অস্বীকার করে। এরূপ কথা-বার্তার মধ্যে তাঁর সে দিনের ঘুমও নষ্ট করে দেয়। তিনি মজলিসে এসে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন, কিন্তু তার দেখা মিলে না। তৃতীয় দিনও দুপুর পর্যন্ত তার অপেক্ষা করলেন। সে না আসায় তিনি ঘরে এসে

www.nagorikpathagar.org

লোকদেরকে বলে দিলেন, কেউ যেন কড়া নাড়া না দেয়। বৃদ্ধ এ দিন এসে কড়া নাড়া দিতে চাইলে তাকে বাধা দেয়া হয়। সে জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে দরজায় আঘাত করতে লাগল। জুলকিফল (আ.) জাগ্রত হয়ে দেখলেন, দরজা যথারীতি বন্ধ আছে এবং বৃদ্ধ ঘরের ভেতরে উপস্থিত। তিনি বুঝতে পারলেন যে, সে শয়তান ছাড়া কেউ নয়। তিনি বললেন, তাহলে তুমি আল্লাহর দুশমন ইবলিস। সে স্বীকার করে বলল, আপনি আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। আমি চেষ্টা করে দেখলাম আপনাকে রাগান্বিত করে আপনার ওয়াদা ভঙ্গ করানো যায় কিনা। এতেও আমি ব্যর্থ হলাম। এ কারণে তাঁকে জুলকিফল (অঙ্গীকার ও দায়িত্ব পূর্ণকারী) খেতাব দেয়া হয়। প্রথমে তিনি খলিফাই ছিলেন। পরে আল্লাহ তাঁকে নবুয়ত দান করেন (তফসীর মা'আরেফুল কোরআনে সূরা আম্বিয়ার তফসীর অবলম্বনে)।

(২৩) হযরত হারুন আলাইহিস সালাম ঃ তিনি ইমরানের পুত্র এবং মূসা (আ.)-এর বড় ভাই। জালেম ফেরাউনকে হেদায়াত করার জন্য মূসা (আ.) হারুন (আ.) কে নবুয়ত দিয়ে তাঁর শক্তি বাড়ানোর দোয়া করলে আল্লাহ সে দোয়া কবুল করে বলেন, হে মূসা, তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হলো (সূরা ত্বাহা # ২০ : ৩৬)। তোমরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে যাও, সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে (সূরা ত্বাহা # ২০ : ৪৩)। নবুয়ত লাভের পর হারুন (আ.) মূসা (আ.)কে যথাসাধ্য সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন যার বিবরণ মূসা (আ.)-এর জীবনীতে বর্ণিত হয়েছে। সে কারণে তাঁর জীবনী পৃথকভাবে বর্ণনা করা হলো না। তিনি ১২২ বছর জীবিত ছিলেন।

হযরত ওযাইর (আ.)

নবী-রাসূলগণের আলোচনার মধ্যে এ ব্যক্তির আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। তিনি ছিলেন ইহুদী সম্প্রদায়ের একজন ধর্মযাজক। ইহুদীরা তাদের অনেক নবীকে হত্যা করার ফলে আল্লাহ তাদের অন্তর থেকে তাওরাত উঠিয়ে নিলেন এবং ধর্মযাজকেরা তাদের কিতাব পুঁতে ফেলল। ওযাইর (আ.) জ্ঞানের সন্ধানে বের হলেন। হযরত জিব্রাইল (আ.)

www.nagorikpathagar.org

তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন, জ্ঞান খোঁজ করছি। জিব্রাইল (আ.) তাঁকে তাওরাত শিখিয়ে দিলেন। তিনি ফিরে এসে লোকদেরকে তাওরাত শিক্ষা দিলেন। তারা পুঁতে ফেলা তাওরাত খোঁজে পেয়ে মিলিয়ে এর সাথে কোন গরমিল না পেয়ে বলল, এর কারণ ওযাইর আল্লাহর পুত্র। (answers.yahoo. com/question)

আল্লাহ বলেন, আর ইহুদীরা বলে ওযাইর আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা (খৃষ্টানরা) বলে মসীহ্ (ঈসা আ.) আল্লাহর পুত্র। এটা তাদের মুখের কথা। তারা পূর্ববর্তী কাফেরদের মত কথা বলে। আল্লাহ্ এদের ধ্বংস করুন, এরা কোন উল্টা পথে চলে যাচ্ছে (সূরা তওবা # ৯ : ৩০)।

আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন, তুমি কি সে লোককে দেখনি যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল যার বাড়ি-ঘরগুলো ভেঙ্গে ছাদের উপর পড়েছিল। সে বলল, কেমন করে আল্লাহ্ মরণের পরে একে জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ্ তাকে একশত বছর মৃত অবস্থায় রাখলেন, অতঃপর তাকে জীবিত করে উঠালেন, বললেন, কতকাল এমনভাবে ছিলে? সে বলল, একদিন অথবা একদিনের কিছু কম। (আল্লাহ্) বললেন, না, বরং তুমি ছিলে একশত বছর। এবার চেয়ে দেখ নিজের খাবার ও পানীয়ের দিকে, সেগুলো পচে যায়নি এবং দেখ নিজের গাধাটির দিকে। আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চেয়েছি; আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ আমি এগুলোকে কেমন করে জুড়ে দেই এবং সেগুলোর উপর মাংস স্থাপন করি। অতঃপর যখন এটা তার নিকট স্পষ্ট হলো তখন সে বলে উঠল, আমি বিশ্বাস করি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান (সূরা বাকারা # ২ : ২৫৯)।

হযরত আলী (রা.) থেকে হাকেম এবং ইবনে আব্বাস ও আবদুল্লাহ (রা.) থেকে ইসহাক ইবনে বশীরের এক রেওয়ায়েত রুহুল মা'আনীতে উদ্ধৃত আছে যে, উক্ত ব্যক্তি ছিলেন হযরত ওযাইর আলাইহিস সালাম। সেজন্য আমি (হযরত থানবী) অনুবাদেই প্রকাশ করে দিয়েছি যে

www.nagorikpathagar.org

তাঁর পুনরুত্থানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ছিল (তফসীরে আশরাফী- সূরা বাকারার তফসীর)।

ওযাইর (আ.)-এর নাম কোরআনে মাত্র একবারই উল্লিখিত হয়েছে। এ কারণে তাঁর নাম অনেকের নিকট পরিচিতও নয়। তাঁর আগমন হযরত মূসা (আ.)-এর পরে হযরত দাউদ (আ.) ও হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সময় কালের মাঝে। কেউ কেউ মনে করে থাকেন তিনি ইহুদীদের একজন নবী ছিলেন। নাসারারা হযরত ঈসা (আ.)-কে এবং ইহুদীরা হযরত ওযাইর (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র মনে করে। অনেকের ধারণা হতে পারে তিনি ঈসা (আ.)-এর মত একজন নবী। আসলে তিনি নবী নন। আল্লাহ্ কোন নবীকে একশত বছর ঘুম পাড়িয়ে রাখবেন এটা চিন্তা করা যায় না। তিনি ছিলেন ইহুদীদের একজন ধর্মযাজক। অনেকের ভুল ধারণা ভাঙ্গাবার জন্য অন্যান্য নবীদের সাথে তাঁর ঘটনা বর্ণনা করা হলো।

(২৪) হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ঃ তিনি ছিলেন নাসারা তথা খৃষ্টানদের নবী। আল্লাহর বিশেষ কুদরতে পিতা ছাড়া তাঁর জন্ম। তাঁর মাতা মারইয়াম (আ.) তখন কুমারী। তিনি নির্জনে গোসল করার সময় ফেরেশতা জিব্রাইল (আ.) তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে সংবাদ দিলেন যে, তিনি এমন এক সন্তানের মা হবেন যিনি বনী ইসরাইলদের নবী হবেন এবং সে সন্তান তাঁর গর্ভে অর্পণ করতে তিনি এসেছেন। এই বলে তিনি মারইয়ামের বক্ষ বরাবর ফুঁক দিলেন। এতে তিনি গর্ভবতী হলেন। আল্লাহ বলেন অতঃপর তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে জীবন ফুঁকিয়ে দিয়েছিলাম (সূরা তাহরীম # ৬৬ : ১২)।

তাঁর গর্ভ প্রকাশ পেতে থাকলে লোকেরা কানাকানি শুরু করল। সন্তান প্রসবের সময় আসন্ন হয়ে আসলে তিনি লোকালয় ছেড়ে পার্বত্য এলাকায় চলে যান। প্রসব বেদনা শুরু হলে তিনি একটি খেজুর গাছে হেলান দিয়ে বসে পড়লেন। জিব্রাইল (আ.) দূর থেকে ডেকে বললেন, তুমি কোন চিন্তা করো না। তোমার পায়ের নীচে আল্লাহ্ একটি শীতল পানির নহর প্রবাহিত করে দিয়েছেন আর তোমার হেলান দেয়া খেজুর

www.nagorikpathagar.org

গাছটিতে নাড়া দিলে সুমিষ্ট পাকা খেজুর তোমার সামনে পড়বে। সন্তান প্রসব হলো।

পরবর্তী ঘটনার বর্ণনা এরূপ ঃ অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা বলল ঃ হে মারইয়াম, তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসছো। হে হারুন ভগিনী, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিণী। অতঃপর তিনি হাতে সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারা বলল, যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব? সন্তান বলল, আমি তো আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। আমি যেখানে থাকব। তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে এবং জননীর অনুগত থাকতে আর তিনি আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি (সূরা মারইয়াম # ১৯ : ২৭-৩২)।

এই ঘটনা তাঁর একটি বিশেষ মুজেযা। তাঁর আরেকটি মুজেযা এ যে, একবার একদল লোক তাঁর নিকট আরজ করল, এটা কি সম্ভব যে, আল্লাহ্ আপনার অসিলায় আমাদের প্রতি আসমান থেকে তৈরি খানা পাঠিয়ে দেবেন? ঈসা (আ.) দোয়া করলেন। আল্লাহর তরফ থেকে খানা আসল।

তাঁর আরও অনেক বিশেষ মুজেযা ছিল। তিনি (ঈসা আ.) বললেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নিদর্শনসমূহ নিয়ে। আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা পাখীর আকৃতি তৈরি করি। তারপর এতে যখন ফুঁক দেই, তখন তা উড়ন্ত পাখীতে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহর হুকুমে। আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং কুষ্ঠ রোগীকে। আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহর হুকুমে। আর আমি তোমাদেরকে বলে দেই যা তোমারা খেয়ে আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস। এতে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও (সূরা আলে ইমরান # ৩ : ৪৯)।

www.nagorikpathagar.org

ইহুদীরা ঈসা (আ.)-কে বিভিন্নভাবে হয়রানি করতে শুরু করে। তারা শলা-পরামর্শ করে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনল যে, তিনি তাদের তাওরাতকে লঙ্ঘন করেছেন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলে নিয়েছেন। এতে শূলবিদ্ধ করে তাঁর প্রাণদণ্ডের ঘোষণা দিল।

ঈসা (আ.) একটি ঘরে স্বীয় অনুসারীদেরকে নিয়ে এই বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। একদল ইহুদী ঘরটি ঘেরাও করে তাঁকে ধরার জন্য তাদের একজনকে ঘরে ঢুকিয়ে দেয়। আল্লাহ তাঁকে রক্ষার ব্যবস্থা করলেন। পবিত্র কোরআনে আছে : আর কাফেররা চক্রান্ত করেছে এবং আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করেছেন। বস্তুত আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী। আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে মৃত্যুদান করব এবং তোমাকে নিজের দিকে তুলে নেব আর কাফেরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করব (সূরা আলে ইমরান # ৩ : ৫৪-৫৫)।

অতঃপর আল্লাহ তাঁর বিশেষ কুদরতে ঈসা (আ.)-কে আসমানে উঠিয়ে নিলেন এবং সে ঘরে প্রবেশকারী লোকটি বা অন্য এক কাফের ঈসা (আ.)-এর আকৃতিতে পরিবর্তিত হয়ে গেল। কাফেররা সে লোকটিকে ঈসা মনে করে শূল দণ্ড দিল।

আল্লাহ আরও বলেন, আর তাদের এ কথা বলার কারণ এই যে, আমরা মারইয়াম পুত্র ঈসাকে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূল। অথচ তারা তাঁকে হত্যাও করেনি এবং তাকে শূলেও চড়ায়নি; বরং তারা ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুতঃ তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এ ক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধুমাত্র অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোন খবর রাখে না। আর নিশ্চয় তারা তাকে হত্যা করেনি (সূরা নিসা # ৪ : ১৫৭)।

কেয়ামতের পূর্বে ঈসা (আ.) দুনিয়ায় ফিরে আসবেন এবং শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্মে থেকে মৃত্যুবরণ করবেন। কেয়ামত অধ্যায়ে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

ঈসা (আ.)-কে নাসারারা (খৃষ্টানরা) আল্লাহর পুত্র বলে থাকে। এর কারণ এই যে, কিছু সংখ্যক ইহুদী তাঁর নিকট প্রেরিত আল্লাহর কিতাব

www.nagorikpathagar.org

ইঞ্জিল গ্রহণ করতে নারাজ ছিল। তাঁর প্রচারিত ধর্ম কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। তাঁর হত্যার চেষ্টা করেছে। তাঁর অবর্তমানেও তার ধর্ম রয়ে গেছে, এটা তারা সহ্য করতে পারছিল না। তাই এক মোনাফেক ইহুদী এ ধর্মকে বিতর্কিত করার জন্য ছদ্মবেশে স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগ করে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে এবং লোকালয় পরিত্যাগ করে বহুকাল পর্যন্ত জঙ্গলে ভণ্ড তপস্যা করতে থাকে। অতঃপর সে হঠাৎ লোকালয়ে ফিরে এসে প্রচারণা চালায় : আমি স্বয়ং যিশু খৃষ্টের (ঈশ্বর) দর্শন লাভ করেছি। তিনি আমাকে বলেছেন, তুমি লোকদেরকে বলে দাও, তারা যেন আমাকে জারজ সন্তান মনে না করে, আমাকে যেন স্বয়ং খোদার পুত্র গণ্য করে এবং আমি যে শূলে মৃত্যুবরণ করেছি, একে যেন অপমৃত্যু মনে না করে। আমি জগতের সমস্ত মানুষের– যারা আমাকে খোদার পুত্র বলে বিশ্বাস করবে তাদের সকলের পাপ মোচনের জন্য শূল কাষ্ঠে মৃত্যুবরণ করেছি। আমি স্বয়ং খোদার বেটা হয়ে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে জগতের সকল মানুষের পাপ পিতার নিকট থেকে মোচন করিয়ে নিয়েছি। অতএব যে ব্যক্তি আমাকে খোদার বেটা (পুত্র) বলে বিশ্বাস করবে, কোন পাপ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

এ প্রবঞ্চক ছদ্মবেশী ইহুদীকেই পরবর্তীকালে প্রবঞ্চিত নির্বোধ খৃষ্টানগণ 'সেন্ট্রপল' নামে অভিহিত করেছে (বোখারী শরীফ, চতুর্থ খণ্ড, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃষ্ঠা-২৫৬)।

(২৫) হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, নবীকুল শ্রেষ্ঠ, সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) ৫৭০ খৃষ্টাব্দে রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার মক্কার প্রসিদ্ধ কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আগমনের পূর্বাভাস পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জিলে রয়েছে। এসব কিতাবের নবীগণ সে পূর্বাভাস সম্পর্কে বলে গেলেও সে সকল ধর্মের কিছু কিছু আলেম সাধারণ উম্মতদেরকে তা জানতে দেয়নি। আল্লাহ বলেন, আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তাঁকে (রাসূল সা.) কে চিনে, যেমন করে চিনে নিজেদের পুত্রদেরকে। আর নিশ্চয়ই এদের কতিপয় লোক (আলেমগণ) জেনে শুনে সত্যকে গোপন করে (সূরা বাকারা # ২ : ১৪৬)।

www.nagorikpathagar.org

(ক) পিতার মৃত্যু ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পিতা আবদুল্লাহ ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়া যেতেন। তিনি যখন মাতৃগর্ভে সে সময় আবদুল্লাহ সিরিয়া থেকে ফেরার পথে অসুস্থ হয়ে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন। সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

(খ) ধাত্রীমাতা হালিমার গৃহে ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মের পরে মাত্র কয়েক দিন মাতার এবং অল্পদিন চাচা আবু লাহাবের কৃতদাসী সুওয়াইবার দুগ্ধ পান করেছিলেন। অতঃপর আরবের তৎকালীন প্রথানুযায়ী স্থায়ী ধাত্রী হালিমার গৃহে তাঁকে দেয়া হয়। বিবি হালিমার নিজের ছেলে আবদুল্লাহর সে সময় পেট ভরে পান করার মত দুধও তাঁর বুকে ছিল না। কিন্তু শিশু মুহাম্মদ (সা.) কে নেয়ার পরে উভয়ে পেট পুরে দুগ্ধ পান করতে পারত।

দুধ পানের মেয়াদ দুই বছর পূর্ণ হলে বিবি হালিমা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে রেখে যেতে মায়ের নিকট নিয়ে আসেন। সে সময় তথায় প্লেগের মহামারী চলছিল। সে অজুহাতে তাঁকে তিনি আবার নিয়ে যান। মুহাম্মদ (সা.) ও দুধ ভাই আবদুল্লাহ বকরির পালের সাথে মাঠে যেতেন। একদিন সাদা পোশাকধারী দু'জন লোক তাকে চিৎ করে শোয়ায়ে বক্ষ চিরে কিছু বের করল এবং তা পরিষ্কার করে আবার ঢুকিয়ে দিয়ে বক্ষ সেলাই করে চলে গেল। দুধ ভাই এটা দেখে বাড়িতে যেয়ে পিতা মাতাকে সংবাদ দিলে তাঁরা ছুটে এসে তাঁকে ঘরে নিয়ে যান। পরবর্তী জীবনে মিরাজ উপলক্ষে ফেরেশতা জিব্রাইল (আ.) আরও একবার তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে কিছু পরিষ্কার করেছিলেন।

(গ) মাতার মৃত্যু ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বয়স যখন পাঁচ বছরের কিছু বেশী তখন তিনি বিবি হালিমার গৃহ থেকে আপন মায়ের নিকট ফিরে আসলেন। কিছু দিন পরে মাতা আমেনা অতি বিশ্বস্ত পরিচালিকা উম্মে আয়মন ও শিশু পুত্রকে নিয়ে মদীনায় গেলেন। উদ্দেশ্য ছিল পুত্রের দাদার পিতৃকুলের লোকদেরকে পুত্রকে দেখানো এবং নিজের স্বামীর কবর শিশু মুহাম্মদ (সা.) কে দেখানো।

www.nagorikpathagar.org

মদীনায় অবস্থানকালে কিছু ইহুদী শিশু মুহাম্মদ (সা.) কে দেখতে আসত। একদিন উম্মে আয়মন শুনতে পায়, কোন এক ইহুদী সঙ্গীদেরকে বলছে, এ শিশু একদিন নবী হবে। কুচক্রী ইহুদীরা শিশু পুত্রের ক্ষতি করতে পারে ভেবে মদীনায় এক মাস অবস্থানের পর মক্কায় ফেরার জন্য সকলে রওনা করলেন। পথিমধ্যে আবওয়া নামক স্থানে মাতা আমেনা অসুস্থ হয়ে সেখানে প্রাণ ত্যাগ করেন। উম্মে আয়মন তাঁকে সেখানে দাফনের ব্যবস্থা করে শিশু মুহাম্মদ (সা.) কে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। এ সময় মুহাম্মদ (সা.)-এর বয়স ছিল প্রায় ছয় বছর।

উম্মে আয়মন মুহাম্মদ (সা.)-এর দেখা-শুনা করতেন। পরবর্তীতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মুহাম্মদ (সা.)-এর ইন্তেকালের কিছুদিন পরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

(ঘ) দাদার মৃত্যু ঃ এতীম মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতিপালনের দায়িত্ব নেন দাদা আবদুল মুত্তালেব। দাদা তাঁকে নিজের সন্তান অপেক্ষাও বেশী স্নেহ করতেন। কিন্তু সেই স্নেহ-মমতা নবীজি (সা.)-এর ভাগ্যে বেশী দিন রইল না। দু'বছর পরে আবদুল মুত্তালেব দুনিয়া থেকে চলে যান। মৃত্যুর পূর্বে স্বীয় পুত্র আবু তালেবের হাতে মুহাম্মদ (সা.)-এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে যান।

(ঙ) সিরিয়ায় অলৌকিক ঘটনা ঃ চাচা আবু তালেব ব্যবসার উদ্দেশ্যে কাফেলার সাথে সিরিয়া যাতায়াত করতেন। মুহাম্মদ (সা.)-এর বয়স যখন ১২ বা ১৩ বছর সে সময় তিনি চাচার সাথে সিরিয়া যান। কাফেলা বসরা পৌঁছলে তাওরাত ও ইঞ্জিলে অভিজ্ঞ বহিরা নামের এক পাদ্রীর সাথে তাঁদের দেখা হয়। পাদ্রী শেষ নবীর লক্ষণ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। বহিরা পাদ্রী লক্ষণ দৃষ্টে নবী (সা.) কে চিনে ফেললেন। তিনি নবী (সা.)-এর সম্মানে সকলকে দাওয়াত করলেন। পাদ্রী দেখলেন নবী (সা.) উট চরিয়ে ফিরে আসার সময় এক খণ্ড মেঘ ছায়া দিয়ে তাঁকে অনুসরণ করে আসছে। নবী (সা.) গাছের ছায়ার বাইরে খেতে বসলে গাছের ডাল বাঁকা হয়ে যেয়ে তাঁকে ছায়া দিচ্ছিল। পাদ্রী সকলকে তা দেখিয়ে বললেন, এ বালককে নিয়ে আপনারা সিরিয়া না যেয়ে ফিরে যান। তাঁর নিদর্শন

www.nagorikpathagar.org

দেখলে ইহুদীরা তাঁকে মেরে ফেলবে। চাচা আবু তালেব তাঁকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন এবং সফর সংক্ষিপ্ত করে নিজেও ফিরে আসলেন।

(চ) আল-আমীন উপাধি লাভ ঃ মুহাম্মদ (সা.) বাল্যকাল থেকে সামাজিক কাজে যোগ দিয়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি এমনই বিশ্বস্ত ছিলেন যে, তাঁর শত্রুরাও তাঁর নিকট অর্থ আমানত রাখত। তাঁর সততা, বিশ্বস্ততা ও অন্যান্য নানাবিধ গুণে মুগ্ধ হয়ে লোকেরা তাঁকে আল-আমীন উপাধি দেয়।

(ছ) বিবাহ ঃ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দু'জন স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা.) ও হযরত আয়েশা (রা.)-এর নাম অধিকাংশ মুসলমান শুনে থাকবেন। আরবের বিখ্যাত কুরাইশ বংশে খাদিজা (রা.)-এর জন্ম। পিতা খুয়াইলিদ ছিলেন বিরাট ব্যবসায়ী। খুয়াইলিদের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। কন্যাকে পর পর তিনবার বিবাহ দিয়েছিলেন। প্রথম সংসারে দু'পুত্রের জন্মের পরে স্বামী আবু হাওলা মারা যান। দ্বিতীয় সংসারে এক কন্যার জন্মের পরে স্বামী আতীক ইবনে যায়েদ মাখদুমী মারা যান। পর পর দু'বার বিধবা হওয়ার ঘটনায় তাঁর পিতা ভেঙ্গে পড়েন। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের চাপে নিজের ভাতিজা উমাইয়া সাইফীর সাথে কন্যাকে তৃতীয় বিবাহ দেন। কিন্তু বিবাহের কয়েক দিনের মধ্যেই এ স্বামীও মারা যান। এ সময় খুয়াইলিদ খুবই বৃদ্ধ। তাই তিনি নিজের বিরাট ব্যবসার দায়িত্ব কন্যা খাদিজার হাতে ছেড়ে দেন।

খাদিজা মুহাম্মদ (সা.)-এর সততার যথেষ্ট প্রশংসা শুনে তাঁকে নিজের ব্যবসায় নিয়োজিত করেন। তিনি তাঁকে বাণিজ্যের জন্য সিরিয়া পাঠান। ব্যবসায় সাফল্য, লোকমুখে তাঁর সততা, সরলতা, বিশ্বস্ততা ও অন্যান্য গুণের প্রশংসা শুনে বিবি খাদিজা মুগ্ধ হন এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে পতিত্বে বরণ করেন। সে সময় মুহাম্মদ (সা.)-এর বয়স ছিল পঁচিশ বছর এবং খাদিজার বয়স ছিল চল্লিশ বছর।

খাদিজা (রা.) মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনে আশীর্বাদ হিসেবে এসেছিলেন। তিনি নবীজি (সা.)-এর একজন অভিভাবকের ভূমিকা পালন করতেন। তাঁর গর্ভে মুহাম্মদ (সা.)-এর ঔরসজাত পাঁচ সন্তানের জন্ম হয়।

www.nagorikpathagar.org

প্রথম সন্তান কাসেম যিনি বাল্যকালেই ইন্তেকাল করেন। অতঃপর চার কন্যা : যয়নব (রা.), রুকাইয়া (রা.), উম্মে কুলসুম (রা.) এবং ফাতেমা (রা.) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সমস্ত সম্পদ তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাতে তুলে দিয়েছিলেন, যা ইসলামের খেদমতে ব্যয়িত হয়েছে। তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বিবাহের পরে তিনি পঁচিশ বছর জীবিত ছিলেন।

হযরত আয়েশা (রা.) ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) ও উম্মে রাওমানের কন্যা। তাঁর স্মরণ শক্তি ছিল খুবই প্রখর। রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বপ্নে তাঁকে বিবাহ করার ইঙ্গিত পান। তিনি মনে করলেন আয়েশা (রা.)-এর মত গুণবতী ও স্মৃতিধর স্ত্রী ইসলামের অনেক উপকারে আসবে।

আবু বকর (রা.) মুহাম্মদ (সা.)-এর ঘনিষ্ঠ বাল্যবন্ধু। উভয় পক্ষের আত্মীয়-স্বজনের উপস্থিতিতে বিবাহ সম্পন্ন হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বয়স ছিল বায়ান্ন বছর। কিন্তু আয়েশা (রা.)-এর বিবাহকালীন বয়স সম্পর্কে মতভেদ আছে। কারো মতে সাত বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় এবং নয় বছরে বয়সে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সান্নিধ্যে আসেন। অন্য মতে তের বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় এবং পনের বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গৃহে আসেন। শেষোক্ত মতটি সঠিক বলে অনেকে মনে করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং আয়েশা (রা.)-এর মধ্যে বয়সের পার্থক্য অনেক হলেও একে অপরকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। খাদিজা (রা.)-এর পরেই তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অফুরন্ত ভালোবাসা পেয়েছিলেন। তাঁদের দাম্পত্য জীবন মাত্র নয় বছরের। আয়েশা (রা.)-এর গর্ভে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। তাঁর বুকের সঙ্গে হেলান দেয়া অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন এবং তাঁর গৃহেই তাঁকে দাফন করা হয়েছিল যা বর্তমানে মসজিদে নববীতে অবস্থিত।

আয়েশা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে মহিলাদেরকে শিক্ষা দিতেন। বোখারী এবং মুসলিমে তাঁর

www.nagorikpathagar.org

বর্ণিত তিন শতাধিক এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বহু হাদীস রয়েছে। তিনি তেষট্টি বছর বয়সেই ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে কবর দেয়া হয়।

(জ) কা'বা গৃহের দেয়ালে হাজরে আসওয়াদ স্থাপন ঃ মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়ত লাভের পূর্বের ঘটনা। কা'বা শরীফ পুনঃনির্মাণকালে এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণের পূর্ব পাশের দেয়ালে মর্যাদাপূর্ণ স্বর্গীয় পাথর "হাজরে আসওয়াদ" স্থাপন নিয়ে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। পাথরটিকে যথাস্থানে স্থাপন করে সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়ার প্রতিযোগিতা পরস্পরের মধ্যে চলতে থাকল। অবশেষে স্থির হলো পরদিন সকালে যিনি সর্বপ্রথম কা'বা গৃহে প্রবেশ করবেন তিনি সে পাথরটি স্থাপন করবেন।

পরদিন সকালে সকল গোত্রের লোক প্রথমে কা'বা শরীফে প্রবেশের উদ্দেশ্যে ছুটে আসল। কিন্তু দেখা গেল মুহাম্মদ (সা.) সকলের আগেই প্রবেশ করেছেন। তাঁকে দেখে সকলে খুশী হলো। তিনি আল-আমীন, সকলেরই প্রিয় পাত্র। সকলের বিশ্বাস তিনি যে মীমাংসা করবেন তা সকল গোত্রের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে।

মুহাম্মদ (সা.) একখানা চাদরে পাথরটি রেখে প্রত্যেক গোত্রের প্রতিনিধিকে চাদরের চারদিকে ধরে দেয়ালের নিকট আনতে বললেন, যাতে সকলেই সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারে। সকলে তাই করল। মুহাম্মদ (সা.) এটা চাদর থেকে উঠিয়ে নিজ হাতে যথাস্থানে স্থাপন করলেন। তাঁর এই মীমাংসায় সকলেই সন্তুষ্ট হলো। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৫ বছর।

(ঝ) হেরা গুহায় আল্লাহর ধ্যান ঃ মুহাম্মদ (সা.) বাল্যকাল থেকেই বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা করতেন। অগণিত সৃষ্টিকে কে সৃষ্টি করেছেন এটা তাঁকে বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলত। নিজের সৃষ্ট দেব-দেবীকে পূজা করার কোন যুক্তি তিনি খোঁজে পেতেন না। তাঁর বয়স যখন চল্লিশের কাছাকাছি সে সময় তাঁর ভাবনার মাত্রা আরও বেড়ে যায়। তিনি রাত্রিকালে হেরা গুহায় যেয়ে ধ্যান করতে শুরু করেন। হেরা গুহায় তিনি এমনই ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়তেন যে, কোন কোন রাতে বাড়িতে ফিরতেন না। কখনো কখনো

www.nagorikpathagar.org

খাদিজা (রা.) তাঁর জন্য খাদ্য নিয়ে সেখানে যেতেন। শেষের দিকে অবস্থা এমন হল যে, তিনি একাধারে কয়েক দিবা-রাত্রি থেকে যেতেন। তাঁর প্রাণ-প্রিয় সহধর্মিণী খাদিজা (রা.) তাঁকে সাহায্য করতেন।

আল্লাহর অসীম লীলা। যে পর্বতের গুহায় তিনি ধ্যানমগ্ন থাকতেন তা তাঁর গৃহ থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত এবং প্রায় এক মাইল উঁচু। রাতে হেঁটে সেখানে যাওয়া, পর্বতে উঠা এবং অন্ধকার গুহায় ধ্যান করা কতই না কষ্টসাধ্য। সে পর্বতটির নাম জাবালে নূর। হাজীগণ তা দেখতে যেয়ে অনেকেই সে পর্বতে উঠে হেরা গুহা দেখতে সাহস করেন না।

(ঞ) নবুয়ত লাভ ঃ মুহাম্মদ (সা.)-এর বয়স চল্লিশ বছর পার হওয়ার পরের ঘটনা। এক অন্ধকার রাত্রে হেরা গুহায় তিনি ধ্যানমগ্ন। সে সময় জিব্রাইল (আ.) গুহা আলোকিত করে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে সালাম করলেন। মুহাম্মদ (সা.) চমকিয়ে উঠলেন। জিব্রাইল (আ.) বললেন, “ইকরা” (অর্থ পড়ুন)। মুহাম্মদ (সা.) বললেন, আমি পড়তে জানি না। জিব্রাইল (আ.) তাঁকে বুকের সাথে মিলিয়ে চাপ দিয়ে আবার বললেন, পড়ুন। মুহাম্মদ (সা.) এবারও বললেন, আমি পড়তে জানি না। জিব্রাইল (আ.) আবার তাঁকে চাপ দিয়ে বললেন, পড়ুন। মুহাম্মদ (সা.) কম্পমান অবস্থায় বললেন, আমি পড়তে জানি না। এবার জিব্রাইল (আ.) তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, (১) ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক। (২) খালাকাল ইনসানা মিন আলাক। (৩) ইকরা ওয়ারাব্বুকাল আকরাম, (৪) আল্লাযী আল্লামা বিল কালাম। (৫) আল্লামাল ইনসানা মালাম ইয়ালাম।

অর্থ : (১) পড়ুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। (২) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। (৩) পড়ুন আপনার পালনকর্তা, মহাদয়ালু, (৪) যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, (৫) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না (সূরা আলাক # ৯৬ : ১-৫)।

উল্লিখিত পাঁচটি আয়াত নিয়ে গৃহে ফিরে মুহাম্মদ (সা.) বলতে লাগলেন, আমাকে আবৃত কর, আমাকে আবৃত কর। খাদিজা (রা.) তাঁকে কম্বল দিয়ে আবৃত করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তার শিহরণ-কম্পন দূর

www.nagorikpathagar.org

হলো। তিনি খাদিজা (রা.)কে সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত বললেন। আরও বললেন আমার প্রাণের ভয় হচ্ছে।

খাদিজা (রা.) তাঁকে সান্ত্বনা ও অভয় দিলেন। তাঁর চাচা সম্পর্কিত এক জ্ঞানীজন ওয়ারাকা ইবনে নওফেল। তিনি তাওরাত ও ইঞ্জিলে যথেষ্ট জ্ঞানী। তাঁকে ঘটনা শুনাবার জন্য তিনি মুহাম্মদ (সা.) কে সঙ্গে নিয়ে তাঁর বাড়িতে গেলেন। ওয়ারাকা ঘটনা শুনে নিশ্চিত হলেন, মুহাম্মদ (সা.)ই শেষ নবী। তিনি নবী (সা.) কে সাবধান করে বললেন, মক্কাবাসী আপনার শত্রুতা করবে এবং মক্কা থেকে বিতাড়িত করবে। তিনি আরও বললেন, যদি আমি সে সময় বেঁচে থাকি তাহলে আমার সর্বশক্তি দিয়ে আপনাকে সাহায্য করব।

অতঃপর দীর্ঘদিন অহী আসা বন্ধ রইল। তিনি হেরা গুহায় যেতে থাকলেন। দীর্ঘ এক মাস হেরা গুহায় কাটিয়ে বাইরে আসলে তাঁর প্রতি কারো আহ্বান শুনে চারদিকে তাকিয়ে কাউকেও দেখতে না পেয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন হেরা গুহায় তাঁর সাথে যাঁর দেখা হয়েছিল তিনি সে জিব্রাইল (আ.)। আগের মত মানুষ বেশে নয়– তাঁর প্রকৃত চেহারায় আকাশ জুড়ে একটি আসনে উপবিষ্ট হয়ে আছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) আতঙ্কিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। জিব্রাইল (আ.) মানুষ বেশে কাছে এসে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। অতঃপর তিনি উঠে বাড়িতে এসে বললেন, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও এবং আমার উপর ঠাণ্ডা পানি ঢাল। তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো। ঠিক সে সময় জিব্রাইল (আ.) অহী নিয়ে আসলেন। সে সময়ে অহী ছিল পবিত্র কোরআনের সূরা মুদ্দাসসির। রাসূলুল্লাহ (সা.) কে সম্বোধন করে সূরাটি এভাবে শুরু হলো, (১) হে চাদর মুড়ি দেয়া! (২) উঠুন, সতর্ক করুন, (৩) আপন পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন...।

অতঃপর দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট অহী আসতে থাকল। এ সময়ের মধ্যে তাঁর জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। অবশেষে আল্লাহ ইসলাম ধর্মকে পূর্ণতা দান করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

(ট) ইসলামের প্রচার ঠেকাতে মুশরিকদের অপকৌশল ঃ মুহাম্মদ (সা.) লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলে অতি অল্প সংখ্যক ছাড়া সকলেই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকল। মুশরিকরা তাঁর চাচা আবু তালেবের নিকট তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করল। তারা বলল, মুহাম্মদ (সা.) তাদেরকে তাদের দেব-দেবী ত্যাগ করতে বলছে। চাচা তাঁকে মানুষের মনোভাবের কথা জানিয়ে তাঁকে ইসলাম প্রচার থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দেন। মুহাম্মদ (সা.) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বললেন, লোকেরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয় তাতেও আমি আমার কর্তব্য কাজ ত্যাগ করব না। আবু তালেব রাসূলুল্লাহ (সা.) কে অভয় দিয়ে বললেন, আমার জীবন থাকতে কিছুতেই তোমাকে শত্রুর হাতে ছেড়ে দেব না।

কুরাইশ দলপতিরা মুহাম্মদ (সা.) কে ধনের লোভ, সর্দার বানাবার লোভ এবং রাজত্ব দানের লোভ দেখিয়ে ব্যর্থ হলো। অতঃপর তারা বলল, আমাদের দেশ থেকে পাহাড়গুলো সরিয়ে দেশের উপর দিয়ে নদ-নদী প্রবাহিত করার জন্য আপনার প্রভুকে বলুন। তিনি তা করতে অস্বীকৃত জানান। অবশেষে তারা তাঁকে কৌশলে যুক্তি তর্কে পরাস্ত করার জন্য তাদের এক সুপণ্ডিত ওতবাকে পাঠাল। ওতবা তাঁর নিকট জানতে চাইল, তিনি উত্তম নাকি তাঁর পূর্ব পুরুষেরা উত্তম। নবী (সা.) উত্তর দিলেন না, ওতবা বলল, কুরাইশদের মধ্যকার সবচেয়ে সুন্দরী রমণী চাইলে তাও আপনাকে দেয়া হবে– আপনি আপনার পথ থেকে সরে আসুন। নবী (সা.) তাকে কোরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শুনালে সে মুগ্ধ হয়ে যায়। ওতবা নিজেদের লোকদের নিকট ফিরে যেয়ে বলল, এমন সুমধুর কালাম আমি কখনো শুনিনি। তোমরা মুহাম্মদ (সা.) কে স্বাধীনভাবে তাঁর কাজ করতে দাও।

অবশেষে তারা ইহুদী আলেমদের নিকট রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বর্ণনা দিয়ে তাঁর সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তারা তাদেরকে বললেন, তোমরা তাঁকে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে। সঠিক উত্তর দিতে পারলে

www.nagorikpathagar.org

তাঁকে সত্য বলে জানবে। জিজ্ঞাসা করবে- (১) অতীতে কতিপয় ঈমানদার যুবক বিধর্মীদের ভয়ে আত্মগোপন করেছিল, তাদের ঘটনা কি? (২) অতীতে কোন বাদশা দুনিয়াময় ঘুরে বেড়িয়েছিলেন? এবং (৩) রূহ কি?

তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাদেরকে পরের দিন আসতে বললেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল আল্লাহ্ অহী মারফতে প্রশ্নগুলোর উত্তর পাঠাবেন। কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ না বলায় আল্লাহ্ অহী পাঠাতে দেরি করলেন। লোকেরা তাঁর উপর বিরক্ত হলো এবং তিনিও খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন। পনের বা আঠারো দিন পরে আল্লাহ্ অহী মারফতে তাঁকে সতর্ক করলেন যেন ইনশাআল্লাহ না বলে কখনো কোন কিছু করার কথা না বলেন। আল্লাহ্ সূরা কাহ্ফে আসহাবে কাহফ ও যুলকারনাইনের বর্ণনা দিলেন এবং সূরা বনী ইসরাইলের ৮৫ আয়াতে রূহ আল্লাহর আদেশ মাত্র তাও জানিয়ে দিলেন। মুশরিকরা সত্য উত্তর পেয়েও সত্যের পথে না এসে বক্র পথ ধরল। তারা তাঁর নিকট প্রস্তাব করল যে, এক বছর তারা তাঁর ধর্ম পালন করবে এবং পরবর্তী বছর তিনি তাদের ধর্ম পালন করবেন। তাদের এ প্রস্তাবের জবাবে আল্লাহ্ সূরা কাফেরূন নাযিল করে জানিয়ে দিলেন, বলুন, হে কাফেরগণ, আমি এবাদত করি না তোমরা যার এবাদত কর এবং তোমরাও এবাদতকারী নও যার এবাদত আমি করি।

(ঠ) **মুসলমানদের উপর কাফেরদের অত্যাচার ঃ** কাফেররা ইসলামের গতি থামাতে না পেরে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাঁদের উপর অত্যাচার চালাতে শুরু করল। যে সকল নিরীহ লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদেরকে মরুভূমির উত্তপ্ত বালিতে খালি গায়ে চিৎ করে শোয়ায়ে রেখে, বেত্রাঘাত করে অথবা পায়ে রশি বেঁধে টেনে হেঁচড়িয়ে তারা শাস্তি দিত। হযরত বেলাল (রা.), হযরত খাব্বাব (রা.), হযরত আবু ফোকায়হা (রা.) এবং আরও বহু সাহাবী এ রকম অমানবিক অত্যাচারের স্বীকার হয়েছিলেন। গোটা আম্মার পরিবারকে তারা হত্যা করেছিল। কিন্তু যাঁরা ঈমান এনেছিলেন শত অত্যাচার সহ্য করেও তাঁরা ইসলাম ত্যাগ

www.nagorikpathagar.org

করেননি। অপরদিকে হযরত হামযা (রা.), হযরত ওমর (রা)-এর মত বীরদের ইসলাম গ্রহণ ইসলামের প্রসারে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল।

(ড) আবু তালেবের মৃত্যু ঃ চাচা আবু তালেব কাফেরদের বিরুদ্ধে নবী (সা.)-এর ঢাল হিসেবে কাজ করতেন। নবুয়তের দশম বছরে তিনি ইসলাম গ্রহণ না করেই মারা যান। তাঁর মৃত্যু শয্যার পাশে কাফের আবু জাহল ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা অবস্থান নেয়। নবী (সা.) চাচাকে ঈমান আনতে যতই অনুরোধ করেছেন কাফেররা ততই তাঁকে বাধা দিয়েছে। ফলে কুফরির উপরই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। হাদীসে বর্ণিত আছে, দোযখীর লঘুতর শাস্তি আবু তালেবকে দেয়া হবে। তাকে দুইটি (আগুনের) জুতা পরিয়ে দেয়া হবে। এর ফলে তার মস্তিষ্ক টগবগ করে ফুটতে থাকবে (সহীহ মুসলিম # ৪২২ ও বোখারী শরীফ # ১৬৯১)। চাচাকে হারিয়ে নবী (সা.) অসহায় অবস্থায় পতিত হলেন।

(ঢ) খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যু ঃ চাচা আবু তালেবের মৃত্যুর আঘাত সামলাবার পূর্বেই মুহাম্মদ (সা.)-এর পঁচিশ বছরের জীবন সঙ্গিনী হযরত খাদিজা (রা.) ৬৫ বছর বয়সেই ইন্তেকাল করেন। খাদিজা (রা.) মুহাম্মদ (সা.)কে অর্থ-সম্পদ দিয়ে যতটুকু সহায়তা করেছিলেন, তার চেয়ে বেশী সহায়তা করেছিলেন তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে সান্ত্বনা ও ভরসা দিয়ে। তাই তাঁকে হারানোর ব্যথা ছিল অত্যন্ত গভীর। নবী (সা.) বছরটিকে শোকের বছর বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

(ণ) তায়েফ সফর ঃ শত্রুর আঘাত প্রতিহত করার বর্ম চাচা আবু তালেব এবং শোকে ও হতাশায় সান্ত্বনা দানকারিণী খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যুতে মক্কার কাফেররা দ্বিগুন উৎসাহে নবী (সা.)-এর উপর জুলুম অত্যাচার শুরু করে। তারা তাঁর খাবারের পাত্রে আবর্জনা দিত, নামাযের সেজদার মধ্যে ঘাড়ের উপর পশুর নাড়ি-ভুঁড়ি ফেলত এমনকি তাঁকে দৈহিক নির্যাতনও করত।

মক্কায় ইসলাম প্রচার অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ায় নবী (সা.) তাঁর পালিত পুত্র যায়েদ (রা.)কে সঙ্গে নিয়ে মক্কা থেকে ৭০/৮০ মাইল দূরবর্তী তায়েফে ইসলাম প্রচারের জন্য যান। কিন্তু তায়েফবাসীরা তাঁর আহ্বানে

www.nagorikpathagar.org

সাড়া না দিয়ে বরং তাঁর উপর অত্যাচার শুরু করে। তাঁর উপর পাথর ও ইট নিক্ষেপ করে তাঁর দেহ রক্তাক্ত করে ফেলে। ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে তিনি পথের উপর বসে পড়লে তারা তাঁর দু'হাত ধরে উঠিয়ে দিয়ে হাঁটতে বাধ্য করে আবার পাথর ছুড়তে শুরু করত। অবশেষে দুঃখ ও হতাশা বুকে নিয়ে এক মাস পরে ক্ষত-বিক্ষত দেহে তিনি মক্কার পথে রওয়ানা হন।

(ত) জিনদের ইসলাম গ্রহণ ঃ তায়েফ থেকে ফেরার পথে নাখলা নামক স্থানে নবী (সা.) রাত্রি যাপন করেন। রাতে নামাযে দাঁড়িয়ে কোরআন পাঠ করাকালীন সময় ৮/৯ জনের একদল জিন সে স্থান দিয়ে যাওয়ার সময় কোরআন শ্রবণ করে তখনই ঈমান আনল। তারা নিজেদের জাতির নিকট ফিরে যেয়ে কুরআনের বর্ণনা দিয়ে তাদেরকে ঈমান আনতে বলল। এ ঘটনা সূরা জিনের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে।

(থ) মদীনায় ইসলাম প্রচার ঃ ইসলাম-পূর্ব সময়েও আরবরা হজ্জ করত। তবে সে হজ্জ ছিল ভিন্ন ধরনের। হজ্জের জন্য আগত লোকেরা মীনায় অবস্থান করত। মীনায় অবস্থানরত প্রত্যেক গোত্রের নিকট যেয়ে নবী (সা.) ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। অপরদিকে তাঁর চাচা আবু লাহাব তাঁর বিরুদ্ধে বুঝাতে থাকল। মদীনা থেকে আগত ছয় বা আট জনের একটি দলের নিকট নবী (সা.) ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তাঁরা নবী (সা.)-এর মুখে আল্লাহর কুরআনের বাণী শ্রবণ করে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

মদীনায় ফিরে তাঁরা অপরাপর লোকদেরকে ইসলাম সম্পর্কে বুঝাতে শুরু করলেন। লোকেরা তাঁদের কথা শুনে ঈমান আনতে শুরু করল। পরবর্তী বছর মদীনা থেকে আরও ১২ জন লোক আসলেন। নবী (সা.)-এর দাওয়াত পেয়ে তাঁরাও ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং ইসলামের প্রসারে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করলেন। মদীনায় ফিরে তাঁরাও ঘরে ঘরে ইসলামের প্রচার শুরু করলেন।

তৃতীয় বছর একটি বড় কাফেলা মক্কায় আসল। তাঁরা নবী (সা.)-এর সাথে একটি গোপন সম্মেলন করলেন। সে সম্মেলনে তাঁরা তাঁকে মদীনায় যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁরা মদীনায় তাঁকে সর্বাত্মক সাহায্য ও

www.nagorikpathagar.org

সহযোগিতা দেয়ার আশ্বাস দিলেন। এটা নবীজি (সা.)-এর মদীনায় হিজরতের পথ সুগম করল।

(দ) মদীনায় হিজরত ঃ মাত্র তিন বছরে মদীনায় ইসলামের প্রচার ও প্রসারের আশানুরূপ পরিবেশ সৃষ্টি হলো। অন্যদিকে নবুয়তের দীর্ঘ তের বছর পরেও মক্কায় অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হলো না। এমনকি মক্কার কাফেরগণ তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল এবং সে জন্য দিন-ক্ষণও ঠিক করে ফেলল। জিব্রাইল (আ.) সে খবর রাসূলুল্লাহ (সা.) কে পৌঁছিয়ে দিলেন এবং হিজরতের জন্য আল্লাহর অনুমতিও জ্ঞাত করলেন। এতে তিনি মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের প্রস্তুতি নিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আলী (রা.) কে নিজের বিছানায় রেখে আবু বকর (রা.) কে সঙ্গে নিয়ে রাতের অন্ধকারে বের হয়ে গেলেন। তাঁর নিকট রাখা মানুষের আমানত মানুষকে বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আলী (রা.) কে দিয়ে গেলেন। অপর দিকে বিভিন্ন গোত্রের একশত যুবক তাঁর গৃহ ঘেরাও করে রাখল। কিন্তু আল্লাহর অসীম দয়া এবং কুদরতে তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে গৃহ ত্যাগের সময় দেখতে পেল না। সকালে পাহারারত লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিছানায় আলী (রা.) কে শায়িত দেখে হতবাক হয়ে গেল। তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে খোঁজার জন্য চারদিকে লোক পাঠাল।

নিজ গৃহ থেকে চার বা পাঁচ মাইল দূরে সওর পর্বতের এক গুহায় রাসূলুল্লাহ (সা.) ও আবু বকর (রা.) আশ্রয় নিলেন। আবু বকর (রা.)-এর কন্যা আসমা (রা.) কিছু খাবার তাঁদের সাথে দিয়েছিলেন। আবু বকর (রা.)-এর বিশ্বস্ত মুক্ত গোলাম মেষ পাল চরাতে চরাতে গুহার নিকট নিয়ে যেত এবং দুগ্ধ দোহন করে গুহার ভেতরে দিয়ে আসত। আবু বকর (রা.)-এর পুত্র আবদুল্লাহ (রা.) সারাদিন কাফেরদের সংবাদ সংগ্রহ করে রাতে তা জানিয়ে আসতেন। এভাবে তিন রাত অতিবাহিত হয়ে গেল। কাফেররা নিরাশ হয়ে খোঁজাখুঁজি বন্ধ করল।

চতুর্থ রাতে আবু বকর (রা.)-এর মুক্ত গোলাম আমের ইবনে ফোহায়রা (রা.) খেদমতের জন্য এবং আবদুল্লাহ ইবনে ওয়ারকীত পথ

www.nagorikpathagar.org

প্রদর্শক হিসেবে তাঁদের সঙ্গী হলেন। আবদুল্লাহ (রা.) আবু বকর (রা.)-এর সংগৃহীত দুইটি উট নিয়ে রাতে হাজির হলেন এবং রাতের অন্ধকারে সকলে যাত্রা শুরু করলেন।

(ধ) মুশরিকদের পুরস্কার ঘোষণা ঃ মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা.) ও আবু বকর (রা.) কে খোঁজে না পেয়ে ঘোষণা করল, যে এ দু'জনকে জীবিত অথবা মৃত হাজির করতে পারবে তাকে প্রত্যেকের জন্য একশতটি উট পুরস্কার দেয়া হবে। আরবের এক দুর্ধর্ষ ব্যক্তি সোরাকা। সে পুরস্কারের লোভে মদীনার পথে ছুটতে লাগল। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাফেলা তাকে দেখতে পেলে তিনি আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন। তৎক্ষণাৎ সোরাকার ঘোড়ার পা মাটিতে গেঁড়ে গেল। ব্যাপার বুঝতে পেরে সোরাকা চিৎকার করে বলল, নিশ্চয় আপনাদের বদদোয়ার ফলে এ অবস্থা হয়েছে। আমার বিপদ মুক্তির জন্য দোয়া করুন; আমি আপনাদের কোন ক্ষতি করব না। রাসূলুল্লাহ (সা.) দোয়া করলেন এবং মুক্ত হয়ে সোরাকা ফিরে চলল। পথে যত লোকের সাথে দেখা হল, প্রত্যেককে এ বলে ফিরিয়ে দিল, মুহাম্মদ (সা.) এ পথে যায়নি। তাঁরা মদীনায় পৌঁছে গেলে সুরাকা লোকদের নিকট সত্যিকারের ঘটনা বর্ণনা করল। উল্লেখ্য যে, অষ্টম হিজরীতে সোরাকা ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

(ন) দস্যু দলের ইসলাম গ্রহণ ঃ কুরাইশদের পুরস্কারের লোভে আসলাম গোত্রের সর্দার বুরায়দা ৭০ জন দুর্ধর্ষ লোক নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খোঁজে বের হলো। তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাফেলার সাক্ষাৎ পেল। তিনি আল্লাহর উপর ভরসা রেখে গাম্ভীর্যের সাথে বুরায়দার গোত্রের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। বুরায়দা তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ এবং আল্লাহর রাসূল। বুরায়দা তাঁর আচার আচরণে মুগ্ধ হয়ে তক্ষুণি ইসলাম গ্রহণ করল। তার সঙ্গীরাও সকলে খুশী মনে ইসলাম গ্রহণ করল।

(প) কুবা মসজিদ নির্মাণ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাফেলা কুবা পল্লীতে ১২/১৪ দিন অবস্থান করেছিল। সে সময় জামাতে নামায আদায়ের

www.nagorikpathagar.org

জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) কুবা পল্লীতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এটা ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ। এ মসজিদে নামায আদায়ের অনেক ফযিলত রয়েছে।

(ফ) মদীনায় নিজের বাসগৃহ ও মসজিদে নববী নির্মাণ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) কুবা থেকে মদীনায় পৌছার জন্য নিজের উষ্ট্রী কাসওয়ায় উঠে বললেন, উটটি আল্লাহর ইচ্ছায় চলবে এবং যেখানে বসে পড়বে সেখানে অবতরণ করব। চলতে চলতে উটটি ঐ স্থানে এসে বসে পড়ল যেখানে পরবর্তীকালে তাঁর নির্মিত মসজিদে নববী অবস্থিত। তিনি বিশিষ্ট সাহাবী আবু আইউব (রা.)-এর গৃহে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। সে সময় মসজিদে নববী ছোট আকারে নির্মিত হলো এবং এর পূর্ব পাশে তাঁর বাসগৃহ তৈরি করা হলো। এ গৃহেই তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন এবং তাতেই তাঁর পবিত্র রওজা শরীফ অবস্থিত।

(ব) বীরে মাউনায় সাহাবাদের শাহাদাত ঃ চতুর্থ হিজরীর প্রথম দিকে নজদ এলাকার আমের গোত্রের সর্দার আবু বরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। কিন্তু সে হ্যাঁ অথবা না বলে তার অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের জন্য কিছু সংখ্যক জ্ঞানী-গুণি সাহাবা পাঠানোর অনুরোধ করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) নজদে সাহাবা পাঠাতে আশঙ্কা প্রকাশ করলে সে তাঁদের দায়িত্ব গ্রহণের আশ্বাস দেয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ৭০ জন বিশিষ্ট সাহাবা সেখানে প্রেরণ করেন। বরার ভাতিজা ইসলাম বিরোধী দুর্ধর্ষ আমেরের নিকট রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবাদের মারফতে একটি পত্র পাঠান। সাহাবাগণ বীরে মাউনা নামক স্থানে পৌঁছে একজন সাহাবীকে পত্র নিয়ে আমেরের নিকট পাঠালেন। আমের পত্রের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করল না। বরং তার ইঙ্গিতে অন্য এক ব্যক্তি বর্শা নিক্ষেপ করে সাহাবীকে শহীদ করে ফেলে। অতঃপর আমেরের প্রেরিত লোকজন বাকী সাহাবাদেরকে ঘেরাও করে একজন বাদে সকলকে শহীদ করে ফেলে। সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এমনই মর্মাহত হয়েছিলেন যে, তিনি এক মাস ধরে ফজরের নামাযের মধ্যে মুশরিকদের

www.nagorikpathagar.org

জন্য বদদোয়া করেছেন। ফলে আমের প্লেগ রোগে এবং কয়েক শত লোক মহামারীতে মারা গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) নজদের জন্য দোয়া করেননি। তাঁর পরে এ নজ্‌দে ইসলামের শত্রু অনেক কুখ্যাত ব্যক্তির জন্ম হয়েছে।

(ভ) **কিবলা পরিবর্তন** ঃ মক্কাবাসী মুসলমানগণ হিজরত করে মদীনায় আসলে আল্লাহ তাদের কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে করে দেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আশা আল্লাহ কা'বার দিকে কিবলা করে দেবেন। একদিন তিনি জোহরের নামায পড়াকালীন সময় জিব্রাইল (আ.) এসে আল্লাহর আদেশ শুনালেন, এখন আপনি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করুন এবং তোমরা যেখানেই থাক, সেদিকে মুখ কর (সূরা বাকারা # ২ : ১৪৪)। নামাযের মাঝখানেই তিনি কা'বার দিকে মুখ ঘুরালেন এবং যাঁরা তাঁর পেছনে নামায পড়তেছিলেন, তাঁরাও মুখ ঘুরালেন। যে মসজিদে এ ঘটনা ঘটেছিল একে মসজিদে কিবলাতাইন বা দুই কিবলার মসজিদ বলে (wikipedia. org/wiki/masjid-al-Qiblatain). এতে এখনো একটি মেহরাব বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে এবং অপর একটি কা'বার দিকে ফিরানো আছে।

তবে বোখারী শরীফের ৩৬ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ পাওয়ার পরে নবী (সা.) (স্বীয় মসজিদে) সর্বপ্রথম আসরের নামায সকলকে নিয়ে কাবা শরীফের দিকে পড়লেন। এক ব্যক্তি নবী (সা.)-এর সঙ্গে নামায পড়ে অন্য এক মহল্লার মসজিদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, ঐ মসজিদের মুসল্লীগণ পূর্ব নিয়ম অনুযায়ী বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে নামায পড়ছিলেন। তারা রুকু অবস্থায় থাকাকালে ঐ ব্যক্তি তাদেরকে ডেকে বলল, আমি শপথ করে সাক্ষ্য দিচ্ছি, এই মাত্র আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে মক্কামুখী হয়ে নামায পড়ে এসেছি। এটা শুনে ঐ নামাযীগণ রুকু অবস্থায়ই মক্কা শরীফের দিকে ফিরে গেলেন।

(ম) **মিরাজের ঘটনা** ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের একটি

www.nagorikpathagar.org

আশ্চর্যজনক ঘটনা তাঁর ঊর্ধ্বাকাশে ভ্রমণ বা মিরাজ। এটা অনেকের নিকট বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে না যে, এশার নামাযের পর থেকে ফজরের নামাযের পূর্বের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে মক্কা থেকে যাত্রা করে বায়তুল মুকাদ্দাসে মসজিদুল আকসায় নামায পড়া, সেখান থেকে একে একে প্রথম থেকে সপ্তম আসমানে যেয়ে পূর্ববর্তী নবীগণের সাথে সালাম বিনিময় করা, হাউজে কাওসার, বেহেশত ও দোযখ দেখা, বায়তুল মামুর ও সিদরাতুল মুনতাহা দেখা, দোযখের কর্মকর্তা মালেক এবং দাজ্জালের সাক্ষাৎ পাওয়া ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে তাই ঘটেছিল– স্বপ্নে নয় বাস্তবে, সশরীরে এবং সজ্ঞানে। মক্কার মসজিদুল হারাম (কা'বা) থেকে মসজিদুল আকসায় যাওয়ার উল্লেখ সূরা বনী ইসরাইলের প্রথম আয়াতে রয়েছে। অতএব যে কোন ঈমানদার ব্যক্তি মিরাজের ঘটনা বিশ্বাস করতে বাধ্য।

ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মক্কা জীবনের শেষের দিকে এক রাত্রিতে তিনি ঘুমিয়েছিলেন। জিব্রাইল (আ.) ঘরের চাল উন্মুক্ত করে তাঁকে কা'বার হাতীমে (খোলা অংশে) নিয়ে তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি জমজমের পানি দিয়ে ধুয়ে আবার যথাস্থানে রেখে বক্ষ বন্ধ করে দেন। অতঃপর তাঁকে বোরাকে (খচ্চর ও গাধার মধ্যবর্তী আকারের একটি বাহন যা বিজলির চেয়ে অধিক গতি সম্পন্ন) চড়িয়ে মাসজিদুল আকসায় নিয়ে যান। সেখানে তিনি নামায পড়েন।

সেখান থেকে ঊর্ধ্বাকাশের দিকে যেতে শুরু করে প্রথম আসমানে হযরত আদম (আ.), দ্বিতীয় আসমানে ইয়াহইয়া (আ.) ও ঈসা (আ.), তৃতীয় আসমানে ইউসুফ (আ.), চতুর্থ আসমানে ইদ্রিস (আ.), পঞ্চম আসমানে হারুন (আ.), ষষ্ঠ আসমানে মূসা (আ.) এবং সপ্তম আসমানে ইব্রাহীম (আ.)-এর দেখা পান এবং তাঁদের সাথে সালাম বিনিময় করেন। তিনি একটি প্রবহমাণ নহর দেখতে পেলেন। জিব্রাইল (আ.) জানালেন এটা হাউজে কাওসার। সূরা কাওসারে আল্লাহ তাঁকে এ নহর দান করার কথা বলেছেন। কঠিন কেয়ামতের দিন তিনি তাঁর নেককার উম্মতগণকে এটা থেকে সুশীতল ও সুমিষ্ট পানি পান করাবেন।

www.nagorikpathagar.org

তাঁকে আরোও ঊর্ধ্বে সিদরাতুল মুনতাহার নিকট নেয়া হলো। এটা বিরাটাকার একটি ফলবান বৃক্ষ! এ এলাকায় বেহেশত অবস্থিত। তাঁকে বেহেশত দেখান হলো। তাঁকে দোযখ এবং দোযখীদের দেখান হলো। বিভিন্ন প্রকারের গুনাহগার কিভাবে শাস্তি ভোগ করছে তা তিনি দোযখে দেখলেন। তিনি দোযখের প্রধান কর্মকর্তা মালেককে দেখেছেন। দাজ্জালের সাক্ষাৎ তিনি পেয়েছিলেন। তাঁকে বায়তুল মামুর পরিদর্শন করান হলো। সেখানে প্রতিদিন ৭০ হাজার ফেরেশতার এক একটি নতুন দল আল্লাহর এবাদত করে থাকেন।

তাঁর মিরাজের সময় মহান আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায উপহার দিয়েছিলেন।

(য) মক্কা বিজয় ঃ অষ্টম হিজরীতে মক্কায় মুসলমানদের বন্ধু গোত্র বনু খোযায়ার উপর প্রতিপক্ষ বনু বকর গোত্রের চরম অত্যাচার চলতে থাকলে খোযায়া গোত্রের পক্ষ থেকে আমর ইবনে সালেম নামক এক ব্যক্তি মদীনায় যেয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট সাহায্যের আবেদন করলেন। ইতোমধ্যে কুরাইশ সর্দার আবু সুফিয়ান নিজের অপরাধের পরিণামের ভয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট যেয়ে পূর্বের সন্ধি চুক্তির পক্ষে সুপারিশ করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) দশ হাজার যোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। যুদ্ধের ফন্দি হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সা.) রাত্রে প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন আলো প্রজ্বলিত করার নির্দেশ দেন। গোপনে খবর পেয়ে আবু সুফিয়ান দু'জন সঙ্গী নিয়ে মুসলমানদের খোঁজ নিতে বের হয়। পথে মুসলমানদের প্রজ্বলিত আগুন দেখে ভীত হয়ে আবু সুফিয়ান মুহাম্মদ (সা.)-এর চাচা আব্বাস (রা.)-এর সাহায্য নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে উপস্থিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) খালেদ বাহিনীকে নিম্ন প্রান্তের পথে মক্কায় প্রবেশের আদেশ দিয়ে নিজে ঊর্ধ্ব প্রান্তের পথে মক্কায় প্রবেশ করলেন। তিনি কা'বা গৃহ থেকে সমস্ত মূর্তি অপসারণ করলেন, বায়তুল্লাহ শরীফ

www.nagorikpathagar.org

তাওয়াফ করলেন, কা'বার ভেতরে নামায পড়লেন এবং এর দরজায় দাঁড়িয়ে ভাষণ দিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন।

(র) যুদ্ধ পরিচালনা ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) মুশরিকদের বিরুদ্ধে ছোট বড় মোট সাতাশটি যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। এদের মধ্যে নয়টিতে নিজে উপস্থিত ছিলেন। এগুলোর মধ্যে বদর, ওহোদ ও খন্দকের যুদ্ধ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বদরের যুদ্ধে আবু জাহেলসহ অনেক কাফের নেতা নিহত হয়েছিল। কিন্তু ওহোদের যুদ্ধে যোগদানকারী মুসলিম যোদ্ধাদের কিছু ভুলের কারণে সে যুদ্ধে পরাজয় হয়েছিল। যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচা বিশিষ্ট বীর হযরত হামযা (রা.)সহ ৭০ জন মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন। কাফের নেতা আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা হামযা (রা.)-এর কলিজা বের করে চিবিয়ে খেয়েছিল। সে যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নীচের মাড়ির একটি দাঁত শত্রু পক্ষের পাথরের আঘাতে ভেঙ্গে গিয়েছিল, নীচের ঠোঁট ভেতর দিকে কেটে গিয়েছিল এবং লৌহ শিরস্ত্রাণের কড়া চোয়ালের হাড় ভেঙ্গে বিদ্ধ হয়েছিল।

ওহোদ যুদ্ধ জয়ের পরে কাফেররা মুসলমানদেরকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য মদীনা আক্রমণের পরিকল্পনা করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এটা জ্ঞাত হয়ে প্রবীণ সাহাবী সালমান (রা.)-এর পরামর্শক্রমে শত্রুদের প্রবেশ পথে পরিখা (খাল) খননের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। প্রায় এক মাসের পরিশ্রমে পরিখা খনন করা হলো। শত্রু পক্ষের বিপুল সংখ্যক যোদ্ধা পরিখা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সেখানে অবস্থান গ্রহণ করে। তিন হাজার মুসলিম যোদ্ধা অপর পাড়ে বিরামহীনভাবে অবস্থান করতে থাকেন। আল্লাহর কুদরতে এক মাস পরে শত্রু পক্ষের এলাকায় হিমবায়ু প্রবাহিত হয়ে তাদের তাঁবু, রসদপত্র ইত্যাদি লণ্ডভণ্ড করে ফেললে রাতের অন্ধকারে তারা মক্কার পথে ফিরে গেল। এতে মুসলমানেরা রক্ষা পেলেন।

(ল) বহির্বিশ্বে ইসলামের দাওয়াত ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন দেশের রাজা, গোত্রপতি, সমাজপতি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র পাঠিয়েছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পারস্য সম্রাট, রোম

www.nagorikpathagar.org

সম্রাট হেরাক্লিয়াস, আবিসিনিয়ার বাদশা নাজ্জাশী, মিসরের শাসনকর্তা মুকাউকিস (যে দাওয়াত পাওয়ার পর রাষ্ট্রীয় উপহার হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট তার চাচাত বোন মারিয়া কিবতিয়াকে পাঠিয়েছিল), সিরিয়ার শাসনকর্তা মোনযের, আরবের ইয়ামামা এলাকার প্রধান হাওয়াযাসহ আরোও অনেকে।

(শ) বিদায় হজ্জ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) দশম হিজরীতে হজ্জে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। চারদিকে এর ঘোষণা দেয়ার ফলে দেড় লক্ষাধিক লোক তার সাথে হজ্জ করতে যাত্রা করলেন। পথে আরও লোক সঙ্গী হলেন। হজ্জ শেষে তিনি যে খোতবা দিয়েছিলেন তা ইসলামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। নবুয়তের পরে এ হজ্জই তাঁর প্রথম ও শেষ হজ্জ। খোতবা শেষে তিনি বলেছিলেন, বিদায়। সেই কারণেই এই হজ্জ বিদায় হজ্জ নামে পরিচিত।

(ষ) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাত ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) জ্বর ও মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হন। এর সাথে দাওয়াতে খাবারের সাথে ইহুদী মহিলার বিষ প্রয়োগের ভীষণ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল। শেষের দিকে তিনি মাঝে মাঝে চেতনা হারিয়ে ফেলছিলেন। আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বীয় পিঠ দ্বারা আমার প্রতি ভর লাগিয়ে ছিলেন, এমতাবস্থায় আমি তাঁর প্রতি কান লাগিয়ে শুনতে পেলাম তিনি বলছিলেন হে আল্লাহ! আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও, আমার প্রতি রহমত কর এবং আমাকে ঊর্ধ্বজগতের বন্ধুর সাথে মিলনের ব্যবস্থা করে দাও (বোখারী শরীফ # ১৭০৪)।

আয়েশা (রা.) বলেন, নবী (সা.)-এর মুখে উচ্চারিত সর্বশেষ বাণী ছিল, হে আল্লাহ! আমার পরম সুহৃদ। তাঁর মৃত্যু যাতনা আরম্ভ হয়ে দ্বিপ্রহরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১২ই রবিউল আউয়াল, সোমবার ৬৩ বছর বয়সে আয়েশা (রা.)-এর কক্ষে তাঁর ইন্তেকাল হয় এবং সে কক্ষেই তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর রওজা শরীফ মসজিদে নববীর মধ্যে অবস্থিত।

---

www.nagorikpathagar.org

বিবিধ বিষয়ে কোরআন ও হাদীসের বাণী

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
(১)	মিথ্যা সাক্ষ্য	৪১৩
(২)	দুনিয়ার সাথে কিরূপ সম্পর্ক রাখবে	৪১৩
(৩)	দুনিয়া কার নিকট কেমন	৪১৪
(৪)	সালামের আদান-প্রদান	৪১৪
(৫)	নবী (সা.)-এর উপর দরূদ পাঠ	৪১৫
(৬)	এতীমের প্রতিপালনকারী	৪১৫
(৭)	গুনাহ্ প্রকাশ না করা	৪১৫
(৮)	পাঁচটির সুবিধা গ্রহণ অপর পাঁচটির পূর্বে	৪১৬
(৯)	আল্লাহর দয়া	৪১৬
(১০)	আল্লাহর বিশেষ রহমত	৪১৬
(১১)	হাত উঠিয়ে দোয়া করা	৪১৭
(১২)	যেখানে মরবে বান্দা সেখানেই যায়	৪১৭
(১৩)	লাশের সঙ্গী	৪১৮
(১৪)	কবর পাকা না করা	৪১৮
(১৫)	সন্তানের উপর মাতা-পিতার হক	৪১৮
(১৬)	আত্মার মিল ও অমিল	৪১৮
(১৭)	আদম সন্তানের চাহিদা	৪১৮
(১৮)	হেদায়াত প্রাপ্ত ও বিপথগামী	৪১৯
(১৯)	জালেমের অবকাশ	৪১৯
(২০)	জালেম শাসকের সামনে ন্যায়ের কথা বলা	৪১৯

www.nagorikpathagar.org

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
(২১)	প্রত্যেকের সাথে একটি শয়তান আছে	৪১৯
(২২)	উম্মতের বিভক্তি	৪২০
(২৩)	অল্প হলেও স্থায়ী আমল আল্লাহর প্রিয়	৪২০
(২৪)	স্বপ্নে নবী (সা.) কে দেখা	৪২১
(২৫)	ইমামের নামায সংক্ষিপ্ত করা	৪২১
(২৬)	মানত করা	৪২১
(২৭)	সময়কে গালি না দেয়া	৪২১
(২৮)	মুসলমানের হক	৪২১
(২৯)	সূরা ইখলাস কোরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান	৪২২
(৩০)	অন্যায়ভাবে অপরের জমি দখল	৪২২
(৩১)	জুতা পরার নিয়ম	৪২২
(৩২)	বদ মেজাজির পরিণাম	৪২৩
(৩৩)	ঋণীর স্বভাব	৪২৩
(৩৪)	কেয়ামতে ভালবাসার লোকদের দলভুক্ত হওয়া	৪২৩
(৩৫)	জাতির উপর শাস্তি নাযিল	৪২৪
(৩৬)	যাদু করা কুফরি	৪২৪
(৩৭)	আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া	৪২৬
(৩৮)	কষ্টে পড়লেও মৃত্যু কামনা না করা	৪২৬
(৩৯)	কুলক্ষণ	৪২৬
(৪০)	জ্ঞানী ও নির্বোধ	৪২৭

www.nagorikpathagar.org

বিবিধ বিষয়ে কোরআন ও হাদীসের বাণী

দৈনন্দিন জীবনে অনুসরণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কতিপয় হাদীস এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কোরআনের আয়াতের বাংলা অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো। এগুলোর সঠিক অনুসরণ পরকালের জন্য পুণ্য সঞ্চয়ে সহায়ক হতে পারে।

(১) মিথ্যা সাক্ষ্য ঃ আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী (সা.)-এর নিকট কবীরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : কোন বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার তুল্য মর্যাদা কারো জন্য প্রকাশ করা, মাতা-পিতার অবাধ্য চলা, কাউকেও খুন করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া (বোখারী শরীফ # ১২০৫)।

কোরআন : তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না, যে কেউ এটা গোপন করে অবশ্যই তার অন্তর পাপী। তোমরা যা কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত (সূরা বাকারা # ২ : ২৮৩)।

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দান কর, যদিও এটা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্নীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়, সে ধনী অথবা দরিদ্র হোক আল্লাহ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায় বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না; আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পর্কেই অবগত (সূরা নিসা # ৪ : ১৩৫)।

(২) দুনিয়ার সাথে কিরূপ সম্পর্ক রাখবে ঃ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, একদা হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার উভয় কাঁধ ধরে বলেছেন : দুনিয়ার মধ্যে এরূপ থাক যেন তুমি একজন বিদেশী মুসাফির (অস্থায়ী আগন্তুক), বরং তুমি যেন একজন পথিক (বোখারী শরীফ # ২৪২০)। অন্য এক হাদীসে তিনি (সা.) বলেছেন, দুনিয়ার সাথে আমার সম্পর্ক এরূপ যে, পথিক পথ চলাকালে কোন বৃক্ষের ছায়ায় বসে যায় এবং

www.nagorikpathagar.org

অনতিবিলম্বে তা ত্যাগ করে পুনরায় পথ চলতে আরম্ভ করে (উপরের হাদীসের পাদটীকা)।

কোরআন : তোমরা জেনে রাখ, এ দুনিয়ার জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক গৌরব-অহংকার করা আর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু নয় (সূরা হাদীদ # ৫৭ : ২০)।

(৩) দুনিয়া কার নিকট কেমন ঃ হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলে পাক (সা.) বলেছেন : দুনিয়া মুমিনদের জন্য জেলখানাস্বরূপ এবং কাফেরদের জন্য বেহেশতস্বরূপ (তিরমিযী শরীফ # ২২৬৬, ইবনে মাজাহ্ # ৪১১৩)।

কোরআন : দল দু'টি (কাফের ও মুমিন) উপমা অন্ধ ও বধিরের এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তি সম্পন্নের ন্যায়, তুলনায় এ দুই কি সমান? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না (সূরা হূদ # ১১ : ২৪)?

(৪) সালামের আদান-প্রদান ঃ আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সা.) বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ.) কে তাঁর নিজস্ব দৈহিক গঠন ও আকারের উপর সৃষ্টি করেছিলেন– তাঁর দেহের উচ্চতা ছিল ষাট হাত। তাঁকে সৃষ্টি করে আল্লাহ্ তা'আলা সেখানে একত্রিত একদল ফেরেশতার নিকটবর্তী যেতে বললেন এবং তাদেরকে সালাম করতে বললেন। আরও বললেন যে, তাঁরা সালামের উত্তর কিরূপ প্রদান করেন তা আপনি লক্ষ্য করবেন; ঐ উত্তরই আপনার এবং আপনার বংশধর সন্তান-সন্ততির জন্য পারস্পরিক সালামের নিয়ম হবে।

আদম (আ.) ফেরেশতাগণের নিকটে যেয়ে আসসালামু আলাইকুম বললেন। ফেরেশতাগণ তদুত্তরে "ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ" বললেন। সালাম বা শান্তির দোয়ার উত্তরে ফেরেশতাগণ সালাম বা শান্তির দোয়া ভিন্ন বিশেষ রহমতের দোয়াও বর্ধিত করলেন (বোখারী শরীফ # ১৬২০)। আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণিত অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের আদান-প্রদান করবে (আবু দাউদ # ৫১০৩)।

www.nagorikpathagar.org

কোরআন : আর তোমাদেরকে যদি কেউ আদবের সাথে সালাম করে, তোমরাও তাকে এর অপেক্ষা উত্তমভাবে সালাম কর অথবা তার মত ফিরিয়ে বল (সূরা নিসা # ৪ : ৮৬)।

(৫) নবী (সা.)-এর উপর দরূদ পাঠ ঃ আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত নাযিল করেন (সহীহ মুসলিম # ৮০৭)।

কোরআন : আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ পাঠান। হে ঈমানদারগণ, তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠাও (সূরা আহযাব # ৩৩ : ৫৬)।

* নামাযের শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পরে যে দরূদ পড়া হয় এটাই উত্তম দরূদ। এছাড়া অন্যান্য দরূদও পড়া যায়।

(৬) এতীমের প্রতিপালনকারী ঃ সাহল ইবনে সাদ (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী (সা.) স্বীয় হস্তের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্গুলদ্বয় মিলিতভাবে দেখিয়ে বলেছেন, আমি এবং এতীমের প্রতিপালনকারী বেহেশতের মধ্যে এরূপে থাকব (বোখারী শরীফ # ২৩০১)।

কোরআন : যারা এতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তো তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে; তারা অচিরেই জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে (সূরা নিসা # ৪ : ১০)।

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সা.) থেকে শুনেছি যে, স্বপ্নদোষ হওয়ার পর আর কেউ এতীম থাকে না (আবু দাউদ শরীফ # ২৮৬৩)।

(৭) গুনাহ প্রকাশ না করা ঃ আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত নবী (সা.) বলেছেন, আমার উম্মতের প্রত্যেকেই ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু ঐ লোকদের গুনাহ মাফ করা হবে না যারা গুনাহ করে তা প্রকাশ করে বেড়ায়। আল্লাহ তা'আলা থেকে নির্ভয় নির্ভীক হওয়ার বড়

www.nagorikpathagar.org

পরিচয় হলো কোন ব্যক্তি রাত্রে কোন গুনাহ্ করে ফেলেছে এবং তা প্রকাশ করে দেয়ার কোন ব্যবস্থা আল্লাহ করেননি, ফলে তা গোপন রয়েছে। কিন্তু সে নিজেই ভোর বেলা লোকদের নিকট তা প্রকাশ করে দিয়েছে (বোখারী শরীফ # ২৩২৪ ও সহীহ মুসলিম # ৭২৬৭)।

(৮) পাঁচটির সুবিধা গ্রহণ অপর পাঁচটির পূর্বে ঃ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন : পাঁচটি জিনিসের সুবিধা গ্রহণ কর অপর পাঁচটির পূর্বে; তোমার যৌবনের তোমার বৃদ্ধ বয়সের পূর্বে, তোমার স্বাস্থ্যের তোমার অসুস্থতার পূর্বে, তোমার সম্পদের তোমার দারিদ্র্যতার পূর্বে, তোমার অবসরের তোমার ব্যস্ততার পূর্বে এবং তোমার জীবনের তোমার মৃত্যুর পূর্বে (আহমদ, আল হাকীম)।

কোরআন : আর আমি বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের অন্তর রয়েছে কিন্তু তা দ্বারা চিন্তা-ভাবনা করে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দ্বারা দেখে না এবং তাদের কান আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা শুনে না; এরা পশুর মত বরং তারা অধিক বিভ্রান্ত। তারাই গাফিল (সূরা আরাফ # ৭ : ১৭৯)।

(৯) আল্লাহর দয়া ঃ হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তা'আলা দয়া সৃষ্টি করে একে একশত ভাগে ভাগ করে নিরানব্বই ভাগ তিনি নিজে ব্যবহার করার জন্য রেখে দিয়েছেন। শুধুমাত্র এক ভাগ সব সৃষ্টি জীবের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন। তারই ক্রিয়ায় সৃষ্টি জগৎ পরস্পর দয়া-মমতার ব্যবহার করে থাকে (বোখারী শরীফ # ২৪৪৪ এবং ২৫০১)।

(১০) আল্লাহর বিশেষ রহমত ঃ আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সা.) বলেছেন : তোমরা সত্য সঠিক পথে অগ্রসর হতে থাক এবং আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভে সচেষ্ট থাক। নিশ্চয়ই জেনে রেখ, শুধু আমল কাউকেও বেহেশতের অধিকারী বানাতে পারে না।

www.nagorikpathagar.org

সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনিও কি আপনার আমল দ্বারা বেহেশতের অধিকারী হতে পারবেন না? হযরত (সা.) বললেন, আমিও বেহেশত লাভ করতে পারব না যাবত না আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আপাদমস্তক তাঁর মাগফেরাত-ক্ষমা ও রহমত দ্বারা আবৃত করে দেন (বোখারী শরীফ # ২৪৪০)।

(১১) হাত উঠিয়ে দোয়া করা ঃ হযরত সালমান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন : তোমাদের রব চিরঞ্জীব ও মহান দাতা। যখন কোন বান্দা হাত উঠিয়ে তাঁর নিকট দোয়া করে, তখন তিনি তার খালি হাত ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন (আবু দাউদ # ১৪৮৮ ও ইবনে মাজাহ # ৩৮৬৫)।

অন্য এক হাদীসে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুরে পাক (সা.) দোয়া করার সময় উভয় হাত উঠাতেন। তিনি তা দ্বারা তাঁর মুখমণ্ডল মাসেহ্ না করা পর্যন্ত নামাতেন না (তিরমিযী শরীফ # ৩৩২২)।

(১২) যেখানে মরবে বান্দা সেখানেই যায় ঃ হযরত মাতার ইবনে উকামিস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলে পাক (সা.) বলেছেন : আল্লাহ্ কোন ব্যক্তির মৃত্যু যে স্থানে অবধারিত করেন, সে স্থানে যাওয়ার জন্য তার কোন প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন (তিরমিযী শরীফ # ২০৯৩)।

* অনেকে বলে থাকে অমুক স্থানে না গেলে আমার অমুকটা হত না অথবা অমুক সময়ে অমুক বাহনে না উঠলে অমুক দুর্ঘটনায় পড়তাম না ইত্যাদি। এরূপ বলা তকদীরে অবিশ্বাস করার শামিল যা গুনাহের কাজ। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : যা তার ভাগ্যে ঘটার আছে তা কখনো তাকে ছাড়বে না এবং যা তার ভাগ্যে ঘটার নয় তা তাকে কখনো স্পর্শ করতে পারবে না (তিরমিযী শরীফ # ২০৯১)।

www.nagorikpathagar.org

(১৩) লাশের সঙ্গী ঃ হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : প্রত্যেক মানুষ মরে যাবার পর কবর পর্যন্ত তিন শ্রেণীর জিনিস তার সঙ্গে যায়। তন্মধ্যে একটি তার চিরসঙ্গী হয়ে থাকে, অপর দু'টি (তার দাফন শেষে) ফিরে আসে। তার সঙ্গে (কবর পর্যন্ত) যায় তার আত্মীয়-স্বজন, কিছু মাল (চাটি-পাটি, চাদর এবং লাশের খাটিয়া ইত্যাদি) এবং তার আমল। অতঃপর তার আত্মীয়-স্বজন ও মালামাল তাকে রেখে চলে আসে, তার আমল চিরসঙ্গী হয়ে থাকে (বোখারী শরীফ # ২৪৭১)।

(১৪) কবর পাকা না করা ঃ জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) কবর পাকা করতে নিষেধ করেছেন (সহীহ মুসলিম # ২১১৯)।

(১৫) সন্তানের উপর মাতা-পিতার হক ঃ হযরত আবু উমামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! সন্তানের উপর মাতা-পিতার হক কি? তিনি (সা.) বললেন : তারা তোমার বেহেশত এবং তোমার দোযখ (ইবনে মাজাহ # ৩৬৬২)।

(১৬) আত্মার মিল ও অমিল ঃ আয়েশা (রা.) বলেছেন, আমি নবী (সা.) কে বলতে শুনেছি, সমস্ত আত্মা (বহু পূর্ব থেকেই সৃষ্ট হয়ে আলমে আরওয়াহ্ বা আত্মা জগতে) সমাবেশিত ছিল। সেখানে যেসব আত্মার পরস্পর পরিচয় ও মিল হয়েছিল ভূপৃষ্ঠে আসার পর তাদের পরস্পরে আকর্ষণ জন্মে এবং পরস্পর সদ্ভাব ও মিল সৃষ্টি হয়। আর সেখানে যেসব আত্মার মধ্যে পরস্পর গরমিল ছিল, ভূপৃষ্ঠে আসার পর তাদের মধ্যে গরমিলই হয় (বোখারী শরীফ # ১৬২৩)।

(১৭) আদম সন্তানের চাহিদা ঃ হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর পাক (সা.) বলেছেন : আদম সন্তান বুড়ো হলেও তার দু'টি স্বভাব যুবকই থাকে; সম্পদের লোভ ও বেঁচে থাকার লালসা (তিরমিযী শরীফ # ২৩৯৭ ও সহীহ মুসলিম # ২২৮১)।

www.nagorikpathagar.org

(১৮) হেদায়াত প্রাপ্ত ও বিপথগামী ঃ হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) লোকদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত খুতবায় আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা ও গুণগান করতেন, অতঃপর বলতেন : আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন তাকে কেউ বিপথগামী করতে পারে না এবং তিনি যাকে বিপথগামী করেন তাকে কেউ হেদায়াত করতে পারে না (সহীহ মুসলিম # ১৮৮৫)।

কোরআন : আল্লাহ যাদেরকে বিপথগামী করেন তাদের কোন পথপ্রদর্শক নেই, আর তাদেরকে তিনি তাদের অবাধ্যতার কারণে উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে দেন (সূরা আরাফ # ৭ : ১৮৬)।

(১৯) জালেমের অবকাশ ঃ আবু মূসা আশআরী (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা জালেম অত্যাচারীকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যখন ধরেন এবং পাকড়াও করেন তখন আর ছাড়েন না (বোখারী শরীফ # ১৯২৭, ইবনে মাজাহ # ৪০১৮)।

কোরআন : কত জনপদ এদের প্রতিপালক ও তাঁর রাসূলগণের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। ফলে তাদের নিকট থেকে কঠোর হিসাব নিয়েছিলাম এবং তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিয়েছি (সূরা তালাক # ৬৫ : ৮)।

(২০) জালেম শাসকের সামনে ন্যায়ের কথা বলা ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন : জালেম শাসকের সামনে ন্যায়ের কথা বলাই উত্তম জিহাদ (ইবনে মাজাহ # ৪০১১)।

(২১) প্রত্যেকের সাথে একটি শয়তান আছে ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : তোমাদের (মধ্যে এমন কেউ নেই যে, শয়তান থেকে মুক্ত) প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে আল্লাহ তা'আলা একজন জিন (শয়তান)কে তার সঙ্গী হিসেবে নিয়োজিত করে দিয়েছেন। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া

www.nagorikpathagar.org

রাসূলাল্লাহ! আপনার সাথেও কি আছে? রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তরে বললেন : হ্যাঁ, আমার সাথেও আছে। তবে আল্লাহ্ আমাকে তার উপর বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছেন, তাই সে আমার বাধ্যগত হয়ে গেছে। অতএব সে আমাকে ভাল ছাড়া খারাপ কাজের পরামর্শ দেয় না (সহীহ্ মুসলিম # ৬৯০৪)।

কোরআন : সে (শয়তান) বলল, তুমি আমাকে শাস্তি দান করলে, এজন্য আমিও তোমার সরল পথে মানুষের জন্য নিশ্চয়ই ওঁত পেতে থাকব। অতঃপর আমি তাদের নিকট আসবই তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান ও বাম দিক থেকে এবং তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবে না (সূরা আরাফ # ৭ : ১৬-১৭)।

(২২) উম্মতের বিভক্তি ঃ হযরত আউফ ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন : ইহুদী জাতি একাত্তরটি দলে বিভক্ত হয়েছিল, তাদের মধ্যে সত্তর দল জাহান্নামী। আর খৃষ্টান জাতি বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল, তাদের মধ্যে একাত্তর দল জাহান্নামী এবং একটি দল মাত্র জান্নাতী। সেই মহান সত্তার শপথ যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, অবশ্যই আমার উম্মত তিয়াত্তরটি দলে ভাগ হবে। এদের মধ্যে একটি দল জান্নাতী এবং বাহাত্তরটি হবে জাহান্নামী। আরজ করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন দলটি জান্নাতী? তিনি বললেন : জামা'আত (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত) (ইবনে মাজাহ্ # ৩৯৯২)।

(২৩) অল্প হলেও স্থায়ী আমল আল্লাহর প্রিয় ঃ হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : তোমরা এ পরিমাণ আমল অবলম্বন করবে, যা সদা-সর্বদা পালন করতে পার। তিনি শপথ করে এও বললেন যে, (তোমরা বেশী পরিমাণ আমল করলে) আল্লাহ তা'আলা সওয়াব দান করতে ক্লান্ত বা কুণ্ঠিত হবেন না, কিন্তু (অবশেষে) তোমরাই ক্লান্ত হয়ে ঐ আমল ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। কম হলেও যে পরিমাণ আমল সর্বদা বজায় রাখা যায় অর্থাৎ স্থায়ী তাই আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় (বোখারী শরীফ # ৩৯ ও সহীহ্ মুসলিম # ১৭০৪)।

www.nagorikpathagar.org

(২৪) স্বপ্নে নবী (সা.) কে দেখা ঃ হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল, সে আমাকেই দেখল। কেননা, শয়তান আমার সুরত ধারণ করতে পারে না (ইবনে মাজাহ # ৩৯০১)।

(২৫) ইমামের নামায সংক্ষিপ্ত করা ঃ আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন নামাযের ইমামতি করবে, সে যেন সংক্ষেপে নামায আদায় করে। কেননা, মুক্তাদীদের মধ্যে দুর্বল, রোগগ্রস্ত, বৃদ্ধ ও কর্মজীবী লোকেরাও থাকে। আর যখন কেউ একাকী নামায পড়ে তখন সে স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী নামায দীর্ঘায়িত করতে পারে (আবু দাউদ # ৭৯৫, ৭৯৬, নাসাঈ শরীফ # ৮২৬ এবং তিরমিযী শরীফ # ২৩৬)।

(২৬) মানত করা ঃ আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : মানত মানুষকে এমন কোন জিনিস এনে দিতে পারে না যা তার জন্য নির্ধারিত ছিল না। হ্যঁা, মানত মানুষকে ঐ জিনিসের প্রতিই পৌঁছায় যা তার জন্য নির্ধারিত ছিল। মানতের দ্বারা কৃপণের মাল ব্যয় হয় (বোখারী শরীফ # ২৫১৪ ও সহীহ মুসলিম # ৪০৯৫)।

কোরআন : বল, আমাদের জন্য আল্লাহ যা নির্ধারিত করেছেন তা ব্যতীত আমাদের জন্য কিছুই হবে না, তিনি আমাদের কর্মবিধায়ক এবং আল্লাহর উপরই মুমিনদের নির্ভর করা উচিত (সূরা তওবা # ৯ : ৫১)।

(২৭) সময়কে গালি না দেয়া ঃ আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : মহান আল্লাহ বলেন, আদম সন্তান যুগ এবং সময়কে গালি দিয়ে আমাকে কষ্ট দেয়। সময় তো আমারই নিয়ন্ত্রণে। রাত-দিনের পরিবর্তন আমিই করে থাকি (সহীহ মুসলিম # ৫৬৯৮, বোখারী শরীফ # ২৩৫৫ ও আবু দাউদ # ৫১৮৪)।

(২৮) মুসলমানের হক ঃ আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : এক মুসলমানের উপর আরেক মুসলমানের

www.nagorikpathagar.org

ছয়টি হক আছে : (১) কারো সাথে তোমার দেখা হলে তাকে সালাম দেবে, (২) কেউ দাওয়াত করলে তা কবুল করবে, (৩) কেউ পরামর্শ চাইলে, তাকে সৎ পরামর্শ দেবে, (৪) কেউ যখন হাঁচি দিয়ে আলহামদু লিল্লাহ বলবে, তুমি তার জবাব (ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে) দেবে, (৫) কেউ অসুস্থ হলে তার সেবা করবে এবং (৬) কেউ মারা গেলে তার জানাযায় ও দাফনে শরীক হবে (সহীহ মুসলিম # ৫৪৮৮)।

(২৯) সূরা ইখলাস কোরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান ঃ আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা হযরত নবী (সা.) তাঁর সাহাবাগণকে বললেন : প্রতি রাত্রে এক-তৃতীয়াংশ কোরআন তেলাওয়াত করার সামর্থ তোমাদের আছে কি? সকলেই একে কঠিন মনে করলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে কে আছে যে এ কাজ করতে পারবে? হযরত (সা.) তখন বললেন, সূরা কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ এক তৃতীয়াংশ– কোরআনের সমান (বোখারী শরীফ # ১৯৮০, সহীহ মুসলিম # ১৭৬৩)।

(৩০) অন্যায়ভাবে অপরের জমি দখল ঃ সায়ীদ ইবনে যায়েদ ও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) বলেছেন : যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো জায়গা-জমিনের কোন অংশ দখল করবে, সে কেয়ামতের দিন সাত তবক জমিনের নীচ পর্যন্ত ধসে যেয়ে শাস্তি ভোগ করবে, অন্য বর্ণনায় সাত তবক জমিন থেকে সে পরিমাণ জমিন তার গলায় ফাঁদরূপে আবদ্ধ করে দেয়া হবে (বোখারী শরীফ # ১১৮৪-৮৫ এবং সহীহ মুসলিম # ৩৯৮৯)।

(৩১) জুতা পরার নিয়ম ঃ আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : তোমাদের যে কেউ জুতা পরিধান করবে, সে যেন ডান পা থেকে শুরু করে এবং যখন খুলবে, তখন যেন বাম পা থেকে শুরু করে (বোখারী শরীফ # ২২৫৬, সহীহ মুসলিম # ৫৩৩৪ ও তিরমিযী শরীফ # ১৭২৫)।

www.nagorikpathagar.org

(৩২) বদ মেজাজির পরিণাম ঃ আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট অতি জঘন্য হবে ঐ ব্যক্তি যার বদ মেজাজির ভয়ে মানুষ তার সাথে মেলামেশা করে না (বোখারী শরীফ # ২৩১৬)।

কোরআন : আল্লাহর দয়ায় আপনি (নবী সা.) তাদের (কিছু ভিন্ন মতের সাহাবার) প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলেন, যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত (সূরা আলে ইমরান # ৩ : ১৫৯)।

(৩৩) ঋণীর স্বভাব ঃ আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি আরজ করল, হুজুর! আপনি ঋণ থেকে বিশেষ ও অধিকরূপে আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকেন। হযরত (সা.) বললেন : মানুষ যখন ঋণগ্রস্ত হয় তখন কথা বলতে মিথ্যা বলে এবং অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করে (বোখারী শরীফ # ৪৭৮)।

* কারো উপর ঋণের বোঝা থেকে গেলে আল্লাহ তা মাফ করবেন না। ঋণদাতাকে তা মাফ করতে হবে।

(৩৪) কেয়ামতে ভালবাসার লোকদের দলভুক্ত হওয়া ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন, একদা এক লোক হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন ব্যক্তি নেককার শ্রেণীর লোকদেরকে ভালবাসে, কিন্তু আমলের দিক দিয়ে সে ব্যক্তি ঐ লোকদের সমশ্রেণীর হতে পারে নি– এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

তদুত্তরে হযরত (সা.) বললেন, কোন ব্যক্তি যে শ্রেণীর লোককে ভালবাসবে, কেয়ামতের দিন সে তাদের সঙ্গী হবে (বোখারী শরীফ # ২৩৫১ ও সহীহ মুসলিম # ৬৫২৯)।

* ইহুদী, নাসারা অথবা অন্য যে কোন বিধর্মীকে যারা আন্তরিকভাবে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে এ হাদীস তাদের জন্য সতর্ক সংকেত। তাই তাদের অনুকরণে-অনুসরণে সাবধান!

www.nagorikpathagar.org

(৩৫) জাতির উপর শাস্তি নাযিল ঃ হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন : যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে পাপকার্য সংঘটিত হয় এবং তাদের নেককার ব্যক্তিরা তাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ও সম্মানিত হওয়া সত্ত্বেও তারা পাপকার্য থেকে তাদেরকে ফিরে রাখে না, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর ব্যাপক শাস্তি নাযিল করেন (ইবনে মাজাহ # ৪০০৯)।

কোরআন : বনী ইসরাইলদের মধ্যে যারা কুফরি করেছিল তারা দাউদ ও মরিয়ম তনয় (ঈসা আ.) কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল– এটা এজন্য যে, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী। তারা সে সকল গর্হিত কাজ করত তা থেকে তারা একে অন্যকে বারণ করত না। তারা যা করত তা কতই না নিকৃষ্ট। তাদের অনেককে তুমি কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে। কত নিকৃষ্ট তাদের কৃতকর্ম– যে কারণে আল্লাহ্ তাদের উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন। তাদের শাস্তি ভোগ স্থায়ী হবে (সূরা মায়েদা # ৫ : ৭৮-৮০)।

(৩৬) যাদু করা কুফরি ঃ আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, মদীনার বনী যোরায়েক গোত্রীয় লবীদ নামক এক মোনাফেক রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপর যাদু করেছিল। এতে কোন করণীয় কাজ সম্পর্কে রাসূলের এরূপ মনে হত যে ঐ কাজ তিনি করেছেন, অথচ তা তিনি করেন নি (এরূপ অস্বস্তিকর অবস্থায় ছয় মাস কাটল) এমনকি একদা রাত্রিবেলা তিনি আমার গৃহেই ছিলেন এবং পুনঃ পুনঃ দোয়া করলেন। তারপর নিদ্রা থেকে হঠাৎ জেগে বললেন, হে আয়েশা! শোন, আল্লাহ তা'আলা আমার দোয়া কবুল করেছেন এবং আমি যা জানতে চেয়েছিলাম তা আমাকে জ্ঞাত করিয়েছেন।

দু'জন লোক এসে একজন আমার মাথার দিকে এবং অপরজন পায়ের দিকে বসল। প্রথমজন জিজ্ঞাসা করল এ ব্যক্তির কি রোগ হয়েছে? দ্বিতীয়জন বলল, তাঁকে যাদু করা হয়েছে। প্রথমজন জিজ্ঞাসা করল, কে

www.nagorikpathagar.org

যাদু করেছে? দ্বিতীয়জন বলল, লবীদ ইবনে আ'ছাম– মোনাফেক ইহুদীদের বন্ধু। প্রথমজন আবার জিজ্ঞাসা করল, কি বস্তুর সাহায্যে যাদু করেছে? দ্বিতীয়জন জবাবে বলল, চিরুনির ভাঙ্গা অংশ ও আঁচড়ানো ছিন্ন চুল (এবং ধনুকের এক খণ্ড রশি যাতে এগারটি গিরা দেয়া– ফাতহুর বারী)। আবার প্রশ্ন করা হল, ঐ সকল বস্তু কোথায় পোঁতা হয়েছে? উত্তরে বলা হল, ঐ সকল বস্তু পুরুষ খেজুর গাছের ফুলের খোলসে ভর্তি করে জারওয়ান নামক অন্ধ কূপে পাথরের নীচে পুঁতে রাখা হয়েছে।

অতঃপর হযরত (সা.) কতিপয় সাহাবাকে নিয়ে সে কূপের নিকট পৌঁছে বললেন, এটাই সে কূপ যা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। এর পচা পানির রং মেহেদি ভেজানো পানির ন্যায় ছিল এবং কূপটি যে বাগানে অবস্থিত সে বাগানের খেজুর গাছগুলোও ভূতের (শয়তানের) মাথার ন্যায় বিশ্রী দেখাচ্ছিল। হযরত (সা.) কূপ থেকে সে সকল জিনিস বের করলেন।

আয়েশা (রা.) বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বিপরীত যাদুর সাহায্যে আপনার উপর কৃত যাদু রদ করার ব্যবস্থা করলেন না কেন? তদুত্তরে হযরত (সা.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে আরোগ্য দান করেছেন, এখন এ ব্যাপারে লোকদের মধ্যে চর্চা ছড়াবার পন্থা অবলম্বন করাকে আমি পছন্দ করি না। অতঃপর হযরত (সা.) কূপটি ভরাট করে দিলেন (বোখারী শরীফ # ২২৩২)।

* উল্লেখযোগ্য যে, এ উপলক্ষে কোরআনের সূরা ফালাক ও সূরা নাস অবতীর্ণ হয়েছে। এ দুইটি সূরায় এগারটি আয়াত আছে। উক্ত সূরাদ্বয়ের এক একটি আয়াত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রশির এক একটি গিরা খুলে গিয়েছিল।

কোরআন : তারা (মানুষ শয়তান) মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত এবং যা বাবেল শহরে হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়ের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা কাউকেও এ কথা না বলে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য, অতএব তোমরা কুফরি করো না। তারা উভয়ের নিকট থেকে এমন যাদু শিখত যা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে, অথচ আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া

www.nagorikpathagar.org

কারো কোন ক্ষতি করতে পারত না। তারা যা শিক্ষা করত তা তাদের ক্ষতি সাধন করত এবং কোন উপকারে আসত না, আর তারা নিশ্চিতভাবে জানত যে, যে কেউ এটা অবলম্বন করে পরকালে তার কোন অংশ নেই (সূরা বাকারা # ২ : ১০২)।

(৩৭) আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া ঃ জুনদুব (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্‌র কসম, অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ্ বললেন : এমন কে আছে যে আমার উপর কর্তৃত্ব করে যে, আমি অমুককে ক্ষমা করব না? আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম আর তোমার আমল বিনষ্ট করে দিলাম (সহীহ্ মুসলিম # ৬৪৯৩)।

কোরআন : বলুন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ (পাপ করেছ) আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না; আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু (সূরা যুমার # ৩৯ : ৫৩)।

(৩৮) কষ্টে পড়লেও মৃত্যু কামনা না করা ঃ হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : তোমাদের কেউ কোন কষ্টে নিপতিত হলে কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। একান্তই যদি করতে হয় তবে এরূপ বলা উচিত ঃ হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে জীবিত রাখ যতদিন আমার বেঁচে থাকা মঙ্গলজনক হয় এবং মৃত্যু দান করো যখন মৃত্যু আমার জন্য মঙ্গলজনক হয় (সহীহ্ মুসলিম # ৬৬২৪)।

কোরআন : তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি দয়াবান। আর যে কেউ বাড়াবাড়ি ও অন্যায়ভাবে তা করবে তাকে আগুনে দগ্ধ করব। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ (সূরা নিসা # ৪ : ২৯-৩০)।

(৩৯) কুলক্ষণ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : কুলক্ষণে বিশ্বাস করা

www.nagorikpathagar.org

শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার মনে এর ধারণা আসে না। তবে আল্লাহ্ পাক তাঁর উপর (মুমিন ব্যক্তির) ভরসার কারণে তা দূর করে দেন (তিরমিযী শরীফ # ১৫৬০)।

(৪০) জ্ঞানী ও নির্বোধ ঃ হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা.) থেকে বর্ণিত। হুজুর (সা.) বলেছেন : জ্ঞানী সে ব্যক্তি যে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য কাজ করে আর নির্বোধ ও অক্ষম সে ব্যক্তি যে তার নফসের দাবীর অনুসরণ করে আর আল্লাহ্র কাছে অযথা আশা পোষণ করে (তিরমিযী শরীফ # ২৪০১)।

কোরআন : বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান? বুদ্ধিমান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে (সূরা যুমার # ৩৯ : ৯)। হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন (সূরা তাহা # ২০ : ১১৪)।

সমাপ্ত

www.nagorikpathagar.org

তথ্যসূত্র

(১) তাফসীর মা'আরেফুল কোরআন-এর বাংলা অনুবাদ পবিত্র কোরআনুল করীম। অনুবাদক : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদী আরব।

(২) শব্দার্থে আল কুরআনুল মজীদ। অনুবাদক : মতিউর রহমান খান, আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।

(৩) আল কুরআনুল করীম। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

(৪) তাফসীরে আশরাফী। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী প্রণীত বয়ানুল কোরআন-এর বাংলা অনুবাদ, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা।

(৫) বোখারী শরীফ। হামিদিয়া লাইব্রেরী লিমিটেড, চক সার্কুলার রোড, ঢাকা।

(৬) সহীহ মুসলিম। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

(৭) সহীহ আবু দাউদ শরীফ। সোলেমানিয়া বুক হাউস, বাংলাবাজার, ঢাকা।

(৮) তিরমিযী শরীফ। সোলেমানিয়া বুক হাউস, বাংলাবাজার, ঢাকা।

(৯) সুনানু ইবনে মাজাহ শরীফ। সোলেমানিয়া বুক হাউস, বাংলাবাজার, ঢাকা।

(১০) সুনানে নাসাঈ শরীফ। মীনা বুক হাউজ, বাংলাবাজার, ঢাকা।

(১১) মেশকাত শরীফ। এমদাদিয়া পুস্তকালয়, বাংলাবাজার, ঢাকা।

(১২) রিয়াদুস সালেহীন। ইসলামিয়া কোরআন মহল, ঢাকা।

(১৩) হাদীসে রসূল। ঝিনুক পুস্তিকালয়, লিয়াকত এভিন্যু, ঢাকা।

www.nagorikpathagar.org

বাংলা বই বিশ্বময়..

বিশ্বের যেকোন স্থান থেকে অনলাইন ও ই-রিডার এ পড়ুন

iBooks kobo
Google play nook amazonkindle

আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন বাংলাবাজার মগবাজার
www.ahsanpublication.com
/ahsanpublication

ISBN : 978-984-8808-70-2